গ্র[illegible]াবলী সিরিজ

দামোদর গ্রন্থাবলী

(৪র্থ ভাগ)

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

দামোদর গ্রন্থাবলী

(৪র্থ ভাগ)

শুক্লবসনা সুন্দরী ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ২৲ টাকা

শুক্লবসনা সুন্দরী

প্রথমভাগ।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

(বয়স—২৫ বৎসর। ব্যবসায়—শিক্ষকতা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাস শেষ হয় হয় হইয়াছে। ওঃ! কি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। বৃষ্টির নাম নাই। পৃথিবী যেন শুষ্ক, আমার শরীরও শুষ্ক, আর বলিতে কি, আমার হাতও শুষ্ক—হাতে একটিও পয়সা নাই।

একখানি বই খুলিয়া বসিয়াছিলাম। পড়িব কি মাথা-মুণ্ড—শরীরেও সুখ নাই, মনেও সুখ নাই। বই বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় উঠিলাম। ভাবিলাম, কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় দুই দণ্ড বেড়াইয়া আসি।

এখানে বলা আবশ্যক, এ পৃথিবীতে আমার আপনার বলিতে কেহই নাই। মা-বাপ অনেক দিন পৃথিবীর সম্বন্ধ ছাড়িয়া গিয়াছেন, ভাই-ভগ্নী কেহই নাই, কাজেই আমি একা। কেবল এক ব্যক্তি অকৃত্রিম প্রণয়-ডোরে আমাকে বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার নিবাস। তিনি আমার ন্যায় নিতান্ত বেকার বা দুরবস্থাপন্ন নহেন। দুই একটি ভদ্রলোকের বাটীতে শিক্ষকতা করিয়া তিনি দশ টাকা উপায় করেন। তাহাতেই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। লোকটি অতি সরল, অতি আমোদী এবং অতি পরোপকারী। একবার তিনি বড় বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। আমি সেই সময় যথাসম্ভব যত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি নিয়ত আমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আর উভয়ের জীবিকাও প্রায় একরকম। সে জন্যও পরস্পরের হৃদয়ে সহানুভূতি ছিল। অদ্য পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই রমেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম, তিনি ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি আসিয়া তিনি আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—"ভাই দেবেন! বড় সু-খবর—বড় সু-খবর।"

আমি বলিলাম,—"কর কি রাস্তার মাঝখানে? গলা ছাড়! কি সু-খবর?"

রমেশ বলিলেন,—"ধন্য জগদীশ্বর! তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহার সীমা নাই। আমি হতভাগা, তোমার কোন উপকারেই লাগি না।"

আমি বলিলাম—"তুমি অনাবশ্যক গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া দিয়া কাজের কথা বল দেখি?"

রমেশ বলিল,—"তাই ত বলিতেছি। আমি যদি তোমার সামান্যমাত্র কাজেও লাগি, সে-ও আমার পরম আনন্দ। আমি যে খবর দিতেছি,—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"খবর দিতেছ কৈ? কেবল বৃথা বকামী করিতেছ। তোমার খবর মিছা কথা। চল, বেড়াইয়া আসি।"

রমেশ বলিলেন,—"কি? খবর মিছা কথা? খবরের প্রমাণ আমার পকেটে।"

এই বলিয়া রমেশ পকেট হইতে একখানি কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন এবং বলিলেন,—"খবর মিছা কথা? খবরের প্রমাণ আমার হাতে। আমি যে

খবর দিতেছি, তাহা বিশেষ ভাল বল বা নাই বল, আমি বলি, সে খবর খুব সু-খবর। সেই জন্যই আমার আনন্দ। আমার দ্বারা সে কাজটি ঘটিতেছে, ইহাতে আমার আরও আনন্দ।"

আমি বলিলাম,—"তুমি এতও বকিতে পার। তোমার দ্বারা কিছুই ঘটে নাই। যে এত বকে, তাহার দ্বারা কি কোন কাজ হয়?"

রমেশ বলিলেন, —"কি! হয় না? এই দেখ।"

এই কথা বলিয়া রমেশ হস্তস্থিত পত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি পত্র খুলিয়া পাঠ করিলাম,—

"এতদ্দ্বারা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে, খোরাকী ও বাসা-খরচ বাদে, মাসিক ১০০ এক শত টাকা বেতনে আমার বাটীতে থাকিয়া বালিকাগণের শিক্ষকতা ও তদনুরূপ অন্যান্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলাম।

তিনি শীঘ্র আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন, ইহাই অনুরোধ। ইতি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়।
'আনন্দধাম' শক্তিপুর।"

আমি পত্র পাঠ করিয়া অবাক্ হইলাম—ব্যাপারটা কি, বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"কাণ্ডটা কি রমেশ?"

রমেশ বলিলেন,—"সামান্য কথা। তোমার যেরূপ গুণ, যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে এ কার্য্য তোমার পক্ষে অতি সামান্য। সামান্যই হউক আর বড়ই হউক, আমার যত্নে তোমার যে একটুও উপকার হইল, ইহা আমার বড় অহ্লাদ।"

আমি বলিলাম,—"তা বেশ। এখন এ ব্যাপারটা কি, আমাকে বল।"

রমেশ বলিলেন,—"ব্যাপার তো তুমি নিজ চক্ষেই দেখিলে। তবে কখন্ শক্তিপুর যাইবে, বল।"

আমি বলিলাম,—"না জানিয়া শুনিয়া যাইব কি না, কেমন করিয়া বলিব?"

রমেশ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন,—"সে কি? জানিবে কি? শক্তিপুরের সুবিখ্যাত জমীদার, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, সুপ্রতিষ্ঠিত রাধিকাপ্রসাদ রায়ের কথা কে না জানে?"

আমি বলিলাম,—"আমি রাধিকাপ্রসাদ রায়ের নাম জানি, তিনি এক জন বড় জমীদার, তাহাও আমি শুনিয়াছি এবং তাঁহারা সপরিবারে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। আমি তোমাকে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। কেমন করিয়া এ পত্র তোমার হস্তগত হইল, কিরূপে এ কাজ যোগাড় হইল, তাহাই বল।"

রমেশ বলিলেন,—"যোগাড়—যোগাড়ের কথা কও কেন? বলি শুন। জান তো তুমি, আমি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম-পরিবার ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে বালক-বালিকার শিক্ষকতা করি।"

আমি বলিলাম,—"জানি, তার পর বল।"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এক দিন ঘোষমহাশয়ের দুইটি অবিবাহিতা কন্যাকে আমি তদ্‌গতচিত্তে মেঘনাদবধ কাব্য পড়াইতেছি। যেখানে—

'বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে;'

বলিয়া সীতা সরমার সমীপে পঞ্চবটী-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, সেই স্থানে আমাদের পড়া চলিতেছে। আমি ঘোষ মহাশয়ের বালিকাদ্বয়ের সমক্ষে কখন শিখি-শিখিনী নাচাইতেছি, করভ-করভী, মৃগশিশু প্রভৃতির আতিথ্য-সৎকার করিতেছি এবং তরু সহ নব-লতিকার বিবাহ দিতেছি, আর কখন বা

'———তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ———'

কেমন করিয়া দেখা যায়, তাহা বুঝাইতেছি। পড়া খুব চলিতেছে। এমন সময় আমাদের ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—'রমেশ বাবু, একটা কথা আছে।' আমরা হঠাৎ তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তিনি যে কখন্ সেখানে আসিয়াছেন, তাহা আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। তিনি আপনি বলিলেন,—'আমি অনেক্ষণ আসিয়াছি। পাছে আপনার ব্যাখ্যার ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া এতক্ষণ শব্দ করি নাই।' আমি বলিলাম,—'আমাকে কি বলিবেন? উঠিব কি?' তিনি বলিলেন,—'শক্তিপুরে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁহার বাটীর দুইটি মেয়ের জন্য এক জন সুযোগ্য সৎস্বভাবাপন্ন শিক্ষক পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। আপনার সন্ধানে এরূপ কোন লোক আছে কি?'—বলা বাহুল্য যে, তোমার কথা আমার মনে গাঁথাই ছিল। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। বলিলাম,— 'অতি সচ্চরিত্র সুযোগ্য লোক আমার সন্ধানে আছেন।' তিনি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,

—'আপনি আমাকে একটা বিশেষ উৎকণ্ঠা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন দেখিতেছি। লোকের জন্য আমি কয়দিন বড় চিন্তা করিতেছি। পূর্ব্বে আপনাকে বলিলে হয় ত এত দিন লোক স্থির করিয়া পাঠান পর্য্যন্ত যাইত। আপনি যখন শিক্ষক মহাশয়কে বিশেষ সচ্চরিত্র এবং সুযোগ্য লোক বলিয়া জানেন, তখন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে পরের কাজ এবং আমাকে দায়ী থাকিতে হইতেছে, সুতরাং একটু বিশেষ করিয়া জানা মন্দ নয়। আপনি যে লোকের কথা বলিতেছেন, তাঁহার কোন প্রশংসাপত্র আছে ?' আমি বলিলাম, 'রাশি রাশি।' তিনি বলিলেন,—'আপনি যদি দয়া করিয়া তাঁহার দুই একখানি প্রশংসাপত্র দেখান, তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। কল্য আসিবার সময় লইয়া আসিবেন কি ?' আমি বলিলাম, 'কল্য কেন, আমি অদ্যই আপনাকে তাহা দেখাইয়া দিব।' ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—'তাহা হইলে তো আরও ভাল হয়। বিদেশে যাইতে তাঁহার মত আছে তো ?" আমি বলিলাম,—'তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁহার মতামত সব জানি। বিদেশে যাইতে অথবা এ কর্ম্ম করিতে তাঁহার কোন অমত হইবে না, তাহা আমি বেশ জানি।' তিনি বলিলেন, 'শিক্ষক মহাশয় যখন আপনার বিশেষ বন্ধু, সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি, তখন তাঁহার এ কর্ম্ম হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।' ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলেন এবং আমিও চলিয়া আসিলাম—পড়ি তো উঠি না। তোমার প্রশংসাপত্র আমার কাছে সবই ছিল, তখনই লইয়া গিয়া ঘোষ মহাশয়ের কাছে ধরিয়া দিলাম। ঘোষ মহাশয় দেখিয়া বলিলেন,—'আপনার বন্ধু মহাশয় অতি সুযোগ্য লোক দেখিতেছি। ইনিই কর্ম্ম পাইবেন। এত প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন নাই। আমি দুইখানিমাত্র প্রশংসাপত্র সহ এখনই রাধিকা বাবুকে পত্র লিখিতেছি। অন্যান্য সমস্ত বৃত্তান্তও পত্রে লিখিয়া দিব, দুই দিন পরে পত্রোত্তর আসিবে ; তখন সংবাদ জানিতে পারিবেন। আপনার বন্ধু দেবেন্দ্র বাবু, যখন বলা যাইবে, তখনই শক্তিপুরে যাইতে পারিবেন তো ?' আমি বলিলাম,—'তখনই।' ঘোষ মহাশয় পত্র লিখিতে গমন করিলেন, আমিও চলিয়া আসিলাম।

"দুই দিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তৃতীয় দিন আমি যখন পড়াইতে গিয়াছি, তখন ঘোষ মহাশয় আসিয়া আমাকে রাধিকা বাবুর এই পত্র পাঠ করিতে দিলেন। আনন্দে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি বলিলাম,—'আপনি আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহাতে আমি যত উপকৃত, অদ্য আপনি এই পরম বন্ধুর জীবিকার সংস্থান করিয়া দিয়া আমাকে তদপেক্ষা অধিকতর উপকৃত করিলেন। অদ্য হইতে আমাকে কিনিয়া রাখিলেন।' ঘোষ মহাশয় শিষ্টাচার-বাক্যে আমাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন,—'কল্য প্রাতে আপনার বন্ধুকে একবার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইব।' আমি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে তোমার বাসায় ছুটিতেছি। পথেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ।"

এতক্ষণে রমেশের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইল। রমেশের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আমাকে মোহিত করিল। আমি বলিলাম,—'ভাই, আমি কি বলিয়া তোমাকে মনের কথা জানাইব ? এ জগতে তোমার ন্যায় বন্ধু দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী ; তোমার বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া যত আনন্দ হইতেছে, কর্ম্ম হইয়াছে বলিয়া তত আনন্দ হইতেছে না।"

রমেশ বলিলেন,—"তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, দেবেন, তাহার তুলনায় এ কিছুই নহে।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা বাসায় ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রমেশ বাবু ও আমি ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলাম। ঘোষ মহাশয় আমাকে যথেষ্ট আদর-অপেক্ষা করিয়া প্রীত করিলেন এবং আমার পাথেয় ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য অর্থ ও বিহিত উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

আমার জুতা, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিনিবার প্রয়োজন ছিল, তৎসমস্ত ক্রয় করিবার নিমিত্ত রমেশ বাবু ভার গ্রহণ করিলেন। আমি বাসায় আসিয়া অন্যান্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

বেলা ২টার সময় রমেশ বাবু আমার জিনিসপত্র আনিয়া দিলেন এবং সে রাত্রে আমাকে তাঁহার বাসায় আহার করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

আমি বেলা ৫টার মধ্যে জিনিসপত্র বাঁধিয়া রাখিয়া, অন্যান্য বিষয়ের বিহিত ব্যবস্থা করিয়া এবং যাঁহার যাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, রমেশের বাসায় আহার করিতে যাত্রা করিলাম।

প্রথমতঃ সেখানে আহার করিতে, তাহার পর বহুদিনের জন্য রমেশের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল। ১২টা বাজিয়া গেল। তখন আমি বাসায় ফিরিবার জন্য বাহির হইলাম। মনটা বড়ই উচাটন ছিল। এই চিরপরিচিত আত্মীয়গণকে ছাড়িয়া চলিতে হইতেছে—যাঁহাদের নিকট যাইতেছি, তাঁহারা কেমন লোক, তাহা জানি না, আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহাই বা কে বলিবে? যাঁহাদের শিক্ষকতা করিতে হইবে, তাঁহারা কেমন প্রকৃতির ছাত্রী, তাহাই বা কে জানে? জানি না, অদৃষ্টে কি আছে! বোধ হইতেছে যেন, এই ঘটনার সহিত আমার সমস্ত জীবন বাঁধা থাকিবে, যেন এই ঘটনা আজীবনকাল আমার সঙ্গ ছাড়িবে না। কি জানি, মন কেন এমন করিতেছে। জানি না জানি, বুঝি না বুঝি, মনটা বড়ই উদাস হইয়াছে। এমন বাঞ্ছনীয় সৌভাগ্য উপস্থিত, সাংসারিক ক্লেশ হইতে—এই ঘোর পয়সার টানাটানি হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় এখন করতলগত, তথাপি মন এমন হইল কেন? কেমন করিয়া বলিব? জানি না, মনের ভাব এমন কেন হইয়াছে!

পথে বাহির হইয়া ইচ্ছা হইল, সোজা পথে না ফিরিয়া একটু ঘুরিয়া যাই। হয় তো তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি বেড়াইতে বেড়াইতে সার্কুলার রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন সুবিমল চন্দ্র-কিরণে ধরণী সমুজ্জ্বল; সার্কুলার রোড জনহীন—নিস্তব্ধ। চন্দ্রালোকে সম্মুখে ও পশ্চাতে বহুদূর পরিষ্কাররূপ দেখা যাইতেছে। কোথাও একখানি গাড়ী নাই—একটি মানুষ নাই। কেবল স্থানে স্থানে এক এক জন পাহারাওয়ালা হয় গাছ হেলান দিয়া, না হয় কোন দোকানের পাটাতনে বসিয়া, না হয় কোন বাটীর বারান্দায় আশ্রয় লইয়া ঘুমাইতেছে। সারি সারি—রমণীয় গ্যাসালোক দপ-দপ করিয়া জ্বলিতেছে; বোধ হইতেছে যেন, কলিকাতার কণ্ঠে হীরক মালিকা সাজাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে আমি চলিতে লাগিলাম। প্রকৃতির প্রশান্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমি মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেমনভাবে চলিব, ছাত্রীগণের সহিত কেমন ব্যবহার করিব, ছাত্রীরাও সম্ভবতঃ আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, গৃহস্বামী জমীদার মহাশয় আমার সহিত কেমনভাবে ব্যবহার করিবেন, আমিই বা তাঁহাকে কিরূপ সম্মান করিব, ছাত্রীগুলি দেখিতে কেমন, তাঁহাদের সহিত আমার মনের ঐক্য ঘটিবে কি না, এই সকল বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনায় আমার মন নিবিষ্ট। তখন সহসা কে যেন ধীরে ধীরে আমার পৃষ্ঠদেশ কোমল-করে স্পর্শ করিল। আমার সমস্ত চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল; আমি অতীব বিস্ময় সহকারে করস্থ যষ্টি সজোরে ধারণ করিয়া ফিরিয়া চাহিলাম,—দেখিলাম কি?

দেখিলাম, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল, গ্যাসালোক-প্রদীপ্ত, সুবিস্তৃত পথিমধ্যে শুক্লবসনা সুন্দরী! সুন্দরী গম্ভীর ও অনুসন্ধিৎসুভাবে আমার বদনের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন—তাঁহার উর্দ্ধোত্তোলিত হস্ত পার্শ্বস্থ পথাভিমুখে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কামিনী কি স্বর্গের সুস্নিগ্ধ নিকেতন হইতে এ স্থলে ধীরে ধীরে অবতারিত হইলেন, অথবা সহসা ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইলেন?

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। এরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্বভাবে, এমন জনহীন স্থানে, এমন গভীর রাত্রিকালে সহসা সেই বিস্ময়জনক নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম; কি বলিতে হইবে, কি করিতে হইবে, তাহা আমার মনে হইল না। সুন্দরী প্রথমেই কথা কহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"পাথুরিয়াঘাটা যাইবার পথ কি এই?"

প্রশ্নকারিণীর বদনমণ্ডল আমি একবার বিশেষরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, তাঁহার বর্ণ পাণ্ডু, বদন যৌবন-শ্রীতে পূর্ণ—কিছু লম্বাকৃতি—বড় ক্ষীণতাযুক্ত। নয়নদ্বয় আয়ত, গম্ভীর, স্থির। অধরোষ্ঠ চঞ্চল। মস্তকে ঘন কৃষ্ণ নিবিড় কেশ-কলাপ। যুবতীর ব্যবহারে কোন প্রকার বিসদৃশ অথবা হীনজনোচিত ভাব পরিলক্ষিত হইল না। তাঁহাকে শান্ত ও স্থির-প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হইল। বোধ হইল, তিনি বিষাদভারে নিপীড়িত এবং নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত। তাঁহার সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার কথা কিছু দ্রুত। তাঁহার এক হস্তে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলী। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র এবং গাত্রাবরণী জামা পরিষ্কার ও শুক্লবর্ণ। কে এ রমণী এবং কেনই বা এই গভীর রাত্রিকালে রাজপথে আসিয়া অপরিচিত পুরুষ সমীপে উপনীত হইলেন, তাহা আমি অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা আমি নিঃসংশয়িতরূপে মীমাংসা করিলাম যে, এই ঘোর রাত্রিকালে

ও এতাদৃশ নির্জ্জন প্রদেশে এই রমণীর সহিত কথোপকথন করিয়া নিরতিশয় ইতর-স্বভাব মনুষ্যের মনেও কদাচ কোন দুরভিসন্ধি স্থান পাইতে পারে না, অথবা তাঁহার বাক্যের কোন বিরুদ্ধ অভিপ্রায় কল্পিত হইতে পারে না। যুবতী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি শুনিলেন কি? আমি জিজ্ঞাসিতেছিলাম, পাথুরিয়াঘাটা যাইবার কি এই পথ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"হাঁ, এই পথ দিয়া যাইলে পাথুরিয়াঘাটা যাওয়া যাইতে পারে। আমি প্রথমেই আপনার কথার উত্তর দিই নাই বলিয়া আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না; আমি সহসা আপনাকে এ স্থানে দেখিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন আমি আপনার এ সময়ে এ স্থানে আগমনের কোনই কারণ স্থির করিতে পারি নাই।"

"আমি কোন মন্দ কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আপনি সন্দেহ করিতেছেন কি? কেন? আমি তো কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই? সম্প্রতি আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল; এ অসময়ে এ স্থানে আমাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য প্রযুক্তই আসিতে হইয়াছে; কিন্তু আপনি আমাকে সন্দেহ করিতেছেন কেন?"

প্রয়োজনাতিরিক্ত অনুনয় ও উদ্বেগ সহকারে যুবতী কথা কয়টি বলিয়া সভয়ে আমার নিকট হইতে কিয়দ্দূর পিছাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে নিরুদ্বিগ্ন ও প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলাম। বলিলাম, 'আপনার সম্বন্ধে সন্দেহসূচক কোন ভাবই আমার মনে নাই এবং যতদূর সম্ভব, আপনার সাহায্য করিবার ইচ্ছা ব্যতীত আমার অন্য কোন প্রকার বাসনাও নাই। আপনি আমার চক্ষুর্গোচর হইবার পূর্ব্বে এই রাজপথ সম্পূর্ণরূপে জনহীন ছিল; তাহার পর হঠাৎ আপনাকে দেখায় আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে এবং তাহাই আমি ব্যক্ত করিয়াছি। সন্দেহের কথা আপনি মনে স্থান দিবেন না।'

যুবতী সন্নিহিত একটি বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন,—"আমি আপনার পদশব্দ শুনিয়া ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম, লোকটি ভদ্রলোক কি না,—তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করা যায় কি না। যতক্ষণ আপনি আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া না গেলেন, ততক্ষণ মনে কতই ভয়, কতই সন্দেহ হইতে লাগিল। তাহার পর অলক্ষিতভাবে আপনাকে স্পর্শ করিলাম।"

আমি ভাবিলাম, লুকাইয়া আসিয়া স্পর্শ করা কেন? ডাকিলে কি দোষ হইত? কি জানি? এ স্ত্রীলোকের সকলই আশ্চর্য্য!

সুন্দরী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি কি না, জানি না, আমি সম্প্রতি কোন দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সে জন্য সন্দেহের কোনই কারণ নাই।"

তাহার পর তিনি কি বলিতে হইবে বা কি করিতে হইবে, তাহাই স্থির করিতে না পারিয়া, কিছু অস্থির হইয়া উঠিলেন, হস্তস্থিত পুঁটুলী এক হস্ত হইতে অপর হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বারংবার সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এই সহায়হীনা বিপন্না স্ত্রীলোকের অবস্থা আমার হৃদয়ে আঘাত করিল; তাঁহাকে সাহায্য করিবার এবং বিপন্মুক্ত করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমার সর্ব্বপ্রকার বিচারশক্তি, সাবধানতা প্রভৃতির অপেক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। বলিলাম,—"নির্দ্দোষ কার্য্যে আপনি অনায়াসে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন। আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিতে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে সে প্রসঙ্গ আর মনেও করিবেন না। আপনার সমস্ত বিষয় জানিতে চেষ্টা করা আমার অধিকারের বহির্ভূত। এক্ষণে কি কার্য্যে আপনার সাহায্য করিতে পারি, তাহা বলুন, যদি তাহা আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।"

"আপনি বড়ই দয়ালু। আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আর একবারমাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানকার কিছুই জানি না। রাত্রি কি অনেক হইয়াছে? নিকটে কোথাও কি গাড়ী পাওয়া যায় না? আমি তো কিছুই জানি না। কলিকাতায় আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁহার নিকট যাইলে আমি সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব। কোথায় গাড়ী পাওয়া যায়, আপনি যদি আমাকে দেখাইয়া দিতেন এবং প্রতিজ্ঞা করিতেন, আমার যেখানে যখন ইচ্ছা, আমি চলিয়া যাইব, তাহাতে আপনি কোন বাধা দিবেন না—আর আমি কিছুই চাই না—আপনি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

অত্যন্ত চিন্তিতভাবে সুন্দরী সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; হস্তস্থিত পুঁটুলী বারংবার হস্তান্তরিত করিতে থাকিলেন এবং বারংবার সভয় ও সানুনয় দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

আমি করি কি? আশ্রয়হীনা, বিপন্না, অপরিচিতা এক স্ত্রীলোক অদ্য আমার করুণা-প্রার্থনায় সম্মুখে দণ্ডায়মান। নিকটে কোন চেনা লোকের বাটী নাই, পথ দিয়াও কেহ যাইতেছে না যে, কাহার সহিত একটা পরামর্শ করি। জানি না, এ স্ত্রীলোকের কি অভিপ্রায়, জানিলেও তাঁহার কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। ভবিষ্যৎ-ঘটনার ছায়া যে কাগজে লিখিতেছি, তাহাও যেন অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে, কাজেই এই কয় পংক্তিতে আত্মবিশ্বাসের রেখা দেখা যাইতেছে। তথাপি বল দেখি পাঠক, আমি এ অবস্থায় করি কি? অন্ততঃ যে উত্তর দিব, তাহা ভাবিবার জন্য একটু সময় চাই, একটু সময় পাইবার জন্য সুন্দরীকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি নিশ্চিত জানেন, এই গভীর রাত্রে আপনার কলিকাতাস্থ আত্মীয় আপনাকে সমাদর সহকারে স্থান দিবেন?"

"তাহাতে কোনই সংশয় নাই। আপনি কেবল বলুন যে, যখন যেরূপ ইচ্ছা আমাকে চলিয়া যাইতে দিবেন—আমার কার্য্যে কোন বাধা দিবেন না? আপনি কি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন?"

তৃতীয়বার প্রতিজ্ঞার কথা বলিবার সময় সুন্দরী আমার সমীপস্থ হইলেন এবং সহসা আমার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কৃশ হস্ত আমার বক্ষোদেশে স্থাপিত করিলেন। ভাবিয়া দেখ পাঠক, এক জন স্ত্রীলোক—বিপন্না, আশ্রয়হীনা, কাতর স্ত্রীলোক আমাকে বার বার সকরুণ-ভাবে জিজ্ঞাসিতেছেন,—'আপনি কি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন?'

"হাঁ"—আমার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল। কি ভয়ানক! এই একটি সতত ব্যবহৃত, সর্ব্বজনরসনাস্থ ক্ষুদ্র বাক্য আমাকে দারুণ সত্য-বন্ধনে বদ্ধ করিল। ওঃ! এখনও লিখিতে লিখিতে কাঁপিয়া উঠিতেছি।

তাহার পর আমরা সিমলার অভিমুখে চলিলাম। যে রমণী আমার সঙ্গে চলিলেন, তাঁহার নাম, বৃত্তান্ত, জীবনের উদ্দেশ্য সকলই আমার পক্ষে অপরিমেয় রহস্যপূর্ণ। সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায়। আমি সেই দেবেন্দ্রনাথ বসু বটি তো? এই সেই বীডন ষ্ট্রীট বটে তো? আমি নিস্তব্ধ—অবাক্—অসীম চিন্তাসাগরে ভাসমান। যুবতীর বাক্যে আবার আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল।

"আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কলিকাতার অনেক লোককে চেনেন কি?"

"হাঁ, অনেককে চিনি।"

যুবতী বড়ই সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"অনেক ধনবান্ বড়লোককে চেনেন কি?"

আমি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম,—"কাহাকে কাহাকে চিনি।"

"রাজ উপাধিকারী অনেক লোককে চেনেন?" প্রশ্নসহ যুবতী আমার বদনের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

আমি উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"আমি ভরসা করি, আপনি এক জন রাজাকে জানেন না।"

"তাঁহার নাম বলিবেন কি?"

সুন্দরী মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় উর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া নাড়িতে নাড়িতে উচ্চৈঃস্বরে পরুষভাবে বলিলেন,—"আমি পারি না—সে নাম উচ্চারণ করিতে হইলে আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ি।" তাহর পর সুন্দরী অনতিবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন,—"বলুন, আপনি কোন্ রাজাকে জানেন না?

এই সামান্য বিষয়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তিন জন রাজার নাম করিলাম। এক জন রাজার পুস্তকালয়ের আমি কিছু দিন অধ্যক্ষ ছিলাম, আর এক জনের একটি পুত্রকে কিছু দিন পাঠ বলিয়া দিতাম, আর এক জনকে সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইবার জন্য কিছু কাল নিযুক্ত ছিলাম।

সুন্দরী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন,—"আঃ! তবে আপনি তাঁহাকে জানেন না! কিন্তু আপনি নিজেও কি এক জন বড় জমীদার?"

"আমি এক জন সামান্য শিক্ষক মাত্র।"

আমার মুখ হইতে এই উত্তর নির্গত হইবামাত্র যুবতী তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতা সহকারে আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবং আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—"বড় জমীদার নহেন—ধন্য জগদীশ্বর! আমি তবে আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি।"

এতক্ষণ আমি ক্রমাগত আমার প্রবর্দ্ধমান কৌতূহল দমন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু অতঃপর আর তাহা পারিলাম না। জিজ্ঞাসিলাম,—'আমার বোধ হইতেছে কোন বিশেষ বিখ্যাত জমীদারের উপর বিরক্ত হইবার আপনার গুরুতর কারণ আছে। আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনি যে জমীদারের নাম পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না,

তিনি হয় ত আপনার প্রতি কোন কঠিন অত্যাচার করিয়া থাকিবেন। সেই ব্যক্তির জন্যই কি আপনাকে এই অসময়ে এরূপ স্থলে আসিতে হইয়াছে ?’

তিনি উত্তর দিলেন,—“আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমাকে আর সে কথা বলিতে বলিবেন না। আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিয়াছি। এক্ষণে তার কোন কথা না কহিয়া আপনি যদি দয়া করিয়া একটু দ্রুত চলেন, তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হইব।”

আবার আমরা দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না। অলক্ষিতভাবে আমি এক একবার তাঁহার বদনের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। বদনের সেই ভাব। ওষ্ঠাধর সংলগ্ন; ললাটের ক্রুদ্ধভাব; নেত্রদ্বয়ের সতেজ অথচ উদ্দেশ্য-বিহীন সম্মুখ-দৃষ্টি। আমরা প্রায় হেদোর স্কুলের নিকটস্থ হইয়াছি, এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসিলেন, “আপনি কি কলিকাতাতেই থাকেন ?”

আমি বলিলাম,—‘হাঁ’, কিন্তু তখনই মনে হইল, কি জানি, সুন্দরী যদি আমার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেন অথবা উপদেশ জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার ভবনত্যাগ হেতু তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে; এ জন্য অগ্রেই তাঁহার আশাভঙ্গের সম্ভাবনা তিরোহিত করিয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া বলিলাম, “কিন্তু কল্য হইতে এখন কিছু দিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিতেছি। আমি বিদেশে যাইতেছি।”

তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—“কোথায় ? উত্তর-অঞ্চলে কি দক্ষিণ-অঞ্চলে ?”

আমি বলিলাম, এখান হইতে উত্তরে—শক্তিপুরে।”

তিনি সাদরে বলিলেন,—“শক্তিপুরে! আহা! আমিও এখনই আপনার সঙ্গে সেখানে যাইতে পারিতাম, এক সময়ে আমি শক্তিপুরে বড়ই সুখে ছিলাম।”

এই সূত্রে সুন্দরীর অপরিজ্ঞাত কাহিনীর কিয়দংশ জানিতে চেষ্টা করিবার জন্য আবার আমার কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম,—“বোধ হয়, সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তিপুর প্রদেশেই আপনার জন্ম হইয়াছিল ?”

তিনি উত্তর দিলেন,—“না, হুগলী জেলা আমার জন্মভূমি। আমি অত্যল্পকাল শক্তিপুরে থাকিয়া সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম। সুন্দর—স্বাস্থ্যপ্রদ হইতেও পারে; কিন্তু আমি সে খোঁজ রাখি না। সেখানকার কেবল আনন্দধাম নামক পল্লী আর আনন্দধাম নামক বাটী দেখিতে আমার সাধ করে।”

আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। আমার মনের তখন ঘোর কৌতূহলাকুল অবস্থা, তাহার উপর এই অপরিজ্ঞেয়া রহস্যপূর্ণ সঙ্গিনী, আমাকে নিয়তি যে রাধিকা বাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইতেছে, সেই রাধিকা বাবুর সেই বাটীর নাম এবং সেই পল্লীর নাম উচ্চারণ করিয়া বিস্ময়ে আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল!

আমি দাঁড়াইবামাত্র সুন্দরী সভয়ে চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেহ কি পশ্চাৎ হইতে আমাদের ডাকিতেছে ?”

“না, না, কেহ ডাকে নাই—কোন ভয় নাই। কয়েক দিবস পূর্ব্বে এক জন লোকের মুখে আমি আনন্দধামের নাম শুনিয়াছিলাম—আজি আবার আপনার মুখে সেই নাম শুনিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।”

সুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—“শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর স্বর্গলাভ হইয়াছে, তাঁহার স্বামীও জীবিত নাই। হয় ত তাঁহার ক্ষুদ্র কন্যাটির এত দিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জানি না, এখন কে আনন্দধামে আছেন। যদি সে বংশের এখনও কেহ কেহ সেখানে থাকেন, আমি বরদেশ্বরীর মায়ায় তাঁহাদিগকেও নিশ্চয়ই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিব না।”

যুবতী আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু পার্শ্বে, অনতিদূরে, এক জন পাহারাওলাকে দেখিয়া তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সভয়ে আমার বাহু ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে কি ?”

পাহারাওয়ালা একটা রেলের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা দিতেছিল; আমাদিগকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু যুবতী বড়ই ব্যাকুল ও কাতর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “গাড়ী দেখিতে পাইতেছেন কি ? আমি বড় ক্লান্ত ও ভীত হইয়াছি। আমি গাড়ীর ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।”

আমি বলিলাম,—“হেদোর ধারে যে গাড়ীর আড্ডা ছিল, তাহা আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি, সেখানে একখানিও ছিল না। এখন হয় সম্মুখস্থ বীডন স্কোয়ারের গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত যাওয়, না হয় কোন চল্‌তী গাড়ী পাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।”

আবার আমি শক্তিপুর-সম্বন্ধীয় কথা উত্থাপন করিলাম। বৃথা চেষ্টা। গাড়ীর ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া যাইবার জন্য তাঁহার এক্ষণে এমন ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে যে, আর কোন কথাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা যেখান দিয়া যাইতেছিলাম, তাহারই অনতিদূরে একটি বাটীর দ্বারে একখানি গাড়ী আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে একটি লোক নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি তখনই সেই গাড়ীর নিকটস্থ হইয়া গাড়োয়ানকে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—"যদি আপনারা গঙ্গার ধারের দিকে যান, তবে লইতে পারি। আমার সেই দিকেই আস্তাবল। অন্য দিকে আমি যাইতে পারিব না। আমার ঘোড়া মারা যাইবে।"

সুন্দরী বলিলেন,—"তাহা হইলেই চলিবে। তাই চল।" তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, গাড়োয়ান নেশাখোর নহে, নিতান্ত অভদ্র বলিয়াও বোধ হইতেছে না, আমি সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত শেষ অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন,—"না, না, না। আমি বেশ নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছি—স্বচ্ছন্দ হইয়াছি। আপনি যদি ভদ্রলোক হন, তাহা হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। গাড়োয়ানকে যতক্ষণ আমি থামিতে না বলি, ততক্ষণ চলিতে বলিয়া দিউন। আমি বিদায় হই। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ।" গাড়ীর দরজায় আমার হাত ছিল। তিনি উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আমি দুঃখিনী। আমাকে ক্ষমা করিবেন; আপনাকে শত ধন্যবাদ।"

তাহার পর তিনি আমার হস্ত সরাইয়া দিলেন। গাড়ী চলিল। জানি না কেন, আমি গাড়ীর পশ্চাতে একটু ছুটিলাম; ভাবিলাম, গাড়ী থামাই; আবার পাছে তিনি ভীত হন ভাবিয়া অগ্রপশ্চাৎ করিতে লাগিলাম। একবার অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম, কিন্তু সে স্বর শকটচালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্রমশঃ শকটের চক্রধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে গাড়ী অন্ধকারে মিলাইয়া গেল —শুক্লবসনা সুন্দরী চলিয়া গেলেন।

প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল, আমি পথের সেই পার্শ্বেই রহিয়াছি। এক একবার যন্ত্রপুত্তলীর ন্যায় দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেছি, আবার তখনই স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছি; এখনই যে সকল ঘটনা ঘটিল, সে সকলই যেন স্বপ্ন; আবার যেন কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ভাবিয়া মন নিতান্ত ত্যক্ত ও কাতর হইতে লাগিল, অথচ কি করিলে যে ভাল হইত, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। আমি তখন কোথায় যাইতেছি, কি বা কবিব, সকলই ভুলিয়া গেলাম; আমার চিত্তে ঘোর চিন্তাজনিত বিশৃঙ্খল ভাব ব্যতীত আর কিছুরই সংজ্ঞা ছিল না। এমন সময় আমার অব্যবহিত পশ্চাদাগত এক দ্রুতগামী শকটের চক্র-নির্ঘোষ শ্রবণে আমার সংজ্ঞার সঞ্চার হইল—আমার জাগ্রত নিদ্রা ভাঙ্গিল।

আমি বীডন গার্ডেনের উত্তরপশ্চিম কোণে ফুটপাতের উপর দাঁড়াইলাম। স্থানটি অন্ধকার—আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। বিপরীত দিকে বারন্দার নিম্নে এক জন পাহারাওয়ালা বসিয়া ছিল। গাড়ীখানি আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী-খানি বগী; তাহার উপর দুই জন লোক। এক জন বলিল,—"থামো! ওখানে এক জন পাহারাওয়ালা রহিয়াছে,—উহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।"

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অনতি-দূরে গাড়ী থামিল। প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসিল,—"পাহারাওয়ালা, এ পথ দিয়া এক জন স্ত্রীলোক যাইতে দেখিয়াছ কি?"

"কেমন ধারা স্ত্রীলোক বাবু?"

"বাদামের রঙ্গের কাপড় পরা,—"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"না, না। আমরা তাহাকে যে কাপড় দিয়াছিলাম, তাহা তাহার বিছানায় পড়িয়া ছিল। নিশ্চয়ই সে প্রথমে আমাদের নিকট যে কাপড় পরিয়া আসিয়াছিল, সেই কাপড় পরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পাহারাওয়ালা, সাদা কাপড়-পরা—সাদা কাপড়-পরা মেয়েমানুষ।"

"না বাবু, আমি দেখি নাই।"

"যদি তুমি কিংবা পুলিসের কোন লোক তাহাকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকে এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে। এই কাগজ লও, ইহাতে ঠিকানা লেখা আছে। আমি পাঠাইবার খরচা এবং উচিতমত বখশীস্ দিব।"

পাহারাওয়ালা সাগ্রহে কাগজখানি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসিল,—"কি জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করিব মহাশয়? সে করিয়াছে কি?"

"সে পাগল,—পলাইয়া আসিয়াছে। ভুলিও না। সাদা কাপড়-পরা মেয়েমানুষ। চল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"সে পাগল—পলাইয়া আসিয়াছে।" এই কয়েকটি কথা আমার জ্ঞানকে আর এক দিকে লইয়া চলিল। এখন মনে হইতে লাগিল, 'তাঁহার কোন কার্য্যেই আমি বাধা দিব না,' আমার এই প্রতিজ্ঞার পর তিনি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, হয় স্ত্রীলোকটি স্বভাবতই চঞ্চল, না হয় লক্ষ্যশূন্য, না হয় ভূতপূর্ব্ব কোন ভীতিজনক দুর্ঘটনা হেতু তাঁহার মানসিক শক্তি কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত। কিন্তু ইহা আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, সম্পূর্ণ পাগ্‌লামীর কোন চিহ্নই আমি তাঁহার ব্যবহারে দেখিতে পাই নাই।

আমি করিলাম কি? যাহা করিলাম, তাহার দুই মীমাংসা সম্ভবে। এক, হয় ত আমি এক জন অকারণ উৎপীড়িতা স্ত্রীলোকের নিষ্কৃতির সহায়তা করিলাম। আর না হয় ত, যে দুর্ভাগিনী উন্মাদিনীর কার্য্য আমার ধীরভাবে সংযত করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া তাহাকে এই জনাকীর্ণ কলিকাতার মাঝখানে ছাড়িয়া দিলাম। বড় শক্ত কথা! এ সকল কথা পূর্ব্বে কেন ভাবি নাই বলিয়া এখন আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম। শয়নের চেষ্টা অনর্থক। সে অস্থির চিন্তা-সমাকুল চিত্তে কি ঘুম আইসে? আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমাকে শক্তিপুর যাত্রা করিতে হইবে। ভাবিলাম, অধ্যয়ন করিলে হয় ত চিন্তার কতকটা শান্তি ঘটিবে। কিন্তু পুস্তকের পত্র ও আমার চক্ষু এতদুভয়ের মধ্যে সেই শুক্লবসনা সুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইল;—পড়া হইল না। আহা! সে আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকের কি কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে? এ চিন্তা করিতে সাহস হইল না—সভয়ে এ চিন্তাকে মন হইতে দূর করিলাম। কিন্তু তথাপি নানা প্রকার অপ্রীতিকর প্রশ্ন স্বতই মনে সমুদিত হইতে লাগিল। কোথায় তিনি গাড়ী থামাইয়াছেন? এখন তাঁহার কি অবস্থা? যাহারা বন্দী করিয়া যাইতেছিল, তাহারা কি তাঁহার সন্ধান পাইয়া ধরিতে পারিয়াছে? অথবা এখনও কি তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? তিনি এবং আমি আমরা উভয়েই কি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথ দিয়া অপরিজ্ঞেয় ভবিষ্যতের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে চলিতেছি? আবার কি সেই নির্দ্ধারিত স্থানে আমাদের পুনঃ সাক্ষাৎ ঘটিবে?

বাসার দরজা বন্ধ করিয়া কলিকাতার আমোদ, বন্ধু-বান্ধব এবং এখানকার ছাত্রবর্গের মায়া ত্যাগ করিয়া যখন আমার প্রস্থান করিবার ও জীবন-নাটকের এক নূতন অঙ্কে প্রবেশ করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন যেন আমার চিন্তার কতকটা নিষ্কৃতি হইল। রেলওয়ে ষ্টেশনের মহা গোলমালে আমার চিত্ত আরও একটু প্রশমিত হইল।

গোল, উৎকণ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে। তিনটি ষ্টেশন যাওয়ার পর গাড়ীর কলখানি ভাঙ্গিয়া গেল। মহা বিপদ্! আমাকে অগত্যা সেই স্থানে নিরুপায় হইয়া কয়েক ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইল। যখন আর এক নূতন কল আসিয়া আমাকে শক্তিপুরে পৌছিয়া দিল, তখন রাত্রি দশটা। অন্ধকার যাহার নাম। রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের গাড়ী আমার নিমিত্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। সে অন্ধকারে গাড়ী কি ছাই দেখিতে পাওয়া যায়? অতি কষ্টে গাড়ীতে উঠিলাম। আমার অত্যধিক বিলম্ব হওয়ায় কোচ্‌ম্যান আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিল; এ জন্য আমার সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিল না। কোচ্‌ম্যান কথা কহুক আর নাই কহুক, গাড়ী চলিতে লাগিল। রাত্রি যখন প্রায় বারোটা, তখন গাড়ী গিয়া রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের বাটীতে পৌছিল। এক জন উচ্চশ্রেণীর চাকর আমাকে 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, বাটীর লোকজন সকলেই শয়ন করিয়াছেন, আজ রাত্রে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। আমি সে জন্য বড় আগ্রহও করিলাম না। আমার আহার্য্য প্রস্তুত ছিল, যথাসাধ্য আহার করিলাম। তাহার পর লোকটি আমাকে শয়ন করিবার স্থানে লইয়া গেল। আমি কল্য রাত্রে নিদ্রা যাই নাই—অঙ্গও ক্লান্তি কিছু মন্দ হয় নাই, শয়ন করিলাম। এখন স্বপ্নদেবী কত কি রঙ্গ দেখাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর মূর্ত্তি আমার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া আবার দেখা দিবেন কি? হয় ত এই অ নন্দ-ধামের ব্যক্তিগণের অপরিচিত আকৃতিই আমার নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইবে। মনে হইল, এ বড় মন্দ নয়; যাহাদের কোন ব্যক্তির সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই, আমি তাহাদের বাটীতে আজ পরমাত্মীয়ভাবে নিদ্রা দিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বেলা হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিবামাত্র পূর্ব্বপরিচিত লোকটি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার তখন যাহা প্রয়োজন, তাহারা ব্যবস্থা করিয়া দিল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া পুনরায় সেই ঘরে আসিবামাত্র এক জন প্রাচীনা স্ত্রীলোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত দুই চারি কথা কহিয়া বুঝিলাম যে, তিনি আমার ভবিষ্যৎ ছাত্রীগণের অভিভাবিকা। তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর মুখে শুনিলাম, আমার ছাত্রীদ্বয়ের মধ্যে এক জনই অধ্যয়নানুরাগিণী, অপরা তাঁহার সঙ্গের সাথী মাত্র। যাঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ আছে, তাঁহার নাম লীলাবতী, তিনি রাধিকাপ্রসাদ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। রাধিকাপ্রসাদ রায় স্ত্রী-পুত্রহীন; তাঁহার শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ; বয়সও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং তাঁহার বিবাহ করিবার ও পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই লীলাবতী তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী। তদ্ভিন্ন লীলাবতীর যে স্বাধীন সম্পত্তি আছে এবং তাঁহার পিতা, বিবাহের পর কন্যা যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন বলিয়া উইলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও প্রচুর সম্পত্তি। তাঁহার বয়স প্রায় সতের বৎসর। আমার দ্বিতীয়া ছাত্রীর নাম মনোরমা। তিনি লীলাবতীর মাসতুতো ভগ্নী। এ সংসারে মনোরমার আপনার বলিতে কিছুই নাই। তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, সহোদর নাই, সহোদরা নাই। শক্তিপুরের রায়-পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বিবাহাদি বিষয়ে যেরূপ উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, মনোরমার পিতা-মাতা খাঁটী হিন্দু ছিলেন বলিয়া তাহা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার গৌরীদানের ফললাভার্থ আট বৎসর বয়সের মধ্যেই মনোরমার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে মনোরমার সে স্বামীও নাই—মনোরমা বিধবা। লীলাবতী বাল্যকালে ক্রমাগত মনোরমার সহিত একত্র থাকিতেন, খেলা করিতেন ও বেড়াইতেন। মনোরমার স্বামি-বিয়োগের পর হইতে লীলাবতী জেদ করিয়া তাহাকে এখানে আনিয়াছেন। মনোরমার বয়স প্রায় উনিশ। দুই ভগ্নীর একের প্রতি অপরের মমতা সহোদরার অপেক্ষাও অধিক। মনোরমা পড়িতে তত ভালবাসিতেন না, কিন্তু লীলাবতী পড়াশুনা বড় ভালবাসেন। স্নেহপরায়ণা মনোরমার সমস্ত বাসনা লীলাবতীর সুখের উদ্দেশে লক্ষিত। লীলাবতী পড়াশুনা করিলে সুখী হন; কাজেই মনোরমার পড়াশুনা করিতে হয়। লীলাবতী পিতৃমাতৃহীনা; রুগ্ন খুল্লতাত তাঁহার একমাত্র অভিভাবক।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া আমি বিস্তর উপকৃত হইলাম। যাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের বৃত্তান্ত যতদূর সম্ভব পূর্ব্ব হইতেই জানা আবশ্যক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাধিকাপ্রসাদ রায় মাহাশয়ের সহিত কোন্ সময়ে আমার আলাপ হইবে?"

অন্নপূর্ণা দেবী বলিলেন,—"কর্ত্তার সহিত কখন্ দেখা হইবে, তাহা বলা সহজ নয়। তিনি সর্ব্বদা শরীর ও ঔষধ লইয়া যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে তাঁহার সহিত দুই এক দিনের মধ্যে দেখা হইবে কি না, বলিতে পারি না। আপনার আগমন-সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। হয় ত এখনই চাকর আপনাকে ডাকিতে আসিবে। তাঁহার ইচ্ছার কথা আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আপনার ছাত্রীদের মধ্যে লীলাবতীর আজ সামান্য অসুখ করিয়াছে; এ জন্য বোধ হয়, তিনি এ বেলা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। মনোরমার সহিত আপনার এখনই সাক্ষাৎ হইবে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাকে সঙ্গে লইয়া এক সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠ মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য কৌচ, চেয়ার, সোফা, আল্‌মারী প্রভৃতিতে পূর্ণ। পদতলে অতি রমণীয় কার্পেট ঝলসিতেছে। একখানি পরম রমণীয় মেহগিনী-টেবিলের উপর নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ, নয়নবিনোদন লেখনী ও মস্যাধার-সমূহ এবং কয়েকখানি পুস্তক পতিত রহিয়াছে। কক্ষের এক দিকে একটি হারমোনিয়ম, তাহার বিপরীত দিকে পিয়ানোফোর্ট রহিয়াছে। সুবিস্তৃত কক্ষমধ্যে দুইখানি টানা পাখা দুলিতেছে। অন্নপূর্ণা দেবী সেই গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এইটি আপনার ছাত্রীগণের পড়িবার ঘর।"

একটি সুগঠিত দেহ-সম্পন্না যুবতী বাতায়ন-মুখে দাঁড়াইয়া গৃহসংলগ্ন উদ্যান-দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। অন্নপূর্ণার কথা শুনিয়া সুন্দরী আমাদের দিকে ফিরিলেন। আমি বুঝিলাম, যুবতীর দেহের গঠন যেরূপ সুপরিণত ও সুসংবদ্ধ, তাঁহার বদন শ্রী তদনুরূপ নহে। যুবতী শ্যামাঙ্গী। তিনি নিকটস্থা হইয়া

বলিলেন,—"কালি আপনার আসিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমরা অনেক রাত্রি দেখিয়া কালি আপনার আসা হইল না স্থির করিয়াছিলাম। আপনি হয় ত রাত্রে বাটীর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে কত কি ভাবিতেছেন। এত রাত্রিতে আপনি যে আসিবেন, তাহা আমরা কেহই ভাবি নাই। লোকজনকে আপনার আসার কথা বলা ছিল। রাত্রিতে আপনার কোন প্রকার অসুখ কি অসুবিধা হয় নাই তো?"

আমি বলিলাম, "না, আমার কোনই অসুবিধা হয় নাই। আমার আসিতে যেরূপ বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে আমি যে ষ্টেশনে গাড়ী পাইব অথবা এখানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইব, তাহা প্রত্যাশা করি নাই।"

এই সময়ে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ইঁহারই নাম মনোরমা; ইনি আপনার এক জন ছাত্রী।"

এই বলিয়া তিনি আমাদের সকলকেই বসিতে বলিলেন। মনোরমা ও আমি দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একখানি কৌচের উপর বসিলেন। কল্য আসিতে কেন এত বিলম্ব ঘটিয়াছিল, মনোরমা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একবার লীলাবতীকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। আমি মনোরমা ও লীলাবতীর সহিত কিরূপভাবে চলিব, তাঁহাদের সহিত কিরূপ আত্মীয়তা করিব এবং তাঁহাদের কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা মনে মনে আলোচনা করিলাম। তাঁহারা আমার ছাত্রী হইলেও তাঁহাদের সহিত বিশেষ সম্মান-সূচক ব্যবহার করাই বিধেয়। আর তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা যথেষ্ট হইলেও আমি কদাচ তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিব না। তাঁহাদের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে আমি প্রাণপণ যত্নবান্ হইব বটে, কিন্তু আমি কখনও তাঁহাদের কোন বিষয় স্বেচ্ছায় জানিতে চেষ্টা করিব না এবং যাহা আমার লক্ষ্যের মধ্যে নহে, তাহার মধ্যে আমি থাকিব না। আমাকে নীরব দেখিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"এই নূতন স্থানে নূতন লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া দিন কাটাইতে হইবে, তাহাই আপনি ভাবিতেছেন কি?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"না, সে চিন্তা আমার মনে একবারও উদয় হয় নাই।"

মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনি তাহা ভাবুন আর নাই ভাবুন, আপনাকে এখানে কেমন করিয়া দিন কাটাইতে হইবে, তাহা এ সময় বলিয়া দেওয়াই ভাল। এই ঘর আমাদের পড়ার ঘর। আপনি প্রাতঃকালে দয়া করিয়া এ দিকে আসেন, ভ লই, না আসেন, সে-ও ভাল। আমাদের পড়ার সময় বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত। এইটুকু সময় আমাদের জন্য আপনার কষ্ট করিতে হইবে—আপনার জন্যও আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে। এই অবুঝ মেয়েমানুষের জাতিকে যাহা হইবার নহে, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা আপনার কষ্টের একশেষ- আর আমরা মেয়েমানুষ, যাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদেরও কষ্টের একশেষ। পড়াশুনায় আমার কোন বাতিক নাই, আমি উহার ধারও ধারি না। তবে লীলা পড়ার জন্য পাগল। সে যাহা এত ভালবাসে, কাজেই আমাকেও তাহা একটু ভালবাসিতে হয়। কারণ, লীলার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা, লীলার ভালতে আমার ভাল, আমার জীবনের লীলাই সর্ব্বস্ব। দিনের মধ্যে আমাদের জন্য আপনার দুই ঘণ্টামাত্র কষ্ট করিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশিষ্ট সময় আপনি যাহা খুসী করিতে পারেন। ইচ্ছা হয়, আপনি আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসিয়া লেখাপড়াও করিতে পারেন; ইচ্ছা হয়, এই বাগানে বেড়াইতে পারেন; ইচ্ছা হয়, কাকা মহাশয় হয় ত আপনাকে যে দুই একটি কাজ দিবেন, তাহাও করিতে পারেন; আর ইচ্ছা হয়, দয়া করিয়া আমাদের ঘরে আসিয়া গল্প-গুজব করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের উপকার বৈ অনুপকার নাই। বাটীর যিনি কর্ত্তা, তিনি শরীর লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার শরীর যে কিসে থাকে, কিসে থাকে না, তাহা কেবল তিনিই বুঝেন। বোধ হয়, তাঁহার রোগ রোগই নহে। হয় ত তিনি আপনাকে আজি একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, দুই চারি কথায় তাঁহার রকমসকম দেখিয়া, তিনি যে কি ধাতুর লোক, তাহা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার এক্ষণে আর কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার সহিত আপনার মাসের মধ্যে এক দিন করিয়াও সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না সন্দেহ। কাজেই এখানে সমস্ত দিন আপনার বনবাস বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছি, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, তখনই আপনি দয়া করিয়া এই পড়িবার ঘরে আসিতে পারেন।"

আমি মনোরমার কথাগুলি কখন বা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ও হাসিতে হাসিতে এবং কখন বা গম্ভীরভাবে শ্রবণ করিলাম। শুনিয়া বুঝিলাম যে, স্ত্রীলোকটি বড় বুদ্ধিমতী এবং বড়ই সরলা।

মনোরমা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আপনি শিক্ষক, আমরা ছাত্রী; সুতরাং আমাদের কার্য্যাদির বিচার করিতে আপনার অবশ্যই অধিকার আছে। কাজ হইয়া যাওয়ার পর ভৎর্সনা করা বা উপদেশ দেওয়া, উভয়ই বৃথা। এই জন্যই আমরা সমস্ত দিন কেমন করিয়া কাটাইব, তাহা এই সময় জানান আবশ্যক বোধ করিতেছি। সকালে উঠিয়া অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কখন বাগানে বেড়ান, কখন গল্প করা, কখনও মাসিকপত্রাদি পাঠ, কখন সেলাই করা, মোজা বোনা ইত্যাদি রকম রকম কার্য্যে ও অকার্য্যে আমাদের দিন কাটে। সন্ধ্যার পর লীলা কোন দিন হারমোনিয়ম, কোন দিন বা পিয়ানো বাজায়, আমরা সকলে শুনি। এইরূপে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে নিদ্রার আয়োজন করা হয়। লীলা হারমোনিয়ম বাজাইতে পারে। সে যাহা করে, তাহাই আমার খুব ভাল বোধ হয়। লীলা ছেলেমানুষ—এত বুদ্ধি। আজি তাহার একটু অসুখ করিয়াছে, এই জন্য এ বেলা আপনার সহিত দেখা করিতে পারিল না। যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বৈকালে আপনার সহিত দেখা করিবে।"

আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত মনোরমার কথা শুনিলাম এবং মনে মনে তাঁহার সরলতা, লীলার প্রতি স্নেহ প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

মনোরমা আবার বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়! লীলাবতী সুরঞ্জিত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিতে ভালবাসে। কলিকাতার সম্প্রদায়-বিশেষের ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণের ন্যায় সে সতত শুক্লবসনা যোগিনী সাজিয়া থাকিতে ভালবাসে না। তাহার যাহা রুচি, তাহা আপনাকে বলা ভাল। আপনি সে জন্য তাহাকে কখনও অনুযোগ করিবেন না, তাহাই আমার অনুরোধ।"

এখন হঠাৎ মনোরমার বদনবিনির্গত শুক্লবসনা কথাটা আমার চিন্তা-তরঙ্গকে আর এক পথে লইয়া চলিল। সেই "শুক্লবসনা সুন্দরীর" আমূল-বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে মনে আসিল। এ কথাও মনে পড়িল যে, সেই 'শুক্লবসনা সুন্দরী' এই আনন্দধামের স্বর্গীয়া কর্ত্রী শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর নিতান্ত অনুরাগিণী। তখন আমার ইচ্ছা হইল যে, যত দিন এ স্থানে থাকিতে হইবে, তাহার মধ্যে সেই অজ্ঞাতকুলশীলা শুক্লবসনা সুন্দরীর সহিত বরদেশ্বরী দেবীর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহার সন্ধান করিতে হইবে। সে সন্ধান করিলে হয় ত সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর নাম এবং পরিচয় জানিতে পারা যাইবে।

আমি বলিলাম,—"কোন আত্মীয়া কামিনী শুক্লবসন ধারণ করে, তাহা আর আমার ইচ্ছা নহে। আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই এক শুক্লবসনা কামিনীর যে ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা জীবনে আর ভুলিতে পারিব না।"

মনোরমা বলিলেন,—"বলেন কি? আমি কি সে ব্যাপার শুনিতে পারি না?"

আমি বলিলাম,—"তাহা শুনিতে আপনার বিশেষ অধিকার আছে। সে ব্যাপারের নায়িকা একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক—হয় ত আপনি তাঁহাকে জানেন না। জানুন বা নাই জানুন, তিনি কিন্তু আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গীয়া শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর নাম বার বার উচ্চারণ করিয়াছেন।"

"আমার মাসীমার নাম করিয়াছেন? কে তিনি? আপনি সমস্ত কথা বলুন।"

যেরূপ ঘটনায় আমার সহিত সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা আমি ব্যক্ত করিলাম। বিশেষতঃ যে যে স্থানে তিনি আনন্দধাম ও বরদেশ্বরী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সকল স্থল বিশেষ করিয়া বলিলাম।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে মনোরমা সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নিরতিশয় বিস্ময় প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, তিনিও আমার ন্যায় সেই শুক্লবসনা কামিনীর রহস্য-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসীমার সম্বন্ধে ঐ সকল কথা তিনি বলিয়াছেন, আপনার ঠিক মনে আছে?"

আমি বলিলাম, "ঠিক মনে আছে। তিনি যেই হউন, এক সময়ে তিনি এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, বরদেশ্বরী দেবী তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতেন এবং সেই অনুগ্রহ হেতু কৃতজ্ঞতা-স্বরূপে তিনি এই পরিবারভুক্ত তাবৎকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করেন। তিনি জানেন যে, বরদেশ্বরী দেবী ও তাঁহার স্বামী কেহই এখন ইহ-সংসারে নাই; আর তিনি যেরূপ ভাবে শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর কথা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহাদের বাল্যকালে পরস্পরের পরিচয় ছিল।"

"তিনি যে এখানকার কেহ নহেন, তাহা বলিয়াছেন ?"

"তিনি এখানকার কেহ নহেন, কিন্তু এখানে আসিয়াছিলেন।"

"আপনি কোনরূপেই ত তাঁহার কিছু বলিতে পারিলেন না ?"

"কোনরূপেই না।"

"আশ্চর্য্য বটে। আপনি তাঁহাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ, তিনি আপনার সমক্ষে এমন কোন ব্যবহার করেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার নামটা কি, জানিবার জন্য যদি আপনি আর একটু যত্ন করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। যেমন করিয়া হউক, এ সন্ধান করিতেই হইবে। আমি বলি কি, আপনি কাকা মহাশয় বা লীলাবতী দুজনের কাহাকেও এ বিষয় এখন জানাইবেন না, তাহাতে কাজ কিছুই হইবে না, কেবল তাঁহারা অকারণ ব্যাকুল হইবেন মাত্র। আমি ত কৌতূহলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। আজি হইতে এই বিষয়ের সন্ধান করা আমি প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য করিলাম। যখন মাসী-মা প্রথমে এখানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন আমি এখানে থাকিতাম না, সে বিদ্যালয় এখনও আছে বটে, কিন্তু এখন তাহার সে সকল প্রাচীন শিক্ষকের কেহ বা মরিয়া গিয়াছেন, কেহ বা স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে দিকে সন্ধানের কোন সুযোগ নাই। আর একটি উপায়—"

এই সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কালি রাত্রে যে বাবু এক জন আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত কর্ত্তা দেখা করিতে চাহেন।"

মনোরমা বলিলেন—"তুমি বাহিরে দাঁড়াও, বাবু যাইতেছেন। আমি বলিতেছিলাম কি—লীলাবতীর এবং আমার নিকট মাসীমার অনেকগুলি হস্তলিখিত পত্র আছে, ঐ সকল পত্র আমার মাসীমা আমার মা ঠাকুরাণীকে এবং লীলাবতীর পিতাকে লিখিয়াছিলেন। যত দিন সন্ধানের অন্য উপায় না পাওয়া যায়, তত দিন মাসী-মার সেই চিঠিগুলি আমি দেখিব। লীলার পিতা সহরে থাকিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি যখন বাটীতে না থাকিতেন, সেই সময় মাসীমা তাঁহাকে সতত পত্র লিখিতেন। সেই সকল পত্রে আনন্দধামের নানা বিবরণ থাকিত; বিদ্যালয়টি তাঁহার প্রিয় পদার্থ ছিল, এ জন্য বিদ্যালয়ের বিবরণ তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকিত। এখনই আমি চিঠির সন্ধান করিতেছি। এক্ষণে আপনি কাকা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; হয় ত বেলা ৩টা অর্থাৎ আমাদের পড়িবার সময়ের পূর্ব্বে আর দেখা ঘটিতেছে না। সেই সময় লীলার সহিত পরিচয় হইবে এবং এ সম্বন্ধেও যাহা হয় জানিতে পারিবেন।"

মনোরমা সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি প্রকোষ্ঠান্তরে আসিয়া চাকরের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে চলিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভৃত্য আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রকোষ্ঠের মধ্যে গিয়া বলিল, "এই ঘরে আপনি বসিয়া নিজের কাজকর্ম্ম, পড়াশুনা করিবেন, আর এই বিছানায় আপনি রাত্রিতে ঘুমাইবেন। আপনার জন্য এই ঘর স্থির করা হইয়াছে। এ ঘর আর এখানকার সব জিনিসপত্র পছন্দমত হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য কর্ত্তা মহাশয় ইহা আপনাকে দেখাইতে বলিয়াছেন।"

আমি দেখিয়া বুঝিলাম, সে ঘর এবং তন্মধ্যস্থ দ্রব্য-সামগ্রী যদি আমার মনোমত না হয়, তাহা হইলে সুরলোকও আমার মনে ধরিবে কি না সন্দেহ। দেখিলাম, ঘরটি অতি প্রশস্ত, উচ্চ, পরিষ্কার এবং আলোকময়। তাহার জানালা ও দরজা অনেক এবং সকলগুলিই বড় বড়। জানালার ভিতর দিয়া নিম্নস্থ কুসুমকানন নেত্র-পথে পতিত হইতেছে। তথায় অগণ্য সুরভি কুসুম বাতাসের সহিত খেলা করিতেছে। ঘরের এক দিকে একখানি পরিষ্কৃত খট্টায় অতি পরিষ্কার শয্যা রহিয়াছে। আর এক দিকে দুইটি অতি সুন্দর টেবিল। তাহার একটির উপর কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় পুস্তক—পুস্তকগুলি সুন্দররূপে বাঁধান। আর একটি টেবিলের উপর অতি সুন্দর দোয়াত, কলম, পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, রকম রকম ডাকের কাগজ, ব্লটিং কাগজ, চিঠির খাম প্রভৃতি পদার্থ যত্ন সহকারে বিন্যস্ত রহিয়াছে। টেবিলের সম্মুখে একখানি গদি-আঁটা চেয়ার এবং জানালার সমীপে একখানি ইজি-চেয়ার রহিয়াছে। দেয়ালের গায়ে সুবৃৎ চিত্র সকল বিলম্বিত। সংক্ষেপতঃ ঘরটিতে যত্ন সহকারে আমার প্রয়োজনীয় ও মনোরম পদার্থ

সমস্ত সংগৃহীত রহিয়াছে। আমি ঘর দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলাম এবং সানন্দে বার বার তত্রত্য সমস্ত সামগ্রীর প্রশংসা করিতে লাগিলাম। আমার প্রশংসা-স্রোত থামিয়া গেলে, ভৃত্য আবার আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া কত প্রকোষ্ঠই ছাড়াইয়া চলিলাম। দুই তিনটা মহল আমরা পার হইলাম; দুই তিনটা ছোট ছোট ফুলের বাগানও ছাড়াইয়া চলিলাম। তাহার পর চারিদিকে নব-দূর্ব্বাদল-সমাচ্ছন্ন সুশ্যামল, নাতি-বিস্তৃত ক্ষেত্রমধ্যে একটি অনতিবৃহৎ অতি চমৎকার ভবন-সম্মুখে আমরা উপস্থিত হইলাম। সমস্ত বাটীর মধ্যস্থ থাকিয়াও যেন ইহা সকলের সহিত সম্পর্কশূন্য ও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইল। চাকর আমাকে উপরে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে আরোহণ করিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রকোষ্ঠের সাজগোজ বড়ই জঁাকাল। সে প্রকোষ্ঠ হইতে আমরা প্রকোষ্ঠান্তরে চলিলাম। এই প্রকোষ্ঠের দ্বার ও জানালা সমূহে নীল বর্ণের পর্দ্দা লম্বিত ছিল। চাকর ধীরে ধীরে একটি পর্দ্দা উঠাইয়া আমাকে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দিল। আমি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে বলিল, "মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।"

আমি দেখিলাম, ঘরটি অতি মনোহরভাবে সজ্জীভূত। অতি মূল্যবান্ সুদৃশ্য সামগ্রী সমূহ তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরের এক দিকে মেহগ্নি-কাষ্ঠের মহার্ঘ টেবিল, চেয়ার, আলমারী আদি শোভা পাইতেছে, অপর দিকে অতি উৎকৃষ্ট ফরাস পাতা রহিয়াছে। সেই ফরাসের উপরে বালিস-বেষ্টিত হইয়া এক পুরুষ বসিয়া আছেন। ঘরের সমস্ত জানালাতেই নীলবর্ণের পর্দ্দা দেওয়া ছিল; সুতরাং ঘরে বিশেষ আলোক ছিল না। যতটুকু আলো ছিল, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, উপবিষ্ট পুরুষের বয়স পঞ্চাশের কম নহে; তাঁহার কলেবর ক্ষীণ, চক্ষু উজ্জ্বল, বর্ণ পাণ্ডু এবং শরীর দুর্ব্বল। তিনিই রাধিকাপ্রসাদ রায়। রায় মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'দেবেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন? আসুন, বসুন। এইখানেই বসুন—না চেয়ারে বসিতে ভালবাসেন? তাই বসুন। আমি বড় রুগ্ন—মরণাপন্ন বুঝিলেন? চিররুগ্ন। আমাকে মাপ করিবেন। আপনি—ওঃ—একসঙ্গে অনেক কথা কহিয়া বড় মাথা ধরিয়া উঠিল। একটু ঔষধ খাইতে হইল—কিছু মনে করিবেন না।"

বাস্তবিক লোকটা ঔষধ খাইল। কি ভয়ানক! এই কয়টা কথা কহিয়া যাঁহার অসহ্য মাথা ধরে, ঔষধ খাইতে হয়, তাঁহার শরীরের অবস্থা তো বড়ই শোচনীয়! আমার বড়ই কষ্ট হইল। রাধিকা-প্রসাদ রায় দেশমধ্যে এক জন বিখ্যাত ধনবান্ এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তাঁহার এ অবস্থা বড়ই কষ্টের কথা। আমার কষ্ট হইল বটে, কিন্তু একটু সন্দেহও হইল। ভাবিলাম, রোগটা কতকটা মানসিক নহে তো?

আমি চেয়ারে না বসিয়া তাঁহার ফরাসের এক পার্শ্বেই উপবেশন করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার বালিসের এপাশে ওপাশে দুই একখানি কেতাব রহিয়াছে। একখানি পুস্তক খোলা পড়িয়া রহি-য়াছে। তিনি আবার নাকি সুরে বলিলেন, "আপনাকে পাইয়া বড় সুখী হইলাম। সময়ে সময়ে আর কিছু না হয়, এক একটা কথা কহিয়াও বাঁচিব। আপনার ঘরটা দেখিয়াছেন কি? পছন্দ হইয়াছে তো?"

আমি বলিলাম,—"আমি এখনই সে ঘর হইতে আসিতেছি। আমার তাহা সম্পূর্ণ—"

কথাটা শেষ করা হইল না। দেখিলাম, হঠাৎ রায় মহাশয় চক্ষু বুজিয়া কপাল জড় করিয়া এবং কানে অঙ্গুলি দিয়া বড় কাতরবদ্‌ভাব প্রকাশ করি-লেন। কাজেই আমাকে থামিতে হইল। তিনি বলিলেন, "ওঃ, ওঃ! ক্ষমা করিবেন। মহাশয়, আমার পোড়া অদৃষ্ট। লোকে চেঁচাইয়া একটি কথা কহিলেও আমার সহ্য হয় না; কেবল সহ্য হয় না নয়—প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। আপনি যদি দয়া করিয়া আস্তে কথা কহিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হই। দোষ লইবেন না। আমার পাপ রোগ—পোড়া শরীর, সকল অনর্থের মূল।"

এতক্ষণে আমি বুঝিলাম, ইঁহার রোগ মিছা কথা, মনের কল্পনা অথবা সখের বিষয়। যাহাই হউক, অপেক্ষাকৃত আস্তে বলিলাম,—"ঘরটি অতি ভাল হইয়াছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "ভাল ভাল। আপনি জানিবেন, আমার সংসারে জমীদারী চাইল নাই। আমি তাহা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আপনি এখানে আমাদের সহিত সমানভাবেই থাকিবেন—কোন ভিন্ন বা অধীনভাব একবারও মনে করিবেন না। আপনি দয়া করিয়া ঐ আলমারী হইতে ঐ সাংখ্যদর্শন পুস্তকখানা আমাকে দিবেন কি?

আমার যে শরীর—নড়িলে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা। সে জন্যই বলিতেছি—ওঃ, আমার মাথা বড় গরম হইয়া উঠিয়াছে! আমি মাথায় একটু গোলাপ-জল দিব। কিছু মনে করিবেন না।"

তাঁহার ফরাসের উপরই নানা প্রকার শিশি, বোতল, গ্লাস, বাক্স সাজান ছিল, তিনি একটা হইতে একটু গোলাপ-জল লইয়া মাথায় দিয়া বলিলেন,—"আঃ!"

আমি আলমারী হইতে পুস্তক বাহির করিয়া আনিলাম। রায় মহাশয়ের এতাদৃশ ব্যবহারে একটুও বিরক্ত হইলাম না, বরং তাঁহার এবংবিধ ভাব দেখিয়া আমার আমোদ জন্মিল। পুস্তকখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, তিনি বলিলেন—"হাঁ, ঠিক বটে। সাঙ্খ্যদর্শন আপনার পড়া আছে তো দেবেন্দ্র বাবু? কেমন, আপনার ইহা ভাল লাগিয়াছে তো? আচ্ছা, বলুন দেখি, এই নিরীশ্বর-বাদের মধ্যেও কেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূল সুন্দর অদ্বৈতবাদের ছায়া স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমি বলিলাম,—"তাহার সন্দেহ কি? 'ঈশ্বরা-সিদ্ধেঃ' বলিয়াও ক্রমশঃ গ্রন্থকারকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"ঠিক ঠিক। আপনি কোন্ বিষয় পড়িতে ভালবাসেন? আচ্ছা, এখন থাক্, পরে স্থির করিয়া বলিবেন; আমি সেই বিষয়ের পুস্তক আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিব। আর কি—আর কি কথা আপনাকে বলিব?—আঃ! মনে পড়িতেছে না—হাঁ—না। কত কথাই বলিব, মনে করিয়া রাখিয়াছি। তাই ত—যে মাথার দশা হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া ঐ জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে একটা চাকরকে যদি ডাকেন; আস্তে আস্তে—চেঁচাইলে আমি মারা যাইব। একটুখানি পর্দা ফাঁক করিবেন। রৌদ্র কি অধিক আলো ঘরে ঢুকিলে আমার বড় কষ্ট হইবে—মূর্চ্ছা হইতেও পারে।"

আমি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া এক জন চাকরকে উপরে আসিতে বলিলাম। এক জন হিন্দুস্থানী খানসামা নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রায় মহাশয় তখন নয়ন মুদিয়া, বালিসের উপর পড়িয়া, কপালে একটা তৈলবৎ পদার্থ লেপন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, এ ছাইয়ের শরীর লইয়া মহা বিড়ম্বনা। একটু আলোক চক্ষে লাগিয়াছিল—মূর্চ্ছা হয় হয় হইয়াছিল! এই হিমসাগর তৈলটা এরূপ সময়ে বড় উপকারী; তাহাই কপালে মাখিতেছিলাম। কে ও, রামদীন? রামদীন, আজি সকালে যে কাগজটায় আজিকার কাজের ফর্দ্দ করিয়াছিলাম, সেই কাগজটা খুঁজিয়া বাহির কর তো বাপু।"

রামদীন একখানা উত্তমরূপ বাঁধান খাতা আনিয়া উপস্থিত করিল। খাতাখানি আনিয়া সে রায় মহাশয়ের হস্তে দিতে গেল। রায় মহাশয় আবার চক্ষু বুজিলেন এবং নিতান্ত কাতরভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কি দুর্ভাগ্য! হায় হায়! আমার এই শরীর—আমার উপর সকলেরই দয়া করা উচিত। দেখিয়াছেন দেবেন বাবু, চাকরটা কি নিষ্ঠুর—কি মূর্খ অক্লেশে পুস্তকখানি আমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল! কি সর্ব্বনাশ! আমার এই মরণাপন্ন অবস্থা—আমি কি মহাশয়, খাতা খুলিয়া, কোন্ পাতায় কাজের ফর্দ্দ ধরিয়াছি, তাহা বাহির করিতে পারি? অসাধ্য—অসাধ্য—অসম্ভব। দেবেন্দ্র বাবু! আমাদের দেশের ইতর লোকদের অবস্থা কি শোচনীয়! তাহারা জ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। হায় হায়! কত দিনে ইহাদের অবস্থা উন্নত হইবে? রামদীন, বইখানির সেই পাতাটা বাহির করিয়া আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরা তোমার উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন সে পাতাটা বাহির কর এবং ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ অত্যাচার করিও না। কিন্তু এ কি—বড় মাথা ধরিয়া উঠিল যে। রামদীন, গোলাপ-জল—গোলাপ-জল—শীঘ্র।"

রামদীন তাড়াতাড়ি করিয়া গোলাপ-জলের বোতল আগাইয়া দিল।

আবার রায় মহাশয় বলিলেন, "হায় হায়! কি নিষ্ঠুর! আমি মাথার জ্বালায় মারা যাইতেছি; রামদীন, তুমি কি একটু জল আমার মাথায় ছড়াইয়া দিতে পার না? ওঃ, কি কষ্ট!"

রামদীন একটু জল তাঁহার মাথায় আস্তে আস্তে হাত দিয়া থাপড়াইয়া দিল, কিন্তু রায় মহাশয় আবার চক্ষু বুজিয়া, হাত ছড়াইয়া ছটফট করিতে করিতে বলিলেন,—"রামদীন, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—আমার প্রাণ যায়। ওরে বাপ্ রে! এমন করিয়া জোরে মাথায় কি কখন হাত দিতে আছে? ওঃ, মরিয়াছিলাম আর কি! ঈশ্বর হে! কত কষ্ট আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছ?"

অনেকক্ষণ হা-হুতাশ করিয়া রায় মহাশয় ক্রমে ঠাণ্ডা হইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার

নিকট হইতে বিদায় হইতে পারিলে বাঁচি। এমন গ্রহতেও মানুষ পড়ে ?

রায় মহাশয় শান্ত হইলে, রামদীন তাঁহার সম্মুখে পুস্তকের নির্দ্ধারিত পাতা খুলিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় খাতা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "হাঁ, তাই বলিতেছিলাম। অতি প্রাচীন—হাঁ, অতি প্রাচীন একখানি হস্তলিখিত পুথি আমি সংগ্রহ করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিদিগের প্রাচীন গ্রন্থ। আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া সেই পুস্তকখানির মধ্যে যে সকল ব্রজবুলী আছে, তাহার টীকা ও সদর্থ স্থির করিতে হইবে। বইখানি আমি ছাপাইব। আহা! কি মিষ্ট! কি চমৎকার! আপনি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা ভালবাসেন বোধ হয়। তা বাসেন বই কি? আহা! কি মধুর! তাহার টীকা প্রস্তুত করিতে হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। অবশ্যই হইবেন। কি সুন্দর!"

আমি বলিলাম,—"চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থ আমি যত্ন সহকারে আলোচনা করিয়াছি এবং আমি তৎসমস্তের নিতান্ত অনুরাগী। যদি বর্ত্তমান পুস্তক সেইরূপ কোন প্রাচীন গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে আমি বিশেষ আনন্দের সহিত ইহার আলোচনা করিব এবং ইহার টীকা প্রস্তুত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিব।"

রায় মহাশয় কহিলেন, "বড় আনন্দিত হইলাম —নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আপনার সাহায্যে আমি বঙ্গদেশের একটি গুপ্ত মহারত্নের পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে সন্তোষের সীমা থাকিবে না।" বলিতে বলিতে তিনি নিতান্ত ভয়চকিতভাবে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, না জানি, আবার কি উপসর্গ উপস্থিত! রায় মহাশয় আবার বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দেবেন্দ্র বাবু, প্রাণ বাঁচান দায়। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ভৃত্যগণ নীচের বারান্দায় গোল করিতেছে। তাহাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বলুন দেখি মহাশয়, এমন অত্যাচারে কি এই কাতর শরীর এক দিনও থাকে?"

আমি বলিলাম,—"কৈ মহাশয়, আমি ত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।"

তিনি বলিলেন,—"আপনি একটু দয়া করিয়া ঐ জানালাটা খুলিয়া শুনুন দেখি; এখনই জানিতে পারিবেন। দেখিবেন, যেন আলো না আইসে।"

আমি অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উঠিয়া জানালার নিকটে গমন করিলাম। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখিবেন, সাবধান! আরবারকার মত অধিক আলো না আইসে, খুব সাবধান।"

আমি খুব সাবধান হইয়াই পর্দ্দার এক কোণ তুলিয়া ঘাড় বাড়াইয়া বাহিরে উঁকি দিলাম। আলো আসিল না, তথাপি রায় মহাশয়কে চক্ষু বুজিয়া কপালে হিমসাগর তৈল লাগাইতে হইল। এই সকল মহাব্যাপার শেষ হইলে আমি বলিলাম,—"কৈ, কিছুই ত শুনিলাম না।"

তিনি বলিলেন,—"ভাল ভাল! না হইলেই বাঁচি। আমার যে শরীর।"

তার পর রামদীনকে একখানি পুস্তক আনিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। রামদীন উত্তম রেশমী রুমালে বাঁধান একখানি পুথি আনিয়া উপস্থিত করিল। রায় মহাশয় বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়, একবার খানিকটা পড়িয়া দেখুন। ওঃ, কি দুর্গন্ধ— যাই যে, কিসের দুর্গন্ধ? হাঁ—হাঁ, এই পচা পুথিখানারই এই গন্ধ। কি ভয়ানক! রামদীন, আতর— আতর, শীঘ্র—শীঘ্র। দেবেন্দ্র বাবু, পুথিখানি আপনি আপনার ঘরে লইয়া যান। দেখিয়াছেন, কি অসহ্য গন্ধ?"

আমার দুর্ভাগ্যই বল বা সৌভাগ্যই বল, আমি দুর্গন্ধ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম, মন্দ নয়। যাহাই হউক, কোন উপায়ে এখন ইঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেই বাঁচি। বলিলাম, "আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি, তাহার কোনই কথা এখনও হয় নাই।"

তিনি বলিলেন,—"আমি রুগ্ন—কাতর। আমার প্রতি আপনিও নিষ্ঠুরতা করিবেন না। কাজের কথা কি ভয়ানক! আমার এই শরীরে কি কোন প্রকার কাজের কথা সম্ভব? দেবেন্দ্র বাবু, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না। আপনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন, তাহা আপনি বুঝিয়াই করিবেন, আপনি ভদ্রলোক—আপনাকে বলিব কি? আমার অবস্থা দেখিতেছেন তো? আমি বলিতে, দেখিতে, শুনিতে, কিছুই করিতে পারিব না। শুনিয়াছি, লীলা পড়িতে বড় ভালবাসে—তাহাকে আপনি পড়াইবেন। মনোরমা যদি পড়িতে চাহে, তবে তাহাকেও পড়াইবেন আর আমার পুথিখানির টীকা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আর আমি কি বলিব? কাজের কথা বলা বা আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। দেবেন্দ্র বাবু, তবে আপনি পুথিখানি লইয়া আপনার ঘরে যান; আমি গন্ধে মারা যাই।"

আমি উঠিলাম। তিনি আবার বলিলেন,—"বইখানি বড় ভারী। দেখিবেন, পড়ে না যেন। লইয়া যাইতে পারিবেন তো?"

ক্ষুদ্র একখানি পুথি লইয়া যাইতে পারিব না সন্দেহে আমার হাসি আসিল। বলিলাম,—"তা লইয়া যাইতে পারিব।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"তবে দেখিতেছি, আপনার শক্তি আছে। আহা! দেহে শক্তি থাকা কি সুখের বিষয়! ভগবান্ আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন।"

আমি আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, যত দিন আনন্দধামে থাকিতে হইবে, তত দিন যেন আর রায় মহাশয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ না ঘটে। আমার সংস্কার হইল, লোকটি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও ভণ্ড। তাঁহার ঘ্রাণ-শক্তি, দর্শন-শক্তি সকলই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাঁহার শরীর নিতান্ত কোমল ও কাতর এবং সাধারণের অপেক্ষা এত যত্নে ও সন্তর্পণে তিনি জীবনপাত করিয়া থাকেন যে, কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অন্যে যাহা বুঝিতেও পারে না, তিনি তাহাতে বিজাতীয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন। বলা বাহুল্য, লোকটির উপর আমার শ্রদ্ধা হইল না।

আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে টেবিলের উপর পুথিখানি রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়া ক্ষণেক ইতিকর্ত্তব্য আলোচনা করিলাম। এক জন চাকর সংবাদ দিল, স্নানাহারের সময় উপস্থিত। আমি ভৃত্যের সঙ্গে গিয়া স্নানার্থ প্রস্তুত হইলাম। পুষ্করিণীতে আমার সমধিক অনুরাগ হওয়ায় ভৃত্য আমাকে সঙ্গে করিয়া সরোবরে লইয়া চলিল। আমার পরিধেয় বস্ত্র, জুতা, জামা সকলই সে লইয়া চলিল। আমি তৃপ্তি-সহকারে আনন্দধামের "আনন্দ-সরোবর" নামক সুবিস্তীর্ণ, অতি পরিষ্কার, উদ্যান-বেষ্টিত সরোবরে অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। স্নানান্তে গৃহাগত হইয়া আহারাদি সমাপ্ত করিলাম। অতি পরিষ্কার পাত্রস্থ, অতি পরিষ্কার অন্ন-ব্যঞ্জন ও নানা প্রকার উপকরণ, পরিষ্কার প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ পরিষ্কার আসনে বসিয়া আহার করিলাম। আহার-কার্য্যও সম্পূর্ণ তৃপ্তিজনক হইল। তাহার পর নিজের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠাগত হইয়া বিশ্রামার্থ খট্টোপরে শয়ন করিলাম। বেলা তখন ১২টা। মনে নানা প্রকার চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। শক্তিপুরের আনন্দধামে আসিয়া যাহা যাহা দেখিলাম, তন্মধ্যে রাধিকা বাবুর কথা ছাড়িয়া দিলে বাকী সকলই সম্পূর্ণরূপ প্রীতিপ্রদ। রাধিকা বাবু লোকটা বেজায় বেতর; কিন্তু মনোরমা বড় উত্তম লোক। চাকর-বাকর সকলে বড়ই ভাল। বাড়ীটি তো স্বর্গ। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও বেশ মানুষ। যত্নের কোনই ত্রুটি নাই। এমন স্থানে অবশ্যই সুখী হওয়া সম্ভব। কিন্তু এখনও আমার লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই,না জানি, তিনি কেমন লোক। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কাল নিকট হইয়া আসিতেছে। তিনি যদি লোক ভাল হন, তবেই তো আমার শক্তিপুরে বাস সুখেরই হয়। যাহা হয়, ক্রমেই বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই শুক্লবসনা সুন্দরী, তাহার সহিত আনন্দ-ধামের কি সম্বন্ধ? সে তো এ স্থানের, বিশেষতঃ রায়-পরিবারের বড়ই অনুরাগী, অথচ মনোরমা তাহার কথা কিছুই জানেন না, কখন কিছু শুনেনও নাই। ব্যাপারটা কি? অবশ্যই এ ব্যাপারের মধ্যে কোন রহস্য আছে। দেখা যাউক, এখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহার কোন সন্ধান হয় কি না। মনোরমা কতকগুলি পত্র দেখিবেন বলিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে কোন সন্ধান বাহির হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বেলা ক্রমে ৩টা বাজিল। আমার পাঠাগারে উপস্থিত হইবার সময় হইয়া আসিল। এখনই লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইবে। হয় তো মনোরমাও শুক্লবসনা সুন্দরীর কোন পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া থাকিবেন। ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মনোরমা আলমারীর নিকট দাঁড়াইয়া কি জিনিস পরিষ্কার করিতেছেন, আর অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এক দিকে বসিয়া ঢুলিতেছেন। আমার অপরা ছাত্রী লীলাবতীকে তখনও দেখিতে পাইলাম না। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মনোরমা যে কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলেন এবং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও উভয় চক্ষু রগড়াইয়া ঘুমের ঝোঁক কাটাইবার চেষ্টা করিলেন। মনোরমা আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আপনি ঠিক আসিয়াছেন। আমরা এমনই সময়ে পড়ি বটে। আমাকে পড়ার তাগাদা করিবেন না, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া

রাখিয়াছি। উহাতে আমার বিশেষ মন নাই। আমি যতটুকু শিখিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট।”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“আপনি যে পড়িবেন না, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। এক্ষণে আমার যে ছাত্রী পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহাকে তো দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার যে অসুখ হইয়াছিল, তাহা সারিয়াছে তো?”

মনোরমা বলিলেন,—“তাঁহার অসুখ সারিয়াছে বটে, কিন্তু আজিও তিনি পড়িবেন না। তবে যদি “আপনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।”

আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে বলিলাম,—আপনি সমস্ত দিন বসিয়া থাকিবেন না কি? দুই পা না নড়া-চড়া করিলে ঘুমের ঝোঁক যাইবে না তো।”

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“চল বাবা, তোমাদের সঙ্গে লীলার কাছে যাই। বুড়া হইলেই ঘুম কিছু অধিক হয়। তোমাদেরও আমার মত বয়স হইলে এমনই করিয়া ঘুমের জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে।”

মনোরমা বলিলেন,—“খুড়া মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল—কি দেখিলেন? তাঁহার অসুখের ঘটা যথেষ্টই দেখিয়াছেন বোধ হয়?”

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। কেমন করিয়া তাঁহাদের পরমাত্মীয়, সেই গৃহের গৃহ-স্বামী মহাশয়ের নিন্দাবাদ ব্যক্ত করিব? কাজেই আমাকে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইল।

মনোরমা বলিলেন,—“বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি; আপনাকে আর বলিতে হইবে না। খুড়ামহাশয়ের স্বভাবের কিছুই আপনার জানিতে বাকী নাই, একবার দেখিলেই আপনি সব বুঝিতে পারিবেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা বাড়ার ভাগ। সে যাহাই হউক, বাটীর সকলের সহিতই তো আপনার পরিচয় হইল। কেবল লীলার সঙ্গে পরিচয় বাকী। আসুন, লীলার সঙ্গে আপনার আলাপ করাইয়া দিব।”

এই বলিয়া মনোরমা অগ্রসর হইলেন। আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে বলিলাম,—“আসুন।”

তিনিও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমরা গৃহের দক্ষিণদিকের সরোবর-সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ বাগানে আসিয়া অবতরণ করিলাম। অতি বৃহৎ পুষ্পবাটিকা; কেমন লাল-টক্‌টকে পথগুলি, কেমন সব গাছ ও লতায় জড়িত কৃত্রিম নিকুঞ্জগুলি, কেমন সমশীর্ষ ঘাসাচ্ছাদিত সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র-গুলি, বাগানে কত জাতীয় কতই মনোহর গাছ—লতার গাছ—ফুলের গাছ, আর পাতা—কত বর্ণের কত রকমের। সেই সুন্দর বাগানের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাগানের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সরোবর—অতি পরিষ্কার—অতি সুশ্রী। সেই সরোবরের চারিদিকে প্রত্যেক বাঁধা ঘাটের উপর একটি করিয়া অতি সুন্দর হর্ম্ম্য। সেই সকল হর্ম্ম্যমধ্যে অতি মসৃণ মার্ব্বল-প্রস্তরা-চ্ছাদিত উপবেশনোপযোগী নানাবিধ স্থান। আমরা একতম হর্ম্ম্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম কি? দেখিলাম, এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী তত্রত্য মর্ম্মর-প্রস্তরাসনে সমাসীন হইয়া একখানি সাময়িক পত্র পাঠ করিতেছেন। এই কামিনী লীলাবতী।

কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া বুঝাইব—লীলাবতী দেখিতে কেমন? পরাগত ঘটনা সকলের সহিত লীলাবতীর ও আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সে সকল ঘটনা বিস্মৃত হইয়া, কি ভাবে লীলাবতীর রূপের বর্ণনা করিব? লীলাবতীর অগাধ রূপরাশি, আমি যে ভাবে তাঁহাকে প্রথমে দেখিলাম, সেই ভাবে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। কিন্তু লীলাবতীর রূপ-চিত্র উপস্থিত করা আমার পক্ষে এখন অসাধ্য। যে সজীব মূর্ত্তি আমার অন্তরে ও বাহিরে দেবী, যে এক্ষণে আমার চিন্তায় ও কার্য্যে, তাঁহার স্বতন্ত্র বর্ণনা করিব কিরূপে? ভাষার অপূর্ণ শক্তি, ক্ষমতার একান্ত অভাব এবং বর্ণনায় বিষয়ের নিতান্ত উচ্চতা সকলই বর্ণন চেষ্টার বিরোধী। কবির লেখনী বা চিত্রকরের তুলিকা পাইলেও সে রূপরাশি—সে স্বর্গীয় সুকান্তির কিছুই বুঝাইতে পারিতাম না। তথাপি পাঠকগণের সন্তোষের জন্য একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি মোটামুটি কিছু বুঝাইতে পারি।

দেখিলাম, লীলাবতী কৃশাঙ্গী অথচ সুগোল ও সুকুমারকায়। তাঁহার পরিচ্ছদ শ্বেতবর্ণ। তাঁহার মস্তকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি। কর্ণে উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড-সংযুক্ত দুল বিলম্বিত। তাঁহার ভ্রূযুগল সুবিস্তৃত, স্থূলমধ্য ও সূক্ষ্মাগ্র। নয়নদ্বয় কবি-বর্ণিত সফরী সদৃশ; তাহার অপূর্ব্ব ভাব—কেমন ভাসা ভাসা, উজ্জ্বল এবং কেমন সুন্দর! নাসিকা সূক্ষ্ম। গণ্ডদ্বয় পূর্ণায়ত ও নিটোল। হাসিলে গণ্ড-দ্বয়ের মধ্যে অতি সুন্দর দুইটি গহ্বরের আবির্ভাব হয়। ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ; পরস্পর সম্মিলিত এবং

যেন রসস্ফীত সুপক্ক ফলের ন্যায় সুন্দর। চিবুক সূক্ষ্ম। মুখখানি কিছু লম্বাটে। সুন্দরী নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর।

যাহা বলিলাম, তাহাতেই কি লীলাবতীর রূপ-বর্ণনা করা হইল? সাধ্য কি! এই লোকললামভূতা রমণী-রত্নকে দেখিয়া আমার হৃদয়তন্ত্রী যেরূপ ভাবে বাজিয়া উঠিল, সহসা ধমনীতে শোণিতের বেগ যেরূপ সংবর্দ্ধিত হইল, তাঁহার সেই সরলতাপূর্ণ কৃষ্ণ-তারযুক্ত অতুলনীয় নয়নের অতুলনীয় দৃষ্টি যেরূপে আমার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল এবং তাঁহার সেই বীণা-বিনিন্দিত মধুর ধ্বনি যেরূপ অপূর্ব্বভাবে আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল, যদি সে সকলের বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত হইত, তাহা হইলে পাঠক, আমি লীলাবতীর রূপ হয় তো বুঝাইতে পারিতাম।

তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কান্তি, মধুর কোমলতা, স্বভাবের মিষ্টতা আমার চিত্তে অঙ্কিত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্তে একটি অনিশ্চিত অজ্ঞাত কেমন এক রকম ভাবের আবির্ভাব হইল। একবার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার কি অপূর্ণতা আছে, যেন তাঁহার কি নাই। আবার মনে হইতে লাগিল,না, আমারই হয় তো কি অভাব আছে এবং সেই জন্যই আমি যথোপযুক্তরূপে লীলাবতীকে প্রণিধান করিতে অক্ষম। যখনই লীলাবতী পূর্ণ ও সরলভাবে আমার প্রতি চাহিলেন, তখনই এই অপূর্ণতার কথা আমার মনে আরও প্রবলভাবে আঘাত করিল। বুঝিতে পারি না, কেন মন এমন হয়; জানি না, কি সে অপূর্ণতা; দেখিতে পাই না, কোথায় সে অভাব; তথাপি মনের এই ভাব। যেন কি নাই! আশ্চর্য্য!

প্রথম সাক্ষাৎকালে এই অপূর্ণতার কথা আমার মনকে এতই বিচলিত করিয়া তুলিল যে, আমি লীলাবতীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার হিতৈষিণী মনোরমা আমাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতির উপায় করিয়া দিলেন। তিনিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "দেখিয়াছেন মাষ্টার মহাশয়, আপনার ছাত্রীর পড়ায় কত মন। তিনি বাগানের মধ্যে হাওয়া খাইতে বসিয়াও পড়া লইয়া ব্যস্ত। আপনি কলিকাতায় আজকালিকার কতকগুলি ভণ্ড দেশ-হিতৈষী পণ্ডিতের দলভুক্ত কি না, জানি না। শুনিয়াছি, সেই সকল পণ্ডিত নাটক, নভেল, কাব্য ইত্যাদির আলোচনা নিতান্ত অনর্থক বলিয়া চীৎকার করেন এবং যে সকল লোক তাহা পড়ে বা যে হতভাগ্যেরা তাহা রচনা করে, তাহাদের সকলকে যমদূতের ন্যায় ধরিয়া নরকস্থ করিবার চেষ্টা করেন। জানি না, তাঁহারা কেমন পণ্ডিত; কিন্তু আমার যেন বোধ হয়, তাঁহারা মূর্খ-চূড়ামণি। যাহা হউক, লীলাবতীকে সে দোষ দিতে পারিব না; কারণ, লীলা এখন 'বান্ধব' পড়িতেছেন। যদি বলেন, 'বান্ধব' ও তো কয়েক বৎসর হইতে উপন্যাস বক্ষে ধারণ করিয়া কলঙ্কিত ও পতিত হইয়া গিয়াছে। তাহার উত্তরে আমার নিবেদন যে, 'বান্ধব' এই ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু লীলা নিশ্চয়ই সে কলঙ্কে হস্ত না দিয়া, অন্য কোন প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছেন। আমি লীলার মুখ দেখিয়াই এ কথা বলিয়া দিতেছি। কেমন লীলা, তুমি এখন কালী-প্রসন্ন বাবুর লেখা পড়িতেছ না?"

সেই অপূর্ব্ব বদনে অপূর্ব্ব হাসির সহিত লীলাবতী বলিলেন, "হাঁ, আমি এখন কালীপ্রসন্ন বাবুর শব্দ-যোজনার মাধুর্য্যই দেখিতেছিলাম বটে; কিন্তু আমি যে কখন উপন্যাস পড়ি না, এ কথা বলি কেমন করিয়া? মাষ্টার মহাশয় হয় তো শুনিয়া বিরক্ত হইবেন যে, আমি সময়ে সময়ে নিতান্ত আগ্রহের সহিত কোন কোন উপন্যাস পাঠ করি। যদি মাষ্টার মহাশয় তাহা দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আর কখন আমি সেরূপ কার্য্য করিব না।"

এই সরলতাপূর্ণ শান্তিমাখা কথাগুলি শুনিয়া আমার বড়ই প্রীতি জন্মিল। আমি ইহার একটা সদুত্তর স্থির করিতেছিলাম, এমন সময় মনোরমা আবার বলিলেন, "তোমার মতামত মাষ্টার মহাশয়কে জানাইলে না তো। কেবল বলিলে, আমি এইরূপ করি বটে, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় নিষেধ করিলে আর করিব না। কেন যে তুমি তাহা কর, সে কথা মাষ্টার মহাশয়কে বলা আবশ্যক। তোমার কথা খণ্ডন করিয়া যদি মাষ্টার মহাশয় সে কার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সে জন্য মাষ্টার মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। তুমি যে কেন আগ্রহ সহকারে উপন্যাস ও কাব্য পড়িয়া থাক, তাহা বুঝাইয়া দেও নাই তো। আমি আমার মত বলিয়াছি, তুমি তোমার মত বল। তাহার পর দুই জন দুই দিক্ হইলে এমনই তর্ক বাধাইব দিব যে, মাষ্টার মহাশয়ের মত না থাকিলেও আমাদের মতে মত দিতেই হইবে এবং অবশেষে অব্যাহতি পাইবার জন্য হয় তো আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করিতে হইবে।"

লীলাবতী বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয় ওরূপ দায়ে পড়িয়া যেন কখন আমাদের প্রশংসা না করেন।"

আমি বলিলাম,—"কেন?"

লীলাবতী বলিলেন,—"কারণ, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আপনার কথাই বিশ্বাস করিব।"

এই এক কথায় লীলাবতীর চরিত্রের পূর্ণ-চিত্র আমি দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তাঁহার স্বকীয় সত্যপ্রিয়তা ও বাঙ্‌নিষ্ঠা তাঁহাকে ক্রমশঃ পরকীয় বাক্যে পূর্ণমাত্রায় আস্থা প্রদান করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে। সেই দিবস আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, এখন আমি তাহা কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত জানিতে পারিতেছি।

তাহার পর আমরা পুনরায় পঠনালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাকে জল খাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাতে অস্বীকার করিলাম না। তিনি তাহার উদ্যোগ করিতে গেলেন। কিয়ৎকাল পরে এক জন দাসী প্রচুর মিষ্টান্ন আর এক জন উপাদেয় ফল-মূল রৌপ্যপাত্রপূর্ণ করিয়া লইয়া আসিল। অন্নপূর্ণা স্বয়ং রজতগ্লাসে করিয়া পানীয় জল আনিলেন। মনোরমা পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে স্বহস্তে স্থান মার্জ্জনা করিয়া দিলেন এবং লীলাবতী আসন বিস্তার করিলেন। যেরূপ আহার হইল, তাহাতে বুঝিলাম যে, রাত্রিতে আর আহারের প্রয়োজন হইবে না। ঠাকুরাণীকে তাহা বুঝাইয়া দিলে, তিনি এক জন ঝির দ্বারা সরকারকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মাষ্টার বাবু রাত্রিতে আহার করিবেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, লীলাবতী ও মনোরমা বেলা ১০টার সময় আহার করেন, তাহার পর বেলা ২টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করেন এবং রাত্রিতে শয়নের অব্যবহিতপূর্ব্বে ইচ্ছামত আহার করেন। তাঁহারা উভয়ে একত্র আহার করেন, সমস্ত দিন একত্র থাকেন এবং রাত্রিতে একত্র শয়ন করেন। তাঁহারা যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করেন, তাহারই পার্শ্বস্থ এক প্রকোষ্ঠে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এবং এক ঝি শয়ন করেন।

আমি আহার-সমাপ্তির পর উঠিয়া আসিলাম। নানা প্রকার গল্প চলিতে লাগিল। সমালোচকদের কথা, মাসিক পত্র সকলের প্রসঙ্গ, কেন মাসিকপত্র সকল এরূপ অনিয়মিত, তাহার কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের কথা, অক্ষয় বাবুর ভাষার কথা, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের বিচার প্রভৃতি কত কথাই যে হইল, তাহার আর সীমা নাই। আপাততঃ কোন্ কোন্ পুস্তক তাঁহাদের পড়িতে ইচ্ছা, তাহার মীমাংসা করিবার ভার তাঁহাদের হং- রাখিয়া দিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গেল। দাসী ৮- সেজ আনিয়া একটি টেবিলের উপর আর এন হারমোনিয়মের উপর রাখিয়া দিল।

মনোরমা বলিলেন,—"লীলা, মাষ্টার মহাশয় হয় তো কলিকাতায় কত উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম বাজান শুনিয়াছেন। তুমি যে হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়াছ, তাহা কত দূর শ্রবণযোগ্য হইয়াছে, মাষ্টার মহাশয়ের কাছে তাহার পরিচয় দিলে মন্দ হয় না; অতএব তুমি একটু বাজনা মাষ্টার মহাশয়কে শুনাইয়া দেও না কেন।"

লীলা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় যদি দয়া করিয়া আমার বাজনা শুনিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইব।"

আমি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তখন লীলা হারমোনিয়ম-সমীপস্থ হইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। মধু—মধু—মধুবৃষ্টি হইতে লাগিল। সে শিক্ষা—সে অভ্যাস—সে নিপুণতার কথা কি বলিব? এ জগতে লীলা ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই কার্য্য। আমার মন-প্রাণ একত্র হইয়া কর্ণ-কুহর দিয়া সেই অপূর্ব্ব বাদ্য-সুধা পান করিতে লাগিল, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একখানি কৌচে বসিয়া বাদ্য শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। মনোরমা এক তাড়া চিঠি লইয়া টেবিলের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া বাজনা চলিল। তাহার পর লীলা যন্ত্র ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বলিলেন,—"বড়ই গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে। আমি এই খোলা ছাদে একটু বেড়াই।"

কেহই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিল না। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন—আমার দৃষ্টিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী দিব্য ঘুমাইতেছেন, মনোরমা চিঠির তাড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, লীলাবতী খোলা ছাদে বেড়াইতেছেন—এক একবার অনেক দূরে যাইতেছেন, আবার অত্যন্ত নিকটে আসিতেছেন; আমার চক্ষু কেবল তাহাই অনুসরণ করিতেছে। এমন সময়ে মনোরমা বলিলেন—"মাষ্টার মহাশয়, শুনুন।" আমি উঠিয়া গিয়া টেবিলের বিপরীত দিকে দাঁড়াইলাম। মনোরমা বলিলেন,—"এই চিঠিখানির শেষ ভাগটা আমি পড়িতেছি, আপনি শুনুন দেখি। বোধ করি, কলিকাতার পথের বৃত্তান্ত ইহাতে মীমাংসা হইতে পারে। মাসী-মা ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে মেসো

যেন ।য়কে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। মাসী-মা এবং সুক্ষ্ম।বতী সে সময়ে এই আনন্দধামেই ছিলেন, না।শো মহাশয় তৎকালে প্রায়ই পশ্চিমে থাকিতেন। আমি সে সময়টাতে কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় ঘোষ বাবু মহাশয়দিগের বাটীতে গিয়াছিলাম।”

একবার বাহিরের ছাদে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, বিমল চন্দ্রালোকে বহির্ভাগ আলোকিত। শ্বেতবস্ত্রাবৃতা লীলাবতী সেই সুন্দর আলোকে ছাদের উপর পরিভ্রমণ করিতেছেন। কি সুন্দর দেখাইতেছে!

মনোরমা পত্রের শেষ ভাগ পড়িতে লাগিলেন,—“তুমি ক্রমাগত আমার স্কুলের ছাত্রীগণের বিবরণ শুনিতে শুনিতে হয় তো ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছ। কিন্তু প্রাণেশ্বর, সে জন্য যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে সে দোষ আমাকে না দিয়া এই উপলক্ষ্যরহিত কার্য্যান্তরহীন আনন্দধামকেই দোষী করা উচিত। এবার তোমাকে একটি নূতন ছাত্রীর বস্তুতই অতি আশ্চর্য্য বিবরণ জানাইব।

কমলা-নাম্নী আমাদের পল্লীবাসিনী সেই প্রাচীনা কায়স্থকামিনীর কথা তোমার মনে আছে তো? কয়েক বৎসর রোগভোগ করার পর তাঁহার অন্তিমকাল নিকটস্থ হইয়া আসিতেছিল—কবিরাজ জবাব দিয়াছেন। হুগলী জেলায় হরিমতি-নাম্নী তাঁহার এক ভগ্নী থাকিতেন। দিদির সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য হরিমতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়েটিও আসিয়াছে। মেয়েটি আমাদের জীবিতাধিক লীলার চেয়ে প্রায় এক বৎসরের বড়।”

আর অধিক দূর পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে লীলাবতী আমাদের নিকট দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তখনই তিনি আবার চলিয়া গেলেন। মনোরমা আবার পড়িতে লাগিলেন,—“হরিমতির চাইল-চলন রীতি-প্রকৃতি মন্দ নহে। মেয়েমানুষটি অর্দ্ধবয়সী—দেখিতেও নিতান্ত মন্দ নহে। বয়সকালে যাহাই হউক, নিতান্ত বিশ্রী বোধ হয় না—মাঝামাঝি গোছের সুন্দরী বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে কেমন একটি চাপা রকম ভাব আছে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এমনই চাপা যে, তাঁহাকে দেখিলে সহজেই বোধ হয় যেন, কিছু গোপন করিতেছেন। আর তাঁহার মুখের রকম দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাঁহার মনেও কিছু আছে। স্ত্রীলোকটির জীবন নিতান্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া আমার মনে হয়। আমার নিকট তিনি একটি সামান্য কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। কমলা হয় তো সপ্তাহমধ্যে কাল-কবলিত হইতে পারেন, না হয় তো কিছু দিন গড়াইতে পারেন। যাহাই হউক, যত দিন হরিমতিকে এখানে থাকিতে হইবে, তত দিন তাঁহার মেয়েটি যাহাতে আমার স্কুলে লেখাপড়া করিতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রার্থনা। সর্ত্ত এই যে, কমলার মৃত্যুর পর যখন হরিমতি বাটী ফিরিয়া যাইবেন, তখনই তাঁহার মেয়েকে সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, আমি সন্তোষ সহকারে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছি এবং সেই দিনই লীলা ও আমি এই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে আনিয়াছি। মেয়েটির বয়স ঠিক এগার বৎসর।”

আবার লীলার পরিষ্কার শ্বেত-বর্ণাচ্ছাদিত দেহ আমাদের সমীপাগত হইল। আবার মনোরমা চুপ করিলেন। আবার লীলাবতী দূরবর্ত্তিনী হইলে, মনোরমা পড়িতে লাগিলেন,—“হৃদয়নাথ, আমি এই মেয়েটিকে বড়ই ভালবাসি। কেন যে তাহাকে এত ভালবাসি, তাহা অগ্রে ব্যক্ত করিয়া তোমার কৌতূহল কমাইয়া দিব না—সকলের শেষে সে কথা বলিব। হরিমতি আমাকে কন্যার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু আমি সেই দিনই পড়া বলিয়া দিবার সময় বুঝিতে পারিলাম, মেয়েটির বুদ্ধি সে বয়সে যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ পরিণত হয় নাই। সেই দিনই তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাটী লইয়া আসিলাম এবং গোপনে ডাক্তার ডাকাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে বলিলাম। ডাক্তার বলিলেন, বয়স হইলে হয় তো দোষ সারিয়া যাইবে। তিনি কিন্তু যথেষ্ট যত্ন সহকারে তাহাকে পাঠ অভ্যাস করাইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, বালিকার মর্ম্মগ্রহণ-শক্তি যেমন কম, ধারণা-শক্তি তেমনই অধিক। একবার যাহা উহার হৃদয়স্থ হইবে, ইহজীবনে তাহা আর ভুলিবে না। না বুঝিয়া অমনই ভাবিও না যে, আমি একটা পাগলের মায়ায় পড়িয়াছি। না প্রাণেশ্বর, বালিকা মুক্তকেশীর বড়ই মিষ্ট স্বভাব, কৃতজ্ঞ হৃদয় এবং সে সহসা মাঝামাঝি ভীত বা বিস্মিত-ভাবে এমন এক একটি কেমন এক রকম মিষ্ট কথা বলে, তাহা বড়ই ভাল লাগে। এক দিনের কথা বলি, শুন। বালিকাটি বেশ পরিষ্কার রঙ্গচঙ্গে কাপড় পরিয়া থাকে। জানই ত তুমি, আমি ছেলে-পিলেকে সাদা কাপড় পরাইতে বড়

ভালবাসি। আমি তাহাকে লীলার একখানি বাসি-করা সাদা ঢাকাই-ধূতি পরিতে দিয়া বলিলাম, তোমার বয়সের মেয়েরা এইরূপ কাপড় পরিলে ভাল দেখায়। মেয়েটি প্রথমে একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিব কি প্রাণনাথ, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুল-ভাবে বলিল, 'এখন হইতে আমি সর্ব্বক্ষণই সাদা কাপড় পরিব মা। যখন আমি তোমার কাছে থাকিব না এবং তোমাকে দেখিতে পাইব না, তখনও সাদা কাপড় পরিলে তোমাকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে বলিয়া আমার মনে আনন্দ হইবে মা।' এমনই ভাবে কথাগুলি বলিল যে, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে বাজিতেছে। আমি তাহার জন্য রকম রকম সাদা কাপড় ক্রয় করিব।"

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার সহিত পথে যে স্ত্রীলোকটির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার বয়স এখন তেইশ বৎসর হইতে পারে বলিয়া আপনার মনে হয় কি?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, ঐ রকমই বটে।"

"তাঁহার গায়ের কাপড় সকলই সাদা?"

"সকলই সাদা।"

তৃতীয়বার আবার লীলাবতী সেই দ্বারের নিকটস্থা হইলেন। এবার তিনি আর চলিয়া গেলেন না; আমাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, ছাদের আলিসায় ভর দিয়া, বাগান দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শুভ্র পরিচ্ছদাবৃত দেহ পূর্ণ-চন্দ্রালোকে শোভা পাইতে লাগিল। আমার বুক কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। কি যেন মনে হইতে হইতে আবার চলিয়া গেল! কে জানে, মনের মধ্যে কেমন একটা ভাবের আবির্ভাব হইল।

মনোরমা বলিলেন,—"সকলই সাদা। চমৎকার বটে। আপনি যে স্ত্রীলোক দেখিয়াছেন, তাঁহার এবং মাসীমার ছাত্রীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য একতা। এরূপ একতা ঘটিবার সম্ভাবনাও অনেক থাকিতে পারে।"

আমি মনোরমার কথা বড় মনোযোগ সহ-কারে শুনিলাম না। আমি তখন কেবল তদ্গত-ভাবে লীলাবতীর শ্বেত-পরিচ্ছদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছি।

মনোরমা কহিলেন,—"এক্ষণে পত্রের শেষাংশ শ্রবণ করুন। এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত বিস্ময়জনক।"

যখন মনোরমা এই কথা বলিলেন, তখন লীলাবতী বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের নিকটস্থ দ্বারসমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সন্দিগ্ধভাবে একবার ঊর্দ্ধে, একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর আমাদের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

মনোরমা পত্রের শেষ অংশ পাঠ করিলেন;—"প্রাণেশ্বর! আমার সুদীর্ঘ পত্র শেষ হইয়া আসি-তেছে; কেন যে আমি মুক্তকেশীকে এত ভালবাসি, তাহার প্রকৃত প্রমাণ তোমাকে এখন জানাইব; শুনিলে তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশল! আকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য! ঐ মুক্তকেশীর চুল, বর্ণ, চক্ষুর ভাব, মুখের আকৃতি—"

মনোরমার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। সেই নির্জ্জন কলি-কাতার রাজপথে, অজ্ঞাত কর-স্পর্শে আমার যে ভাব হইয়াছিল, এখন আবার আমার সেই ভাব জন্মিল। লীলাবতী সেই চন্দ্রালোকপূর্ণ স্থানে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার গ্রীবার পার্শ্ব-নত ভাব, তাঁহার বর্ণ, তাঁহার মুখের আকৃতি ইত্যাদি এই দূর হইতে দেখিয়া আমার স্পষ্টই মনে হইতে লাগিল, তিনি সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর সজীব প্রতিমূর্ত্তি। যে নিদারুণ সন্দেহ বিগত কয়েক ঘণ্টা আমাকে নিয়ত উৎপীড়ন করিতেছিল, এক মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মীমাংসা হইয়া গেল। প্রথম সাক্ষাৎকালে সেই যে কি যেন নাই বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, এখন বুঝিলাম, তাহা আর কিছুই নহে, সেই পলাতকা উন্মাদিনীর সহিত আনন্দধামস্থ আমার এই ছাত্রীর অদ্ভুত সাদৃশ্য।

মনোরমা পত্র ফেলিয়া দিয়া আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি বুঝিতে পারিতেছেন? এগার বৎসর পূর্ব্বে মাসীমা যে সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, আপনিও এখন সেই সাদৃশ্য বুঝিতে পারিতেছেন?"

আমি বলিলাম,—"কি বলিব? আমার মনের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমি স্পষ্টই সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সাদৃশ্য হেতু সেই সহায়-হীনা, অপরিচিতা, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকের সহিত ঐ বিকা-শিতাননা নারীর তুলনার উল্লেখ করিলেও যেন উঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনে বিষাদের কালিমা লেপন করা হয়। অতএব এ ভাব চিত্ত হইতে শীঘ্রই অন্তরিত করা আবশ্যক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া লীলাবতী দেবীকে ঘরের ভিতরে ডাকুন—ওখানে আর থাকিয়া কাজ নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। স্ত্রীলোকের কথা ছাড়িয়া দিউন, কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে আপনার এরূপ ভ্রান্ত সন্দেহ নিতান্ত আশ্চর্য্যের কথা বটে!"

আমি বলিলাম,—"যাহাই হউক, আপনি লীলাবতী দেবীকে ডাকুন।"

"চুপ করুন, লীলা আপনিই আসিতেছে। এখন লীলাকে বা আর কাহাকেও এ সকল কথা জানাইয়া কাজ নাই। লীলা, এ দিকে এস। ঠাকুরাণীর ঘুম তো ভাঙ্গে না দেখ্‌ছি, তুমি চেষ্টা কর দেখি, যদি ভাঙ্গাইতে পার।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এইরূপে আনন্দধামে আমার প্রথম দিন কাটিয়া গেল। মনোরমা ও আমি এ রহস্য আর ভাঙ্গিলাম না। সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় রহস্য ব্যতীত আর কোন রহস্যও জানিতে পারা গেল না। এক দিন সুযোগ-ক্রমে মনোরমা অতি সতর্কতা সহকারে লীলাবতীর নিকট মুক্তকেশীর কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে একটি বালিকার সহিত লীলার আকৃতি-গত সাদৃশ্য ছিল, এ কথা লীলাবতীর মনে পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু আর তিনি বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ঐ বালিকার নাম মুক্তকেশী। সে কয়েক মাস মাত্র আনন্দধামে ছিল, তাহার পর হুগলি চলিয়া যায়। তাহার মা ও সে আর কখনও এখানে আসিয়াছিল কি না, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাহাদের নাম তিনি আর কখন শুনেন নাই। মনোরমা অবশিষ্ট পত্রাদি পাঠ করিয়াও আর কোন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করা হইল, তাহাতে বুঝা গেল যে, কলিকাতার পথে যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে এবং মুক্তকেশী একই স্ত্রীলোক। আরও বুঝা গেল, মুক্তকেশীর বাল্যকালে যে চিত্তচাঞ্চল্য ছিল, যৌবনেও তাহা তেমনই আছে। এ সন্ধানের এ স্থানেই আপাততঃ শেষ।

দিনের পর দিন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যাইতে লাগিল। সুখে—আনন্দে সময় কাটিতে থাকিল। কিন্তু যে সকল সুখ, যে সকল আনন্দ তৎকালে অজস্র-ধারায় আমার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, তাহার কয়টা সারবান্—কয়টা মূল্যমান্। বিগতজীবন আলোচনা করিয়া কেবল নিজের অপূর্ণতার, ত্রুটির এবং জ্ঞান-হীনতারই পরিচয় পাইতেছি।

আমার এই জ্ঞানহীনতার ও ত্রুটির কথা ব্যক্ত করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; কারণ, সে কথা পূর্ব্বেই অজ্ঞাতসারে আমি একরূপ বলিয়া ফেলিয়াছি। যখন আমি লীলাবতীর রূপ-বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারি নাই, যখন আমার ভাষা আমার সহায়তা করিতে একটুও অগ্রসর হয় নাই, তখন কি সুচতুর পাঠক, সে কথা বুঝিতে পার নাই? যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে এখন মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি।

না জানি, কত জনই আমার এই কথা শুনিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিবেন। কিন্তু আমি করিব কি? যদি কোন করুণহৃদয়া সুন্দরী আমার এই কথা পাঠ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, আমার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহিত মিলিত হইবে। আর যদি কোন কঠিন-হৃদয় পুরুষ পরিহাসের হাসি হাসিয়া আমার কথা উড়াইয়া দেন, আমি অগত্যা তাহা নীরবে সহ্য করিব। আমাকে ঘৃণাই কর অথবা দয়া করিয়া আমার প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ কর, আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি।

কিন্তু আমার দোষ-ক্ষালন করিবার কি কোনই যুক্তি নাই? আমি আনন্দধামে যেরূপ ভাবে কাল কাটাইতাম, তাহা শুনিলে অবশ্যই তাহার মধ্য হইতে আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি পাঠক, কিরূপ ভাবে আমাকে এই আনন্দ-ধামে কালাতিপাত করিতে হইত। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত আমি নিয়ত রায় মহাশয়ের সেই প্রাচীন পুথির আলোচনা করিতাম। সে গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি?—প্রেম, সৌন্দর্য্য ও শোভা। সেই সকল উচ্চকল্পনা-সম্ভূত সদ্ভাব-পূর্ণ প্রেম-চিত্র দর্শন করিতে করিতে আমার মন স্বতঃই নিতান্ত প্রেম-প্রবণ হইয়া উঠিত; সেই গ্রন্থোক্ত মনোহর সৌন্দর্য্য-বর্ণন পাঠ করিতে করিতে আমার অন্তরে স্বভাবতঃ লীলাবতীর অপূর্ব্ব মাধুরীর সহিত গ্রন্থবর্ণিত সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হইত। তুলনায় কি বুঝিতাম? বুঝিতাম, কবির কল্পনা যে সৌন্দর্য্য-সংগঠনে সমর্থ, তাহা লীলাবতীর বাস্তব সৌন্দর্য্যের সমীপস্থ হইতও সমর্থ নহে। গ্রন্থে পরম শোভাময় দৃশ্যমধ্যে পরমা সুন্দরী তরুণীর বিবরণ

পাঠ করিয়া মনে হইত, সে কবি কখনই আনন্দোদ্যানের মনোহর নিকুঞ্জমধ্যস্থ লীলাবতী সুন্দরীকে দেখেন নাই; তাহা দেখিলে তাঁহার কল্পনা তাদৃশ অঙ্গহীন অপূর্ণ চিত্র পাঠক-সমক্ষে উপস্থিত করিয়া কদাচ গৌরব প্রার্থী হইত না। এইরূপ চিন্তায়, এইরূপ আলোচনায়, স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া, বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেও এবংবিধ চিন্তা ও তর্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতাম না। তাহার পর সমস্ত বৈকালটা সেই ভুবনমোহিনীর নয়ন-সমক্ষে আমি থাকিতাম এবং আমার নয়ন-সমক্ষে তিনি থাকিতেন। মনোরমার পরম রমণীয় সরলতা এবং লীলাবতীর অপরিমেয় সৌন্দর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব কোমলতা এবং মধুরতা আমাকে সমস্ত অপরাহ্ন মাতাইয়া রাখিত। লীলাবতী কবিতা রচনা করিতেন, এক এক দিন তাহা আমাকে শুনাইতেন। কেমন মধুরভাবে, সুন্দর স্বরে, গ্রীবা সুন্দররূপে আন্দোলন করিতে করিতে, সেই সকল কবিতা আমাদের সমক্ষে পাঠ করিতেন! কেমন করিয়া বলিব যে, সে ভাব, সে কবিতা, সে অধ্যয়ন আমার হৃদয়ে আঘাত করিত না! তাহার পর আরও বলি, হস্তাক্ষরের উন্নতি করিতে লীলার বড় অনুরাগ ছিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া টেবিলে কাগজ রাখিয়া লিখিতেন। আমাকে হয় তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, না হয় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, অনেক সময় লেখার দোষগুণ বিচার করিতে হইত এবং কখন কখন কি হইলে লেখা আরও ভাল হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমাকে নত হইয়া, তাঁহার লেখার পার্শ্বে লিখিতে হইত। তখন আমার বদন লীলাবতীর বদন-কমলের সমীপস্থ হইত, লীলাবতীর সুরভি নিশ্বাস আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত, আমার গণ্ডে তাঁহার গণ্ড মিলিত হয় হয় হইত! কি জানি, তখন কি অপূর্ব্ব ভাবে আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিত, প্রাণের ভিতর কেমন ঝন্‌ঝনা বাজিয়া উঠিত। এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দিন কাটিত। কত সময় কত কথায় তাঁহার মধুর অধরে হাসি দেখা দিত, কত সময় তাঁহার এক একটি কথা কেমন অলক্ষিতভাবে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিত, আর কত সময় মনোরমা এবং অন্নপূর্ণাঠাকুরাণীর কথা আমার চিত্তের এই আবেগময় ভাব আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিত। হয় তো কোন সময় মনোরমা বলিতেন, "মাষ্টার মহাশয় আর লীলাবতী দু'জনেরই একই রকম। দু'জনেরই দিবারাত্রি কেবল পড়া আর লেখা, লেখা আর পড়া!" অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কখন হয় তো বলিতেন,—"দেবেন্দ্র বাবুর মত সুশ্রী পুরুষ এবং লীলাবতীর মত সুন্দরী মেয়ে আমার চক্ষে আর কখন পড়ে নাই।" এ সকল কথা তাঁহারা সরলভাবে ও সরল বিশ্বাসের বশে বলিতেন; কিন্তু আমার উন্মত্ত হৃদয় সে সকল কথার অনুরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া সুখী হইত। এই সকল নানা কারণে আমি ক্রমশঃ এই দুরাশা-সাগরে ডুবিয়াছি। ভাল বল, মন্দ বল, আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি!

তাহার পর তোমরা বলিতে পার, স্বীয় পদ ও অবস্থা স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কথা ঠিক বটে! কিন্তু সত্য কথা বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে কি? আমি কি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম যে, আমার হৃদয়ের এইরূপ পতন হইবে? কত সময়, কত দিন, আমি তো কতই ভদ্র ও সুন্দরী মহিলামণ্ডলীর মধ্যে বিচরণ করিয়াছি, কত সুন্দরী নারীর সহিত পুনঃ পুনঃ কতই আলাপ করিয়াছি, কতই কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, কিন্তু কখনই আমার মনের এরূপ ভাব—এমন হৃৎকম্প হয় নাই তো? তবে হৃদয়কে অবিশ্বাস করিব কেন? আমার হৃদয় পরীক্ষিত, সাবধান এবং নিতান্ত দীন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। সে হৃদয় এরূপে ভগ্ন হইবে, তাহার এতাদৃশ পতন ঘটিবে, অথবা তাহা এরূপ স্পর্দ্ধিত হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর কথা। যখন বুঝিলাম, আমার হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাব আর নাই, সে সাবধানতা, সে আত্মাবস্থাজ্ঞান, সে মনোবৃত্তির নিরতিশয় অধীনতা আর নাই, তখনই আমি হৃদয়বেগ মন্দীভূত করিয়া দিয়া, তাহার গতি ভিন্নপথাবলম্বী করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম। তখনই হৃদয়কে বুঝাইতে, বিহিতবিধানে সাবধান করিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু বুঝিলাম যে, আমার হৃদয় আর আমার নহে। আর তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। সে এখন সম্পূর্ণরূপে শাসনের বাহিরে গিয়াছে। বুঝিলাম, আমার হৃদয় পূর্ণমাত্রায় লীলাবতীকে ভালবাসিয়াছে, সেখানে আর প্রবোধ বা উপদেশ, শাসন বা সান্ত্বনার স্থান নাই। কিন্তু এ কথা এত দিন কেন বুঝি নাই? আরও পূর্ব্ব হইতে কেন সাবধান হইবার চেষ্টা করি নাই? মনের গতি কেন আগেই অনুভব করি নাই? যখন শত সহস্র কার্য্যে, প্রতি হৃৎস্পন্দনে, প্রতি চিন্তার মধ্য হইতে হৃদয়ের এই ভাব ও এই গতি ধরিলে ধরা যাইত, তখন কেন ধরি নাই? তাহারও এই উত্তর। যে অন্ধতা আমাকে অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই দেখিতে না দিয়া, একই পথে লইয়া

গিয়াছিল, সেই অন্ধতাই আমাকে মূলে হৃদয়ের ভাব দেখিতে না দিয়া, এই বিষম দুরাশা-সাগরে আনিয়া জমাইয়াছে।

এই অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল। এক দিন দুই দিন করিতে করিতে ক্রমে তিন মাস অতীত হইয়া গেল। ভূত-ভবিষ্যৎ আমার তখন মনে নাই —নিজের অবস্থা-জ্ঞান নাই; চিত্ত একমাত্র সুখময় কল্পনায়—একমাত্র বিষয়-ধ্যানে মগ্ন। সহসা এক দিন এক মুহূর্ত্তে আমার অবস্থা-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিল, —আমার কল্পনার ঘোর ভাঙ্গিল।

এক দিন প্রাতে—ওঃ, কি বিষম দিন! এই দিন প্রাতে দেখিলাম, লীলার বদন-কমল ভাবান্তরিত। কল্য বৈকালে যে লীলা দেখিয়াছি, আজি আর সে লীলা নহেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহার নয়নের বিষাদময় দৃষ্টি দেখিয়া, আমি তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে যে কোন গুরুতর বিষাদের অঙ্কপাত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সে দৃষ্টি—সে ভাব তাঁহার নিজের জন্যও কাতর—আমার জন্যও ব্যথিত। তাঁহার পবিত্র হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিতে, তথাকার ভাব বর্ণনা করিতে আমার কোনই অধিকার বা ক্ষমতা নাই। তথাপি তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল, তিনি কেবল আমার জন্যই কাতর নহেন, নিজের জন্যও কাতরতার অভাব নাই।

আর দেখিলাম, মনোরমার বদনমণ্ডলও প্রফুল্লতা-পরিশূন্য, দারুণ চিন্তায় সমাচ্ছন্ন। আমি বুঝিলাম, আমার দুরাশা—আমার প্রগল্‌ভতা—আমার আত্মাবস্থা অতিক্রম করিয়া এই অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষা লীলাবতী ও মনোরমার এই কাতরতার কারণ। মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কি করিলে কি উপায়ে সকলের হৃদয়ে পুনরায় পূর্ব্ববৎ শান্তির আবির্ভাব হইবে, ইহাই আমার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল। চিন্তা যথেষ্ট করিলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কোনই মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভাবিত নহে—আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে এক দিন মনোরমার স্পষ্টভাষিতা এবং উদারতা আমার এই দারুণ দুরবস্থার শেষ করিয়া দিল, কটুকষায় হইলেও উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা তিনি আমার এই বিষম ব্যাধির চিকিৎসা করিলেন এবং আমাকে ও সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দধামের আরও কাহাকে কাহাকে বিজাতীয় বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে দিন শুক্রবার। আমি প্রাতঃকালে, বেলা অনুমান আটটার সময় একটি বিশেষ প্রয়োজন হেতু পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরে কেহই নাই। চারিদিকে ফলের সুদৃশ্য টবপূর্ণ বাহিরের বারান্দায় লীলাবতী ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তাঁহার বদনের সেই বিষাদময় ভাব। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র একটুকু হাস্য করিলেন, কিন্তু সে হাস্য শুষ্ক—নীরস —অস্বাভাবিক। তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন না। হায়! সপ্তাহদ্বয় পূর্ব্বে আমাদের এমন সঙ্কুচিত ভাব ছিল না তো? তখন লীলাবতী আমার নিকট আসিতে একটুও সঙ্কুচিতা হইতেন না তো? তখন আমাকে দেখিলে তাঁহার মুখে এমন শুষ্ক হসি পরিদৃষ্ট হইত না তো? হায়! সে দিন কোথায় গেল? সে দিন কি আর ফিরিবার উপায় নাই?

তখনই মনোরমা সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আসিবামাত্র লীলাবতী ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় কতক্ষণ আসিয়াছেন? আমাদের কাহাকেও এখানে না দেখিয়া আপনি হয় ত বিরক্ত হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম,—"আপনাদের সহিত এক্ষণে দেখা করিবার আমার প্রয়োজন ছিল না। আর এরূপ সময়ে আপনারা এখানে থাকিবেন, আমি তাহা প্রত্যাশাও করি নাই।"

মনোরমা তাহার পর লীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন দুইবার—তিনবার চেষ্টার পর বলিলেন, —"লীলা, আমি কাকা মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। হোরী ঘরটাই ঠিক করিয়া রাখা তাঁহার ইচ্ছা। আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তিনিও তাহাই বলিলেন—মঙ্গলবার নহে তো সোমবার।"

এ সকল কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিলাম না; কিন্তু লীলাবতীর বড়ই উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, কাতর ও অবসন্ন ভাব লক্ষিত হইল। আমার বোধ হয়, মনোরমাও সে ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন। তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; লীলাবতী তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া অগ্রেই গৃহত্যাগ করিলেন। গমনকালে তাঁহার সেই বিষাদ-ভারাবনত কাতর নয়ন আমার নয়নের সহিত মিলিত হইল। হায়! কেন আনন্দধামে শিক্ষকতা করিতে আসিয়াছিলাম?

লীলাবতী চলিয়া গেলে, মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, এক্ষণে আপনার বিশেষ কাজ আছে কি? আপনার সহিত দুইটা কথা ছিল। বোধ হয়, বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহা শুনিতে আপনার কষ্ট না হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "চলুন। আমার এক্ষণে কোনই বিশেষ কাজ নাই।"

আমি নীচে নামিবামাত্র দেখিলাম, বাগানের ছোক্‌রা মালী একখানি পত্র লইয়া আসিতেছে। মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন, - "কাহার পত্র? আমার না কি?"

মালী বলিল,—"না দিদি বাবু—চিঠি ছোট দিদি বাবুর।"

মনোরমা পত্র লইয়া তাহার শিরোনামা পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহা অপরিচিত হস্তে লিখিত। জিজ্ঞাসিলেন,—"কে এ পত্র দিল?"

মালী বলিল,—"একটা মেয়েমানুষ আমাকে এ চিঠি দিয়াছে।"

মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম মেয়েমানুষ?"

"ওঃ, বড় বুড়ো।"

"বুড়ো? তাকে তুমি চেন?"

"আজ্ঞে না—আমি চিনি না।"

"কোন্ দিকে সে মেয়েমানুষ গেল?"

বালক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, হাত নাড়িয়া, দক্ষিণ-দিক্ দেখাইয়া দিল।

মনোরমা বলিলেন, "হয় ত কাহার ভিক্ষার পত্র।"

তাহার পর বালকের হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাটীর ভিতরে গিয়া কোন ঝির দ্বারা ছোট দিদির কাছে পত্র পাঠাইয়া দেও।" বালক পত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

তাহার পর মনোরমা আমাকে বলিলেন,—"এখন মাষ্টার মহাশয়, যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই দিকে আসুন।"

যে স্থানে আমার সহিত লীলাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে মনোরমা আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। বলিলেন, "আমার যাহা বক্তব্য আছে, এই স্থানেই তাহা বলিব।"

এই বলিয়া তিনি এক আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে অপর এক আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মাষ্টার মহাশয়, অনর্থক বাগাড়ম্বর আমি ভাল বাসি না, ঘোর-ফের করিয়া কথা বলিতেও আমার অভ্যাস নাই; অতএব আপনাকে আজি যাহা বলিব, তাহা স্পষ্ট ও সরলভাবেই বলিব। এত দিন একত্র অবস্থান করিয়া আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার যেরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি হৃদয়ের সহিত আপনাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয় থাকি। কলিকাতার পথে ঘোর রাত্রিকালে নিসহায়া দুঃখিনীর বিপদ্ উদ্ধারের নিমিত্ত আপনি যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার দুঃখে যেরূপ আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত যে দিন আপনি আমার সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আপনার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ক্রমে ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আমার শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই—আপনি প্রকৃতই শ্রদ্ধার পাত্র।"

মনোরমা একটু চুপ করিলেন। বহুকাল পরে আজি আবার সেই শুক্লবসনা কামিনীর উল্লেখ হইল। মনোরমার কথায় সেই দুঃখিনীর সমস্ত বৃত্তান্ত স্মৃতি-পথারূঢ় হইল এবং চিত্তমধ্যে জাগরূক রহিল। অচিরে তাহার ফলও ফলিল।

মনোরমা বলিলেন,—"দেবেন্দ্রবাবু, আপনার হৃদয়স্থ রহস্য আমার অবিদিত নাই। জানিবেন, কেহ আমাকে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই, ইঙ্গিত বা আভাসও দেয় নাই, তথাপি আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। মাষ্টার মহাশয়, আপনি ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া, আমার ভগ্নী লীলাবতীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হৃদয়মধ্যে স্থান দিয়াছেন। আমি আপনাকে তাহা স্বীকার করিয়া ক্লিষ্ট করিতে বাসনা করি না; মহাশয়ের ন্যায় ভদ্রলোক যে তাহা অস্বীকার করিতে অক্ষম, তাহা আমি বিশেষ জানি। আমি আপনাকে সে জন্য নিন্দা করিতেছি না—আপনি এই নিষ্ফল প্রেমে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি মাত্র। আপনি কখন আমার ভগ্নীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহেন নাই; সুতরাং আপনাকে দোষী করিবার কারণ নাই। এ বিষয়ে আপনার দোষ—আপনি স্বীয় অবস্থা ও স্বার্থ ভুলিয়া দুরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর কোন অংশেই আপনাকে দোষী করা যায় না। যদি আপনার ব্যবহার ভদ্রতার পথ হইতে বিন্দুমাত্র

বিচলিত বলিয়া বোধ হইত, তাহা হইলে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, আপনাকে তখনই আনন্দধাম হইতে বিদূরিত কবিবার অনুজ্ঞা প্রচার করিতাম এবং অপর কাহারও সহিত কথা কহিতেও আপনাকে সময় দিতাম না—অপর কাহারও মতের অপেক্ষাও করিতাম না। ঈশ্বরেচ্ছায় সেরূপ ব্যবহার হয় নাই, এ জন্যই আজি আমি কেবল আপনার বিবেচনার নিন্দা করিতেছি। মাষ্টার মহাশয়, আমার উপর রাগ করিবেন না। আমি আপনাকে কষ্ট দিয়াছি—আরও কষ্ট দিব। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমাকে আত্মীয় বলিয়া জানিবেন।”

আমি মনোরমার এই সরলতা-পূর্ণ—আত্মীয়তা-পূর্ণ কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম। নানাবিধ ভাব-তরঙ্গ আমার হৃদয়সাগরে প্রবল ঝটিকা উত্থাপিত করিয়া তুলিল। আমি কিছু বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কথা মুখ দিয়া বাহিরিল না।

মনোরমা আবার বলিতে লাগিলেন,—“দেবেন্দ্র বাবু, আমি এক্ষণে যাহা বলি, ভাবিবেন না যে, ধন-সম্পত্তি বা অবস্থার বৈষম্য হেতু তাহা বলিতেছি। মাষ্টার মহাশয়, আরও অধিক অনিষ্ট ঘটিবার পূর্ব্বেই আপনাকে আনন্দধাম ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে এই কঠোর কথা বলিতে হইল। আবশ্যক হইলে—এইরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটিলে, বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ-প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন বংশ-সম্ভূত কোন ব্যক্তি হইলেও তাঁহাকেও হয় ত আমার কর্ত্তব্যানুরোধে অবিকল এই কথা বলিতে হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়, ঐশ্বর্য্যের অভাব, পদের হীনতা বা তথাবিধ কারণে আমি এ সকল কথা বলিতেছি, এরূপ মনে করিবেন না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অন্য কারণ আছে—”

মনোরমা নীরব হইলেন এবং আমার করদ্বয় স্বীয় করে ধারণ করিয়া নয়নে নয়ন সম্মিলিত করিয়া বলিলেন,—“তাহার অন্য কারণ আছে। লীলাবতীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া রহিয়াছে।”

আমূল ছুরিকা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। বাহ্যজ্ঞান আমাকে ত্যাগ করিল। যে কর-যুগল আমার করদ্বয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার স্পর্শ আমার বোধাতীত হইয়া গেল। পার্শ্বে ও পশ্চাতে শুষ্ক বৃক্ষ-পত্র-সমূহ বায়ু-ভরে যেরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এখন আমার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষার সেই দশা। সম্বন্ধ স্থির থাকুক না থাকুক, আমার পক্ষে সকলই সমান দুরাশা। হা বিধাতঃ!

যন্ত্রণার প্রথম বেগ অতীত হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, মনোরমা তখনও আমার হস্ত ধারণ করিয়া আছেন। আমি মুখ তুলিলাম, মনোরমা সুতীক্ষ্ণ-নয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন।

মনোরমা বলিলেন,—“চূর্ণ করিয়া ফেলুন। দেবেন্দ্র বাবু, যে স্থানে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানেই এ দুরাশা চূর্ণ করিয়া ফেলুন—পদ-বিদলিত করিয়া দূর করিয়া দিউন।”

মনোরমার বাক্যের তেজ, তাঁহার দৃঢ়তা, তাঁহার সৎপরামর্শ ও তাঁহার সদুদ্দেশ্য সমস্ত অমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল এবং অনতিকাল-মধ্যে আমি অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইলাম বটে। আমি আত্ম-চিত্তের উপর কিয়ৎপরিমাণে প্রভুতা লাভ করিয়া মনোরমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম এবং ভবিষ্যতে আমি তাঁহারই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

মনোরমা বলিলেন,—“আমার ভগ্নীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের যে ভাব আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাও আপনার নিকট হইতে গোপন করিতে চাহি না। আপনাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য আমি বলিতেছি যে, আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন। আপনার বাঞ্ছনীয় সঙ্গ এবং নির্দ্দোষ আত্মীয়তা পরম স্পৃহণীয় হইলেও তাহাতে লীলার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে এবং সে নিতান্ত অসুখী হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসি এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে আমার যেমন অচল বিশ্বাস, আমি লীলার উদার, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়কে তেমনই বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি জানিতে পারিতেছি, মাষ্টার মহাশয়, লীলার হৃদয়ে তাহার স্থিরীকৃত বিবাহের বিরোধি-ভাবের আবির্ভাব হওয়ায় তাহার কি অসহনীয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, লীলার যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে, তা। তাহার হৃদয় কখনই অধিকার করে নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে লীলার ভাবান্তর জন্মিবে কেন? লীলার পিতা মৃত্যু-কালে এই বিবাহ স্থির করিয়া যান; লীলার প্রণয় বা অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে সম্বন্ধ স্থির করা হয় নাই। পিতার আদেশ পালন করিতে লীলা বাধ্য; সুতরাং লীলা এ সম্বন্ধে অনুমত করে নাই—করিতে তাহার সাধ্য নাই। আপনি যত দিন এখানে না আসিয়াছেন, তত দিন লীলার

মনে কোনই বিরুদ্ধ ভাব ছিল না। আমার বোধ হয়, আপনি যদি হৃদয়বেগ সংযত করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই নবীনভাব লীলার হৃদয়ে এখনও বদ্ধ-মূল হয় নাই। আপনি নয়নান্তরালে থাকিলে, আমার বোধ হয়, লীলার এই ভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে এবং সম্ভবতঃ সময়ে সকল অমঙ্গল-সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়া যাইবে। আর আপনাকে কি বলিব? কলিকাতার সেই জনহীন পথে নিশাকালে সেই অপরিচিতা অসহায়া স্ত্রীলোক আপনার শরণাগত হইয়া আশাতিরিক্ত করুণা লাভ করিয়াছিলেন; প্রার্থনা করি, অদ্য আপনি আপনার ছাত্রীর মঙ্গলার্থ সেইরূপ সদ্ব্যবহার ও অপরিসীম ত্যাগস্বীকার করিবেন।"

আবার এ স্থলে দৈবাৎ সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর উল্লেখ! কি জানি, তাহার কথা বাদ দিয়া লীলাবতী ও আমার কথা কি চলিবার উপায় নাই? কি জানি, নিয়তির কি লেখা!

আমি বলিলাম,—"বলুন আমাকে, আমি এখন কি উপায়ে রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব? তিনি বিদায় দিলে কোন্ সময়ে আমার চলিয়া যাওয়া আবশ্যক? আমি অতঃপর সর্ব্বপ্রকারে আপনার উপদেশাপেক্ষী হইয়া চলিব।"

মনোরমা বলিলেন,—"সময়ের কথাই কথা। আপনার মনে আছে বোধ হয়, আমি লীলাকে সোমবার এবং হোরী ঘরের কথা বলিতেছিলাম। সোমবারে যিনি আসিবেন, তিনিই—"

আবারও কি বলিতে হইবে? এখনও কি বুঝিতে বাকী আছে যে, সোমবারে যিনি আসিবেন, তিনিই লীলাবতীর ভবিষ্যৎ স্বামী? আমি মনোরমার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—"আমি আজিই যাই না কেন? যত শীঘ্র যাওয়া ঘটে, ততই মঙ্গল।"

মনোরমা বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না। আপনি জানেন, কাকা মহাশয় কেমন লোক। তিনি যদি বুঝিতে পারেন, আপনি বিশেষ কারণ ব্যতীত যাইতেছেন, তাহা হইলে আপনার যাওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কল্য ডাক আসিবার সময়ের পর আপনি তাঁহার নিকট বিদায়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি মনে করিতে পারেন যে, হয় ত আপনার যাওয়ার জন্য বিশেষ কোন পত্র আসিয়াছে; সুতরাং মত দিতে পারেন। আপনি কিন্তু ইহারই মধ্যে আর সব ঠিক্‌ঠাক করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে আপনার যাওয়ার কোন ব্যাঘাত হইবে না বোধ হয়। কি দুঃখের বিষয় দেবেন্দ্রবাবু, নির্দ্দোষ কার্য্যের জন্যও আমাদিগকে কপটতা অবলম্বন করিতে হইতেছে।"

তাঁহার কথামত কার্য্য করিব, এই কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মনুষ্যের পদ-শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। না জানি কে। লীলাবতী না হইলেই বাঁচি! কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! যে লীলাবতী আমার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, আজ আর তাঁহাকে দেখিতেও সাহস নাই! বাঁচা গেল—যে আসিতেছে, সে লীলাবতী নহে, লীলাবতীর এক জন দাসী। দাসী মনোরমাকে বাহিরে আসিতে সঙ্কেত করিল। তিনি তাহার সহিত চলিয়া গেলেন।

আমি একাকী বসিয়া কতই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ কি উৎপাত! আবার সেই শুক্লবসনা কামিনীর কথা ক্রমে ক্রমে মনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি দায়! সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল বিষয়ের মধ্যেই কি সে আসিবে? তাহার সহিত আবার কখন কি আমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে? কিছু না। কলিকাতায় আমি থাকি, তাহা কি সে জানে? জানে বই কি? তাহাকে আমি এ কথা বলিয়াছিলাম। রাজা উপাধিধারী কোন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে কি না, এই অদ্ভুত প্রশ্নের পূর্ব্বেই হউক কি পরেই হউক, এ কথা তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম।

অত্যল্পকাল পরেই মনোরমা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বদনের কিছু ব্যাকুল ভাব। তিনি বলিলেন, "দেবেন্দ্রবাবু, আমাদের পরামর্শ সমস্তই স্থির হইয়াছে, এক্ষণে চলুন, আমরা বাটীর ভিতর যাই। আমি লীলার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি। ঝি বলিল, লীলা একখানি পত্র পাইয়া বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে—নিশ্চয়ই সে মালী আমাদিগকে যে পত্র দেখাইতেছিল, সেই পত্র।"

আমরা ব্যস্ততা সহ চলিলাম। মনোরমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার এখনও বলিবার অনেক কথা রহিয়াছে। লীলার স্বামী আসিবেন; তিনি কেমন লোক, তাহা জানিবার জন্য আমার হৃদয় প্রবল কৌতূহল ও ঈর্ষ্যাময় আগ্রহে পূর্ণ হইয়াছে। হয় ত ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অন্য সুযোগ উপস্থিত না হইতে পারে; অতএব এই সময়ে জিজ্ঞাসা করাই সুবিধা।"

আমি বলিলাম,—"আপনি বুঝিয়াছেন বোধ হয়, আমি হৃদয়কে যথেষ্ট সহিষ্ণু করিয়াছি এবং অতঃপর আপনার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেই সঙ্কল্প করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে বলিবেন

কি, যাঁহার সহিত লীলাবতীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তিনি কে ?"

মনোরমা অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"হুগলী জেলার এক জন মহা ধনবান্ ব্যক্তি।"

হুগলী জেলা। মুক্তকেশীর জন্মভূমি। কি বিপদ্ গা! সকল কথাতেই সেই শুক্লবসনা সুন্দরী!

আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"তাঁহার নাম কি ?"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন।"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন! এই ত আবার সেই মুক্তকেশীর প্রশ্ন—রাজা উপাধিধারী লোক!"

নবম পরিচ্ছেদ

আর বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা বাটীতে প্রবেশ করিলাম। মনোরমা লীলার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। আমি নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলাম। কত শত ভয়ানক ভয়ানক দুশ্চিন্তা আজি আমাকে উৎপীড়িত করিয়াছে, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর চিন্তা—হুগলী-নিবাসী এক মহা ধনবান্ রাজার সহিত লীলাবতীর বিবাহ হইবে! বেশ ত! তাহাতে চিন্তার বিষয় কি? কি জানি কি। সেই শুক্লবসনা কামিনীই চিন্তার মূল। তাহার নিবাস হুগলী এবং সে অত্যন্ত ভীতভাবে রাজা উপাধিধারী কোন লোকের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি কি জানি না—কিন্তু মন কোনমতেই স্থির হইতেছে না। লীলাবতীর সহিত সেই অসহায়া কামিনীর বিষম সাদৃশ্য অনুভব করার পর হইতে আমার মনের কেমন গতি হইয়া পড়িয়াছে। যেন মনে হইতেছে, যাহা মুক্তকেশীর পক্ষে ভয়ানক ও বিপজ্জনক, তাহা লীলাবতীর পক্ষেও ভয়ানক ও বিপজ্জনক। কি জানি, যেন কতই বিপদ্—যেন কতই ভয়ানক ঘটনা আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত বহুদুর হইতে চেষ্টা করিতেছে! কি বলিতে পারি, কি হইবে।

এইরূপ চিন্তাকুল অবস্থায় নিয়মিত সময়ের মধ্যে রায় মহাশয়ের কার্য্যাদি সমস্ত শেষ করিয়া দিবার নিমিত্ত উপবেশন করিলাম। কার্য্যাদি প্রায় শেষ হইয়াছিল; একবার দেখিয়া শুনিয়া সব ঠিক করিয়া দিলাম মাত্র। তাহরে পর স্নানাহার সমাপিত হইলে, সেই খট্টিকোপরি শয়ন করিয়া, অসীম দুরাশার জন্য আপনাকে আপনি বার বার ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার ঘরের দ্বারে মনোরমা ডাকিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় ঘরে আছেন?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম,—"আছি,—আসুন।"

আমি উঠিয়া গিয়া চেয়ারে বসিলাম। মনোরমার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি বড়ই উত্ত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিকটস্থ এক চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্রবাবু, মনে করিয়াছিলাম, সর্ব্বপ্রকার অপ্রীতিজনক কথাবার্ত্তা বুঝি অন্ধকার মত অবসান হইয়া গেল। এখন দেখিতেছি, তাহা হইবার নহে। আমার ভগ্নীকে তাহার আগতপ্রায় বিবাহ সম্বন্ধে ভয় জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত গুপ্ত চক্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আজি প্রাতে মালী লীলার নামে একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরযুক্ত পত্র আনিয়াছিল, জানেন?"

"জানি বই কি?"

"সেই চিঠিখানি বেনামী। তাহা আর কিছুই নহে, লীলার চক্ষে প্রমোদরঞ্জনকে একটি জঘন্য মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান করাইবার অতি ঘৃণিত চেষ্টা। লীলা সেই পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমি অতি কষ্টে তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি—সে কি আসিতে দেয়? মাষ্টার মহাশয়, এ সকল পারিবারিক প্রসঙ্গে আপনার সহিত পরামর্শ করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে এবং হয় তো আপনারও এরূপ বিষয়ে কোনই অনুরাগ—"

আমি বলিলাম,—"আপনি অন্যায় বলিতেছেন। যে কোন বিষয়ের সহিত আপনার বা লীলাবতী দেবীর ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ আছে, আমি তাহাতে কেমন করিয়া উদাসীন থাকিব?"

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এ বাটীতে আপনি ছাড়া এমন কোন লোক নাই, যাহার সহিত একটা পরামর্শ করা যায়। বাটীর যিনি কর্ত্তা, তাঁহার নিকট এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই অসম্ভব, পরামর্শ তো দূরের কথা। এক্ষণে আমি করি কি, আপনি তাহাই পরামর্শ দিয়া বাধিত করুন। এখন কে এ পত্র লিখিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইব, অথবা যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য কলিকাতাস্থ আমাদিগের উকীলের নিকট পাঠাইয়া দিব? আপনার সহিত এই তিন মাসে যেরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, তাহাতে আপনার নিকট এইরূপ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া

মনে করি। আপনি বলিয়া দিন. এখনই কি করা কর্ত্তব্য। এই সে পত্র, পাঠ করুন।"

তিনি আমার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। পত্রে পাঠ কিছুই নাই। আমি তাহা এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আপনি কি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন? না করিবেন কেন? স্বপ্নে বিশ্বাস করা ভাল।

"লীলাবতী দেবি, আমি গত রাত্রে আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। এক বৃহৎ বাটী সুসজ্জিত ও আলোক-মালাশোভিত অঙ্গনে আমি দাঁড়াইয়া আছি—তথায় বিবাহের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত; পুরোহিত, লোক-জন, দান-সামগ্রী, বর-কন্যা সমস্তই রহিয়াছে। দেখিলাম, সে কন্যা আপনি। আপনার সুন্দর বর্ণ হরিদ্রা-সংযোগে আরও চমৎকার দেখাইতেছে। আমার বোধ হইল, আপনার সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়। আপনার পরিধান রক্তবর্ণ বারাণসী সাটী—অঙ্গের সর্ব্বত্র মূল্যবান্ প্রস্তর-খচিত অলঙ্কার। আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু হইতে অশ্রু-প্রবাহ প্রবাহিত হইল।

"আমার সে অশ্রু সহানুভূতির উৎস হইতে নিঃসৃত। কিন্তু মনুষ্যের নয়ন হইতে যেরূপ অশ্রু প্রবাহিত হয়, এ অশ্রু সেরূপ নহে। আমার এ অশ্রু নয়নদ্বয় হইতে দুইটি উজ্জ্বল আলোকধারারূপে নিক্রান্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে বরের সমীপস্থ হইল এবং তাহার বক্ষোদেশ স্পর্শ করিল। তাহার পর সেই আলোকরূপী অশ্রু-প্রবাহ ধনুকের ন্যায় অর্দ্ধমণ্ডলাকারে অবস্থিত হইল। আমি সেই অর্দ্ধমণ্ডলমধ্য দিয়া বরের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম।

"বরের বাহ্যাকৃতি দেখিতে মন্দ নহে। মধ্যমাকার, গৌরবর্ণ, কর্ম্মিষ্ঠ দেহ—বয়স বোধ হয়, পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইতে পারে। কেশ সমুদয়ই কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকের সম্মুখদিকে খানিকটা টাক। চক্ষু অতি উজ্জ্বল, কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে একটা কাটা দাগ। কেমন, আমি ঠিক স্বপ্ন দেখিয়াছি, না স্বপ্ন আমাকে প্রতারিত করিয়াছে?

"সেই ধনুকাকার আলোক-মালার মধ্য দিয়া আমি সেই বরের মর্ম্ম-স্থল দেখিতে পাইলাম;—দেখিলাম, সে হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার উপর জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, 'এ হৃদয়ে দয়া নাই, মায়া নাই। এ ব্যক্তি কত লোকের জীবন চির-বিষাদময় করিয়া দিয়াছে, আবার পার্শ্ববর্ত্তী যুবতীর জীবনও সেইরূপ করিয়া দিবে।' আমি তাহা পাঠ করিলাম। তাহার পর সেই বক্র আলোক স্থলভ্রষ্ট হইয়া ঐ বরের স্কন্ধদেশে সংযুক্ত হইল। দেখিলাম, বরের পশ্চাৎ হইতে এক পিশাচ হাসিতে হাসিতে উঁকি দিতেছে। তাহার পর সেই ধনুকাকার আলোক স্থানত্যাগ করিয়া কন্যার স্কন্ধদেশে অবস্থিত হইল। দেখিলাম, আপনার পশ্চাতে এক দেবী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাহার পর সেই আলোক-প্রবাহ আবার একবার স্থানত্যাগ করিয়া আপনার ও বরের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল। সেই আলোক ক্রমশঃ আপনাদিগকে অন্তরিত করিয়া দিতে লাগিল। বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। আমার মহানন্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লীলাবতী দেবি! আমি স্বপ্ন বিশ্বাস করি।

"আপনাকে বড় ভালবাসি বলিয়া এত কথা লিখিয়া সাবধান করিয়া দিলাম। আমার নিজের এ বিষয়ে কোন স্বার্থ নাই, তাহা স্থির জানিবেন। আপনার জননীর দুহিতা আমার বড় ভালবাসার ধন; কারণ, এ জগতে আপনার জননীই আমার এক পরম আত্মীয়া ছিলেন।"

এই আশ্চর্য্য পত্র এইরূপে সমাপ্ত হইল। হস্তাক্ষর দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, ইহা স্ত্রীলোকের লিখিত।

মনোরমা বলিলেন,—"নিশ্চয়ই এ পত্র মূর্খ লোকের লেখা নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য! লেখিকা এমন সুন্দর লিখিতে জানে, অথচ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ-পদ্ধতি কিছুই জানে না।"

আমি বলিলাম,—"ইহা স্ত্রীলোকের লেখা নিশ্চয়ই। তবে সে স্ত্রীলোক যেন—"

মনোরমা বলিলেন,—"যেন অস্থিরবুদ্ধি। পত্র পাঠ করিয়া প্রথমেই আমার মনে এই সংস্কার হইয়াছে।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার নয়ন-মন তখন পত্রের শেষাংশ, যে অংশে লিখিত রহিয়াছে—'আপনার জননীর দুহিতা আমার বড় ভালবাসার ধন; কারণ, এ জগতে আপনার জননী আমার একমাত্র পরমাত্মীয়া ছিলেন,' সেই অংশ পাঠে নিযুক্ত ছিল। বলিতে সাহস হয় না, এই কথা অবলম্বন করিয়া মন ক্রমে সেই ভয়ানক স্থানে উপনীত হইয়া বর্ত্তমান ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কি বিপদ্! বলা দূরে থাকুক, ইহা ভাবিতেও সাহস হয় না।

পত্রখানি মনোরমার হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম,—"পত্র যে লিখিয়াছে, তাহাকে সন্ধান করিতে হইলে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে—এখনই সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আমার বিবেচনায় প্রথমে

সেই মালীকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা, তাহার পর গ্রামস্থ অপরাপর লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। হাঁ, আপনি কলিকাতার উকীলের নিকট কল্য পত্র লিখিবেন বলিতেছিলেন, আজি লিখিলে দোষ কি ?"

মনোরমা বলিলেন,—"কয়েকটি কারণে আজি পত্র লেখা সঙ্গত হইতেছে না। রাজা প্রমোদরঞ্জন এখানে সোমবারে আসিতেছেন। তাঁহার সোমবারে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য, বিবাহের দিন স্থির করা। বিবাহ স্থির হইয়া আছে বটে, কিন্তু দিন এখনও স্থির হয় নাই। রাজা দিন-স্থির করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম,—"রাজা যে এই উদ্দেশ্যে এখানে আসিতেছেন, লীলাবতী দেবী তাহা জানেন ?"

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"বিন্দু-বিসর্গও না। আমি তাঁহাকে এ সকল কথা বলিতে পারিব না। কাকা মহাশয় তাঁহার অভিভাবক, তিনিই যাহা হয় বলিবেন। এ দিকে বিবাহের দিন-স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতীর বিষয়-সম্পত্তির বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। আপনি জানেন বোধ হয়, লীলার কিছু নিজ-সম্পত্তি আছে। কাকা মহাশয় আমাদের উকীল কলিকাতাস্থিত শ্রীযুক্ত উমেশবাবুকে পত্র লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ উমেশবাবু কল্যই এখানে আসিবেন এবং বিহিত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কয়েক দিন এখানে থাকিবেন। রাজা প্রমোদরঞ্জন যদি আলোচ্য প্রসঙ্গের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হন এবং যদি লীলার নিজ সম্পত্তি-বিষয়ক সুব্যবস্থা হইয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহের দিন-স্থির হইয়া যাইবে। এই জন্যই আমি একটু অপেক্ষা করিব বলিতেছি। উমেশবাবু আমাদের হিতৈষী বন্ধু; তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে কোন হানি নাই।"

বিবাহের কথা স্থির। কথাটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমার হৃদয় কেমন এক প্রকার ঈর্ষ্যাপূর্ণ হতাশভাবে অভিভূত হইয়া গেল এবং আমার উচ্চাভিলাষ ও মহত্তর বুদ্ধি যেন তিরোহিত হইল। যে ভয়ানক কাহিনী আমি এক্ষণে ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার এক বর্ণও আমি প্রচ্ছন্ন করিব না। সেই লেখকের নামবিহীন পত্রে রাজা প্রমোদরঞ্জন-সংক্রান্ত যে সকল ভয়ানক কথা লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তের সম্পূর্ণ সত্যতার জন্য আমার মনে প্রবল ঘৃণিত আশার আবির্ভাব হইল। যদি সেই সকল ভয়ানক কথা সত্যমূলক হয় এবং বিবাহের কথা স্থির হইবার পূর্ব্বে যদি সেই সকল সত্য সপ্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে ? এখন বুঝিয়া দেখিতেছি যে, তৎকালে আমার চিত্তের যে ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা লীলাবতী দেবীর কল্যাণ-কামনা-মূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, লীলাবতীর বিবাহার্থী ব্যক্তির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষে এই ভাব আরব্ধ ও পরিপুষ্ট হইল। এই নবীন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমি বলিলাম,—"যদি অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা বিধেয় নহে। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের এখনই প্রথমে মালীকে জিজ্ঞাসা, তাহার পর গ্রামমধ্যে সন্ধান করা কর্ত্তব্য।"

মনোরমা বলিলেন,—"বোধ হয়, এ সম্বন্ধে আমিও আপনার সহায়তা করিতে পারি। চলুন তবে, দেরী করিয়া কাজ নাই।"

যাত্রার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঐ লেখকের নামহীন পত্রের এক স্থানে খানিকটা আকৃতিগত বর্ণনা আছে। পত্রে রাজা প্রমোদরঞ্জনের নাম উল্লেখ নাই। কিন্তু ঐ বর্ণনার সহিত তাঁহার আকৃতির সাদৃশ্য আছে কি ?"

"ঠিক সাদৃশ্য। এমন কি, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঠিক—"

পঁয়তাল্লিশ বৎসর! এ দিকে লীলা এখন এই নব-যৌবনে অবতীর্ণা! তাহাতে ক্ষতি কি ? এরূপ বয়স-বৈষম্যে তো কতই বিবাহ ঘটিতেছে এবং দেখা যাইতেছে, সে সকল স্থলে দম্পতি সুখেই আছেন। তথাপি রাজার বয়স ও লীলার বয়সের বৈষম্য মনে করিয়া আমার রাজার উপর ঘৃণা ও অবিশ্বাস আরও একটু বাড়িয়া গেল।

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—"এমন কি, পশ্চিম-ভ্রমণকালে তাঁহার হাতে দৈবাৎ একটা আঘাত লাগায় যে একটি দাগ রহিয়া গিয়াছে, তাহাও ঠিক লিখিয়াছে। পত্রলেখক যে তাঁহাকে খুব ভালরকমে জানে, তাহার কোনই ভুল নাই।"

"আচ্ছা, তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ কথা কখনই কেহ বলে না কি ?"

"সে কি মাষ্টার মহাশয়! এই জঘন্য পত্রপাঠে আপনি কি বিচলিত হইয়াছেন ?"

আমি বড় লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। কথা ঠিক—পত্রখানা আমাকে বিচলিত করিয়াছে সত্য। বলিলাম,—"না—না—যাহা হউক, এ কথা আমার জিজ্ঞাসা করা ভালই হয় নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"আপনি এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় দুঃখিত হই নাই। আমি রাজা

প্রমোদরঞ্জনের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত প্রশংসার সমর্থন করিতেছি। তাঁহার বিরুদ্ধে বিন্দুবিসর্গও গ্লানি-সূচক কথা কখন আমাদের কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। রাজা কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের এক জন কমিশনর এবং জষ্টিস্ অব্ দি পিস। তাঁহার সচ্চরিত্রতার বোধ হয় ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।"

কোন উত্তর না দিয়া আমরা গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলাম। তাঁহার কথা বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া আমার বোধ হইল না। স্বর্গের দেবতা আসিয়া যদি আমাকে রাজার সচ্চরিত্রতা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহাও বোধ হয়, আমি তখন বুঝিতাম না।

আমরা বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। নানারূপে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার নিকট হইতে বিশেষ সংবাদ কিছুই পাওয়া গেল না। সে বলিল, একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক এই পত্র দিয়া দিয়াছে। তাহার সহিত সে কোন কথাই কহে নাই। চিঠি দিয়াই স্ত্রীলোকটি কিছু ব্যস্তভাবে দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া গ্রামের মধ্যে যাওয়া যায়। আমরাও সেই দিকে চলিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

আনন্দপুরের মধ্যে নানা প্রকার অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু বিশেষ ফল কিছুই হইল না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সেই বলে, এরূপ স্ত্রীলোক দেখি নাই। কেবল দুই তিন জন 'দেখিয়াছি' বলিল বটে, কিন্তু সে দেখিতে কেমন ও সে কোন্ দিকে গেল, ইহা তাহারা কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। ক্রমে সন্ধান করিতে করিতে আমরা বরদেশ্বরী দেবীর সংস্থাপিত বিদ্যালয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিদ্যালয়ভবন ছাড়াইয়া যাই যাই সময়ে আমি বলিলাম,—"এ গ্রামের অন্যান্য সকল লোকের অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় অবশ্যই অধিক বিজ্ঞ ও বিদ্বান্। এতই সন্ধান করা গেল, একবার শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেই হইত।"

মনোরমা বলিলেন, "আমার বোধ হয়, স্ত্রীলোক যখন যাতায়াত করিয়াছিল, তখন পণ্ডিত মহাশয় হয় ত আপন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাহা হউক, সন্ধান করায় হানি নাই।"

আমরা বিদ্যালয়ের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা জানালা দিয়া দেখিতে পাইলাম, পণ্ডিত মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া বালকগণ দাঁড়াইয়া আছে, তিনি তাহাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন। কেবল একটি বালক জনহীন দ্বীপে দ্বীপান্তরিত ব্যক্তির ন্যায় এক কোণে একখানি টুলের উপর অধোবদনে দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা দ্বার-সমীপস্থ হইয়া শুনিতে পাইলাম, পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন, "বালকগণ! সাবধান! ভূত-প্রেতিনীর কথা যদি তোমরা কেহ কখন বল, তাহা হইলে তোমাদের বিষম শাস্তি হইবে। আমি বলিতেছি, ভূত-প্রেতিনী মিথ্যা কথা, সংসারে তাহার কিছুই নাই। তোমরা দেখিতেছ, রামধনের কেমন অপমান হইয়াছে। রামধন যদি এখনও প্রেতিনী মিছা কথা, ইহা না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বেতের আগায় প্রেতিনী ছাড়াইয়া দিব। আর তোমরাও যদি ঐরূপ কথা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি লাঠিবাজি করিয়া সকলেরই ভূত ছাড়াইয়া দিব।"

বক্তৃতার অবসান-সময়ে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহ-প্রবেশকালে মনোরমা বলিলেন,—"আমরা বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি।"

আমরা গৃহাগত হইলে পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমাদের সকলেরই এখন জলখাবারের ছুটী; কেবল রামধন যাইতে পাইবে না। দেখা যাউক, প্রেতিনীতে খাবার আনিয়া দেয় কি না।"

রামধন চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

মনোরমা বলিলেন,—"আমরা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আপনি যে এখন ভূত ছাড়াইতে নিযুক্ত আছেন, তাহা আমরা জানিতাম না। যাহা হউক, ব্যাপারটা কি? এত গোল কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"বলিব কি আপনাকে, এই দুষ্ট বালকটা কল্য রাত্রে একটা প্রেতিনী দেখিয়াছে বলিয়া গল্প করিয়া বিদ্যালয়ের সমস্ত বালককে ভয় দেখাইতেছে। উহার গল্প যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা ও কিছুতেই বুঝিবে না।"

মনোরমা বলিলেন,—"এখনকার ছেলেরা এত ভূতের ভয় করে, ইহা আশ্চর্য্য বটে।"

তাহার পর তিনি যে কথা সকলকে জিজ্ঞাসা

করিতেছিলেন, পণ্ডিত মহাশয়কেও তাহা জিজ্ঞাসিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও সে সম্বন্ধে কোনই সন্ধান দিতে পারিলেন না। তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া মনোরমা বলিলেন,—"চলুন তবে বাটী ফিরিয়া যাই। আমরা যে সংবাদের সন্ধান করিতেছি, তাহা আর পাওয়া যাইবে না।"

তিনি বিদায়সময়ে অপমানিত রামধনকে দুই একটা সান্ত্বনাবাক্য বলিবেন, ইচ্ছা করিলেন। তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "দুষ্ট ছেলে, পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে ক্ষমা চাও। ভূতের কথা আর কখন মুখেও আনিও না।"

রামধন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল,—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি সত্যি পেত্নী দেখেছি —অ্যাঁ।"

মনোরমা বলিলেন,—"মিছা কথা, তুমি কখন পেত্নী দেখ নাই। পেত্নী কি রকম—"

পণ্ডিত মহাশয় যেন একটু উৎকণ্ঠিতভাবে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ও মূর্খ বালককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। হয় ত না বুঝিয়া,-"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। মনোরমা ত্বরিত জিজ্ঞাসিলেন,—"না বুঝিয়া কি?"

পণ্ডিত বলিলেন,—"না বুঝিয়া হয় ত আপনার অপ্রীতিকর কোন কথা ও বলিয়া ফেলিতেও পারে।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমি কি এমনই পাগল যে, এই দুগ্ধপোষ্য বালকের কথায় অপ্রীত হইব?"

তাহার পর বালকের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—"তোমার ভূতের গল্প আমি শুনিব। বল তুমি, কোথায় ভূত দেখিয়াছিলে?"

রামধন বলিল, "ভূত নয়, পেত্নী। কা'ল রাত্তিরে জ্যোৎছনার সময়।"

"পেত্নী! আচ্ছা,তোমার পেত্নী দেখিতে কেমন?"

বালক বিজ্ঞভাবে বলিল, "পেত্নীতে যেমন শাদা কাপড় পরে, তেমনই; তার আগাগোড়া গায়ে শাদা কাপড়।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

"কেন? রায় মোশাইদের বাগানে—যে রকম জায়গায় পেত্নী থাকে।"

মনোরমা বলিলেন, "ভূত-পেত্নী কেমন কাপড় পরে, কোথায় থাকে, সকল কথাই তুমি জান দেখিতেছি। যেন তাহারা তোমার চিরকালের আলাপী। যেরূপ তোমার ভাব দেখিতেছি, তাহাতে হয় ত কে মরিয়া পেত্নী হইয়াছে, তাহাও তুমি বলিতে পার।"

ঘাড় নাড়িয়া রামধন বলিল,—"তা তো পারি।"

পণ্ডিত মহাশয় অনেকবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। এবার তিনি জোর করিয়া বলিলেন,—"বালককে অনর্থক এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উহাকে বিষম প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।"

মনোরমা বলিলেন,—"আর একটি কথা।"

বালককে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি দেখিয়াছ? সে পেত্নী কে?"

রামধন ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে বলিল,-"বরদেশ্বরী ঠাকুরাণী।"

পণ্ডিত মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ হইল; বালকের উত্তর শুনিয়া মনোরমা দেবী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বালককে কি বলিবেন মনে করিলেন। বালক তাঁহার বদনের নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও উত্ত্যক্ত ভাব দেখিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর মনোরমা পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"এ ক্ষুদ্র বালককে তিরস্কার করিয়া কি কাজ? নিশ্চয়ই অপর কোন ব্যক্তি বালকের সম্মুখে এরূপ গল্প করিয়াছে। এই আনন্দধামে আমার মাসীমার নাম এরূপ ভাবে আলোচনা করে, এমন লোক যে যে আছে, তাহাদের যাহাতে বিহিত শাস্তি হয়, তাহার উপায় আমি করিবই করিব।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"দেবি! আপনার ভুল হইতেছে। বিষয়টা আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত কেবল ছেলেমানুষের ছেলেমী। কালি রাত্রে বালক যখন বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিল, হয় ত সেই সময়ে তথায় কোন শুক্লবসনা স্ত্রীলোক দেখিয়া থাকিবে, অথবা আর কিছু দেখিয়া মনে সেইরূপ ভাবিয়া থাকিবে। সেই কল্পিত বা বাস্তব মূর্ত্তি বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি-সন্নিধানে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে ঐ নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া, বালক আপনার বিরাগজনক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, বোধ হয়।"

তথাপি মনোরমার মন প্রকৃতিস্থ হইল না। তিনি অন্য কোন উত্তর না দিয়া বিদ্যালয় হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলাম। এক্ষণে বাহিরে বসিয়া বর্ত্তমান ব্যাপারে আমার কি মত, মনোরমা দেবী তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

আমি বলিলাম,—"আমার ধারণা হইয়াছে যে, বালকের কাহিনীর মূলে নিশ্চয়ই কোন সত্য আছে। আমি এখনই বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে

যাইব এবং তাহার পার্শ্বের জমী ভাল করিয়া দেখিব।"

মনোরমা কিয়ৎকাল অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—"বিদ্যালয়-গৃহের ঘটনা আমাকে এত চঞ্চলচিত্ত করিয়াছে যে, আমি পত্রের কথা এককালে ভুলিয়া গিয়াছি। তবে কি আমরা এখন পত্র-লেখকের সন্ধান আর করিব না? উমেশ-বাবু আসিয়া যাহা হয় করিবেন ভাবিয়া এখন কি আমরা চুপ করিয়া থাকিব?"

"কখনই না। বিদ্যালয়-গৃহে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধানে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছি।"

"কেন?"

"কারণ, আপনি আমাকে যখন প্রথমে পত্র পাঠ করিতে দেন, তখন আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, সেই সন্দেহ এই ঘটনায় আরও বদ্ধমূল হইতেছে।"

"সে সন্দেহ আমার নিকট গোপন করা আবশ্যক কি?"

"সে সন্দেহের অধিক আলোচনা করিতে আমার সাহস হয় না। সে সন্দেহ প্রথমে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার ও আমার দুষ্টবুদ্ধির ফল মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সেরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। বালকের কথাবার্ত্তায় এবং তাহার সামঞ্জস্য করিবার কালে, দৈবাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ হইতে যে একটা উক্তি বাহির হইয়াছিল, তদুভয়ই এক্ষণে আমার সেই সন্দেহকে সতেজ করিয়া দিয়াছে। হয় ত ভবিষ্যতে আমার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ আমার চিত্তে তাহার আধিপত্য নিতান্ত প্রবল। আমার বিশ্বাস, বাগানের কল্পিত প্রেতিনী এবং ঐ নামহীন পত্রের লেখক একই ব্যক্তি।"

"কে সে ব্যক্তি?"

"না জানিয়া ও না বুঝিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন। যখন তিনি বালক-দৃষ্ট মূর্ত্তির কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনি তাহা কোন শুক্ল-বসনা স্ত্রীলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।"

"তবে কি সে মুক্তকেশী?"

"হাঁ, মুক্তকেশী!"

মনোরমা বলিলেন,—"জানি না, কেন আপনার সন্দেহ আমাকে এখন চমকিত ও বিচঞ্চল করিয়া তুলিল। আমার বোধ হয়—"

তিনি চুপ করিলেন এবং কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যত্ন করিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন, "দেবেন্দ্রবাবু, আপনাকে মাসীমার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়া এখন আমি বাটী ফিরিয়া যাই। লীলা অনেকক্ষণ একা আছে। তাহাকে এরূপ একা রাখা ভাল নয়।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা বাগানের নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সুন্দর সুবিস্তৃত উদ্যানের একদেশে স্বর্গীয়া বরদেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ভাস্করের অত্যদ্ভুত নিপুণতা হেতু দূর হইতে যেন প্রতিমূর্ত্তি সজীব বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রতিমূর্ত্তির গম্ভীর বদন-শ্রী দেখিয়া স্বর্গীয়া দেবী যে, বিশিষ্ট বুদ্ধিমতী ও সৎস্বভাবসম্পন্না ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। অতি সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তর-বেদিকায় ঐ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত। স্থানটি নিতান্ত নির্জ্জন। উদ্যানের সে দিকে কেহই কখন বেড়াইতে আইসে না এবং তত্রত্য বৃক্ষাবলী বৃহৎকায়, এ জন্য মালীদিগকেও সে স্থানে সতত গমন করিতে হয় না। এই উদ্যানের প্রান্তদেশ দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। বাগানের আবর্জ্জনা সমস্ত বাহিরে ফেলিবার নিমিত্ত সেই পথের উপর একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে। জীর্ণ হইয়া সেই দ্বারের একখানি কপাট পড়িয়া গিয়াছে।

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার সহিত আমার আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। যদি আপনি কোন সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে বলিবেন। আমি যাই।"

তিনি চলিয়া গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে প্রতিমূর্ত্তি-সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলাম। প্রতিমূর্ত্তি যে ভূমির উপরে অবস্থিত, তাহার চারিদিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস এবং তত্রত্য ভূমি নিতান্ত কঠিন। সুতরাং তথায় কোন পদচিহ্ন লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে মর্ম্মর-প্রস্তর-খণ্ডের উপর প্রতিমূর্ত্তির চরণদ্বয় সংস্থিত, তাহা বৃষ্টি ও অন্যান্য নানা কারণে মলিনতাযুক্ত। সেই মলিন প্রস্তরখণ্ডের এক পার্শ্ব বিশেষ শুভ্র ও নূতনের ন্যায় পরিষ্কার বোধ হওয়ায় আমার কৌতূহল প্রচুর-পরিমাণে উদ্রিক্ত হইল এবং আমি সে অংশ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলাম। সে অংশ যে অত্যল্পকাল পূর্ব্বে মানব-হস্ত দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপ বুঝা যাইতেছে। প্রস্তরখণ্ড আংশিক পরিষ্কৃত হইয়াছে, অপরাংশ পরিষ্কৃত হয় নাই। কে এ মর্ম্মর-প্রস্তর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ

করিয়াছিল এবং অবশেষে আরব্ধ কার্য্য অর্দ্ধ-সমাপিত অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে ?

কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর পাইব বা মীমাংসা করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বাগানের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম ; কিন্তু কোনই ফল হইল না – কোন দিকে কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। বাগানের কার্য্যে যাহারা লিপ্ত, তাহাদের নিকটে চলিয়া আসিলাম এবং একে একে সকলকে সুকৌশলে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির অপরিষ্কৃততার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; যাহাদের জিজ্ঞাসিলাম, বুঝিলাম, তাহারা কেহই পরিষ্কার-করণে হস্তক্ষেপ করে নাই। তবে কে এ কার্য্য করিল ? স্থির মীমাংসা করিলাম, এ কোন বাহিরের লোকের কার্য্য। ভূতের গল্প শুনিয়া, তাহার পর প্রতিমূর্ত্তির নিকটেও এই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া স্থির-প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সেই রাত্রিতে সন্নিহিত কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া প্রতিমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিব। মীমাংসা করিলাম, যে ব্যক্তি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে আরব্ধ অর্দ্ধসমাপিত কার্য্য নিশ্চয়ই অদ্য সম্পূর্ণ করিতে আসিবে।

ভবনাগত হইয়া মনোরমা দেবীকে আমার অভিসন্ধি জানাইলাম, তিনি শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, কিন্তু আমার অভিপ্রায়ে কোন বাধা দিলেন না ; বরং তিনি আমার চেষ্টার সফলতার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে ধীর ও স্থিরভাবে লীলাবতী দেবীর স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদ জিজ্ঞাসিলাম। শুনিলাম, তিনি ভাল আছেন এবং হয় ত বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন।

আমি স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া অসম্পূর্ণ কার্য্য-সমূহ সম্পূর্ণ করিতে নিযুক্ত হইলাম এবং মধ্যে মধ্যে কতক্ষণে দিবা অবসান হইবে, জানিবার নিমিত্ত জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। একবার দেখিতে পাইলাম, নিম্নে বাগানে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি পরিক্রমণ করিতেছেন। সে মূর্ত্তি লীলাবতী দেবীর।

অদ্য প্রাতে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, আর সমস্ত দিন পরে এই দেখিলাম। আর এক দিনমাত্র আমি এখানে আছি এবং এই একদিন হইয়া গেলে হয় ত ইহ-জীবনে আর তাঁহার সহিত কখন সাক্ষাৎ হইবে না। এই চিন্তার উদয় হওয়ায় আমি জানালার সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং সাবধানতা সহকারে জানালার খড়খড়ে ফাঁক করিয়া যতদূর সম্ভব, ততদূর তাঁহাকে নয়ন দ্বারা অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

অতি নির্ম্মল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লীলাবতী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন ; শুষ্ক বৃক্ষপত্র সকল পদনিম্নে ও চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, কখন বা গায়ে আসিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। ফুলের শোভা, বায়ুর কোমলতা কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহাকে নিতান্ত অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হইল। আমার নয়ন দর্শন করিয়া সুখী হইতেছিল, সে সুখও তিরোহিত হইল। লীলাবতী দেবী চলিয়া গেলেন।

আমার হস্তস্থিত কার্য্য সমাপ্ত হইল, এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পর আমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম এবং ধীরে ধীরে আসিয়া বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির সমীপে উপস্থিত হইলাম। তথায় জীবসমাবেশের চিহ্নও নাই। স্থানটি এক্ষণে দিনের অপেক্ষা অধিকতর প্রশান্ত ও নির্জ্জন হইয়াছে। আমি একটি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নির্নিমেষ-নয়নে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

কতক্ষণই অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কৈ, কোথাও ত কিছু চিহ্ন নাই। বায়ু কেবল সময়ে সময়ে শাঁ শাঁ করিতেছে, কোথাও এক একটি শুষ্ক পত্র উড়িতেছে, কদাচিৎ কোন পক্ষী ধ্বনি করিতেছে। এই জনহীন স্থানে—এই রাত্রি কালে আর একাকী বসিয়া থাকিতে যেন কষ্ট হইতে লাগিল।

এখনও জ্যোৎস্না আছে। এমন সময়ে সহসা কোমল পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। সে পদশব্দ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের। অতি অস্ফুট কথার শব্দও পাইলাম। শুনিলাম, এক জন বলিতেছে,—"ভয় করিও না। আমি সে পত্র নির্ব্বিঘ্নে বালকের হস্তে দিয়াছি ; বালক আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই। সে পত্র লইয়া চলিয়া গেল, আমিও চলিয়া আসিলাম। নিশ্চয়ই কেহই আমার অনুসরণ করে নাই।"

এই কয়টি অস্ফুট বাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করায় আমার কৌতূহল এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে, আগন্তুকেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। অবিলম্বে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি আমার নেত্রপথে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রতিমূর্ত্তির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকদ্বয়ের একজনের পরিচ্ছদ সাধারণবৎ, অপরার পরিচ্ছদ সর্ব্বত্র পরিষ্কার শুক্ল। আমার

শিরায় রক্তের গতি বর্দ্ধিত হইল এবং হস্ত-পদাদি যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকদ্বয় প্রতিমূর্ত্তির সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। একজনের বদন আমি দেখিতে পাইলাম; কিন্তু শুক্লবদনা স্ত্রীলোকের বদন আমার নয়নগোচর হইল না।

যে স্বরে প্রথমে কথা শুনিয়াছিলাম, সেই স্বর আবার বলিল,—"মোটা কাপড়টা গায়ে থাকে যেন। তারামণি বলিয়াছিলেন, তোমাকে সম্পূর্ণ শাদা কাপড়ে যেন কেমন এক রকম দেখাইতেছে। আমি নিকটেই থাকিতেছি। তুমি যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা শীঘ্র শেষ করিয়া লও। মনে থাকে যেন, আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া সেই স্ত্রীমূর্ত্তি চলিয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইলে আমি বুঝিলাম, স্ত্রীলোক প্রবীণা এবং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কোনক্রমেই অসৎ লোক বলিয়া বোধ হয় না।

তিনি যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"এক রকম—কেমন এক রকম—চিরকাল দেখিতেছি, এই রকম। কিন্তু বড় ঠাণ্ডা—নিতান্ত গোবেচারা।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্ত্রীলোক চলিয়া গেলেন।

এই স্ত্রীলোকের অনুসরণ করিয়া ইঁহার সহিত কোন প্রকার কথাবার্ত্তা কহা উচিত কি না, তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। প্রবীণার সঙ্গিনীর সহিত কথোপকথন করাই আমি অধিক আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম। যে পত্র লিখিয়া গিয়াছে, তাহাকে কি প্রয়োজন? যে লিখিয়াছে, রহস্যের মূলাধারই সে। আমার বিশ্বাস, সেই পত্রলেখিকা এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত।

যখন আমি এই সকল আলোচনায় নিযুক্ত, সেই সময়ে শুক্লবসনা স্ত্রীলোক প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল ভক্তিপূর্ণভাবে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তদনন্তর বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি রুমাল বাহির করিলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রতিমূর্ত্তির পদনিম্নে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর পাষাণখণ্ড পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধীরে ধীরে ও সাবধানতা সহকারে আমি বিপরীতদিক্ দিয়া প্রতিমূর্ত্তির নিকটস্থ হইলাম। কিন্তু রমণী স্বীয় কার্য্যে এতই নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন যে, আমার আগমন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। আমি প্রতিমূর্ত্তির ঠিক বিপরীতদিকে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দর্শনমাত্র চমকিত হইয়া ভীতিব্যঞ্জক ধ্বনি সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভয়চকিত ও স্পন্দহীনভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম,—"ভীত হইবেন না, আপনি আমাকে জানেন, মনে করিয়া দেখুন।"

আর অগ্রসর হইলাম না। কিয়ৎকাল পরে আবার ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। মনে এতক্ষণ যদি বা কিছু সন্দেহ ছিল, এখন তাহা তিরোহিত হইয়া গেল। কলিকাতার নির্জ্জন পথে মধ্যরাত্রে যে যুবতী আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, অদ্য এই বিসদৃশ স্থানে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির অন্তরাল হইতে সেই ভয়চকিতা যুবতী আমার সম্মুখে আবার দণ্ডায়মানা।

আমি বলিলাম,—"আপনি আমাকে মনে করিতে পারিতেছেন না? অল্পদিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে আমি আপনাকে কলিকাতায় পথ দেখাইয়া দিয়াছিলাম। বোধ হয়, আপনি সে ঘটনা এখনও বিস্মৃত হন নাই।"

এতক্ষণে যুবতীর ভীতভাব একটু কমিয়া গেল এবং তিনি যেন আশ্বস্তভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দারুণ ভয়ে তাঁহার বদনের যে মরণাপন্নবৎ ভাব হইয়াছিল, দেখিলাম, ক্রমশঃ পূর্ব্বপরিচয় স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়ায় সে ভাব তিরোহিত হইতেছে। আমি আবার বলিলাম,—"এখনই কথা কহিতে চেষ্টা করিবেন না। ভাবিয়া দেখুন—মনে করিয়া দেখুন, আমি আপনার হিতৈষী।"

অস্ফুটস্বরে যুবতী বলিলেন,—"আপনি আমার প্রতি বড়ই কৃপাবান্। তখনও আপনাকে যেমন সদয় দেখিয়াছি, এখনও আপনাকে সেইরূপ সদয় দেখিতেছি।"

উভয়েই কিয়ৎকালের নিমিত্ত নির্ব্বাক্। স্থান, কাল, ঘটনা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া আমার চিত্তও সম্পূর্ণরূপ স্থির ছিল, এ কথা বলিতে পারি না। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির মধ্যে আবার সেই স্ত্রীলোক

ও আমি ; মধ্যে এক পরলোকগতা রমণীর প্রতিমূর্ত্তি। রাত্রিকাল—চতুর্দ্দিক্ নির্জ্জন—প্রশান্ত। মনে হইতে লাগিল, এখন যদি এই স্ত্রীলোক আমাকে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার পত্র-লিখিত বিবরণের সমর্থন-সূচক প্রমাণের উল্লেখ করেন, তবেই আমার বহু যত্নের সফলতা হয়। এক্ষণে এই স্ত্রীলোকের কথার উপর লীলার ভবিষ্যৎজীবনের সুখ ও শান্তি নির্ভর করিতেছে। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"বোধ হয়, আপনি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আমাকে হিতৈষী জানিয়া আপনি নির্ভয়-চিত্তে আমার সহিত কথোপকথন করুন।"

আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে মনঃসংযোগ না করিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন ?"

"আপনার কি মনে নাই, গত সাক্ষাৎকালে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি শক্তিপুরে যাইতেছি ? আমি সেই অবধি এই স্থানে এই আনন্দ-ধামেই আছি।"

তাঁহার পাণ্ডুরগণ্ডও আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"আনন্দধামে আপনি কত সুখেই আছেন !"

এই নবভাবের প্রাবল্যে তাঁহার বদন-শ্রী অপেক্ষাকৃত সংবর্দ্ধিত হইল। সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকে এই নবীনার প্রতি চাহিলাম। একদিন এইরূপ চন্দ্রালোকে বারান্দায় যে সুন্দরীর মুখ দেখিয়া মুক্তকেশীর মুখ মনে পড়িয়াছিল, অদ্য মুক্তকেশীর মুখ দেখিয়া সেই সুন্দরীর বদন মনে আসিল। লীলাবতী এবং মুক্তকেশী উভয়ের দৈহিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আজি সুন্দররূপ প্রণিধান করিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম, মোটামুটী মুখের গঠন, বদনের দৈর্ঘ্য-বিস্তার, কেশের উজ্জ্বল মসৃণতা, সমস্ত দেহের উচ্চতা ও আয়তন, গ্রীবার ঈষৎ বক্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে উভয়েরই বিস্ময়জনক সাদৃশ্য ! উভয়ের আকৃতিগত যে এত সাদৃশ্য আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আর দেখিলাম, লীলার ন্যায় মুক্তকেশীর উজ্জ্বল বর্ণ নাই ; নয়নের সেরূপ পরিষ্কার ভাব, ত্বকের তাদৃশ মসৃণতা, অধরৌষ্ঠের সুপক্ক বিম্বের ন্যায় সে শোভা এই কাতর ও ক্লিষ্ট নারীর নাই। মনে এক বিষাদময় ভাবের আবির্ভাব হইল। মনে হইল, যদি কখন লীলার ভবিষ্যৎ-জীবন দুঃখের কঠিন পেষণে নিষ্পেষিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের আকৃতিগত এই যে সূক্ষ্ম বৈষম্য, তাহা আর থাকিবে না। যদি কখন লীলাবতী দেবী বিষাদ বা ক্লেশের পরুষ আক্রমণে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার যৌবন-শ্রী ও বদন-শোভা মুক্তকেশীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে এবং তখন এই উভয় কামিনী যমজ সহোদরার ন্যায় একরূপ হইবে ; তখন উভয়েই সজীব প্রতিমূর্ত্তিরূপে পরিণত হইবে। এই ভয়ানক চিন্তার প্রাবল্যে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। অন্ধকার—অপরিজ্ঞেয় ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কতই বিকট ভাবনা হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। সহসা আমার অজ্ঞাতসারে মুক্তকেশীর হস্ত আমার হস্তে মিলিত হওয়ায় আমার চৈতন্য হইল। প্রথম সাক্ষাৎকালে যেরূপ অজ্ঞাতসারে তিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যও আবার সেইরূপ করিলেন। যুবতী তাঁহার স্বভাব-সঙ্গত দ্রুতভাবে বলিলেন,—"আপনি আমাকে দেখিতেছেন, আর কি ভাবিতেছেন ?"

"আমি বলিলাম,—"অসঙ্গত কোন ভাবনাই ভাবিতেছি না। আপনি কেমন করিয়া এখানে আসিলেন, ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি।"

"আমি একটি আত্মীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে আসিয়াছি। তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। আমি এখানে দুই দিন আছি।"

"কল্যও আপনি এখানে আসিয়াছিলেন ?"

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?"

"আমি অনুমান করিতেছি মাত্র।"

আবার তিনি বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এখানে না আসিয়া আর কোথায় যাইব ? যিনি ইহ-জগতে আমার জননীর অপেক্ষাও স্নেহময়ী ছিলেন, তাঁহাকে দেখিতেই আমার আসা। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মলিন দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। কল্য আমি তাহা পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিলাম, অদ্য তাহা শেষ করিতে আসিয়াছি। ইহাতে আমার কি কোন দোষ হইয়াছে ?—না, স্বর্গীয়া বরদেশ্বরী দেবীর নিমিত্ত যাহা কিছু করি, তাহাতে দোষ হয় না।"

দেখিলাম, এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে সেই বাল্য-কৃতজ্ঞতার ভাব এখনও সম্পূর্ণ প্রবল। বুঝিলাম, এই নারীর চিত্তে পবিত্রতা ও সততার ভাব-সমূহ নিতান্ত বলবান্ এবং সে হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার দুষ্ট ভাব কখনও উন্মেষিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে উৎসাহিত করিলাম। তিনি পুনরায় প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্ভাবিত প্রশ্নের পথ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাঁহাকে সাবধানতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনাকে এ স্থানে দেখিয়া আমি বড়

আনন্দিত হইলাম। আপনি সে দিন আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া গেলে, আমি আপনার জন্য বড়ই চিন্তাকুল হইয়াছিলাম।"

তিনি নিতান্ত সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আকুল! কেন?"

"আপনি চলিয়া গেলে, আর একটি কাণ্ড ঘটিয়াছিল। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারই নিকটে গাড়ী করিয়া দুইটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। পাহারাওয়ালার সহিত কথা কহিয়া তাহারা চলিয়া গেল।"

তখনই তাঁহার হস্তের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। যে রুমালের দ্বারা তিনি কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভীতভাবে আমার প্রতি চাহিলেন। আমি দেখিলাম, যখন এ কথা আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন ইহা শেষ করাই সঙ্গত। এ জন্য বলিতে লাগিলাম,—তাহারা পাহারাওয়ালাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিল। পাহারাওয়ালা আপনাকে দেখে নাই বলিল। তাহার পর ঐ দুই জনের এক জন বলিল, আপনি পলাইয়া আসিতেছেন।"

তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন—যেন অনুসরণকারীরা এখানেও তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে।

আমি বলিলাম,—"শুনুন, শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। আমি সে স্থলেও আপনার উপকার করিয়াছি। আমি অনায়াসে তাহাদিগকে সন্ধান বলিয়া দিতে পারিতাম–কিন্তু কোন কথাই কহি নাই। আমি আপনার পলায়নের সহায়তা করিয়াছিলাম, যাহাতে সে পলায়ন নির্ব্বিঘ্ন হয়, তাহাও আমি করিয়াছি। যাহা আমি বলিতেছি, তাহা আপনি বুঝিয়া দেখুন।"

যেন আমার ভাব ও বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল। প্রথম সাক্ষাৎসময়ে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র পুঁটুলী যেমন বারংবার এক হস্ত হইতে অপর হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখনও রুমালখানি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বদনের স্বাভাবিক ভাব আবির্ভূত হইল এবং তিনি কৌতূহলপূর্ণ-নয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিলেন; জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে বাতুলরূপে আটকাইয়া রাখা উচিত বলিয়া আপনি মনে করেন না, কেমন?"

"কখনই না। আপনি যে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন এবং আমি যে আপনার সহায়তা করিয়াছি, এ জন্য আমি পরমানন্দিত।"

"আপনি আমাকে কঠিন স্থলেই সাহায্য করিয়াছিলেন। পলায়ন করা সহজ,কিন্তু কলিকাতায় ঠিকানা খুঁজিয়া লওয়াই কঠিন কার্য্য। আপনার নিকট সে জন্য আমি নিতান্ত কৃতজ্ঞ। আমাকে পুনরায় আবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া আপনি মনে করেন না, কেমন?"

আমি বলিলাম,—"আপনাকে কখনই আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নয়, ইহা আমার স্থির-বিশ্বাস। আপনি যে নির্ব্বিঘ্নে পলাইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত। আপনি বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের নিকটে যাইবেন। তাঁহার দেখা পাইয়াছিলেন তো?"

"হাঁ, দেখা পাইয়াছিলাম। তাঁহার নাম রোহিণী। তিনি আমাকে বড় দয়া করেন; তবে বরদেশ্বরী দেবীর মত নহেন, তেমন আর কেহ হয় না।"

"রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত কি আপনার অনেক দিনের পরিচয়?"

"তিনি আমাদের প্রতিবাসিনী ছিলেন। আমি যখন বালিকা, তখন হইতে তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন—বড় দয়া করেন। তিনি যখন নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন, তখন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"মুক্ত! তোর যদি কখন কষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার কাছে আসিস্।' বড় দয়ার কথা নয়? দয়ার কথা বলিয়া ইহা আমার মনে আছে।"

"আপনার কি পিতা-মাতা নাই?"

"পিতা? কে, আমি তো কখন তাহাকে দেখি নাই; মাতার মুখেও কখন শুনি নাই তো? পিতা! হয় তো তিনি অনেক দিন মরিয়া গিয়াছেন।"

"আর আপনার মাতা?"

"তাঁহার সহিত আমার মনের মিল নাই। আমরা পরস্পর পরস্পরের জ্বালা!"

জ্বালা! মনে সন্দেহ হইল, তবে কি ইঁহার মাতা ইঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার মূল?

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"মার কথা বলিবেন না। রোহিণী ঠাকুরাণীর কথা বলুন। আপনি আমাকে যেমন দয়া করেন, রোহিণী ঠাকুরাণীও আমাকে সেইরূপ দয়া করেন। আমি কয়েদে থাকি, ইহা তিনিও উচিত মনে করেন না। আমি পলাইয়া আসায় তিনি বড় সন্তুষ্ট। আমার দুঃখ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। আমার দুর্ভাগ্যের কথা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন না।"

"দুর্ভাগ্যের কথা?" তাহার অর্থ কি? স্ত্রীলোকের

দুর্ভাগ্য অনেক প্রকার হইতে পারে। বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য কি প্রকার? জিজ্ঞাসিলাম,—"কি দুর্ভাগ্য?"

তিনি সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন,—"এই আবদ্ধ থাকায় দুর্ভাগ্য, আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে?"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম,—"স্ত্রীলোকের জীবনে আরও একপ্রকার দুর্ভাগ্য হইতে পারে। সেরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে যাবজ্জীবন লজ্জা ও মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়।"

তিনি ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সে দুর্ভাগ্য?"

আমি বলিলাম,—"প্রণয়াস্পদের চরিত্রে অত্যধিক বিশ্বাসস্থাপন করিলে সেরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিতে পারে।"

স্ত্রীলোক যেরূপ সরলতা-পূর্ণ—পবিত্রতা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম, যাঁহার সেরূপ দৃষ্টি, তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার লজ্জাজনক কার্য্য বা কলঙ্কিত ব্যবহার প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। শত বাক্যে যাহা বুঝাইতে পারিত না, এক দৃষ্টিতে তাহা বুঝাইয়া দিল। ইহা আমি স্থির বুঝিয়াছিলাম যে, মুক্তকেশী পত্র-মধ্যে রাজা প্রমোদরঞ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রমোদরঞ্জন ইঁহার চরিত্র কলঙ্কিত করেন নাই, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। তবে কেন তাহাকে লীলাবতী দেবীর চক্ষে ঘৃণিত বর্ণে রঞ্জিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে? অবশ্যই তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ কি?"

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কলিকাতায় রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত কত দিন ছিলেন? তাহার পর এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?"

তিনি বলিলেন,—"এখানে দুই দিন আসিয়াছি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে বরাবর সেইখানেই ছিলাম।"

আমি বলিলাম,—"আপনি তবে এই গ্রামেই রহিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য, আপনি এখানে দুই দিন আছেন, কিন্তু আমি আপনার সংবাদ পাই নাই।"

"না, না, আমি এখানে থাকি না। এখান হইতে ক্রোশখানেক দূরে একটা খামারবাড়ী আছে, আপনি জানেন কি? তারার খামার?"

স্থানটি আমার পরিচিত। আমি তাহার নিকট দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"খামারের মালিক তারামণি; তিনি রোহিণী ঠাকুরাণীর বিশেষ আত্মীয়। রোহিণী ঠাকুরাণীকে একবার তাঁহাদের বাটী আসিবার নিমিত্ত তারামণি বড় অনুরোধ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় আমাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। শক্তিপুরের নিকটে খামার শুনিয়া, আমি মহা আনন্দে তাঁহার সঙ্গে আসিতে সম্মত হইলাম। এখানকার পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান সকলের উপর দিয়া বেড়াইব—কি আনন্দ! খামারের লোকগুলি বেশ! বোধ হয়, আমি এখানে অনেক দিন থাকিব। এক বিষয়ে রোহিণী ঠাকুরাণী ও তারামণি আমাকে বড় জ্বালাতন করেন—"

"কি বিষয়?"

"আমার এই ধপধপে শাদাকাপড় পরার জন্য তাঁহারা আমাকে বড় ব্যস্ত করেন। তাঁহারা জানিবেন কি? বরদেশ্বরী দেবী জানিতেন; তিনি শাদা কাপড় পরাইয়া সুখী হইতেন। সেই জন্যই তো আমি যত্ন করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আরও শাদা করিয়া দিতেছি। তাহার ছোট কন্যাকেও তিনি শাদা কাপড়ে সাজাইতেন। মহাশয়, লীলাবতী দেবী সুখে আছেন—ভাল আছেন তো? তিনি বালিকাকালে যেমন শাদা কাপড় পরিতেন, এখনও তেমন পরেন কি?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম,—"আজি প্রাতঃকাল হইতে তিনি একটু অসুখে আছেন।"

কেন যে লীলাবতী দেবী আজি অসুস্থ হইয়াছেন, বোধ হইল, তাহা মুক্তকেশীর অগোচর নাই। তিনি অস্ফুট-স্বরে আপনা আপনি কি বলিতে লাগিলেন। আমি অবসর বুঝিয়া প্রশ্ন করিলাম,—"কেন লীলাবতী দেবী অসুখী হইয়াছেন, তাহা কি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

তিনি ব্যস্ততা সহ উত্তর দিলেন,—"না, তাহা আমি আপনাকে একবারও জিজ্ঞাসা করি নাই।"

আমি বলিলাম,—"আপনি জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি আপনাকে তাহা বলিতেছি। তিনি আপনার পত্র পাইয়াছেন।"

আমার বাক্যের প্রথমাংশ শুনিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। বাক্য সমাপ্ত হইলে তিনি প্রস্তরবৎ অচল ও নিস্পন্দ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বস্ত্রখণ্ড ভূপতিত হইয়া গেল, ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত হইয়া পড়িল, বদন বিজাতীয় পাণ্ডুত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্ষীণস্বরে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? কে আপনাকে তাহার কথা বলিল?"

আবার ক্রমশঃ তাঁহার বদনের স্বাভাবিক বর্ণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। তিনি হতাশভাবে

সভয়ে হস্তে হস্ত মিলাইয়া আবার বলিলেন,—"আমি তো তাহা লিখি নাই আমি তাহার কিছুই জানি না।"

আমি বলিলাম.—হাঁ, আপনি তাহা লিখিয়াছেন, আপনি তাহা জানেন। এরূপ ভাবে পত্র প্রেরণ করা ও লীলাবতী দেবীকে ভয়-প্রদর্শন করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। আপনার বর্ত্তব্য যদি তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং আনন্দধামে উপস্থিত হইয়া নিজমুখে লীলাবতী দেবীর সমক্ষে সমস্ত কথা ব্যক্ত করা আপনার উচিত ছিল।"

তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন। আমি আবার বলিলাম,—"তাঁহার জননী আপনার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, লীলাবতী দেবীও আপনার অভিসন্ধি ভাল হইলে অবশ্যই আপনার সহিত সেইরূপ সদয় ব্যবহার করিবেন। সমস্ত বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যাহাতে আপনার কোন অনিষ্ট না হয়, লীলাবতী দেবী অবশ্যই তাহা করিবেন আপনি তাঁহার সহিত কল্য খামারে দেখা করিবেন কি? অথবা আনন্দধামের উদ্যানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি?"

তিনি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"মা গো, তুমিই জান, আমি তোমার কন্যাকে কত ভালবাসি, বলিয়া দেও দেবি, তাহাকে বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে কি উপায়ে রক্ষা করিতে হইবে? বল মা, কি করিলে ভাল হইবে?"

এই ব'লয়া তিনি সেই প্রতিমূর্ত্তির পদ-নিম্নে মস্তকস্থাপন করিলেন এবং বারংবার সেই পাষাণময় চরণ-যুগল চুম্বন করিতে লাগিলেন। এ দৃশ্য আমাকেও বিচলিত করিল। আমি তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার প্রযত্ন করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহাকে অন্যমনস্ক না করিলে নহে বুঝিয়া বলিলাম,—"শান্ত হউন, স্থির হউন। নচেৎ আমিও হয় ত বুঝিব, আপনাকে লোকে নিতান্ত অকারণে আবদ্ধ—"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তিনি তীরবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন ঘৃণা ও ভয়ে বিষম ভাব ধারণ করিল। তাঁহার মূর্ত্তি বস্তুতই উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া উঠিল। যে বস্ত্রখণ্ড তাহার হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহা তিনি তুলিয়া লইলেন এবং বারংবার সজোরে তাহা পেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অতি অস্ফুটস্বরে মুক্তকেশী বলিলেন,—"অন্য কথা বলুন। ও প্রসঙ্গ আমার অসহ্য।"

আমি বুঝিলাম, বরদেশ্বরী দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতাই এই যুবতীর হৃদয়ের একমাত্র বদ্ধমূল ভাব নহে। যে ব্যক্তি ইঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার প্রতি বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তিও ইঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রবল। এ অবৈধ অত্যাচার কে করিয়াছিল? ইহা কি যুবতীর জননীর কার্য্য? আমার উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রশ্ন করা আবশ্যক হইলেও যুবতীর ভাব দেখিয়া তাহা বলিতে ইচ্ছা হইল না। আমি করুণভাবে বলিলাম,—"আপনার যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কথা আর বলিব না।"

তিনি বলিলেন,—"আপনার কোন দরকারী কথা আছে বোধ হইতেছে। কি কথা, বলুন।"

"আপনি সুস্থির হইয়া, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।"

তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে পাক দিতে দিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"বলিয়াছেন? কৈ, কি বলিয়াছেন? আমার তো মনে হয় না। আমাকে মনে করাইয়া দিন।"

আমি বলিলাম,—"আমি আপনাকে কল্য প্রাতে লীলাবতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিতেছিলাম।"

"আঃ, লীলাবতী দেবী--বরদেশ্বরী দেবীর কন্যা! বরদেশ্বরী···"

তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রমশঃ সুস্থিরভাব ধারণ করিল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনার কোন ভয় নাই। পত্রের কথা লইয়া কোনই গোল ঘটিবে না; লীলাবতী দেবী সে সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানেন। তাঁহার নিকট সে কথা লুকাইবার কোনই দরকার নাই। আপনি পত্রে কোন নামের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু লীলাবতী দেবী জানেন, আপনি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম রাজা প্রমোদরঞ্জন—"

নাম শেষ হইতে না হইতে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিকট চীৎকার করিলেন। তাঁহার বদন পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে অধিক কাতর ও উত্ত্যক্তভাব ধারণ করিল। নাম-শ্রবণে তাঁহার দারুণ ঘৃণা ও ভীতভাব স্পষ্টই বুঝা গেল। আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। তাঁহাকে অবরোধ করার সম্বন্ধে তাঁহার জননীর কোন দোষ নাই। এক ব্যক্তি তাঁহার অবরুদ্ধ করিয়াছিল—সে ব্যক্তি প্রমোদরঞ্জন।

তাঁহার চীৎকার-ধ্বনি অন্য কর্ণেও প্রবেশ

করিয়াছিল। শুনিতে পাইলাম, রোহিণী বলিতেছেন,—"যাই, যাই—ভয় কি ?"

অবিলম্বে তাঁহার সঙ্গিনী প্রবীণা ঠাকুরাণী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রুক্ষভাবে আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি ? কোন্ সাহসে তুমি এই নিঃসহায় স্ত্রীলোককে ভয় দেখাইতেছ ?"

মুক্তকেশীকে রোহিণী আপনার ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইলেন এবং সযত্নে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তাহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হইয়াছে মা ? এ ব্যক্তি তোমার কি করিয়াছে ?"

মুক্তকেশী উত্তর দিলেন,—"কিছু না—কিছু করেন নাই। আমি শুধুই ভয় পাইয়াছি।"

রোহিণী রাগতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। আমি বলিলাম,—"রাগ করিবেন না—রাগ করিবার মত কোন কাজ আমি করি নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অনিচ্ছাতেও উনি চমকিয়া উঠিয়াছেন। উঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ নহে। আপনি উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক উঁহার বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের কোন প্রকার ক্ষতি করিবার লোক আমি নহি।"

মুক্তকেশী যাহাতে আমার কথা ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া বাক্যগুলি পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। দেখিলাম, আমার উদ্দেশ্য সফলিত হইয়াছে। মুক্তকেশী বলিলেন, "হাঁ, ঠিক কথা। উনি একবার আমাকে বড় দয়া করিয়াছিলেন। উনি আমাকে—"

অবশিষ্ট কথা মুক্তকেশী রোহিণীর কানে কানে বলিলেন।

রোহিণী বলিলেন,—"তাই ত। আপনার সহিত কর্কশভাবে কথা বলা আমার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু আমি আগে তো কিছু জানিতাম না। যাহা হউক, মুক্তকেশীকে এরূপ স্থানে একাকী থাকিতে দেওয়াই আমার ভাল হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহার হাত নাই, এখন এস মা, আমরা বাড়ী যাই।"

আমার বোধ হইল যে, রোহিণীর ফিরিয়া যাইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে রাখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু ঠাকুরাণী সে উপকার-গ্রহণে স্বীকার করিলেন না।

যখন তাঁহারা প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, তখন আমি মুক্তকেশীকে কাতরভাবে বলিলাম,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মুক্তকেশী বলিলেন,—"তাহা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি আমার সম্বন্ধে এত অধিক সংবাদ জানেন যে, আপনি আমাকে যখন তখন ভয় দেখাইতে পারিবেন।"

রোহিণী আমার প্রতি কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন,—"আপনি উঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভয় দেখান নাই। যাহা হউক, আপনি যদি উঁহাকে ভয় না দেখাইয়া আমাকে ভয় দেখাইতেন, তাহা হইলে হানি ছিল না।"

কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হইয়া মুক্তকেশী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং বরদেশ্বরী দেবীর সেই প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন; তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"এখন মনটা অনেক সুস্থ হইল। আমি অপনাকে ক্ষমা করিলাম।"

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর আমি নিমেষশূন্য-নয়নে মুক্তকেশীকে দেখিতে লাগিলাম। মুক্তকেশীর মূর্ত্তি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার হৃদয় কি জানি কেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। যেন বোধ হইল, ইহজগতে এই শুক্লবসনা সুন্দরীর সহিত আমার এই শেষ সাক্ষাৎ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাটী ফিরিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত মনোরমা দেবীকে জানাইলাম। নিঃশব্দে ও সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে।"

আমি বলিলাম,—"বর্ত্তমানের ব্যবহারের উপর ভবিষ্যতের ফলাফল নির্ভর করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, মুক্তকেশী আমাকে যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে, কোন স্ত্রীলোকের সমক্ষে তদপেক্ষা নিঃসঙ্কোচে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারে। যদি লীলাবতী দেবী—"

মনোরমা দেবী বাধা দিয়া বলিলেন,—"না—না, সে কথা মনেও করিবেন না।"

আমি বলিলাম,—"তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে আপনি মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মনের কথা জানিবার নিমিত্ত যতদূর সম্ভব যত্ন করুন। আমার কথায় সে একবার বড় ভয়

পাইয়াছে। সে নিরপরাধ স্ত্রীলোককে আবার এক-বার ভয় দেখাইতে আমার বাসনা নাই। আমার সহিত কালি খামার-বাড়ীতে যাইতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?"

"কিছু না। লীলার হিতার্থে যে কোন স্থানে যাইতে অথবা যে কোন কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। যে স্থানে তাঁহারা আছেন, তাহার কি নাম বলিলেন ?"

"আপনি সে স্থান বেশ জানেন। তাহার নাম তারার খামার।"

"আমি সে স্থান বেশ জানি। তাহা রায় মহাশয়ের জমীদারীভুক্ত। সেখানকার খামারওয়ালার একটি মেয়ে আমাদের বাটীতে চাকরাণী আছে। দাঁড়ান, আমি দেখিয়া আসি, সে এখন আছে কি না। তাহার নিকট হইতে অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

মনোরমা দেবী তাহার সন্ধানে গমন করিলেন, কিন্তু সে বাটী চলিয়া যাওয়ায় তাহার সহিত দেখা হইল না। তিনি শুনিয়া আসিলেন, সে দুই দিন কামাইয়ের পর আজি আসিয়াছিল এবং অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই চলিয়া গিয়াছে।

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"আচ্ছা, কল্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। আপাততঃ মুক্তকেশীর সহিত কথাবার্ত্তায় কি কি ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, তাহা বুঝা আবশ্যক। যে ব্যক্তি তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সে যে রাজা প্রমোদরঞ্জন, এ সম্বন্ধে কি আপনার কোনই সন্দেহ নাই ?"

আমি বলিলাম, "এক বিন্দুও না। এ সম্বন্ধে কেবল একমাত্র রহস্য আছে। তাঁহাকে এরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় কি ? রাজার ও এই দরিদ্র নারীর অবস্থার বৈষম্য দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ইঁহাদের পরস্পর কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে রাজা ইঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ভার কেন গ্রহণ করিলেন, তাহা নিতান্ত দুজ্ঞেয়।"

মনোরমা বলিলেন,—"কোথায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন ? সাধারণ বাতুলালয়ে কি ? সেখানকার খরচপত্র কে দিত ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"ব্যয়ভার সমস্তই রাজা বহন করিতেন ! এরূপ বহুব্যয় স্বীকার করিয়া উহাকে আটকাইয়া রাখায় তাঁহার কি স্বার্থ, তাহা কিছুতেই বুঝা যাইতেছে না।"

মনোরমা বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কালি মুক্তকেশীর সহিত দেখা হয়, ভালই, না হইলেও এ রহস্য কখনই অজ্ঞাত থাকিবে না। এ বিষয়ের সদুত্তর দিয়া আমাকে ও উমেশ-বাবুকে রাজার সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি এখানে থাকিতেও পাইবেন না, এ বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া দিব।"

সে রাত্রিতে এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইল। পর-দিন প্রাতে খামার-বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে অন্য এক বিষম কর্ত্তব্যচিন্তা আমার মনে উদিত হইল। অদ্য আমার অনন্দধামে আবস্থানের শেষ দিন। এক্ষণে যত শীঘ্র সম্ভব, রায় মহাশয়ের নিকট বিদায় লওয়া আবশ্যক। কোন্ সময়ে একটু বিশেষ প্রয়োজন হেতু আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব, তাহা জানিবার নিমিত্ত এক জন ভৃত্যকে রায় মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে পাঠাইয়া দিলাম।

রায় মহাশয় সহজে অনুমতি দিউন বা না দিউন, আমি যে চলিয়া যাইব, তাহা স্থির। লীলাবতী দেবীর নিকট হইতে অবিলম্বে অন্তরিত হওয়াই আমার স্থির-সংকল্প। এই সংকল্পসাধনার্থ আমার চিত্ত এতই চিন্তাকুল যে, তথায় অন্য মানাপমান চিন্তার অবসর ছিল না ; সুতরাং রায় মহাশয় আমার প্রার্থনা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা একবারও আমার মনে হইল না। অনতি-দীর্ঘকালমধ্যে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, রায় মহাশয়ের শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, বিশে-ষতঃ অদ্য তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতুলানন্দ লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ জন্য তিনি সবিনয়ে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং আমার বক্তব্য তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইবার অনুরোধ করিয়াছেন। এই তিন মাস কালের মধ্যে রায় মহাশয়ের সহিত আমার সেই প্রথম একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল আর হয় নাই। তাঁহার নিয়ত অসুখ। তিনি সতত সাক্ষাতে অশক্ত ; কিন্তু লোক-মুখে আপ্যায়িতের কোন ত্রুটি নাই। রকম রকম মিষ্টবচনে তিনি আমাকে তুষ্ট করিয়া আসিতেছেন এবং আমার কৃত প্রাচীন পুঁথির টীকা দেখিয়া বিশেষবিধানে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে দেখা করা অসম্ভব বলিয়া তিনি সততই দুঃখ জানাইয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় কখনই দুঃখিত

বা নারাজ ছিলাম না ; আজিও হইলাম না। আমি তাঁহার সমীপে নিতান্ত বিনীতভাবে ও সংক্ষেপে বিদায়-প্রার্থনা জানাইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রায় মহাশয়ের উত্তর আসিল। সুন্দর কাগজে, বেগুনে কালীতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ অক্ষরে রায় মহাশয় জাঁকাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। চিঠিতে অনেক দুঃখের রোদন, শরীরের জন্য অনেক খেদ, তাঁহাকে এরূপে উত্যক্ত করার জন্য অনেক অভিমান, লোকের হৃদয়-হীনতা স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপোক্তি লিখিত ছিল। উপসংহারকালে তিনি আমাকে বিদায় দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি যে আমার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগ করিতে আমার সময় ছিল না, ইচ্ছাও হইল না। আমি তাঁহার পত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে রাখিয়া, মনোরমা দেবীর উদ্দেশে বাহিরে আসিলাম। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমরা তারার খামারের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। খামারের নিকটস্থ হইয়া আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনোরমা দেবী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শীঘ্রই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। এত শীঘ্র তিনি ফিরিয়া আসিলেন দেখিয়া, আমি সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম—"মুক্তকেশী কি আপনার সহিত সাক্ষাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন ?"

মনোরমা দেবী উত্তর দিলেন,—"মুক্তকেশী চলিয়া গিয়াছেন।"

"চলিয়া গিয়াছেন ?"

"আজি প্রাতে ৮ টার সময়ে রোহিণীর সহিত মুক্তকেশী চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি নির্ব্বাক্। বুঝিলাম, রহস্য-প্রকাশের যে শেষ আশা ছিল, তাহাও আর থাকিল না।

মনোরমা দেবী বলিলেন -"তারামণি তাহার এই অতিথিগণের বৃত্তান্ত যতদূর জানে, আমি তাহা জানিয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। রাত্রিতে আমাদের বাগানে আপনার সহিত সাক্ষাতের পর তাহারা এখানে ফিরিয়া আইসে এবং স্বচ্ছন্দে থাকে। দিনে এক জন রেলযাত্রীর গাড়ী এই খামারের নিকট কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়াছিল। গাড়ীর বাবু একখানি নিষ্প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা খবরের কাগজ ফেলিয়া গিয়াছিলেন। তারামণির ছোট মেয়েটি সেই কাগজখানা তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই কাগজখানা মুক্তকেশীর চক্ষে পড়ে এবং সে সেই কাগজের কিয়দংশ পাঠ করিয়া অত্যন্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।"

আমি বলিলাম,—"কাগজখানা আপনি একবার দেখিলেন না কেন ?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তাহা দেখিয়াছি। দেখিলাম, কাগজের অকর্ম্মণ্য সম্পাদক রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ-সম্বন্ধের সংবাদ আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রথমেই প্রকটিত করিয়াছেন। বুঝিলাম, এই সংবাদই মুক্তকেশীর মূর্চ্ছার কারণ এবং এই বিবাহ-সম্বন্ধই মুক্তকেশীর নামহীন পত্রের মূল।"

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহার পর ?"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে মুক্তকেশী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সে সময়ে তারামণির যে বড় মেয়েটি আমাদের বাটীতে কাজ করে, সেও গৃহে ছিল। সকলের সহিত কথা কহিতে কহিতে মুক্তকেশী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহার আবার হঠাৎ ভয়ানক মূর্চ্ছা হইল। কেহই এ মূর্চ্ছার কোন কারণ স্থির করিতে পারিল না। অনেক যত্নে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল ; তখন রোগিণী তারামণিকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহাদের আর থাকা হইতেছে না, তাঁহারা তখনই যে রেলের গাড়ী যায়, তাহাতেই চলিয়া যাইবেন। কেন যে তাঁহারা এরূপ মত করিলেন, তাহা জানিবার জন্য তারামণি অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু রোহিণী সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। তারামণি দুঃখিত হইল, বিরক্তও হইল। রোহিণী কেবল বলিলেন,—"বিশেষ কোন কথা নহে। যে কারণে আমরা যাইতেছি, তাহার সহিত আপনাদের কোন সম্পর্ক নাই। সে কারণ কোন ক্রমেই ব্যক্ত করিবার নহে।" তারামণি আর কি করিবে? তাহার পর মুক্তকেশী ও রোহিণী বেলা ৯॥০ টার সময় যে ট্রেণ যায়, সেই ট্রেণে যাইবার জন্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন—কি বৃত্তান্ত, কেহই জানে না। এই তো ব্যাপার মাষ্টার মহাশয়! এখন আপনি বুঝিয়া দেখুন, ইহা হইতে কি মীমাংসা করা সঙ্গত।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যে সময়ে মুক্তকেশীর মূর্চ্ছা হয়, তখন তথায় কি গল্প হইতেছিল, তাহা আপনি জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি ?"

তিনি বলিলেন,—"করিয়াছি বটে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কারণ, সে সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট

কথা চলিতেছিল না; সুতরাং কেহ বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না।"

আমি বলিলাম,—"তারামণির বড় মেয়ে হয় তো বিশেষ বৃত্তান্ত মনে করিয়া বলিলেও বলিতে পারে। চলুন, বাটী গিয়া আগে তাহার নিকট সন্ধান করা যাউক।"

বাটী ফিরিয়া আসিয়া উভয়েই তারার কন্যার নিকটে গমন করিলাম। মনোরমা দেবী প্রথমে নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তার দ্বারা তাহার সন্দেহভঞ্জন করিয়া তাহার পর সুকৌশলে জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি তোমাকে এখানে দেখিতে পাই নাই। বাটী ছিলে বুঝি ?"

তারার মেয়ে উত্তর দিল,—"হাঁ দিদি ঠাকুরাণি, কালি আমাদের বাটীতে দুইটি বিদেশী মেয়েমানুষ ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের বার বার মূর্চ্ছা হইয়াছিল; সেই জন্যই আমার বেলা হইয়া গেল বলিয়া কালি আসা হয় নাই।"

মনোরমা দেবী জিজ্ঞাসিলেন,—"মূর্চ্ছা হইতে লাগিল কেন? তোমরা বুঝি তাহাকে কোন ভয়ের কথা বলিয়াছিলে ?"

সে উত্তর দিল,—"না দিদি, আমরা সোজাসুজি গল্প করিতেছিলাম। আমি এখানে সারাদিন থাকি, এখানকারই অনেক গল্প আমি করিতেছিলাম।"

মনোরমা দেবী জিজ্ঞাসিলেন, "এখানকার গল্প ? এখানকার আবার গল্প কি ?"

সে বলিল,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন কেন এখানে শীঘ্র আসিবেন, সেই কথা, বিবাহের জন্য কত উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে, তাহার কথা, এই সব রকম কথা বলিতেছিলাম।"

আর কথা শুনিবার প্রয়োজন হইল না। উভয়ে বাহিরে চলিয়া আসিয়া আমরা কিয়ৎকাল পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"দেবি, এখনও কি আপনার মনে কোন প্রকার সন্দেহ আছে ?"

মনোরমা বলিলেন,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন এ সন্দেহভঞ্জন করিতে পারেন ভালই, নচেৎ লীলা কখনই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে পাইবে না, ইহা স্থির।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মনোরমা দেবী ও আমি বাহিরে আসিতে না আসিতে দেখিলাম, গাড়ী-বারান্দায় একখানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা দেবী গাড়ীর আরোহীকে দেখিবামাত্র বাহিরে আসিলেন। গাড়ী হইতে একটি প্রবীণ ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। তিনিই উমেশবাবু—উকীল।

এই বয়স্ক ব্যবহারাজীবীর সহিত আমার পরিচয় হইলে আমার চিত্তে অনেক চিন্তার আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম, আমি প্রস্থান করিলে ইনিই কিছু দিন এখানে থাকিবেন এবং রাজা প্রমোদরঞ্জন আত্মচরিত্র-সমর্থনার্থ যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিবেন, ইনিই তাহার বিচার করিবেন; আর অতঃপর ইনিই এ সম্বন্ধে মনোরমা দেবীকে বিহিত মীমাংসা করার সহায়তা করিবেন। বিবাহবিষয়ক সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হওয়া পর্য্যন্ত ইনিই এ স্থানে অপেক্ষা করিবেন এবং বিবাহ স্থির হইলে লীলাবতীর সম্পত্তি-সংক্রান্ত লেখা-পড়া এবং ব্রাহ্মবিবাহ-বিধি অনুসারে কাগজপত্র ইনিই প্রস্তুত করিবেন। ইঁহারই দ্বারা বিবাহ-বন্ধন চিরকালের নিমিত্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে নিবদ্ধ হইবে। এই সকল কারণে লোকটির প্রতি আমার তৎকালে বড়ই অনুরাগ জন্মিল।

দেখিতে শুনিতে উমেশবাবু লোকটি বেশ। তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র, কেশ প্রায় ধবল, কথাবার্ত্তা অতি মিষ্ট, মুখখানি হাসি-মাখা, মানুষটি ছোট-খাট, চেহারাটি বেশ বুদ্ধিমান্ লোকের মত। সংক্ষেপতঃ অল্প আলাপের পরই এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীবীর প্রতি আমার ভক্তি জন্মিল।

বৃদ্ধ উমেশবাবু ও মনোরমা দেবী কথা কহিতে কহিতে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম না।

আনন্দধামে আমার অবস্থানকাল ক্রমশঃই শেষ হইয়া আসিতেছে। কল্য প্রাতে আমি প্রস্থান করিব, ইহার আর অন্যথা নাই। আমার জীবনের এই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বপ্ন এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার প্রণয়-লীলার এই স্থানেই অনন্ত অবসান।

চিত্তের অযথা চাঞ্চল্য হেতু আমি অত্রত্য উদ্যানে পূর্ব্বপরিচিত দৃশ্য-সমূহের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু যেখানে যাই, দেখি, কিছুই তো সে মর্ম্ম-মন্থনকারী স্মৃতি-বিবর্জ্জিত নহে। কোথায় বসিয়া তাঁহাকে পাঠ বলিয়া দিই নাই? কোথায় বসিয়া তাঁহার সহিত নানা সাংসারিক বিষয়ের বাক্যালাপ করি নাই? কোথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তত্রত্য শোভার প্রশংসা করি নাই? তবে আজি কোথায় গিয়া হৃদয় জুড়াইব?

কোথায় গিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত সে ভ্রান্তি-সম্ভাবনা-বিরহিত স্মৃতি ভুলিব ?

বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে উমেশবাবুকে দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তিনি আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন। মনের এরূপ অবস্থায় তাদৃশ অল্প-পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন অসম্ভব হইলেও অধুনা তাহা অপরিহার্য্য। নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়, আমি আপনাকেই খুঁজিতে-ছিলাম। আপনার সহিত আমার গোটা দুই কথা আছে। যে কার্য্যের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, মনোরমা দেবীর সহিত তৎসংক্রান্ত কথোপকথনকালে একখানি নামহীন পত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম। আপনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যে বিহিত যত্ন করিয়াছেন, তাহাও শুনিতে পাইলাম। আপনার সন্তোষের নিমিত্ত আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি আপাততঃ যে সন্ধান ত্যাগ করিতেছেন, অতঃপর সে সন্ধানের ভার আমার হস্তেই পড়িতেছে। আমি সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।"

আমি বলিলাম,—"উমেশবাবু, এ কার্য্যে আপনি আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি সন্দেহ নাই। অতঃপর মহাশয় এ বিষয়ে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা জানিতে আমার অধিকার আছে কি ?"

উমেশবাবু উত্তর দিলেন,—"আপাততঃ এই নামহীন পত্রের একটা নকল ও ইহার অন্যান্য বৃত্তান্ত আমি কলিকাতায় রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীলের নিকট পাঠাইব স্থির করিয়াছি। আসল পত্র আমার নিকটেই থাকিবে এবং রাজা আসিবামাত্র তাহা তাঁহাকে দেখাইব। ইতিমধ্যেই ঐ দুই স্ত্রীলোকের সন্ধানের জন্য আমি এক জন লোক পাঠাইয়া দিয়াছি। সে ব্যক্তি প্রথমে রেল-ষ্টেশনে, তাহার পর কোন সন্ধান পাইলে, যেখানে স্ত্রীলোকেরা গিয়াছে, সেখানেও যাইবে। তাহাকে আবশ্যকমত অর্থ ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আগামী সোম-বারে রাজা এখানে আসিবেন। যতক্ষণ তিনি না আসিতেছেন, ততক্ষণ যাহা করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইতেছে। আমার বিশ্বাস, রাজা এ সম্বন্ধে সহজেই সমস্ত সন্দেহভঞ্জন করিয়া দিবেন। রাজা প্রমোদরঞ্জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য ঘটে নাই, ইহা এক প্রকার স্থির।"

এতদ্বিষয়ক ভবিষ্যৎসম্বন্ধে উমেশবাবুর যতটা স্থির-বিশ্বাস, আমার ততটা ছিল না; তথাপি আমি আপাততঃ কোন উচ্চবাচ্য করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলাম না, এ সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিয়া আমার অন্যান্য প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মনের অবস্থা তৎকালে উমেশবাবুর সহিত কোন অংশেই সমান ছিল না। যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় গ্রহণ করিয়া শক্তিপুর ত্যাগ করাই আমার সংকল্প। যখন যাইতেই হইতেছে, তখন আর কালব্যাজ কেন ? শীঘ্রই উদ্যোগায়োজন করিয়া প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আমি উমেশবাবুর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। পথে মনোরমা দেবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমার ব্যস্ত ও বিচলিত ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম।

তিনি শুনিয়া বলিলেন,—"তাহা হইবে না, মাষ্টার মহাশয়, এরূপ অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় অবন্ধু-ভাবে আপনার যাওয়া হইবে না। আপনি যাইবার পূর্ব্বে আবার এক দিন পূর্ব্বকালের ন্যায় ব্যবহার—আমোদ, প্রমোদ, খাওয়া-দাওয়া না করিলে আপ-নাকে যাইতে দিতে পারি না। দেবেন্দ্রবাবু, এ অনু-রোধ আমার—অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আর—"

মনোরমা নীরব। ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন, "আর লীলারও এই অনুরোধ জানিবেন।"

আমি থাকিতে স্বীকার করিলাম। তাঁহাদের কাহাকেও দুঃখিত করিতে আমার এক বিন্দু ইচ্ছা ছিল না। যতক্ষণ আহারের সময় না হয়, ততক্ষণ নিজগৃহে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আজি সমস্ত দিন আমি লীলাবতী দেবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহি নাই—দেখাও হয় নাই। আহারের সময় তাঁহার সহিত দেখা হইবার কথা। বড় কঠিন সমস্যা—উভয়ের চিত্তের বিষম পরীক্ষাস্থল। আহা-রের সময় উপস্থিত হইল—আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপ-স্থিত হইলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বস্মৃতি—পূর্ব্বসদ্ভাব—পূর্ব্ব-আনন্দ সজীব করিতে আজি সকলেরই যত্ন। দেখিলাম, যে পরিচ্ছদ পরিধান করিলে ভাল দেখাইত বলিয়া আমি প্রশংসা করিতাম, লীলাবতী দেবী অদ্য সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। আমি গৃহ-প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আগ্রহ সহকারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া, তাঁহার সমস্ত আনন্দ দমন করিয়া তাঁহার মুখে বিষাদের অঙ্ক পরিদৃষ্ট হইতেছে। সে স্থানে উমেশবাবু উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার ও আমার উভয়েরই আহারের স্থান হইয়াছিল।

আমরা উভয়ে আহারে বসিলাম। গল্পে উমেশবাবু খুব পণ্ডিত, তিনি অবিশ্রান্ত গল্প চালাইতে লাগিলেন। আমিও যতদূর সাধ্য তাহার সহিত যোগ দিতে লাগিলাম। আহার সমাপ্ত হইলে লীলা ও মনোরমা পাঠাগারে গমন করিলেন। উমেশবাবুর তামাক খাওয়ার বড় অভ্যাস। তিনি তামাক খাইয়া সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। আমিও কাজেই তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। উমেশবাবু তামাক টানিতেছেন, এমন সময় এক জন লোক তথায় প্রবেশ করিল। উমেশবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি—সন্ধান পাইলে ?"

লোক উত্তর দিল,—"সন্ধান পাইলাম, স্ত্রীলোক এখান হইতে বর্দ্ধমানের টিকিট লইয়া যাত্রা করিয়াছেন।"

"তুমিও বর্দ্ধমান গিয়াছিলে ?"

"আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে আর কোন সন্ধান হইল না।"

"তুমি রেলওয়েতে খোঁজ করিয়াছিলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহার পর পুলিসে যেরূপ লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম, তাহা দিয়াছ ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আচ্ছা, তোমার যাহা কার্য্য, তাহা তুমি ঠিকই করিয়াছ, আপাততঃ এ বিষয়ের এই স্থানেই শেষ। তবে চলুন, মাষ্টারবাবু, মেয়েদের পাঠের ঘরে গিয়া লীলার বাজনা শুনা যাউক। আপনি তো কালি প্রাতেই যাইতেছেন। যতক্ষণ এখানে আছেন, ততক্ষণ আপনার সহিত আমোদ-প্রমোদে থাকাই আবশ্যক।"

আমরা সেই চিরপরিচিত পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। যে পাঠাগারে কতই আনন্দ, কতই স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা সহকারে জীবনের কত দিনই সুখে অতিবাহিত করিয়াছি, অদ্য সেই পাঠাগারে, বিদায়ের দিনে শেষ প্রবেশ করিলাম।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কৌচে আসীনা —নিদ্রিতা বলিলেও হয়। মনোরমা একখানি ইজিচেয়ারে উপবেশন করিয়া আছেন। আর লীলা পিয়ানোর নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। উমেশবাবু দুই এক কথায় মজ্‌লীস গরম করিয়া লইলেন এবং জানালার নিকটে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন। এমন দিন ছিল, যখন আমি গৃহাগত হইয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে লীলার নিকটস্থ হইতাম এবং তাঁহাকে ইচ্ছামত বাদ্য বাজাইতে অনুরোধ করিতাম, কিন্তু আজি আর তাহা পারিলাম না। এখন কি করি কি করি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময়ে লীলা স্বয়ং আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয়, আপনি ভৈরবী রাগিণীর আলাপ বড় ভালবাসেন, তাই কি এখন বাজাইব ?"

আমি তাঁহার এতাদৃশ অনুগ্রহসূচক বাক্যের সমুচিত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি পিয়ানোর নিকটস্থ হইলেন। তিনি যে সময় বাদ্য বাজাইতেন, সেই সময় তাঁহার সন্নিধানে যে চেয়ারে আমি উপবেশন করিতাম, আজি তাহা অনধিকৃত। লীলা একটু বাজাইয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন, অচিরে আবার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া বাদ্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার পর সহসা অনুচ্চস্বরে বলিলেন, —"আপনি কি অদ্য আপনার সেই পূর্ব্বস্থান গ্রহণ করিবেন না ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"শেষ দিনে আমি তাহা গ্রহণ করিলেও করিতে পারি।"

তিনি কোন উত্তর না দিয়া বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। আমি সেই স্থান অধিকার করিয়া দেখিলাম, তাঁহার বদনমণ্ডল পাণ্ডু হইয়া গেল এবং তাঁহার বিশেষ ভাবান্তর হইল। তিনি বলিলেন, —"আপনি যাইতেছেন বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর নিতান্ত অস্ফুট, শব্দ সকল প্রায় অপরের অশ্রাব্য। তাঁহার অঙ্গুলি পিয়ানোর উপর অত্যন্ত দ্রুত ও অস্বাভাবিকভাবে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—"লীলাবতী দেবি, আপনার এই অসীম দয়া আমি চিরকাল স্মরণ করিব। কল্য প্রস্থান করিতে হইবে; সুতরাং অদ্যই সাক্ষাতের শেষ হইলেও এ অনুগ্রহ আমি কখন ভুলিব না।"

তাঁহার হৃদয় আরও ভাবান্তরিত হইল এবং তিনি আমার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,— "না, না, কালিকার কথা আজি আর তুলিবেন না— অদ্য যেমন আনন্দে যাইতেছে, তেমনই যাউক।"

কথাসমাপ্তি সহকারে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যে বাদ্য তাঁহার চিরাভ্যস্ত, তাহাতেও তাঁহার ভুল হইতে লাগিল। তিনি বিরক্তি সহকারে বাদ্য ত্যাগ করিলেন; সকলেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। মনোরমা ও উমেশবাবু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ঢুলিতেছিলেন; তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

মনোরমা দেবী আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, দেখিয়াছেন, পূর্ণ চন্দ্রালোকে বাগানের কি সুন্দর শোভা হইয়াছে ?"

আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম এবং স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া মনোরমা দেবীর নিকটস্থ হইলাম। লীলাবতী দেবী অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলিলেন,—"আমি উহা বাজাইব। আজি শেষ দিনে আমাকে উহা বাজাইতে হইবে।"

বাস্তবিক চন্দ্রালোকে বাগানের বড়ই শোভা হইয়াছিল। আমরা অনেকক্ষণ নানা প্রকার সমালোচনা সহকারে তাহা সন্দর্শন করিলাম। লীলা নিজ স্থানে বসিয়া পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন। বাদ্য অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু যেরূপ মধু স্রোত চিরদিন তাঁহার হস্ত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, আজি তাহা একবারও হইল না। রাত্রি অনেক হইয়াছে বুঝিয়া আমরা সকলে স্ব স্ব গৃহে বিশ্রামার্থ গমন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলাম। আমরা তদভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিলে, লীলাবতী দেবীও বাদ্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। আমি প্রথমতঃ অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম।

তিনি বলিলেন,—"হয় তো তোমাকে আর কখন দেখিতে পাইব না। তুমি আমার সঙ্গে এত দিন বড়ই সদ্ব্যবহার করিয়াছ; আমার মত প্রবীণ বয়সের লোক সদ্ব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী। যাও বাবা, যেখানে থাক, সুখে থাক, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।"

তাহার পর উমেশবাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"কলিকাতায় আবার আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে। যে কার্য্য আপনি অর্দ্ধ-সমাপিত করিয়া গেলেন, তাহা আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। আপাততঃ নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে গমন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

তাহার পর মনোরমা দেবী আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"কালি প্রাতে ৭৷৷৹ টায় যাওয়ার সময় বুঝি ?" নিতান্ত মৃদুস্বরে আবার বলিলেন,—"আজি আপনার সমস্ত ব্যবহার আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সে সমস্ত ব্যবহার আমাকে চিরকালের নিমিত্ত আপনার আত্মীয় করিয়াছে।"

তাহার পর লীলাবতী দেবী আসিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি চাহিতে আমার ভরসা ও সাহস হইল না। আমি বলিলাম,—"অতি প্রত্যূষেই আমি প্রস্থান করিব। সম্ভবতঃ আপনি শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমি চলিয়া—"

তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া কহিলেন,—"না, না, তাহা হইবে না। নিশ্চয়ই আমি তাহার পূর্ব্বে উঠিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি এত অকৃতজ্ঞ নহি—গত তিন মাসের ব্যাপার এতদূর বিস্মৃত হয় নাই—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল—আরব্ধ বাক্য সমাপিত হইল না। আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রস্থান করিলেন। আমিও আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

উষার আলোক অচিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দধামে অবস্থানকালেরও অবসান হইয়া আসিল এবং অপরিহার্য্য প্রস্থানকাল সমুপস্থিত হইল। প্রায় ৭টার সময়ে আমি পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তথায় লীলা এবং মনোরমা উভয়েই আমার সহিত শেষ সাক্ষাতের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। বুঝিলাম, এ কঠোর ক্ষেত্রে চিত্তের স্থৈর্য্যরক্ষা করা সকলের পক্ষেই সুকঠিন। আমি বিদায় প্রার্থনা করিলাম। কোন উত্তর না দিয়া, লীলাবতী দেবী ব্যস্ততা সহ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"ভালই হইল। উঁহার পক্ষেও ভাল, আপনার পক্ষেও ভাল।"

আমি ক্ষণেক নির্ব্বাক্ রহিলাম। এ শেষ-বিদায়-সময়ে তাঁহার সহিত একটা কথা না কহা, একবার প্রস্থানকালে তাঁহার মূর্ত্তি না দেখিয়া যাওয়া বড় ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু কি করিব? হৃদয় বেগ শান্ত করিয়া আমি মনোরমা দেবীকে সমুচিতভাবে বিদায়কালোচিত বাক্য বলিলাম। কিন্তু যত কথা বলিব, যত কথা ব্যক্ত করিব ভাবিয়াছিলাম, তহো হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল; কেবল একটি বাক্য মুখ হইতে বাহিরিল। বলিলাম,—"সময়ে পত্র দ্বারা আপনি আমাকে আপনাদের সংবাদ জানাইবেন, এরূপ প্রগল্ভ আশা হৃদয়ে স্থান দিব কি ?"

"অবশ্যই আপনার আশা সফল হইবে। আপনি সদ্ব্যবহার দ্বারা আপনার চরিত্রের যেরূপ উচ্চতা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপে যতকাল আপনার ও আমার জীবন থাকিবে, ততকাল আমার দ্বারা আপনার যে কিছু হিত সম্ভবে, তাহা সম্পন্ন করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। এ দিকের বিষয় যখন যেমন দাঁড়াইবে,তাহা তখনই আপনাকে জানাইব।"

"আর দেবি, আমার এই উন্মত্ততা ও প্রগল্ভতা বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যাওয়ায় বহুকাল পরেও যদি

কখন আমার দ্বারা আপনার কোন সহায়তা হইতে পারে—”

আর কথা আমি কহিতে পারিলাম না। শত চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াও আমার চক্ষু জলভারাকুল হইল। মনোরমা তখন অতীব স্নেহময়ভাবে আমার উভয় হস্ত ধারণ করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার নেত্রদ্বয় সমুজ্জ্বল এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে আন্তরিক উদারতা ও করুণাময়তা প্রকটিত। তিনি বলিলেন, —“যদি সময় উপস্থিত হয়, তখন আপনাকে বিশ্বাস করিব। আপনাকে তখন আমার বন্ধু এবং লীলার বন্ধু, আমার ভ্রাতা এবং লীলার ভ্রাতা বলিয়া পূর্ণ-বিশ্বাস করিব।” তাহার পর এই স্নেহময়ী কামিনী আমাকে আমার নাম ধরিয়া বলিলেন,—“দেবেন্দ্র, এই স্থানে ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া স্থির হও। আমাদের উভয়েরই মঙ্গলার্থ আমি প্রস্থান করিতেছি। গবাক্ষ হইতে আমি তোমাকে গমন কালে দেখিব।”

তিনি চলিয়া গেলেন। আমি একবার নয়ন-মার্জ্জন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত এ প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে অতি ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন-শব্দ শুনিয়া আমি সেই দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, ধীরে ধীরে লীলাবতী দেবী প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমার হৃদয়ে সজোরে শোণিত প্রধাবিত হইতে লাগিল। লীলাবতী আমাকে একাকী দেখিয়া একবার সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার দেহ যেন বলহীন, শরীর ঈষৎ বিকম্পিত। তিনি দেহকে আশ্রয় দিবার জন্য সন্নিহিত টেবিলে হস্তার্পণ করিলেন। অপর হস্তে তিনি যেন কি পদার্থ-বিশেষ অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন,—“আমি এই খাতাখানির সন্ধানে গিয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া সময়ে সময়ে আপনার এ স্থানের এবং এখানকার বন্ধুগণের কথা মনে পড়িতে পারে। আপনি বলিয়াছেন যে, আমার অনেক উন্নতি হইয়াছে, হয় তো এগুলি আপনার ভাল লাগিতে—”

তিনি কথা সাঙ্গ না করিয়া বিপরীতদিকে মুখ ফিরাইলেন এবং সেইরূপ অবস্থায় হাত বাড়াইয়া সেই খাতা আমাকে দিলেন। তিনি ইদানীং অবকাশকালে প্রাকৃতিক বর্ণনা-পূর্ণ যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে সংগৃহীত ছিল। খাতা তাঁহার হস্তে কম্পিত হইতে লাগিল; আমিও বিকম্পিত-হস্তে তাহা গ্রহণ করিলাম। হৃদয় যাহা বলিতে চাহিল, তাহা বলিতে সাহস হইল না। কেবল বলিলাম,—“যত দিন বাঁচিব, তত দিন ইহা অতুলনীয় সম্পত্তির ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিব। আর আপনাকে কি বলিব? আপনাকে বিদায়কালে না দেখিয়া যাইতে হইলে মনে বড় কষ্ট হইত। আপনি যে দয়া করিয়া এ সময়ে দেখা দিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।”

তিনি বলিলেন,—“এত দিন এত আনন্দে একত্র অবস্থানের পর কেমন করিয়া আপনাকে সহজে বিদায় দিতে পারি?”

আমি বলিলাম,—“লীলাবতী দেবি, এরূপ দিন হয় তো আর কখন ফিরিবে না; কারণ, আপনার ও আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু দেবি, যদি কখনও এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন আমার প্রাণপণ চেষ্টাতে আপনার এক মুহূর্ত্তেরও সন্তোষ জন্মিতে পারে বা এক মুহূর্ত্তের দুঃখও বিদূরিত হইতে পারে, তখন কি দে'ব, আপনি দয়া করিয়া এ দীনহীন শিক্ষককে স্মরণ করিবেন? মনোরমা দেবী আমাকে মনে করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন।”

দেখিলাম, তাঁহার নয়ন জলভারাকুল। তিনি বলিলেন,—“আমিও সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত তাহা স্বীকার করিলাম।”

আমি আবার বলিলাম,—“আপনার অনেক আত্মীয় আছেন, আপনার ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি তাঁহাদের প্রধান ভাবনা। দেবি, এই বিদায়কালে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে অনুমতি করুন যে, এই অধম বন্ধুরও তাহাই প্রধান ও প্রিয় চিন্তা।”

তখন তাঁহার নবনীতবিনির্ম্মিত গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া সন্নিহিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। উপবেশনকালে বলিলেন,—“আর না মাষ্টার মহাশয়, দয়া করিয়া এ সাক্ষাতের শেষ করুন।”

তাঁহার হৃদয়ের ভাব এই কয় কথায় স্পষ্টই বুঝা গেল। তাহার পর আর কি বলিব? আমার তো কোন কথা বলিতে—তাঁহার বাক্যের কোন উত্তর দিতে আর এক মুহূর্ত্তও সে স্থানে অপেক্ষা করা অবৈধ। একবার দ্বার-সন্নিহিত হইয়া, একবারমাত্র লীলাবতীর সেই দেবীমূর্ত্তি শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। তাহার পর সুদূর-বিস্তৃত সমুদ্র উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইল—লীলাবতীর মূর্ত্তি তখন অতীতের স্মৃতিরূপে পরিণত হইল।

দেবেন্দ্রবাবুর কথা সমাপ্ত।

হাইকোর্টের উকীল

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেনের কথা।

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুরোধে আমাকে এই অংশ লিখিতে হইতেছে। দেবেন্দ্রবাবু চলিয়া আসার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই ইহাতে বিবৃত হইবে। এরূপ পারিবারিক কথা প্রচার করা উচিত কি না, তাহা একটা বিচারের বিষয় বটে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব দেবেন্দ্রবাবু স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার অপরাধ নাই। পরের ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে যে এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দেবেন্দ্রবাবুর যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছে। তিনি এই অত্যদ্ভুত উপাখ্যান-যেরূপভাবে সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনাচক্রের মধ্যে যে যে ব্যক্তি বিশেষ লিপ্ত ও সম্পর্কিত, তাঁহারই সেই সেই অংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে দেবেন্দ্রবাবু যে স্থান হইতে বর্ত্তমান কাহিনী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর হইতে আমাকেই লিখিতে হইতেছে।

অগ্রহায়ণ মাসের ২রা আমি আসিয়া আনন্দধামে পৌছিলাম। সে দিন শুক্রবার। রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় মহাশয়ের আগমনকাল পর্য্যন্ত আমাকে এ স্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি আসিলে লীলাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহের দিনস্থির হইলে আমাকে কলিকাতায় গিয়া বিবাহ-সংক্রান্ত যাবতীয় লেখাপড়া ও ব্যবস্থা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। এই জন্যই আমার এখানে আসা।

লীলাবতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে দেখিলাম যে, তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থা ভাল নহে। লীলাবতী বড় ভাল মেয়ে, তাঁহার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার সমস্তই তাঁহার জননীর ন্যায় সুমিষ্ট ও সুন্দর। আকৃতিতে লীলা কিন্তু মাতার মত ছিলেন না, সে সম্বন্ধে তাঁহার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল, তাহা শেষ করিলাম। শুক্রবারটা এইরূপে কাটিয়া গেল।

শনিবারের দিন আমি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রবাবু চলিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু লোকটি মন্দ নয়। সে দিন লীলার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ ঘটিল না—তিনি একবারও বাহিরে আসিলেন না। মনোরমার সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু তাঁহাকে অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বেলা ২টার সময় রাধিকাবাবুর সংবাদ পাইলাম। তাঁহার শরীর এখন একটু ভাল আছে; এ সময় আমি দেখা করিলে করিতে পারি। তাঁহাকে পূর্ব্বেও যেমন দেখিয়াছিলাম, আজিও তেমনই দেখিলাম। তাঁহার গল্প কেবল তাঁহার রোগের, তাঁহার দুর্ভাগ্যের তাঁহার পুস্তকের দুর্গন্ধের, লোকের গোলমালের আর সেই চিরকেলে মাথামুণ্ড-ছাইভস্মের। আমি যেই কাজের কথা পাড়িলাম, অমনই তিনি শিহরিয়া উঠিয়া নয়ন মুদিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ!"

আমি কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলাম না। বুঝিলাম, লীলার বিবাহ স্থির হইয়াই আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া অগ্রে লীলার মত গ্রহণ করা আবশ্যক। লীলার মত জানা হইলে, আমি বিষয়ের যে সকল সংবাদ স্বয়ং জ্ঞাত আছি, তাহার সহিত মিলাইয়া যথারীতি কার্য্য করিব। রাধিকাবাবু লীলার অভিভাবক। তাঁহারও সম্মতি লওয়া আবশ্যক। সমস্ত স্থির করিয়া তাঁহাকে আমি বলিবামাত্র তিনি সম্মতি দিবেন, স্বীকার করিলেন। আমি বুঝিলাম, এ বৃথা মানুষের সাহায্যে কোনই কার্য্য হইবে না। কেন আর উঁহাকে দগ্ধান।

রবিবারে লিখিবার মত কোন ঘটনাই ঘটিল না। কলিকাতার রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীল মহাশয়ের নিকট আমি নামহীন পত্রের একটা নকল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র অদ্য ডাকযোগে আমার হস্তে আসিয়া পৌছিল।

সোমবারে রাজা প্রমোদরঞ্জন আসিয়া পৌছিলেন।

রাজাকে এই প্রথম দেখিলাম। লোকটির বয়স যত ভাবিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষাও কিছু অধিক বলিয়া বোধ হইল। চেহারাটি বেশ—দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। মাথার চুল বড় পাকে নাই। রংটি বড় পরিষ্কার। মুখখানি যেন চিন্তাপূর্ণ। কথাবার্ত্তায় রাজা বড় অমায়িক লোক। আমার সহিত প্রথম পরিচয়ে যেরূপ ভাবে আলাপ করিলেন, তাহাতে যেন কত কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ চলিতেছে বলিয়া বোধ হইল। মনোরমার সহিত তিনি অতি বিনম্র-ভাবে শিষ্টাচারসঙ্গত কথাবার্ত্তা কহিলেন। লীলা তখন সেখানে ছিলেন না, অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার বিমর্ষ ও কাতর ভাব দেখিয়া নিতান্ত আগ্রহ ও আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়- লীলা যেন রাজার সাক্ষাতে সঙ্কুচিত ও অস্থির হইয়া পড়ি-লেন এবং অচিরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজা কিন্তু লীলার এই ভাব যেন লক্ষ্যই করিলেন না।

লীলা প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করার পরে রাজা সেই নামহীন পত্রের কথা স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তিনি আসিবার কালে কলিকাতা হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার উকীলের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছেন। সমস্ত কথা শুনিয়া অবধি এ সম্বন্ধে আমাদের সকলের সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি মূল পত্র তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি না দেখিয়াই পত্রখানি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন যে, তিনি চিঠির নকল দেখিয়াছেন —আসল আমাদের নিকটে থাকা ভাল। তাহার পর যে সকল কথা তিনি বিবৃত করিলেন, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই যেমন ভাবিয়াছিলাম, তেমনই সরল ও সন্তোষজনক। হরিমতি-নাম্নী একটি স্ত্রীলোক বহুকাল পূর্ব্বে কোন কোন বিষয়ে রাজার নিজের এবং তাঁহার কয়েক জন আত্মীয়ের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। এই স্ত্রীলোকের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। তাহার স্বামী তাহাকে ফেলিয়া যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কোনই সন্ধান নাই; অধিকন্তু তাহার একটি কন্যাসন্তান—সেটিও পাগল! একে তো এই স্ত্রীলোকের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ ছিল; বিশেষতঃ এই সকল দুর্ব্বিপাকে তাহার হৃদয়ের অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া তাহার প্রতি রাজার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাহার সেই কন্যার পীড়া বড়ই বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহাকে কোন স্থানে আটকাইয়া না রাখিলে চলে না; কিন্তু অবস্থা যেমনই হউক, কন্যাকে নিরুপায় দরিদ্রের ন্যায় সাধারণ বাতুলালয়ে রাখিতে হরিমতির কোনক্রমেই মত ছিল না, অথচ কিছু একটা উপায় না করিলেও চলে না। সেই সময় হরিমতি-কৃত উপকারের যৎসামান্য প্রতিদান-স্বরূপে স্বয়ং ব্যয়ভার বহন করিয়া রাজা তাহার কন্যাকে কলিকাতায় দুই জন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে আটকাইয়া রাখিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। হরিমতি কৃতজ্ঞতা সহ-কারে এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিল; প্রস্তাবমত কার্য্যও করা হইল। অনতিকালমধ্যে পাগলিনী মুক্তকেশী জানিতে পারিল যে, রাজাই তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার প্রধান সহায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের পর হইতে সে রাজার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। বর্ত্তমান পত্রও সেই রাগের ফলমাত্র। যাহা হউক, সম্প্রতি সে তাহার আশ্রয়স্থান হইতে কেমন করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া তাহার মাতাও যেমন দুঃখিত, রাজাও তেমনই দুঃখিত। যে লোকের তত্ত্বাবধানে মুক্তকেশী কলি-কাতায় থাকিত এবং যে দুই জন ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেন, রাজা তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা জানাইলেন। ইহাও রাজা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করি-লেন যে, যদি মনোরমা দেবী অথবা উমেশবাবু তাহাদিগকে প্রকৃত বিষয় জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন, তাহা হইলে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারি-বেন, মুক্তকেশী যাহাই ভাবুক, রাজা তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং সম্প্রতিও কলিকাতা আসিবার কালে তিনি আপনার উকীলকে যথাসম্ভব যত্ন সহকারে ঐ উন্মাদিনীর সন্ধান করিয়া, তাহাকে তাহার পূর্ব্ব-আশ্রয়ে পুনঃ স্থাপনের জন্য উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন অংশে যদি লীলাবতী দেবী অথবা তাঁহার কোন আত্মীয়ের কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে রাজা বিহিত প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা তাহা দূর করিয়া দিতে সম্মত আছেন।

আইনের অপার মহিমার অশ্রয় অবলম্বন করিয়া তর্ক করা যায় না, এমন বিষয়ই নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এরূপ মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কথার উপর সেরূপ কোন তর্ক উত্থাপন করিবার আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। মনোরমাও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু সন্তোষ যেন তাঁহার মনের নয় বলিয়া বোধ হইল।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যদি কেবল উমেশ-বাবুকে বুঝাইলেই আমার কর্ত্তব্যের শেষ হইত,

তাহা হইলে আমার আর কিছু বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, উমেশবাবু মহাপুরুষ, সুতরাং তিনি সকল বৃত্তান্ত বুঝিয়া আমার কথাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, ইহা আমার ভরসা আছে। কিন্তু স্ত্রীলোককে বুঝান শক্ত কথা; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাদের প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। মনোরমা দেবি, আপনি প্রমাণগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও আমি স্বয়ং তাহা দিতেছি। অপনি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সেই অভাগিনী হরিমতিকে একখানি পত্র লিখুন, তাহা হইলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

মনোরমা দেবী কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"ভরসা করি, আমি রাজার কথায় অবিশ্বাস করিতেছি ভাবিয়া, রাজা আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন না।"

রাজা বলিলেন,—"কখনই না। আমি কেবল আপনার সন্তোষের জন্য এ প্রস্তাব করিতেছি; পত্র লিখিবার জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ জানিবেন।"

এই বলিয়া রাজা স্বয়ং উঠিয়া অন্য টেবিল হইতে কাগজ, কলম ও কালী আনিয়া মনোরমার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন এবং হরিমতির নিকট প্রকৃত বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"অতি সহজ পত্র। স্পষ্ট করিয়া দুইটা কথা লিখিলেই কাজ মিটিবে। এক কথা, হরিমতির ইচ্ছামতে তাহার কন্যাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল কি না? দ্বিতীয় কথা, এ সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য হরিমতির মনে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন ভাব আছে কি না? আপনারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে এই পত্রখানা লিখিত হইলে আমিও সন্তুষ্ট হই।"

মনোরমা বলিলেন,—"ইচ্ছা না থাকিলেও আপনার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করিতে হইতেছে।"

এই বলিয়া তিনি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র সমাপ্ত হইলে তিনি তাহা রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা তাহা পাঠ করিয়াই খামের ভিতর পুরিয়া উপরে শিরোনামা লিখিয়া, মনোরমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা এখনই ডাকে পাঠাইয়া দিউন। পত্র লেখা তো শেষ হইল, এক্ষণে উন্মাদিনীর সম্বন্ধে আমি আরও দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। উমেশবাবু সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া আমার উকীলকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। সে পত্রে কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। মুক্তকেশী কি লীলাবতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল?"

মনোরমা উত্তর দিলেন,—"না।"

"আপনার সহিত সে দেখা করিয়াছিল কি?"

"না।"

"দেবেন্দ্রবাবু নামক এক জন লোক ছাড়া আর কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই?"

"না, কাহারও সহিত নহে।"

"দেবেন্দ্রবাবু বুঝি এখানে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন? তিনি কি বেশ যোগ্য লোক?"

"হাঁ।"

তিনি ক্ষণেক মৌনভাবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুক্তকেশী যখন এ দেশে আসিয়াছিল, তখন সে কোথায় থাকিত, তাহা আপনি সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

"হাঁ, নিকটে তারার খামার নামে একটা জায়গা আছে, সেখানেই সে থাকিত।"

রাজা বলিলেন,—"এই অভাগিনীর সন্ধান করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। হয় ত যেখানে সে ছিল, সেখানে এমন কোন কথা বলিয়া থাকিবে যে, তাহা ধরিয়া তাহার সন্ধান হইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ে লীলাবতী দেবীকে আমি স্বয়ং কোন কথাই বলিতে পারিব না। এ জন্য মনোরমা দেবি, আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনার লিখিত পত্রের উত্তর আসিলে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া লীলাবতী দেবীর সন্দেহভঞ্জনার্থ যাহা বলিতে হয়, বলিবেন।"

মনোরমা স্বীকার করিলেন। তাহার পর রাজা হাস্যমুখে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার অবস্থানার্থ যে প্রকোষ্ঠ সজ্জিত ছিল, তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমি বলিলাম,—"একটা মহা দুর্ভাবনা আজি বেশ শেষ হইয়া গেল; কি বল মনোরমা?"

মনোরমা বলিলেন,—"তাহার সন্দেহ কি? আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই সুখের বিষয়।"

আমি বলিলাম,—"কেবল আমি কেন? তোমার হাতে যে পত্র রহিয়াছে, তাহাতে তোমারও সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন, "তা তো বটেই। আমি জানিতাম, এরূপ কাণ্ড কখনও ঘটিতে পারে না। যাহা হউক, যদি এ সময় দেবেন্দ্রবাবু এখানে থাকিয়া

রাজার কথা শুনিতেন এবং এই চিঠির প্রস্তাব জ্ঞাত হইতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বলিলাম,—"সেই নামহীন পত্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রবাবুর কতকটা সম্বন্ধ জন্মিয়াছে সত্য। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি আজ এখানে উপস্থিত থাকিলে যে কি উপকার হইত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মনোরমা উদাসভাবে বলিলেন,—"মনের কল্পনা-মাত্র, এ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতাই আমাদের প্রকৃষ্ট সহায়।"

সমস্ত ঝোঁক যে আমার ঘাড়ে চাপে, তাহাও আমার ইচ্ছা নয়। বলিলাম,—"যদি এখনও মনে কোন সন্দেহ থাকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল না কেন?"

তিনি বলিলেন, "কোনই সন্দেহ নাই।"

"রাজার কথার মধ্যে কোন অংশ অসংলগ্ন বা অসম্ভব বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে কি?"

"যখন তিনি এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন, তখন আর কি বলিবার আছে? মুক্তকেশীর মাতার সাক্ষ্যের অপেক্ষা আর কি ভাল প্রমাণ হইতে পারে?"

"ইহার অপেক্ষা ভাল প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এই পত্রের উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে রাজার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণ আর কি সন্দেহ করিতে পারেন, তাহা আমি তো বুঝিতেছি না।"

মনোরমা বলিলেন,—"তবে আমি চিঠি ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসি। যত দিন এ পত্রের কোন উত্তর না আইসে, তত দিন আর কোন কথায় কাজ নাই। আমার দোমনা ভাব দেখিয়া কিছু মনে করিবেন না; লীলার ভাবনায় এ কয় দিন আমি বড় উৎকণ্ঠিত আছি। উৎকণ্ঠা, জানেন তো আপনি, কঠিন হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া ফেলে।"

মনোরমা চলিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য স্থিরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। হাজারে এরূপ এক জন স্ত্রীলোকও মিলে কি না সন্দেহ। যখন তিনি বালিকা, তখন হইতে আমি তাঁহাকে দেখিতেছি। কত পারিবারিক বিপদের সময় আমি তাঁহার বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দেখিয়াছি এবং প্রশংসা করিয়াছি। বর্ত্তমান ঘটনায় তাঁহার সঙ্কোচ ও সন্দিগ্ধভাব দেখিয়া আমারও কতকটা সন্দেহ জন্মিল। অন্য স্ত্রীলোক হইলে হয় তো কিছুই মনে হইত না। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি মন একটু ব্যাকুল হইল। ধীরে ধীরে বাগানে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈকালে আমরা সকলে মিলিত হইলাম। প্রাতে রাজা প্রমোদরঞ্জনকে যেরূপ ঠাণ্ডালোক দেখিয়াছিলাম, এ বেলা সেরূপ দেখিলাম না। রাজার কণ্ঠস্বর যেন উচ্চ—তাঁহার গল্পের বিরাম নাই। কিন্তু এ দিকে যাহাই হউক, লীলাবতীর প্রতি তাঁহার মনোযোগের ত্রুটি নাই। তাঁহার সহিত কথোপকথনকালে রাজা যত দূর সম্ভব প্রেমপূর্ণ কোমলস্বরে কথা কহিতেছেন। লীলা কিন্তু রাজার এ সকল সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেছেন বলিয়া আমার বোধ হইল না। আমার বোধ হইল, রাজা পদ, উপাধি, সম্পত্তি ও প্রেম অকাতরে লীলার চরণে সমর্পণ করিতে প্রস্তত; লীলা যেন কিছুতেই রাজি নহেন। এ বড় আশ্চর্য্য কথা!

পরদিন মঙ্গলবারে রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া, লোক সঙ্গে লইয়া, তারার খামারে গমন করিলেন। পরে শুনিলাম, সেখানে তাঁহার সন্ধানে কোন ফল হয় নাই। রাজা ফিরিয়া আসিয়া রাধিকাপ্রসাদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে দিন আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিল না।

বুধবারের ডাকে হরিমতির প্রত্যুত্তর-লিপি আসিল। আমি তাহার নকল রাখিয়াছিলাম। চিঠিখানি নিম্নে লিখিয়া দিতেছি;—

"নিবেদন—আমার কন্যা মুক্তকেশীকে আমার ইচ্ছামতে চিকিৎসকের অধীনে রাখা হইয়াছে কি না এবং তৎপক্ষে রাজা প্রমোদরঞ্জন যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত আপনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি। এই উভয় প্রশ্নেই আমার সম্মতিসূচক উত্তর জানিবেন। ইতি—

শ্রীহরিমতি দাসী।"

চিঠিখানি বড় সংক্ষিপ্ত, যেন চাঁচা কথায় লেখা—কাজের কথা ছাড়া একটি কথাও নাই। কিন্তু প্রশ্নের অতি সন্তোষ-জনক উত্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজা বলিলেন,—"হরিমতি কথাবার্ত্তা বড় কম কহে; বড় শাদা স্বভাবের লোক। তাহার পত্রও তাহার স্বভাবের অনুরূপ।"

রাজা অন্তরালে ঘোড়া দেখিতে গমন করিলেন; মনোরমাও লীলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে গমন করিলেন; ক্ষণেক পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া আমার পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং হরিমতির পত্রখানি এ হাত ও হাত করিতে করিতে বলিলেন,—"বস্তুতই কি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করা উচিত, তাহা আমরা করিয়াছি ?"

এখনও তাঁহার সন্দেহ দেখিয়া আমি একটু বিরক্তভাবে বলিলাম,—"যদি আমরা রাজার বন্ধু হই এবং রাজাকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান ও বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমাদের সমস্তই—এমন কি, আবশ্যকের অপেক্ষাও অধিক করা হইয়াছে। কিন্তু যদি আমরা শত্রুর ন্যায় তাঁহাকে সন্দেহ করি—"

মনোরমা বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে কথা মুখেও আনিবেন না; আমরা তাঁহার বন্ধু আত্মীয়। আপনি জানেন, কল্য আমি রাজার সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলাম।"

"তা জানি।"

পথে আমরা প্রথমতঃ মুক্তকেশীর কথা এবং যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে তাহার সহিত দেবেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ ঘটে, তাহারই কথা কহিতে থাকি। সে কথা শেষ হইলে রাজা অতি অমায়িকভাবে, লীলার ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করেন। লীলা যদি কোন কারণে মত-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজা সম্পূর্ণ উদারভাবে তাঁহার পাণিগ্রহণ-আশা পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছেন। কেবল পূর্ব্ব-ঘটনা এবং যে যে অবস্থায় বর্ত্তমান বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়, তৎ-সমস্ত স্মরণ করিয়া লীলাবতী যেন আপনার মত ব্যক্ত করেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র অনুরোধ। সেই সকল বিগত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লীলাবতীর যে মত হইবে, রাজা তাহা লীলার নিজ মুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করেন। লীলার মত তাঁহার বাসনার প্রতিকূল হইলে, তিনি বিবাহের জন্য আর কোন উপরোধ করিবেন না এবং লীলার স্বাধীনতার কোন প্রতিবন্ধক হইবেন না।"

আমি বলিলাম, "অতি উত্তম কথা; রাজার পক্ষে ইহা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা।"

মনোরমা আমার মুখের প্রতি কিয়ৎকাল বিষণ্ণভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি কোন সন্দেহও করিতেছি না, কাহাকে দোষীও করিতেছি না; কিন্তু লীলাকে এই বিবাহে সম্মত করাইবার ভার আমি কখনই লইব না।"

আমি বলিলাম, "তোমাকেই তো রাজা এই ভার দিয়াছেন; কিন্তু লীলার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করিতে তিনিও তো তোমাকে নিষেধ করিয়াছেন।"

"রাজার বক্তব্য লীলাকে জানাইলেই প্রকারান্তরে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ-চেষ্টা ঘটিতেছে।"

"তাহার অর্থ কি ?"

"উমেশবাবু, আপনি লীলার প্রকৃতি একবার ভাবিয়া দেখুন। যে অবস্থায় বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়, যদি তাহা লীলাকে আলোচনা করিতে বলি, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির দুই শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি তাহার পিতৃভক্তি ও তাহার সত্যপ্রিয়তা উভয়কেই আঘাত করা হইবে। আপনি জানেন, লীলা জীবনে কখন কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই; আর জানেন, মেসো মহাশয়ের পীড়ার সূত্রপাতে এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তিনি মৃত্যুশয্যায় এই বিবাহে বড়ই অনুরাগ প্রকাশ করেন।"

বলিতে কি, কথাগুলি শুনিয়া আমি একটু বিচলিত হইলাম। বলিলাম, "যাহাই হউক, মনোরমা, বর্ত্তমান বিবাহসম্বন্ধে অমত প্রকাশ করার পূর্ব্বে তোমার ভগ্নীর সমস্ত বিষয় বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখা আবশ্যক এবং ইহাও মনে করা উচিত যে, বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদি সেই নামহীন পত্র লীলার মনে রাজার সম্বন্ধে কোন কুসংস্কার জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই লীলার নিকট যাও এবং তাঁহাকে সমস্ত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিতে বল। তাঁহাকে আরও বল, এ সম্বন্ধে তোমার অথবা আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার পরেও লীলা রাজার বিরুদ্ধে আর কি বলিবেন ? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে লীলা স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতঃপর কি আপত্তিতে তিনি তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন ?"

"যুক্তি এবং আইনের তর্কে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নাই। তথাপিও যদি লীলা সঙ্কোচ প্রকাশ করে, অথবা আমিই যদি করি, তাহা হইলে আমাদের আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিয়া আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বুদ্ধির দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিবেন। অগত্যা আমাদিগকে সে অপবাদ সহ্য করিতে হইবে।"

এই বলিয়া মনোরমা ত্বরিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যখন কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বাজে কথায় তাহা ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করে, তখন প্রায়ই সে কোন কথা লুকাইয়া রাখে। আমার বিশেষ সন্দেহ হইলে যে,

বর্ত্তমান স্থলে লীলা ও মনোরমা রাজার ও আমার নিকট কোন কথা গোপন করিতেছেন।

বৈকালে যখন মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, তখন আমার সন্দেহ—প্রতীতি আরও বাড়িয়া গেল। লীলার সহিত তাঁহার সাক্ষাতে কি ফল হইল, তাহা আমার সমক্ষে ব্যক্ত করিতে তিনি যেরূপ চাপিয়া চাপিয়া সংক্ষেপে কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা বস্তুতই সন্দেহজনক। লীলা বিহিত মনঃসংযোগ সহকারে পত্রের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছেন। তাহার পর যখন বিবাহের দিনস্থিরের কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি উত্তর দিবার জন্য আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিয়া, সমস্ত কথার শেষ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে রাজা যদি অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বেই লীলা শেষ উত্তর দিবেন বলিয়াছেন। লীলা যেরূপ উৎকণ্ঠিত ও কাতরভাবে সময় প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে মনোরমা রাজাকে তৎসম্বন্ধে সম্মত করিবার নিমিত্ত বিহিত চেষ্টা করিতে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কাজেই লীলার আন্তরিক অনুরোধ হেতু বিবাহের প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত থাকিতেছে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমার কিছু অসুবিধা হইয়া পড়িল। অদ্য প্রাতে আমার শীঘ্র কলিকাতায় যাওয়ার আবশ্যক। একবার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে আবার যে শীঘ্র অবকাশ পাইব, এমন বোধ হয় না—হয় ত বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে আমার আসা না-ও ঘটিতে পারে। এ দিকে ইতিমধ্যে যদি বিবাহের দিনস্থির হইয়া যায়, তাহা হইলে বৈষয়িক ব্যবস্থা সম্বন্ধে লীলার মত তাঁহার নিজ মুখ হইতে এই সময়েই জানিয়া লওয়া আবশ্যক। রাজার কি অভিপ্রায় হয়, তাহা না জানিয়া আমি এ কথা উত্থাপন করিলাম না। জ্ঞাত হইলাম, রাজা লীলাবতীর প্রস্তাবানুসারে সন্তোষসহ নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তখন আমি মনোরমাকে জানাইলাম যে, লীলার সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তা এই সময়েই শেষ করা আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন প্রাতে আমি লীলার সহিত সাক্ষাতাশয়ে তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। লীলার অস্থিরমতিত্ব ও বিবেচনার ত্রুটি সম্বন্ধে আমি প্রথমেই বড়গোছ একটা উপদেশ দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র লীলা আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যেরূপভাবে অগ্রসর হইলেন, তাহা দেখিয়া আমি সব ভুলিলাম। আমি উপবেশন করিলে, লীলার পোষা কুকুরটি লাফাইয়া আমার ক্রোড়ের উপর উঠিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন এই কোলে তুমি বসিতে, আজি এই শূন্য সিংহাসন তোমার কুকুর দখল করিতে চাহিতেছে। তোমার হাতে ও কিসের খাতা?"

লীলার হাতে হস্তলিখিত একখানি সুন্দর খাতা ছিল। লীলাবতী খাতাখানি রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—"ও কিছু নয়; কতকগুলি হিজিবিজি লেখা।"

দেখিলাম, লীলার হাত এখনও সেই বালিকাকালের ন্যায় চঞ্চল, নিয়তই এটা ওটা পড়িতে ভালবাসে। লীলা ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। না জানি, আমি কি প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব ভাবিয়া যেন তিনি অস্থির হইলেন। আমি আর কাল-ব্যাজ না করিয়া কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম,—"আমি আজই কলিকাতায় যাইব; এ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তোমার সহিত তোমার নিজের বৈষয়িক দুই একটি কথাবার্ত্তা হওয়া আবশ্যক।"

লীলা দীনভাবে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আপনাকে এখানে দেখিতে পাইলে আমার সুখময় বাল্যকালের কথা মনে পড়ে।"

আমি বলিলাম,—"আমি হয় তো আর একবার আসিব; কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও একটু অস্থিরতা আছে বলিয়া তোমার সঙ্গে যে যে কথার দরকার আছে, তাহা এখনই শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছি। আমি তোমাদের অনেক দিনের উকীল এবং তোমাদের অনেক দিনের বন্ধু। আর যদি এখন রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত তোমার বিবাহের কথা উত্থাপন করি, তাহাতে দোষ গ্রহণ করিও না।"

লীলা সজোরে হস্তের খাতা পরিত্যাগ করিলেন,—যেন তাহাতে বৃশ্চিক ছিল। বারংবার এক হস্তে অপর হস্ত ধারণ করিতে করিতে কহিলেন,—"বিবাহের কথা না তুলিলে কি চলিতে পারে না?"

আমি বলিলাম,—"একবার তোমার অভিপ্রায়টা আমার জানা দরকার। বিবাহ হইবে কি হইবে না, তাহা জানিতে পারিলেই হইবে। যদি তোমার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তোমার পিতৃকৃত উইল অনুসারে তোমার নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা

অগ্রেই করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছা কি, তাহাও আমি জানিতে চাহি। ধরা যাউক, তোমার বিবাহ হইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে এবং বর্ত্তমানে তাহা কিরূপ আছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি।"

তাহার পর আমি তাঁহাকে তাঁহার নিজ বিষয়-সংক্রান্ত সমস্ত কথা বুঝাইলাম। তাঁহার অতুল সম্পত্তির মধ্যে কতক তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের, আর কতকের উপর তাঁহার জীবনস্বত্ব মাত্র। তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর কতক সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবে। সমস্ত বুঝাইয়া, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিবাহ ঘটিলে তোমার সম্পত্তি সম্বন্ধে তুমি তোমার ইচ্ছামত কোন সর্ত্ত রাখিতে চাহ কি না, তাহা আমি জানিতে চাহি।"

বড় অস্থিরভাবে লীলা এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন, তাহার পর তিনি সহসা আমার মুখের প্রতি চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন,—"যদিই তাহা ঘটে—যদিই আমার—"

তিনি কথা শেষ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া আমি বলিলাম,—"যদিই তোমার বিবাহ হয়—"

লীলা বলিলেন,—"তাহা হইলে মনোরমা দিদি যেন তফাৎ না হন। দিদি আমার সঙ্গে থাকিবেন, আপনি দয়া করিয়া ইহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিন।"

অন্য স্থান হইলে এ কথায় আমার হাসি আসিত। আমি সম্পত্তির বন্দোবস্তের জন্য এত বকাবকি করিলাম, কিন্তু ফলে এই হইল! কিন্তু এ স্থলে লীলার মুখের ভাব, তাঁহার কণ্ঠস্বর ও কাতরতা দেখিয়া আমিও কাতর হইলাম। তাঁহার এই অল্প কথায় অতীতের প্রতি তাঁহার অত্যাসক্তি প্রকাশিত হইতেছে; ভবিষ্যতের পক্ষে ইহা শুভলক্ষণ নহে।"

আমি বলিলাম,—"মনোরমা তোমার সঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত অতি সহজেই করা যাইতে পারিবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা হয় তো তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। মনে কর, তোমার যদি একটা উইল করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি তোমার টাকা কাহাকে দিবে?"

স্নেহপরায়ণা বালিকা বলিলেন,—"দিদি আমার ভগ্নী এবং জননী দুই-ই। আমি কি আমার টাকা দিদিকে দিতে পারি না?"

আমি বলিলাম—"অবশ্য পার। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তোমার টাকা কত। এত টাকা সবই কি তুমি মনোরমাকে দিবে?"

লীলা যেন কি বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না; বালিকা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"সব নহে—দিদি ছাড়া আর একজনকে—"

বালিকা কথার শেষ করিলেন না। তাঁহার অঙ্গ সকল চঞ্চল হইল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—"মনোরমা ছাড়া এই পরিবারভুক্ত অপর কোন লোককে তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি?"

আবার তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। তিনি সন্নিহিত পুস্তক সজোরে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আর এক জন আছেন,—তাঁহার জন্য যদি আমি কিছু রাখিয়া যাইতে পারি, বোধ হয়, তাহা তাঁহার কাজে আসিতে পারে। যদি আমার অগ্রে মৃত্যু হয়—"

আবার বালিকা নীরব। তাঁহার দেহ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, বদন পাণ্ডু হইল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। একবার বালিকা আমার মুখের প্রতি চাহিলেন, আবার পরক্ষণেই বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাহার পর উভয় হস্তে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সংসার কি কঠোর স্থান! এই নিয়ত হাস্যমুখী বালিকা অধুনা সুখের যৌবনে উপস্থিত। কিন্তু হায়, সংসারের ঘর্ষণে তিনি আজি ক্লেশভারে নিপীড়িত। লীলার এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া আমার এতই কষ্ট উপস্থিত হইল যে, অধুনা সময় উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটাইয়াছে, তাহা আর আমার মনে হইল না। আমি আমার চেয়ার তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম এবং তাঁহার মুখ হইতে হাত টানিয়া লইয়া বলিলাম,—"কাঁদিও না মা!"

দশ বৎসর পূর্ব্বে যে লীলাবতী ছিলেন, যেন তাহাই আছেন মনে করিয়া আমি স্বহস্তে তাঁহার চক্ষের জল মোচন করিয়া দিলাম। ইহাতে উপকার হইল। লীলা আমার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার বদনে অশ্রুবারি ভেদ করিয়া একটু মৃদু হাসি দেখা দিল।

সরলা লীলা সরলতা সহ বলিলেন,—"আমার ভুল হইয়াছে। কয় দিন হইতে আমার শরীর ও মন বড় খারাপ যাইতেছে। আমি যখন তখন কোন কারণ না থাকিলেও কাঁদিয়া ফেলি। এখন আমার শরীর অনেক ভাল হইয়াছে। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিবেন, তাহার উত্তর দিতেছি।"

আমি বলিলাম,—"না বাছা, এখন আর কাজ নাই; অন্য কোন সময়ে যাহা জানিবার আবশ্যক, তাহা জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই কাজ চলিবে।"

আমি অন্যান্য কথার অবতারণা করিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি বেশ সুস্থ হইলেন। তখন আমি বিদায় প্রার্থনা করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

লীলাবতী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বিনীত ও কাতর ভাবে বলিলেন,—"আবার আসিবেন। আপনি আমাকে যেরূপ দয়া করেন, আবার যখন আসিবেন, তখন আমি সেই দয়ার অনুরূপ ব্যবহার করিব। আপনি আসিতে ভুলিবেন না।"

আমি বলিলাম,—"আবার যখন আসিব, ভরসা করি, তোমাকে তখন সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিতে পাইব।"

অর্দ্ধঘণ্টাকাল আমি লীলাবতীর নিকটে ছিলাম, এই স্বল্পসময়ের মধ্যে লীলা তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় কথা কিছুই আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই এবং বর্ত্তমান বিবাহ বিষয়ে তাঁহার কাতরতার কারণ কি, তাহাও আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। তথাপি আমি কি জানি কেন, তাঁহার পক্ষাবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন লীলার প্রকোষ্ঠে আসিয়াছিলাম, তখন অনেকটা রাজার পক্ষ ছিলাম, যখন প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলাম, তখন মনে হইল, কোনরূপে এ বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে মন্দ হয় না।

আমার প্রস্থানকাল ক্রমে নিকটস্থ হইল। রাধিকাবাবুর সহিত দেখা করা হইল না। লোক দ্বারা মুখে মুখে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লওয়া হইল। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে মনোরমাকে বলিলাম যে, তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ না পাইলে আমি কোন কার্য্যই করিব না।

রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি জেদ করিয়া আমার গাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন। বলিলেন,—"যদি কখন দৈবাৎ আমার বাটীর দিকে যাওয়া হয়, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার বাটীতে পদধূলি দেওয়া হয় যেন। আমাকে আত্মীয় বলিয়া অনুগ্রহ রাখিবেন।"

রাজা লোকটা খুব মাটীর মানুষ,গাড়ী ষ্টেশনাভি-মুখে ছুটিল। আমি স্থির করিলাম, রাজার সহিত সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ আত্মীয়োচিত ব্যবহার করিব; কেবল এ বিবাহের বড় একটা সহায়তা করিব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিয়া সাত দিনের মধ্যে মনোরমার নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইলাম না। অষ্টম দিনে মনোরমার হস্তলিখিত এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। পত্রপাঠে জানিলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত লীলার বিবাহ স্থির হইয়াছে—সম্ভবতঃ বিবাহ আগামী মাঘমাসেই হইবে। তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমার কথা কি আছে? তথাপি পত্রের সংবাদ জানিয়া মন বড় কাতর হইল। পত্রখানি বড় ক্ষুদ্র, সংবাদও আমার পক্ষে বড়ই অচিন্তিতপূর্ব্ব। সে দিনটা আর কোন কাজ করিতে পারিলাম না। পত্রের প্রথম ছয় ছত্রে বিবাহ-সংবাদ, তাহার পর তিন ছত্রে রাজা হুগলী চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ, শেষ কয়েক ছত্রে লীলার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ এবং তাঁহারা শীঘ্রই বৈদ্যনাথ বেড়াইতে যাইবেন, এই সংবাদ। আর কিছুই নাই। কোন বিষয়ের একটা কারণ লেখা নাই, হঠাৎ এক সপ্তাহমধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য মতপরিবর্ত্তন কেন ঘটিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

লীলার বিবাহ হইবে—বেশ কথা। আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিতে নিযুক্ত হইলাম। লীলার সম্পত্তির ব্যবস্থা। লীলার সম্পত্তি দ্বিবিধ—১ম সম্ভাবিত, ২য় হস্তগত। পিতৃব্যের পরলোক-প্রাপ্তির পর লীলা যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন, তাহাই তাঁহার সম্ভাবিত সম্পত্তি এবং পিতৃকৃত উইল অনুসারে তিনি বিবাহের পরই যে দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাই তাঁহার হস্তগত সম্পত্তি বলিতে পারা যায়। লীলার সম্ভাবিত সম্পত্তির সম্বন্ধে কোনই গোল নাই এবং তাহার জন্য কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত এক লক্ষ টাকার উপর লীলার জীবন-স্বত্ব আছে এবং তাঁহার জীবনান্ত ঘটিলে তাহা তাঁহার পিসী শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবীর হস্তগত হইবে ব্যবস্থা আছে। এখানে পাঠক জিজ্ঞাসিতে পারেন, ভাইঝির মৃত্যু হইলে পিসী সম্পত্তি পাইবেন কি জন্য? রঙ্গমতী দেবী লীলার পিতা ৺প্রিয়প্রসাদের একমাত্র ভগ্নী। এই ভগ্নীর যত দিন বিবাহ না হইয়াছিল, তত দিন তাঁহার সহিত কাহারও সদ্ভাবের অভাব হয় নাই। কিন্তু তিনি সকল আত্মীয়ের বিরুদ্ধে জোর করিয়া, পূর্ব্ব-বঙ্গনিবাসী এক ব্যক্তিকে বিবাহ করায়, প্রিয়প্রসাদ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ রায়

যার-পর-নাই বিরক্ত হন এবং ভগ্নীর সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহার নাম জগদীশনাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় নিঃস্ব, অথবা অযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি বিবাহ হেতু রঙ্গমতির উপর তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বিরক্ত হইলেন এবং তিনি পিতৃসম্পত্তির কিছুই পাইবেন না স্থির হইল। অনেক চেষ্টায়, বহুদিন পরে, তাঁহার প্রতি এই অনুগ্রহ হইল যে, লীলার জীবনান্ত হইলে রঙ্গমতি এক লক্ষ টাকা পাইবেন এবং লীলা সমস্ত জীবনকাল ঐ সম্পত্তির আয় স্বয়ং ভোগ করিবেন। নগদ দুই লক্ষ টাকা ও এই এক লক্ষ টাকার আয়, এই উভয় কথার বিহিত ব্যবস্থা এই সময় হওয়া আবশ্যক; যাহাতে এই সম্পত্তি অব্যাহতরূপে লীলার অধিকারে থাকে, তাহাই আমার লক্ষ্য। আমি ব্যবস্থা করিলাম যে, এই দুই লক্ষ টাকা এরূপে আবদ্ধ থাকিবে যে, তাহার আয়ে তাঁহার স্বামীর কোন অধিকার থাকিবে না। লীলার পরলোক ঘটিলে তাঁহার স্বামী সেই আয় ভোগ করিবেন এবং ভবিষ্যতে মূল টাকা লীলার সন্তানাদি প্রাপ্ত হইবেন। যদি সন্তানাদি না থাকে, তাহা হইলে লীলা উইল দ্বারা তাঁহার মাসতুতো ভগ্নী মনোরমাকে বা অপর যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকে তাহা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আমার মনে লীলার সম্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি সেইমত লেখাপড়া প্রস্তুত করিয়া রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীলকে দেখিতে পাঠাইলাম। তাঁহার উকীল অন্যান্য সমস্ত কথায় সম্মতি দিলেন; কিন্তু যে স্থলে লীলার দুই লক্ষ টাকা, তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর, সন্তানাদি না থাকিলে রাজা আয় ভোগ করিবেন, পরে ইচ্ছানুসারে অপরের হস্তগত হইবে, এই কথা লেখা ছিল, সেই স্থানে উকীল মহাশয় বিষম আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সন্তানাদি না থাকিলে লীলাবতী দেবীর পরলোক-প্রাপ্তির পর ঐ দুই লক্ষ টাকা রাজার হইবে।"

কাজেই ঐ টাকার একটি পয়সাও যে মনোরমা বা আর কেহ প্রাপ্ত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা থাকিতেছে না। এ বড় অন্যায় ব্যবস্থা! সমস্ত টাকা রাজা পাইবেন কেন? আমি এ কথার সম্পূর্ণ আপত্তি করিলাম; রাজার উকীলও আমার কথায় আপত্তি করিলেন। তখন যাঁহাদের বিষয়, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল,

রাধিকাপ্রসাদ রায় লীলাবতীর অভিভাবক। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া পত্র লিখিলাম। সম্প্রতি রাজার বড় অর্থের অভাব। দেখিতে তাঁহার যথেষ্ট বিষয় বটে, কিন্তু তিনি দেনায় ডুবিয়া আছেন। বর্ত্তমান বিবাহ কেবল টাকার জন্য; তাঁহার উকীলের প্রস্তাব কেবল স্বার্থপরতামূলক। আমি কোন কথাই লিখিতে বাকী রাখিলাম না। দুই দিনের মধ্যেই রাধিকাবাবুর উত্তর আসিল। তাহা পাঠ করিয়া আমি অবাক্ হইলাম। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই যে, "কোন্ কালে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া এই পীড়িত ব্যক্তিকে কাতর করা কি উমেশবাবুর উচিত? ষোল বৎসরের এক বালিকা ৪০ বৎসরের পুরুষের অগ্রে মরিবে, ইহা কি কখন সম্ভব? আর যদিই তাহা ঘটে, একটিও সন্তান থাকিবে না, এই বা কোন্ কথা? কোন্ কালে দুই লক্ষ টাকা কি হইবে, তাহার ভাবনা অপেক্ষা সংসারে শান্তি ও সুখই প্রধান দ্রষ্টব্য। হায়, এ পাপ সংসারে উহা কি দুর্লভ!"

ঘোর বিরক্তির সহিত আমি তাঁহার পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলাম। তখনই রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীল মণিবাবু আমার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। মণিবাবু লোক বড় চতুর। হাসি হাসি মুখ—রহস্যময় কথাবার্ত্তা, কিন্তু কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল, হাস্য-পরিহাস যথেষ্ট হইল, কিন্তু কাজের কথায় তিনি এক বিন্দুও নরম হইলেন না। তখন অগত্যা আমি স্বয়ং শক্তিপুর গিয়া, বাচনিক পরামর্শ স্থির করিবার অভিপ্রায়ে, মণিবাবুর নিকট আর এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলাম। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি প্রস্থানকালে জিজ্ঞাসিলেন, —"সেই নামহীন পত্র লিখিবার আর কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম,—"কিছু না। আপনারা কি কিছু জানিতে পারিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন,—"না, তবে আমরা হতাশও হই নাই। রাজার বিশ্বাস, কোন লোক তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমরা সেই লোককে চোখে চোখে রাখিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যে তাহার সঙ্গে শক্তিপুর গিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোকটা বুঝি?"

তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়, স্ত্রীলোক নহে, এ পুরুষ। আমাদের বোধ হয়, পাগলী যখন প্রথমে পলায়, তখনও সেই লোকটা তাহার সাহায্য

করিয়াছিল, সে লোকটা এখন কলিকাতাতেই আছে। রাজা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন আমি বলিলাম, তাহাতে কাজ নাই। দেখা যাউক, সে কি করে, তাহাকে লক্ষ্যছাড়া করা হইবে না। এখন আসি মহাশয়! গোলটা শীঘ্র মিটাইয়া দিবেন।"

মণিবাবু চলিয়া গেলেন। অন্য মক্কেল হইলে আমার এত ভাবিবার দরকার ছিল না। আমাকে যেমন উপদেশ দিত, আমি তেমনই কাজ করিতাম। কিন্তু লীলাবতীর বিষয়ে সেরূপ করা আমার অসাধ্য। লীলার পিতার সহিত আমার বড় আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমার প্রধান মুরুব্বী ও বন্ধু ছিলেন লীলাকে আমি চিরকাল নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। আমি নিঃসন্তান; অপত্য স্নেহের মর্ম্ম আমার কিছুই জানা নাই। কিন্তু আজি আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন বর্ত্তমান বৈষয়িক ব্যবস্থা আমার নিজ কন্যার ব্যবস্থা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উদাসীনভাবে কার্য্য করা আমার অসাধ্য। রাধিকাবাবুকে পুনরায় পত্র লেখা নিতান্ত অনাবশ্যক। যদি তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্য হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে মুখামুখি জোর করিয়া না ধরিলে হইবে না। কল্য শনিবার। স্থির করিলাম, কল্য শক্তিপুর যাইব এবং যত দূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া দেখিব।

পরদিন শনিবার—শক্তিপুরে যাইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ীর একটু বিলম্ব দেখিয়া আমি প্লাটফরমে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ একটি লোক নিতান্ত ব্যস্ততা সহকারে আমার নিকটস্থ হইল। লোকটি দেবেন্দ্রবাবু। দেবেন্দ্রবাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ নিতান্ত মলিন, আকৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, বদন বিবর্ণ ও কাতর। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি শক্তিপুর হইতে অনেক দিন আসিয়াছেন? আমি মনোরমা দেবীর এক পত্র পাইয়াছি। আমি জানি, পাগলিনীর সম্বন্ধে রাজা প্রমোদরঞ্জনের কথা আপনারা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। আপনি জানেন কি উমেশবাবু, বিবাহ কি শীঘ্রই হইবে?"

তিনি এত শীঘ্র শীঘ্র কথা কহিলেন যে, তাঁহার অনুসরণ করা অসম্ভব। এক সময়ে দৈবাৎ তাঁহার সহিত রায়-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পারিবারিক সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে আমি জানাইব কেন? আমি বলিলাম,—"সময়ে সকলই জানিতে পারিবেন। সে বিবাহ লুকাইয়া হইবার নহে। দেবেন্দ্রবাবু, আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্রী দেখিতেছি কেন?"

তাঁহার মুখের ভাবে হৃদয়-বেদনার চিহ্ন ব্যক্ত হইল। এরূপ পরুষভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় আমার মনে কষ্ট হইল। তিনি ক্লিষ্টভাবে বলিলেন, "বিবাহের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আমার কোনও অধিকার নাই বটে,—তা—তা—আচ্ছা?"

আমি একটা মিষ্টকথা দ্বারা আমার ত্রুটি স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি দেশে থাকিতেছি না। কাজকর্ম্মের চেষ্টায় অন্য দেশে যাইতেছি। মনোরমা দেবী আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। অনেক দূরদেশে কোথায় যাইতেছি, সেখানকার জলবায়ু কেমন, সে ভাবনা আমার নাই।"

কথা কহিতে কহিতে, সন্দিগ্ধভাবে চতুষ্পার্শ্বে যে বহু লোক যাতায়াত করিতেছিল, তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যেন কে তাঁহার প্রতি নজর রাখিয়াছে।

আমি বলিলাম, "আপনি যেখানে যাইতেছেন, নির্ব্বিঘ্নে সেখানে যান এবং নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি একটু প্রয়োজন হেতু আজি শক্তিপুর যাইতেছি। মনোরমা ও লীলাবতী বৈদ্যনাথ গিয়াছেন।"

তাঁহার বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ আমাকে নমস্কার করিয়া জনকোলাহলমধ্যে মিশিয়া গেলেন। যদিও তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অতি সামান্যমাত্র, তথাপি তাঁহার জন্য আমার মন কিছু ব্যাকুল হইল। আমার বোধ হইল, দেবেন্দ্রবাবুর ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈকালে গিয়া আমি শক্তিপুরে পৌছিলাম। আনন্দধাম বড় ফাঁক; লীলা, মনোরমা, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কেহই নাই। আমি রাধিকাবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। সহসা আমার খবর পাইয়া তাঁহার শরীর নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল, কাজেই আজি আর তাঁহার সঙ্গে কোন ক্রমেই সাক্ষাৎ হইতে পারে না—কল্য প্রাতে দেখা হইবে। চাকরবাকরেরা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিল।

পরদিন বেলা ১০টার সময়ে আমি রাধিকাপ্রসাদবাবুর নিকটস্থ হইলাম। দেখিলাম, তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট। সম্মুখে তাঁহার খানসামা এক প্রকাণ্ড ছবির বহি ধরিয়া আছে, আর রায় মহাশয় চসমা চক্ষে লাগাইয়া সেই সকল ছবির শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। বহিখানি এত বড় ও এমনই ভারী যে, খানসামার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সে ব্যক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িবার মত হইয়াছে। আমি রায় মহাশয়ের নিকটস্থ হইলে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন,—"প্রাণের বন্ধু উমেশবাবু, তবে ভাল আছ তো? বেশ ভাল আছ?"

আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি বসিলে খানসামাকে প্রস্থান করিতে বলা হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণই দেখিলাম না। সে যেমন বোঝা ধরিয়াছিল, তেমনই খাড়া রহিল। আমি বলিলাম,—"আমি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আসিয়াছি। আর কেহ এখানে না থাকিলে ভাল হয়।"

খানসামাটা কৃতজ্ঞভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিল; ভাবিল, এতক্ষণ পরে বুঝি তাহার এ যন্ত্রণার অবসান হইবে। রাধিকাবাবু চক্ষু মুদিত করিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"আর কেহ না থাকিলে ভাল হয়!"

আমার এ সকল ছেলেমী ভাল লাগিল না। আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম,—"এই লোকটিকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলে বাধিত হইব।"

রাধিকাবাবু নেত্রবিস্তার করিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া, রসিকতা করিয়া বলিলেন,—"লোক! ও কি একটা লোক না কি? আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ও একটা লোক ছিল বটে, আধ ঘণ্টা পরেও আবার লোক হইতে পারে বটে, এখন তো ও আমার কেতাব রাখা টেবিল। টেবিল এখানে থাকায় তোমার আপত্তি কি?"

"আমার আপত্তি আছে। রাধিকাবাবু, আমি আবার বলিতেছি, আমাদের এখানে আর কেহ না থাকে।"

আমি যেরূপ স্বরে ও যেরূপ ভাবে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে অন্য মত করা অসম্ভব। রাধিকাবাবু নিতান্ত বিরক্তভাবে খানসামাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"রাখ—ছবির বহি ঐ চেয়ারে রাখ। খবরদার, পড়ে না যেন। পড়েনি তো? সাবধান! আতরের শিশি আমার কাছে রাখ। রাখিয়াছ? তবে হতভাগা, এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

খানসামাটা বাহিরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। রায় মহাশয় বার বার আতর শুঁকিতে লাগিলেন এবং একদৃষ্টিতে পার্শ্বস্থ আলমারীর পুস্তকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"আমি অনেক ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনাদের কার্য্যের জন্য আসিয়াছি। বোধ হয়, আমার কথায় আপনার মনঃসংযোগ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন,—"আমাকে বাক্যযন্ত্রণা দিও না। আমি নিতান্ত কাতর—পীড়িত—অনুগ্রহের পাত্র।"

এই বলিয়া তিনি নয়ন মুদিয়া, মুখে রুমাল দিয়া বসিলেন। আমি আজি লীলার হিতার্থে সকল অত্যাচারই সহ্য করিব স্থির করিয়াছি। বলিলাম, "আমি আপনাকে বিনয় করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমার পত্রের লিখিত বিষয় আর একবার বিচার করিয়া দেখুন এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ঠিক থাকিতে দিন। আমি আর একবার এই শেষবার আপনাকে সমস্ত ঘটনা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।"

রায় মহাশয় অতি কাতরভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ এবং বারংবার মস্তকান্দোলন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"উমেশবাবু, তুমি নিতান্ত হৃদয়হীন—ছি! যাহা হউক, কি তোমার কথা, বলিয়া যাও।"

আমি সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আতরের শিশি নাকের নিকট রাখিয়া ও রুমালে মুখ ঢাকিয়া শুঁকিতে লাগিলেন। আমার বাক্য শেষ হইলে তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন। বলিলেন, "ওঃ বাপ রে! উমেশবাবু, বে-তর তোমার যুক্তি! ওঃ!"

আমি বলিলাম,—"আমাকে একটা সাদা জবাব দিন। আমার বিশ্বাস, আপনি জোর করিলে রাজা প্রমোদরঞ্জনকে নরম হইতেই হইবে। লীলার টাকা লীলার নিজ সম্পত্তি, তাহাতে রাজার কোন দাওয়া নাই। লীলার সন্তান না থাকিলে তাঁহার অবর্ত্তমানে সে টাকা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিভুক্ত হওয়া উচিত, অথবা তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হওয়া উচিত, রাজা যদি জেদ্ না ছাড়েন, তবে নিশ্চয় জানিবেন, তিনি কেবল অর্থ-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এ বিবাহ করিতেছেন এবং এ কথার উল্লেখ করিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিবে।"

রায় মহাশয় ধীরে ধীরে রুমাল নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"বাপ্ রে! এত কথা! আমার

কথা কহা বড় সুখের। সে সুখ, উমেশবাবু, তুমি এখনও জানিতে পার নাই বোধ হয়। উমেশবাবু, তুমি তুলসী দাসের দোঁহা জান? তাহাতে বিস্তর সদুপদেশ আছে। আমি অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"আমার এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার মীমাংসা আগে আবশ্যক, তাহার পর অন্য কথা। আপনি যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই বলিবে, স্ত্রীলোকের টাকা অকারণে স্বামীর হস্তগত হইতে দেওয়া অন্যায়। আপনাকে বন্ধুভাবে সেই কথা জানাইতেছি।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বটে! যাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, সেই এরূপ কথা বলিবে কি? তাহা যদি বলে, তাহা হইলে তখনই তাহাকে দ্বারবান্ দিয়া তাড়াইয়া তবে অন্য কথা।"

আমি বলিলাম,—"আমাকে উত্ত্যক্ত করায় কোন ফল নাই। যেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার জন্য ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আপনিই দায়ী।"

তিনি বলিলেন,—"না, উমেশবাবু, না। সমস্ত ঝোঁক আমার ঘাড়ে চাপাইও না। আমি তোমার সহিত তর্ক করিতাম, কিন্তু হায়! আমার শরীর! তুমি আমার—তোমার নিজের—প্রমোদরঞ্জনের এবং লীলার মাথা খাইতে বসিয়াছ। এত করিতেছ কি সর জন্য? ইহজগতে যাহা হইবার বা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি বিরল, তাহারই জন্য। শান্তি ও সুখ বজায় রাখিতে চেষ্টা কর—এ কথা ছাড়িয়া দাও।"

আমি আসন ত্যাগ করিয়া বলিলাম,—"তবে আপনি চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই আপনার মত?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ—হাঁ। এত তর্ক—এত বকাবকির পর আমার অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ দেখিতেছি। ওঠ কেন? বইস।"

আমি তাঁহার অনুরোধ কর্ণেও ঠাঁই দিলাম না। দ্বারসন্নিহিত হইয়া ফিরিয়া বলিলাম,—"ভবিষ্যতে যাহাই কেন হউক না, মনে রাখিবেন, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। আমি আপনাদিগের বহুদিনের বন্ধু ও কর্ম্মচারী। বিদায়কালে আমি আবার বলিতেছি যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্পত্তির যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, আমি কখনই আমার কন্যার জন্য সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না।"

আমি বাহিরে আসিলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"খাওয়া-দাওয়া না করিয়া যাইও না। বুঝিয়াছ, উমেশবাবু, আহার করিয়া যাইও।"

আমি বিরক্তি হেতু তাঁহার কথার কোনই উত্তর দিলাম না। সেই দিনই বৈকালের ট্রেণে আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বের লেখাপড়া বদলাইয়া ফেলিলাম। লীলা নিজমুখে যাহাদিগকে নিজ-সম্পত্তি দান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সফলতা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকিল না। আমি কি করিব? আমার ইচ্ছায় তো কাজ নহে। আমি না করিতাম, আর এক জন উকীল লেখা-পড়া করিয়া দিত।

আমার কথা ফুরাইল। অতঃপর এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের অবশিষ্টাংশ অন্যান্য লেখনী ব্যক্ত করিবে। দুঃখিত-হৃদয়ে আমার কাহিনী আমি এই স্থানে সমাপ্ত করিলাম।

উমেশবাবুর কথা সমাপ্ত

শ্রীমতী মনোরমা দেবীর কথা।

মনোরমা দেবীর লিখিত দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত।

(দিনলিপির যে যে অংশের সহিত বর্ত্তমান উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

৮ই অগ্রহায়ণ। আজি প্রাতে উমেশবাবু চলিয়া গেলেন। তিনি বলুন আর নাই বলুন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লীলার সহিত সাক্ষাতে তিনি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। আমার ভয় হইল, বুঝি বা লীলা সমস্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবনা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি রাজার সহিত বেড়াইতে না গিয়া, লীলার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, লীলা নিতান্ত অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র লীলা আমার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"আমি তোমাকেই মনে করিতেছিলাম। বইস দিদি, যাহা হয় একটা স্থির কর,—আমি তো এরূপে আর থাকিতে পারি না।"

তাহার কণ্ঠস্বর তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দিল। আমি তাহার নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার হস্ত হইতে দেবেন্দ্রবাবুর সেই পুস্তকখানি গ্রহণ করিলাম এবং তাহার অজ্ঞাতসারে তাহা তাহার চক্ষুর অগোচর স্থানে রক্ষা করিলাম, তাহার পর বলিলাম,—"বল দিদি, তোমার কি অভিপ্রায়? উমেশবাবু কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়াছেন?"

লীলা মস্তকান্দোলন করিয়া বলিল,—"যে বিষয় আমি এক্ষণে ভাবিতেছি, সে সম্বন্ধে তিনি কোনই উপদেশ দেন নাই। তিনি আমার প্রতি নিতান্ত স্নেহময় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলাম। যাহা হউক, দিদি, এমন করিয়া তো আর চলে না। হৃদয়কে বলবান্ করিয়া, এ বিষয়ের যাহা হয়, মীমাংসা করিতে হইতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"বর্ত্তমান বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া কি তোমার অভিপ্রায়?"

লীলা উত্তর দিল,—"না দিদি, আমি সত্যকথা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি।"

এই বলিয়া সে উভয় হস্তে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিল এবং আমার স্কন্ধে স্বীয় মস্তক রক্ষা করিল। সম্মুখে দেয়ালে তাহার পিতৃ-প্রতিমূর্ত্তি বিলম্বিত ছিল, সে তাহাতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিল,—"বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া আমার অসাধ্য। আমি দুর্ভাগিনী। আমার যতই কেন যন্ত্রণা হউক না, অমি কখনই পিতার অন্তিম আদেশ এবং আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিয়া জীবনকে চিরদিনের মত অনুতপ্ত ও দুঃখভারগ্রস্ত করিব না, ইহা স্থির।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তবে তোমার অভিপ্রায় কি?"

লীলা উত্তর দিল,—"আমি রাজাকে নিজমুখে সত্যকথা জানাইতে চাহি। সমস্ত কথা জানিয়া, আমি প্রার্থনা না করিলেও যদি তিনি আপনিই বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে স্বীকৃত হন, উত্তম।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"লীলা, তুমি রাজাকে বলিবে কি?"

লীলা বলিল,—"আমি তাঁহাকে বলিতে চাহি যে, যদি অন্য এক—যদি অন্য এক নূতন অনুরাগ আমার হৃদয় অধিকার না করিত, তাহা হইলে পিতৃদেবের আদেশক্রমে ও আমার সম্মতিতে যে বিষয় এত দিন স্থির হইয়াছিল, আমি তাহা সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিতে পারিতাম।"

আমি বলিলাম,—"না লীলা, এ নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট কদাচ তোমাকে আমি হীন হইতে দিব না।"

লীলা বলিল,—"যাহা জানিতে তাঁহার

অধিকার আছে, সেই কথা গোপন করিয়া অন্য কল্পিত বাক্যের সাহায্যে সত্য-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলে, আমাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা ও পরত্র হীন হইতে হইবে।"

"তোমার হৃদয়ের কথা জানিতে তাঁহার কোনই অধিকার নাই।"

"অন্যায়—দিদি—অন্যায় কথা বলিতেছ। কাহা-রও সহিত আমি প্রতারণা করিতে চাহি না। বিশে-ষতঃ পিতৃদেব যাঁহাকে বরণ করিতে বলিয়াছেন এবং আমি স্বয়ংও যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার নিকটে আমি কখনই প্রতারণা করিব না।"

তাহার পর আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল,—"দিদি, তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর, আমার যুক্তি ন্যায়-সঙ্গত কি না? তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়িতে, তাহা হইলে কি হইত? রাজা আমার অভিপ্রায়ের যেরূপ ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করুন, তথাপি আমি কখন মনে মনেও তাঁহার নিকট অবিশ্বাসী থাকিব না।"

আমি জানিতাম, আমার চিত্ত অনেকটা পুরুষের ন্যায় কঠিন এবং সঙ্কোচ-বিরহিত। আজ দেখিলাম, আমি সঙ্কোচে পরিপূর্ণ আর কোমলতাময়ী লীলার হৃদয় আজি সম্ভবাতীত স্থির ও দৃঢ়। আমি লীলার সেই বিশুদ্ধ হতাশ বদনের প্রতি নেত্রপাত করিলাম। সেই প্রেমময় চক্ষে তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা স্পষ্টই প্রতিভাত হইতে লাগিল। যে সকল সতর্কতাপূর্ণ অসার আপত্তি আমার রসনায় উদিত হইতেছিল, তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। আমি নীরবে মস্তক বিনত করিলাম।

লীলা আমার নিস্তব্ধতা বিরক্তি-সূচক মনে করিয়া বলিল,—"দিদি, আমার উপর রাগ করিও না।"

আমি কথায় কোন উত্তর না দিয়া, উভয় হস্তে লীলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলাম; কথা কহিলে পাছে কাঁদিয়া ফেলি, ভয়ে কথা কহিলাম না। পুরু-ষের ন্যায় আমারও সহজে রোদন আইসে না। কিন্তু আজি কান্না আটকান কঠিন বোধ হইতে লাগিল।

লীলা অঙ্গুলীতে আমার মাথার চুল জড়াইতে জড়াইতে বলিতে লাগিল,—"দিদি, এই কথা আমি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি। প্রগাঢ়রূপে এই বিষয় বিচার করিতেছি। যখন আমার বিবেক আমার যুক্তিকে সত্য বলিতেছে, তখন ইহা ব্যক্ত করিতে আমার সাহসের অভাব হইবে না। দিদি, কালি আমি তাঁহাকে তোমার সমক্ষে সমস্ত কথা জানাইব। যাহা অন্যায়, যাহাতে তোমাকে কি আমাকে লজ্জিত হইতে হয়, এমন কোন কথাই আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না। যাহা হউক, ইহাতে এই ঘৃণিত গোপন চেষ্টার শেষ হইবে, সুতরাং হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। স্থির করিয়াছি, তাঁহাকে সমস্ত কথা সরলভাবে বলিব; তাহার পর সমস্ত বিষয় শুনিয়া আমার সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনি সেইরূপ করিবেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লীলা আমার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিল। এই যুক্তির শেষ কি দাঁড়া-ইবে, তাহার চিন্তায় আমার মন বড় ব্যাকুল হইল; তথাপি লীলাকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী সঙ্কল্প-সাধনে বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না। অতঃপর আমরা উভ-য়েই ও প্রসঙ্গের আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। কিয়ৎকাল পরে আমি প্রস্থান করিলাম।

বৈকালে লীলা বাগানে বেড়াইতে আসিল। আমি বাগানে পুষ্করিণী-তীরে দাঁড়াইয়া রাজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। লীলাকে দর্শনমাত্র আমরা উভয়েই সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। লীলা প্রাতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা এখনও অবিচলিত আছে কি না, মনে মনে আমি তাহাই ভাবিতে-ছিলাম। অন্য নানা কথার পর বিদায়ের সময়ে লীলা রাজাকে জানাইল যে, কালি প্রাতে রাজাকে সে কোন বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা করে। আমি বুঝি-লাম, লীলার সঙ্কল্প এখনও স্থির রহিয়াছে। লীলার কথা শুনিয়া রাজার মুখের ভাবান্তর জন্মিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, কল্য প্রাতের সংবাদের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে আমি লীলার শয্যায় গমন করিলাম। দেখিলাম, শিশুকালে লীলা যেমন বালিসের নীচে প্রিয় ক্রীড়া-সামগ্রী সকল লুকাইয়া রাখিত, অদ্যও সেইরূপে মাথার বালিসের নীচে দেবেন্দ্রবাবুর হস্ত-লিখিত পুস্তকখানি অর্দ্ধ-লুক্কায়িত-ভাবে রাখিয়া দিয়াছে। আমি বলিবার কোন কথা পাইলাম না; কেবল পুস্তকখানির দিকে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া মস্তকান্দোলন করিলাম। লীলা উভয় হস্তে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—"দিদি, এক রাত্রি, আর এক রাত্রি মাত্র উহা ঐরূপে থাকিতে দেও। কালি হয় ত এমন ঘটনা ঘটিবে যে, চিরজীবনের জন্য উহার সহিত আমার সম্পর্ক শেষ হইয়া যাইবে।"

পরদিন প্রাতের প্রথম ঘটনা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। দেবেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে আমার নামে এক পত্র আসিয়া পৌছিল। রাজা মুক্তকেশীর নাম-হীন পত্র সম্বন্ধে যেরূপে আত্ম-চরিত্রের সততা সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া আমি পূর্ব্বে দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। অদ্য দেবেন্দ্রবাবুর যে পত্র পাইলাম, তাহা আমার সেই পূর্ব্বপত্রের উত্তর। রাজার চরিত্র-সমর্থন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু অতি সামান্যই উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বীয় হীনাবস্থায় তাদৃশ উচ্চ ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা অনধিকার-চেষ্টা বলিয়া সংক্ষেপে প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে এবং কোন বিষয়-কর্ম্মেই তিনি মনঃ-সংযোগ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। নূতন ব্যক্তিবর্গের মধ্যগত হইলে হয় ত চিত্ত অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে পারে মনে করিয়া, তিনি আমাকে সানুনয়ে অনুরোধ করিয়াছেন যে, আমার চেষ্টায় পশ্চিমাঞ্চলে যদি তাঁহার কোন কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত অনুগৃহীত হইবেন। তাঁহার পত্রের শেষাংশ পাঠ করিয়া আমি ভীত হইলাম এবং তাঁহার অনুরোধানুযায়ী চেষ্টা করিতে সঙ্কল্প করিলাম। তিনি আর মুক্তকেশীকে দেখিতে অথবা তাহার কোন সংবাদ শুনিতেও পান নাই। এই সংবাদ লিখিয়াই নিতান্ত সন্দেহজনকভাবে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসা অবধি অপরিচিত লোক অনবরত তাঁহার অনুসরণ করিতেছে এবং কদাচ তাঁহাকে চক্ষু-ছাড়া হইতে দিতেছে না। এই বিষম সন্দেহজনক ব্যবহারের মূল কে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে তিনি অক্ষম; তথাপি দিবারাত্রির মধ্যে এ সন্দেহের কদাচ বিরাম নাই। এই সংবাদ যথার্থই আমাকে শঙ্কাকুল করিল। হয় ত নিরন্তর লীলার চিন্তায় তাঁহার এই মনোবিকার জন্মিয়া থাকিবে। সঙ্গী এবং দৃশ্য-পরিবর্ত্তনে তাঁহার বিশিষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল এবং সেই দিনই আমি আমার পিতৃদেবের কোন কোন পরিচিত বন্ধুকে দেবেন্দ্রবাবুর জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিব স্থির করিলাম।

এই সময়েই রাজাকে লীলা সমস্ত কথা জানাইবে স্থির ছিল। রাজা সংবাদ পাঠাইলেন যে, অদ্য মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে লীলাবতী ও মনোরমা দেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে না।

মধ্যাহ্নকালে যখন লীলা ও আমি রাজার অপেক্ষায় বসিয়া আছি, তখন আমি লীলার মনের ভাব বুঝিবার জন্য বার বার তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। লীলা আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"দিদি, আমার জন্য ভয় করিও না। উমেশবাবুর ন্যায় প্রাচীন বন্ধু, অথবা তোমার ন্যায় স্নেহময়ী ভগ্নীর সহিত কথোপকথন-কালে আমি আত্মবিস্মৃত হই; কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতে পারি; কিন্তু রাজা প্রমোদরঞ্জনের সমীপে সেরূপ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

লীলার কথা আমি বিস্ময় সহকারে শ্রবণ করিলাম। তাহার হৃদয়ের যে এত বল, তাহা এত দিন একত্রাবস্থান, এত অভেদাত্মা আত্মীয়তা সত্ত্বেও আমি জানিতে পারি নাই। অধুনা প্রেম ও অন্তর্যাতনা লীলার সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

ঠিক মধ্যাহ্নকালে রাজা সমাগত হইলেন। তাঁহার বদনের নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাব। লীলা ও আমি নিকটস্থ হইয়া বসিলাম এবং রাজা সম্মুখস্থ টেবিলের পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন। লীলা এবং রাজা এতদুভয়ের মধ্যে রাজাকেই অধিকতর উৎকণ্ঠিত ও বিবর্ণ বলিয়া আমার বোধ হইল। সতত তিনি যেরূপ ভাব দেখাইয়া থাকেন, তদ্রূপ সরল ভাব বজায় রাখিবার নিমিত্ত তিনি প্রথমেই কয়েকটি অনাবশ্যক কথা কহিলেন। তাঁহার স্বরের বিকৃত ভাব এবং নয়নের অস্থির ভাব স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি নিজেও আপনার অপ্রতিভ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, এমত নহে।

রাজার বাক্য সমাপ্ত হইলে তথায় ঘোর নীরবতা উপস্থিত হইল। তাহার পর লীলা বলিতে আরম্ভ করিল,—"রাজা, আমাদের উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন কথা আপনাকে জানাইতে বাসনা করিয়াছি। আমার সহায়তার নিমিত্ত এ স্থলে আমার ভগ্নীরও উপস্থিত থাকা আবশ্যক। আমি এখন যাহা ব্যক্ত করিব, তাহার এক বর্ণও আমার ভগ্নী আমাকে বলিয়া দেন নাই জানিবেন। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কেবলমাত্র আমার আত্ম-চিন্তার ফল। প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ সকল কথা বুঝিয়া রাখেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"

রাজা প্রমোদরঞ্জন সম্মতি-সূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। লীলা আবার বলিতে লাগিল,—"আমি দিদির মুখে শুনিয়াছি, আমাদের সম্ভাবিত বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকট কেবল প্রার্থনা করিলেই হইবে। রাজা, আপনার এই কথা বস্তুতঃই আপনার মহৎ মন ও

উদার স্বভাবের পরিচায়ক। কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, সহসা তাদৃশ প্রার্থনা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

রাজার বদনমণ্ডলে একটু চিন্তা-মৃত্তির চিহ্ন বুঝা গেল। লীলা আবার বলিতে লাগিল,—"আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে আপনি যে আমার পিতৃদেবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমি বিস্মৃত হই নাই। আপনার প্রস্তাবে সম্মতি-প্রদানকালে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, আপনিও তাহা বিস্মৃত হন নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে. আমার পিতার আজ্ঞা ও উপদেশ-বশবর্ত্তী হইয়াই আমি উপস্থিত প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতেছি। পিতাকে আমি দেবতা জ্ঞান করিতাম। পিতা এক্ষণে নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমার শুভাশুভ তিনি বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত ছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাতেই আমারও ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত।"

লীলার স্বর একটু বিকম্পিত হইল। আবার উভয়েই নীরব। কিয়ৎকাল পরে রাজা বলিলেন,—"দেবি, যে বিশ্বাস আমি এত দিন সগৌরবে অধিকার করিয়া আসিতেছি, অধুনা আমি কি তাদৃশ অনুগ্রহের অযোগ্য হইয়াছি?"

লীলা উত্তর দিল,—"আপনার চরিত্রে নিন্দার কার্য্য আমি কিছুই দেখি নাই। আপনি এতাবৎকাল আমার সহিত ধীর ও অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আপনি সর্ব্বপ্রকারে আমার বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র। আরও বিশেষ কথা, যে বিশ্বাস হইতে আমার বিশ্বাস সমুৎপন্ন, আপনি আমার পিতৃদেবের সেই বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। আপনি এমন কিছুই করেন নাই, যাহা উপলক্ষ করিয়া আমি আপনার সহিত সম্ভাবিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা আপনার-প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কথা। আপনার সদ্ব্যবহার, আমার পিতৃদেবের স্মৃতি, আমার স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সকলই আমার পক্ষে বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার বিরোধী। রাজা, বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাধীন—আমার তাহা আয়ত্ত নহে।"

রাজা বলিলেন,—"আমার ইচ্ছাধীন বিবাহ-সম্বন্ধ আমি কেন বিচ্ছিন্ন করিব?"

লীলার নিশ্বাস ঘনবেগে বহিতে লাগিল। তিনি উত্তর দিলেন,—"কেন, তাহা ব্যক্ত করা বড় কঠিন। রাজা, ইতিমধ্যে আমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই গুরুতর পরিবর্ত্তন হেতু আপনার এবং আমার উভয়েরই পক্ষে সম্ভাবিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।"

রাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি টেবিলে হস্তস্থাপন করিয়া অবনত-বদনে ক্ষুব্ধ-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি পরিবর্ত্তন?"

লীলা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিত-স্বরে বলিল,—"আমি শিক্ষা পাইয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করি, নারীহৃদয়ে স্বামীর অবিচলিত প্রেম থাকা আবশ্যক। যখন এই সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়, তখন আমার প্রেমের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল; আমাকে ক্ষমা করিবেন, অধুনা আমার সে অবস্থা নাই।"

লীলার চক্ষু জল-ভারাকুল হইল। রাজা উভয় হস্তে স্বীয় বদন আবরণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে দুঃখ বা ক্রোধ কোন্ ভাবের উদয় হইল, তাহা কে বলিবে? তাহার মনের ভাব না বুঝিয়া ছাড়িব না স্থির করিয়া, আমি বলিলাম,—"রাজা, আমার ভগ্নী যাহা যাহা বলিবার, সমস্তই বলিলেন, এখন আপনি কি বলিবেন? বলুন।"

রাজা মুখের হাত না উঠাইয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আমি তো এত কথা শুনিতে চাহি নাই!"

আমি বিহিত উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে লীলা বলিল,—"আপনি স্থির জানিবেন যে, আমি কোন স্বার্থসাধনোদ্দেশে এত কথা বলি নাই। রাজা, আপনি আমার হৃদয়ের কথা জানিতে পারিয়াছেন; অতঃপর যদি আপনি আমার সহিত বিবাহ-কল্পনা পরিত্যাগ করেন—জানিবেন, তাহার পর আমি আর কোন ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী হইব না; যাবজ্জীবন আমি কুমারী রহিব, ইহা স্থির। আপনার সমীপে আমি মনে মনে অপরাধিনী হইয়াছি। মনের সীমা অতিক্রম করিয়া আমার অপরাধ এক পদও অগ্রসর হয় নাই।"

লীলা ক্ষণেক স্থির হইয়া আবার বলিতে লাগিল,—"আপনার সমক্ষে প্রকারান্তরে যে ব্যক্তির প্রসঙ্গ এই প্রথম ও এই শেষ উল্লেখ করা যাইতেছে, তাঁহার সহিত আমার অথবা আমার সহিত তাঁহার এতৎসংক্রান্ত কোনই মনের কথা চলে নাই—কখন তাদৃশ কথা চলিবারও সম্ভাবনা নাই—ইহজগতে তাঁহার সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাতের কোনই সুযোগ নাই। আমি অন্য যাহা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ

সত্যমূলক, ইহা আপনি স্থির জানিবেন। আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর এই সকল আভ্যন্তরিক রহস্য জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি। তিনি নিজ উদারতাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং এই রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

রাজা বলিলেন,—"দেবীর বাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে আমি সম্পূর্ণ বাধ্য।"

রাজা আরও কথা শুনিবার নিমিত্ত নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

লীলা বলিল,—"আমার যাহা বলিতে বাসনা ছিল, তাহা বলা হইয়াছে; যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই আপনার পক্ষে বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ করা সম্বন্ধে যথেষ্ট কারণ।"

রাজা বলিলেন,—"সুন্দরি, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থায়ী করার পক্ষেই যথেষ্ট কারণ।"

এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিলেন এবং লীলার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

লীলা চমকিয়া উঠিল এবং তাহার অজ্ঞাত-সারে একটা অনুচ্চ বিস্ময়সূচক শব্দ মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সরল ও উচ্চ হৃদয় আজি তাহাকে বিপন্ন করিল। আজি সে যত কথা বলিল, তাহাতে তাহার স্বভাবের পবিত্রতা ও সততা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাজা সেই মহোচ্চ মনের মহোচ্চ ভাব সম্পূর্ণই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন,— "দেবি, আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। অতঃপর বিবাহের আশা পরিত্যাগ করা না করা আমার ইচ্ছা..ন। কিন্তু সুন্দরি, আমি এতাদৃশ হৃদয়-হীন নহি যে, এখনই যে ভুবনমোহিনীর হৃদয়-ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নারীজাতির অলঙ্কার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহাকে স্বেচ্ছায় পরি-ত্যাগ করিব।"

লীলা অবনত বদন উত্তোলন করিয়া বলিল,— "না না। সে যখন বিবাহ হেতু আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, অথচ হৃদয়ের ভালবাসা দিতে পারিবে না, তখন নিশ্চয়ই সে নারী-জাতির মধ্যে যার-পর-নাই অভাগিনী।"

রাজা বলিলেন,—"সেই প্রেম-রত্ন লাভ করাই যদি তাঁহার স্বামীর একমাত্র যত্ন হয়, তাহা হইলে এখনই না হউক, দশ দিন পরেও কি তিনি আপনার স্বামীকে সেই দুর্লভ সম্পত্তি কিয়ৎপরিমাণেও দান করিতে পারিবেন না?"

লীলা বলিল,—"কখনই না। যদি এখনও আপনি বিবাহের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্থির জানিবেন, আমি আপনার বিশ্বস্তা ধর্ম্ম-পত্নী হইতে পারিব, কিন্তু আপনার প্রেমময়ী প্রণয়িনী আমি কখনই হইব না।"

সতেজে, দর্পিতভাবে লীলা এই কথা কয়েকটি বলিল। উৎসাহ হেতু তাহার স্বভাব-সুকুমার কান্তি অদ্য পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিল। সে পরম রমণীয় বদনশ্রী দেখিয়া চিত্ত স্থির করিতে পারে, এমন পুরুষ কে আছে?

রাজা বলিলেন,—"সুন্দরি, আমি আপনার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম সম্ভোগ করিয়াই পরম পরিতৃপ্ত হইব। অন্য কোন কামিনীর নিকট হইতে তাহার পূর্ণ-হৃদয়ের পূর্ণ-প্রেম লাভ করা অপেক্ষা আপনার নিকট হইতে কণিকামাত্র লাভ করাও পরম ভাগ্যের কথা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।"

লীলা সংজ্ঞাহীনার ন্যায় অধোবদনে বসিয়া রহিল। বাক্যসমাপ্তির পর রাজা ধীরে ধীরে গৃহ ত্যাগ করিলেন। লীলার ভাব দেখিয়া তখন কোন কথা কহিতে আমার সাহস হইল না। আমি বাহু দ্বারা সেই দুঃখিনী মর্ম্মপীড়িতা বালিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলাম। কতক্ষণ এইরূপেই রহিলাম। এ অবস্থা নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তখন আমি ধীরে ধীরে লীলাকে সম্বোধন করিলাম; আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া লীলার সংজ্ঞা জন্মিল এবং সে যেন চমকিয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহ দাঁড়াইয়া বলিল,—"দিদি! যাহা ঘটিবে, যথাসম্ভব যত্নে তাহার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। আমার জীবনের আগত-প্রায় পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আমাকে অনেক কঠোর কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইবে এবং অদ্যই তাহার একতম আরব্ধ হইবে।"

কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর হস্তা-ক্ষর-লিখিত যে যে পুস্তক পড়িয়া ছিল, লীলা তৎ-সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একটি পেটিকা-মধ্যে রক্ষা করিল এবং তাহার চাবী বন্ধ করিয়া চাবীটা আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—"যে কিছু দেখিলে তাঁহাকে মনে পড়ে, তৎসমস্তই আমি পরি-ত্যাগ করিব। যেখানে ইচ্ছা তুমি এই চাবী রাখিয়া দাও, আমি আর কখন ইহা চাহিব না।"

আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লীলা আলমারী

হইতে দেবেন্দ্রবাবুর হস্ত-লিখিত একখানি অতি চমৎকার খাতা বাহির করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে সেই খাতাখানি চুম্বন করিল। আমি তখন বিষণ্ণ ও কাতর স্বরে বলিলাম,—"লীলা, লীলা!"

লীলা নিতান্ত বিনীতভাবে বলিল,—"দিদি, এই শেষ—এই স্মৃতি-চিহ্নের সহিত আজ হ'তে আমার চির-বিচ্ছেদ।"

টেবিলের উপর খাতাখানি স্থাপন করিয়া লীলা স্বীয় ঘন-কৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশরাজি উন্মুক্ত করিয়া দিল। সুচিক্কণ কেশমালা বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিল। তাহার পর লীলা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ একগাছি কেশ বাছিয়া লইল এবং সযত্নে তাহা ছেদন করিয়া খাতার প্রথম পত্রে গোল করিয়া আল্‌পিন দ্বারা আঁটিয়া দিল; তাহার পর অবিলম্বে সেই খাতা বন্ধ করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—"দিদি. তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া থাক এবং তিনিও তোমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিনের মধ্যে যদি কখন তিনি তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লিখিও যে, আমি ভাল আছি; আমার দুঃখের কথা কখন তাঁহাকে লিখিও না। আমার জন্য—দিদি, আমার জন্য কখন তাঁহাকে ভাবনাগ্রস্ত করিও না। যদি অগ্রে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আমার কেশ-সংযুক্ত এই খাতাখানি তাঁহাকে প্রদান করিও। ইহ-জগতে যখন আর আমি থাকিব না, তখন এই কেশ যে আমি স্বহস্তে এই পুস্তকে সংলগ্ন করিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে বলিলে কোন দোষ হইবে না। আর দিদি, ইহ-জগতে যে কথা আমি তাঁহাকে নিজ মুখে কখন জানাইতে পারি নাই, সে কথা তখন তুমি তাঁহাকে জানাইও। বলিও, দিদি, আমার একান্ত অনুরোধ, তখন তাঁহাকে বলিও, দিদি, যে, আমি তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভালবাসিতাম।"

নিতান্ত যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীর ন্যায় লীলা শয্যায় পড়িয়া গেল এবং উভয় হস্তে বদনাবৃত করিয়া অবিরল-ধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। আমি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য নানা প্রকার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে বালিকার একটু নিদ্রা আসিল। আমি সেই অবসরে খাতাখানি নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার চক্ষে না পড়ে, এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। শীঘ্রই লীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজার কথা অথবা দেবেন্দ্রবাবুর কথা সে দিন আর উল্লেখ করা হইল না।

১০ই তারিখে প্রাতে লীলাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমি এই ক্লেশ-প্রদ বিষয়ের পুনরায় অবতারণা করিলাম। আমি বলিলাম, "রায় মহাশয়কে আমি জোর করিয়া ও স্পষ্ট করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলি।" আমার কথা শেষ হইতে না হইতে লীলা বলিল,—"না দিদি, তাহাতে কাজ নাই। গত কল্য বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় ছিল। এখন আর কোনমতেই পশ্চাৎপদ হওয়া হইবে না।"

বৈকালে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলাম। বুঝিলাম, লীলার পাণি-গ্রহণ-লালসা তিনি কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। লীলা রাজার হস্তে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া যদি স্বয়ং জোর করিয়া আত্ম-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে শুভ ফল ফলিত। কিন্তু তাহা লীলা পারে নাই—পারিবেও না। কাজেই রাজা হাতে পাইয়া বাসনা সিদ্ধ না করিবেন কেন? আমার মনের যে অসহ্য জ্বালা, তাহা রাজার সমক্ষে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

রাত্রে দেবেন্দ্রবাবুর কর্ম্মের নিমিত্ত দুইখানি অনুরোধপত্র দুই স্থানে লিখিয়া পাঠাইলাম। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার পর দেবেন্দ্রবাবুর ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার উপর আমার যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবুর হিতচেষ্টা করিতে আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল। আমার চেষ্টায় তাঁহার ভাল হইলে পরম সুখী হইব।

১১ই তারিখে রাজা প্রমোদরঞ্জন রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। রায় মহাশয়ের নিকট হইতে আমারও তলব আসিয়াছে। আমি রায় মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বুঝিলাম, এত দিনে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে জানিয়া তিনি বড়ই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এতক্ষণ আমি চুপ করিয়াই ছিলাম। তার পর যখন তিনি রাজার কথা অনুসারে শীঘ্রই বিবাহের দিনটাও স্থির করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, তখন আমার বড় রাগ হইল এবং বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিলাম যে, লীলার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কখনই কোন বিষয় স্থির করা হইবে না। রাজা তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রায় মহাশয় নয়ন মুদিয়া শয়ন করিলেন। বলিলেন,—"বাপ্ রে! এত কি মানুষে সহিতে

পারে? ভাল ভাল, যাহা ভাল হয়, সকলে মিলিয়া বিবেচনা করিয়া কর।"

আমি বলিলাম,—"লীলা স্বয়ং এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে আমি তাহাকে কোন কথাই বলিব না।"

রাজার মুখে বিষাদ-চিহ্ন দেখিলাম। রায় মহাশয় শুইয়া শুইয়া মাথা দুলাইতে লাগিলেন। আমি প্রস্থান করিলাম। গমনকালে রায় মহাশয় বলিলেন,—"সাবধান মনোরমা, যেন ঝনাৎ করিয়া দরজা ঠেলিও না।"

লীলার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। রায় মহাশয় যে আমাকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা লীলা জানিতে পারিয়াছিল। আমাকে দেখিবামাত্র কেন আমাকে রায় মহাশয় ডাকিয়াছিলেন, তাহা লীলা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে সমস্ত কথা জানাইলাম এবং আমার মনের যে ভাব, তাহাও ব্যক্ত করিলাম। লীলার উত্তর শুনিয়া আমি বিরক্ত ও অবাক্ হইলাম। যাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই, লীলা তাহার ব্যবস্থা করিল। লীলা বলিল,—"দিদি, খুড়া মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। আমি তোমাকে এবং সম্পর্কীয় সমস্ত লোককেই অনেক জ্বালাতন করিয়াছি। আর জ্বালাতন করিয়া কাজ নাই। রাজা যাহা স্থির করিবেন, তাহাই হউক।"

আমি বিশেষ আপত্তি করিলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না। লীলা আত্মত্যাগ করিয়াছে—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা সে বিসর্জ্জন করিয়াছে। সে বলিল, -"দিন পিছাইয়া দিলেই কি অশুভ কিছু কম হইবে দিদি? তবে কেন? আমার জীবন আমি বিসর্জ্জন দিয়াছি। কোন ব্যবস্থাতেই আমার আর ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।"

তাহাকে এরূপ আশা-শূন্য, এরূপ ভগ্ন-মনোরথ এবং উৎসাহহীন দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

১২ই তারিখে প্রাতে রাজা আমাকে লীলার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজেই তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইতে হইল। আমরা যখন কথাবার্ত্তা কহিতেছি, সেই সময় লীলা তথায় গমন করিল। বিবাহের দিন স্থির করিবার কথা উঠিলে, লীলা বলিল যে, এ সম্বন্ধে রাজার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাতেই সম্মত। রাজা দয়া করিয়া নিজের ইচ্ছা মনোরমা দিদিকে জানাইবেন। এই কথা বলিয়া লীলা সে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল, সুতরাং রাজারই জয় হইল। বর্ত্তমান বর্ষমধ্যেই বিবাহ হওয়া রাজার অভিপ্রায়। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে আমার কোনই অধিকার নাই। সেই দিন বৈকালের গাড়ীতে রাজা বিবাহের উদ্যোগ ও আয়োজন করিবার নিমিত্ত হুগলীর প্রাসাদে যাত্রা করিলেন। বলিব আর কি? আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে।

১৩ই তারিখে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রাতে স্থির করিলাম, স্থান পরিবর্ত্তন করিলে হয় ত বিশেষ উপকার হইতে পারে। হয় ত অন্য স্থানে নূতন দৃশ্যমধ্যে উপস্থিত হইলে লীলার বর্ত্তমান মানসিক অবসাদ অনেক কমিয়া যাইতে পারে। বিবেচনা করিলাম, বৈদ্যনাথ যাওয়াই ভাল। সেখানে পরিচিত লোকও কয়েক জন আছেন এবং জায়গাও ভাল। আমি বৈদ্যনাথে এক জন পরম আত্মীয়ের সমীপে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পত্র সমাপ্ত হইলে আমি তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া লীলাকে সমস্ত কথা জানাইলাম। ভাবিয়াছিলাম, বুঝি লীলা ইহাতে আপত্তি করিবে। কোথায় আপত্তি! লীলা আপত্তি ও প্রতিবাদ এককালে ভুলিয়া গিয়াছে। বলিল,—"দিদি. তোমার সঙ্গে আমি সর্ব্বত্র যাইতে পারি। স্থানপরিবর্ত্তনে নিশ্চয়ই আমার উপকার হইবে; তোমার যুক্তি ভাল।"

১৪ই তারিখে উমেশবাবুর নিকট পত্র লিখিলাম। বিবাহ ঘটিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। স্থান-পরিবর্ত্তনের কথাও লিখিলাম। বিশেষ কথা কিছুই লিখিলাম না।

১৫ই তারিখে ডাকে আমার নামে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। একখানি বৈদ্যনাথস্থ আত্মীয়ের নিকট হইতে। তাহা আত্মীয়তা ও আনন্দে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পত্র, দেবেন্দ্রবাবুর কর্ম্মের জন্য যে দুই ব্যক্তিকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহারই এক জনের নিকট হইতে। তাঁহার যত্নে দেবেন্দ্রবাবুর একটি কর্ম্ম হইয়াছে। তৃতীয় পত্র দেবেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে। তাঁহার জন্য অনুরোধ করায় তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। কাবুলের যুদ্ধের নিমিত্ত যে সৈন্যদল সজ্জিত হইতেছে, তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া, কলিকাতাস্থ কোন দৈনিক সংবাদপত্রে যুদ্ধের প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে ভারত-ভূমি ত্যাগ করিয়া বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ভয়ানক কর্ম্ম! তাঁহার সঙ্গে ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট হইয়াছে। তিনি যাত্রাকালে আমাকে আবার পত্র লিখিবেন।

বলিয়াছেন। কে জানে, অদৃষ্টে কি আছে? তাঁহার জন্য এ প্রকার কর্ম্মের চেষ্টা করিয়া ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম, তাহা ভগবান্ ভিন্ন আর কে বলিতে পারে?

১৬ই। দ্বারে আসিয়া গাড়ী লাগিল। লীলা এবং আমি আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলাম।

* * * * * *

দেওঘর। (বৈদ্যনাথ)

২৩শে। নূতন স্থানে পূর্ব্ব-পরিচিত কয়েকটি আত্মীয়ের সহিত একত্র অবস্থান হেতু লীলার অনেক উপকার হইল। আরও এক সপ্তাহ কাল এখানে থাকিব স্থির করিলাম। যত দিন ফিরিয়া যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা উপস্থিত না হইবে, তত দিন শক্তিপুরে ফিরিব না সঙ্কল্প করিলাম।

২৪শে। আজিকার ডাকে বড় দুঃখের সংবাদ পাইলাম। গত ২০শে কাবুল যুদ্ধের লোকজন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছে। কাজেই দেবেন্দ্রবাবুও দেশত্যাগ করিয়াছেন। এক জন যথার্থ আত্মীয় ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইলাম; এক জন প্রকৃত বন্ধুকে আজি হইতে আমরা কিছু দিনের জন্য হারাইলাম।

২৫শে। অদ্যকার সংবাদ বড় ভয়ানক। রাজা প্রমোদরঞ্জন কাকা মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন এবং রায় মহাশয় লীলাকে ও আমাকে অবিলম্বে বাটী ফিরিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? তবে কি আমাদের অনুপস্থিতির মধ্যে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আনন্দধাম

আমার আশঙ্কা সত্য। আগামী ২২শে অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন-স্থির হইয়াছে। রাজা প্রমোদরঞ্জন, আমরা বাটী হইতে চলিয়া যাওয়ার পর রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার হুগলীস্থ বাটী মেরামত করিতে হইবে ও অন্যান্য নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিতে হইবে। ঠিক্ কোন্ সময়ে বিবাহ ঘটিবে, তাহা জানিতে না পারিলে এ সকল কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে না। এই পত্রের উত্তরে রায় মহাশয় রাজাকেও বিবাহের দিন-স্থির করিতে অনুরোধ করেন এবং রাজা যে দিন স্থির করিবেন, যাহাতে লীলারও তাহাতেই মত হয়, সে পক্ষে রায় মহাশয়ও চেষ্টা করিবেন বলেন। পত্রপ্রাপ্তিমাত্র রাজা উত্তর লেখেন যে, অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে—২২শেই হউক বা ২৪শেই হউক বা আর যে কোন দিন পাত্রী ও কন্যা-কর্ত্তা মহাশয় স্থির করিবেন, রাজা তাহাতেই সম্মত। পাত্রী তো তথায় উপস্থিত নাই। রায় মহাশয় উত্তর লিখিলেন যে, শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র হইয়া যায়, ততই মঙ্গল; অগ্রহায়ণের ২২শেই ভাল। রাজার নিকট এই কথা লিখিয়া রায় মহাশয় আমাদিগকে বাটী ফিরিতে লিখিলেন।

আমরা বাটী ফিরিয়া আসার পর রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বিবাহের যে দিনস্থির হইয়াছে, তাহাতে লীলাকে সম্মত করাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা। আমি লীলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু কোনক্রমেই তাহার ইচ্ছার বিরোধে তাহাকে উপস্থিত প্রস্তাবে স্বীকৃত করাইতে আমি সম্মত হইলাম না।

অদ্য প্রাতে আমি লীলাকে সমস্ত কথা জানাইলাম। ইদানীং বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে লীলা যেরূপ আত্মত্যাগ-সূচক উদাসীনবৎ ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল, আজি সেরূপ করিতে পারিল না। আজি বালিকা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। বলিল,—"না না—দিদি, এত শীঘ্র যেন না হয়।"

আমি তো তাহাই চাই। তাহার অভিপ্রায় জানিতে না পারায় কোন কথায় আমি স্বয়ং জোর করিতে পারি না। তাহার একটা ইঙ্গিতই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তৎক্ষণাৎ রায় মহাশয়ের নিকট যাইবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলাম। কিন্তু লীলা আমার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া প্রতিবন্ধকতা জন্মাইল।

আমি বলিলাম,—"ছাড়িয়া দেও! এ কি কথা? তোমার কাকা মহাশয় আর রাজা মিলিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহাই কি করিতে হইবে? তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে আমার মনের জ্বালা ঘুচিবে না।"

লীলা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"না দিদি, কোন কথায় কাজ নাই—এখন অসময় হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আর যাইও না।"

আমি বলিলাম,—"না, একটুও অসময় হয় নাই। দিন-স্থিরের ভার আমাদের হস্তেই থাকা আবশ্যক। আমরা এ সম্বন্ধে কাহারও আদেশ শুনিতে বাধ্য নহি।"

এই বলিয়া আমি জোর করিয়া লীলার হস্ত হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইলাম। তখন লীলা উভয় হস্তে আমার কটিবেষ্টন করিয়া বলিল,—"না দিদি, তাহাতে আরও অনিষ্ট হইবে। তোমার সহিত খুড়া মহাশয়ের বিসংবাদ ঘটিবে এবং হয় তো সেই সংবাদ শুনিয়া রাজা আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

আমি বলিলাম,—"বেশ তো, আসুন না কেন রাজা। সে জন্য তুমি নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিবে কেন? আমাকে যাইতে দেও লীলা। এ জ্বালা অসহ্য।"

আমার চক্ষে জল আসিল। লীলা বলিল, "দিদি, তুমি কাঁদিতেছ? তোমার এত সাহস, এত হৃদয়ের বল, আর আজি তুমি কাঁদিতেছ? কেন দিদি, ব্যাকুল হইতেছ? ভাবিয়া দেখ, তুমি সহস্র প্রতিকূল চেষ্টা করিলেও, যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই; কেবল দশ দিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। তাহাতে কি ক্ষতি? কাকা মহাশয়ের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক। আমার কষ্টে যদি সকলের কষ্ট বিদূরিত হয়, তবে তাহাই হইতে দাও। বল দিদি, বিবাহের পর তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না? আর আমি কিছু চাহি না।"

আমি অশ্রু সংবরণ করিয়া ধীরভাবে লীলাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু লীলা আমার কোন যুক্তিই শুনিল না। বিবাহের পরও যে আমি তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না, এ সম্বন্ধে সে আমাকে বারংবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল। তাহার পর সহসা লীলা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে আমার সহানুভূতি ও দুঃখ আর এক নূতন পথে সঞ্চারিত হইল। লীলা জিজ্ঞাসিল,—"দিদি, আমরা যখন দেওঘরে গিয়াছিলাম, তখন তুমি একখানি পত্র পাইয়াছিলে—"

বালিকা বাক্য শেষ করিতে পারিল না; সহসা সে আমার স্কন্ধে আপনার মুখ লুকাইল। তাহার প্রশ্ন কোন্ ব্যক্তির উদ্দেশে লক্ষিত, তাহা তাহার ভাব দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম। ধীরে ধীরে বলিলাম,—"লীলা, আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহজীবনে তোমার মধ্যে তাঁহার প্রসঙ্গ আর কখনই উঠিবে না।"

লীলা তথাপি জিজ্ঞাসিল,—"তুমি তাঁহার পত্র পাইয়াছিলে?"

আমি অগত্যা উত্তর দিলাম,—"হাঁ।"

"তুমি কি পুনরায় তাঁহাকে পত্র লিখিবে?"

কি উত্তর দিব? কোথায় তিনি? তিনি যে আমারই চেষ্টায় সুদূর-প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন, এ কথা লীলাকে জানাইতে আমার সাহস হইল না। বলিলাম,—"মনে কর, আমি তাঁহাকে উত্তর লিখিব।"

লীলার দেহ কাঁপিয়া উঠিল এবং সে সমধিক আগ্রহ সহকারে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিল। তাহার পর নিতান্ত অস্ফুট-স্বরে বলিল, তাঁহাকে আগামী ২২শের কথা জানাইও না। আর দিদি, আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি তাঁহাকে অতঃপর যত পত্র লিখিবে, তাহাতে আমার নাম-মাত্রও কখন উল্লেখ করিও না।"

আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। ভগবান্ জানেন, তখন আমার মনের কি অবস্থা। লীলা আমার নিকট হইতে উঠিয়া একটা জানালা-সন্নিধানে গমন করিয়া আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সেইরূপ অবস্থাতেই বলিল,—"দিদি, তুমি কি এখন কাকা মহাশয়ের ঘরে যাইবে? তাঁহাকে বলিও যে, তাঁহারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি।

আমি প্রস্থান করিলাম। যদি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আমার বাসনার প্রভুতা থাকিত, তাহা হইলে আমি কাকা মহাশয়কে ও রাজাকে এই দণ্ডেই রসাতলে পাঠাইয়া দিতাম। ক্রোধে ও মনস্তাপে আমার মন জর্জ্জরীভূত। রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার আর ইচ্ছা হইল না। আমি ঘোর শব্দ সহকারে তাঁহার প্রকোষ্ঠ-দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম এবং সেই স্থান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"লীলা ২২ শেতেই রাজি আছে।"

আবার সেইরূপ শব্দ সহকারে দ্বার বন্ধ করিলাম; বারংবার এই কঠোর শব্দ শুনিয়া বোধ করি, রায় মহাশয়ের মরণাপন্ন দশা উপস্থিত হইল! তা হউক।

২৮শে। প্রাতে উঠিয়া দেবেন্দ্রবাবুর শেষ পত্র-গুলি আর একবার পাঠ করিলাম। লীলার নিকট দেবেন্দ্রবাবুর দেশত্যাগের সংবাদ ব্যক্ত করি নাই। অতএব চিঠিগুলি রাখিয়া কি ফল? এগুলি কেন নষ্ট করিব না? কাজ কি রাখিয়া? যদি ইহা কখন ঘটনাক্রমে অপর কাহারও হস্তে পড়ে: ইহাতে লীলার সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহা আর

কখন কাহারও চক্ষে পড়া উচিত নহে। এ সকল পত্রে সেই বিষম অপরিজ্ঞেয় আশঙ্কা এবং সন্দেহের কথা আছে, সেই দুই জন অপরিচিত লোক নিয়ত দেবেন্দ্রবাবুর অনুসরণ করিতেছে, এ কথারও উল্লেখ আছে। যে সময় তিনি বিদেশে যাত্রা করেন, সে সময়ে রেলষ্টেশনে, বহুজনতার মধ্যেও সেই অনুসরণকারী ব্যক্তিদ্বয়কে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কোন ব্যক্তি মুক্তকেশীর নাম উচ্চারণ করিয়াছে, এ কথা স্পষ্টই শ্রবণ করিয়াছিলেন,—"এ সকল ব্যাপারের অবশ্যই কোন অর্থ আছে এবং এ সকল কাণ্ড হইতে অবশ্যই কোন ফল পাওয়া যাইবে। মুক্তকেশী-সংক্রান্ত রহস্য এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহ-জীবনে হয় তো কখন আর আমার নয়ন-পথবর্ত্তিনী না হইতে পারে; কিন্তু যদি সে কখন আপনার চক্ষে পড়ে, তাহা হইলে মনোরমা দেবি, আপনি সে সুযোগ কদাচ অবহেলা করিবেন না। আমি আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে এত কথা বলিতেছি। আপনাকে মিনতি করিতেছি, যাহা আপনাকে বলিলাম, তাহা কখনও ভুলিবেন না।" এ সকল তাঁহার নিজ হস্ত-লিখিত শব্দ। দেবেন্দ্রবাবুর কোন কথাই আমার ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমার হস্তে এ সকল পত্র থাকা না থাকা সমানই কথা। যদি আমার পীড়া হয়—যদি আমি মরিয়া যাই—তাহা হইলে এ পত্রগুলি হস্তান্তরে পড়িতে পারে, তাহাতে অনেক আশঙ্কা—অনেক অনিষ্ট। তবে এ সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলি।

পত্র ভস্ম হইয়া গেল। শেষ বিদায়লিপি ছাই হইয়া গৃহমধ্যে উড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্রবাবুর বিষাদময় কাহিনীর কি এই স্থানেই অবসান হইল?

২৯শে। বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য কলিকাতা হইতে জহরৎওয়ালা নানাবিধ জড়াও অলঙ্কার দেখাইতে আসিয়াছিল। কতকগুলি নূতন গহনা লওয়া হইল বটে, কিন্তু লীলা তাহা দেখিলও না, তজ্জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিল না। কিন্তু আজি যদি দেবেন্দ্রবাবু রাজার স্থানীয় হইতেন এবং তাঁহারই সহিত যদি বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকিত, তাহা হইলে লীলা কতই আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত এবং বসন-ভূষণের জন্য না জানি আজি কতই আয়োজন হইত।

৩০শে। প্রতিদিনই আমরা রাজার পত্র পাইতেছি। রাজার শেষ পত্রে জানিলাম, তাঁহার স্বীয় বাসভবন এখন মেরামত হইতেছে এবং অন্ততঃ ছয় মাসের পূর্ব্বে তাহা সম্পন্ন ও ব্যবহার-উপযোগী হইবে না। বিবাহের পর যত দিন ভবন ব্যবহারোপযোগী না হয়, তত দিন রাজা লীলাকে লইয়া হয় পশ্চিম-প্রদেশে নানা সুরম্য স্থানে বেড়াইতে যাইবেন, না হয় তো কলিকাতায় কোন বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিবেন। এ উভয়ের যাহাই হউক, অগত্যা বিবাহের পর কিছুকাল লীলার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, কারণ, লীলা সুস্থির হইয়া স্বামি-ভবনে বাস করিতে আরম্ভ না করিলে তাহার সঙ্গে আমার থাকা ঘটিবে না। দুইটি পরামর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তৎসম্বন্ধে রাজা আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, যখন কিছু দিনের জন্য লীলার সঙ্গে আমার থাকা হইবে না, তখন তাহার কলিকাতায় থাকার অপেক্ষা পশ্চিমে যাওয়াই ভাল। কারণ, তাহাতে তাহার শরীরও ভাল হইবে এবং নানাবিধ মনোরম দৃশ্য-সমূহ দেখিয়া মনেরও প্রফুল্লতা জন্মিবে।

কি ভয়ানক! লীলার বিবাহ—তাহার সহিত বিচ্ছেদ, এ সকলই যেন স্থির হইয়া গিয়াছে। লোকে স্থির-নিশ্চিত বিষয়ের যেরূপ ভাবে আলোচনা করে, আমি তেমনই ভাবে এ প্রসঙ্গ লিখিতে বসিয়াছি। কি নিদারুণ চিন্তা! আর এক মাস অতীত হইতে না হইতে লীলা পর হইয়া যাইবে—আমার লীলা রাজার হইবে। মনে বড় যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কি জানি, মনের কেন এ অবস্থা। এ বিবাহের আলোচনা, যেন লীলার মৃত্যুর আলোচনা।

১লা। বড় যাতনার দিন। ভয়-প্রযুক্ত বিবাহের পর পশ্চিম-প্রদেশে পর্য্যটনের প্রসঙ্গ কল্য রাত্রে লীলার নিকট ব্যক্ত করিতে পারি নাই—আজি তাহা বলিলাম। আমি তাহার সঙ্গে থাকিব মনে করিয়া সরলা বালিকা প্রথমে এ প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন আমি তাহাকে ধীরে ধীরে ও সাবধানতা সহকারে বুঝাইয়া দিলাম যে, বিবাহের পরই কিছু দিন নিয়ত আমি সঙ্গে থাকিলে তাহার স্বামীর সুখের ও আনন্দের অবশ্যই ব্যাঘাত জন্মিবে, কারণ, আমি লীলার যত আত্মীয়, লীলার স্বামীর এখনও তত আত্মীয় নহি। সেরূপ আত্মীয়তা উভয়-পক্ষের সদ্ভাব ও সময়-সাপেক্ষ। এরূপ লোক স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যবর্ত্তিরূপে

নিয়ত উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই নানা প্রকারেই অসুবিধা ঘটিতে পারে। অতএব যাহাতে তাঁহার প্রেমের ও সন্তোষের ব্যাঘাত ঘটে, সে ব্যবস্থা এক্ষণে কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং এ যাত্রায় আমার সঙ্গে থাকা ঘটিবে না। উত্তমরূপে লীলাকে এ কথার যুক্তি ও কারণ বুঝাইয়া দিলাম। নীরবে লীলা সকলই স্বীকার করিল।

২রা। রাজার বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি, সকলই যেন অপ্রীতিকর ভাবের বলিয়াছি। রাজার সম্বন্ধে মনে কোন বিরুদ্ধভাব থাকা নিতান্ত অন্যায়। রাজার সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে মনে এমন ভাব ছিল না তো। কেমন করিয়া এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা এক্ষণে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহার সহিত বিবাহ হওয়ায় লীলার মত ছিল না বলিয়াই কি এরূপ মনের ভাব জন্মিয়াছে? রাজার প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধসংস্কারই কি ইহার কারণ? মুক্তকেশী সম্বন্ধে রাজার নির্দ্দোষিতা-বিষয়ক স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি; তথাপি সেই নামহীন পত্র কি এখনও আমার মনকে সন্দেহাকুল করিয়া রাখিয়াছে? জানি না কি। যাহাই হউক, ইহা স্থির, রাজাকে অন্যায়-রূপে সন্দেহ করা এখন আমার পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজার সম্বন্ধে এরূপ ভাব আর কখন লিপিবদ্ধ করিব না। ছিঃ, আমার এ নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার!

১৬ই। দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। লিখিবার মত বিশেষ কোন ঘটনাই ইতিমধ্যে ঘটে নাই। বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, রাজা কল্য আসিবেন এবং বিবাহ পর্য্যন্ত এখানেই অবস্থান করিবেন। লীলা সমস্ত দিনের মধ্যে আর এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছাড়িতে চাহে না। গত রাত্রে আমাদের উভয়েরই ঘুম হয় নাই। লীলা মধ্য-রাত্রে ধীরে ধীরে আমার শয্যায় উপস্থিত হইল এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"দিদি, শীঘ্রই তো তোমার কাছ-ছাড়া হইতে হইবে; যতক্ষণ সময় আছে, ততক্ষণ আর একবারও তোমার কাছ-ছাড়া হইব না।"

১৭ই। রাজা আজ আসিয়া পৌছিলেন। আমি পূর্ব্বে যেমন মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন ও কাতর বলিয়া বোধ হইল; তথাপি তিনি অতি প্রফুল্লচিত্তের ন্যায় হাস্যালাপ চালাইতে লাগিলেন। লীলা একবারও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতেছে না। আজি দ্বিপ্রহরকালে পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন-সময়ে লীলা আমাকে বলিল,—"দিদি! আমাকে একা থাকিতে দিও না—আমাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিও না। আমি যেন ভাবিতে সময় না পাই, ইহাই আমার অনুরোধ।"

আন্তরিক যাতনা হেতু লীলার ভাব-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন তাহার ভাবী স্বামীর চক্ষে অধিকতর সুন্দর ও সজীবতার লক্ষণ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। লীলা হৃদয়ভাব বিধিমতে প্রচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশে নিয়ত হাস্য-পরিহাস ও অনবরত বাক্যালাপ করিতে লাগিল। রাজা এ সকল ব্যবহার হিত-পরিবর্ত্তনের সূচনা বলিয়া মনে করিলেন।

যাহাই হউক, লীলার ভবিষ্যৎ-স্বামীর কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রবীণতা হইলেও তিনি যে সুপুরুষ, তাহাতে সংশয় করিবার কোনই কারণ নাই। রাজা দেখিতে শুনিতে লোকটি বেশ। আমাদের বিশ্বস্ত আত্মীয় উকীল উমেশবাবুরও এই মত। দোষের মধ্যে রাজা সকল কার্য্যেই কিছু ব্যস্তবাগীশ, আর চাকর-বাকর সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয়ভাষী। এরূপ সামান্য দোষ লক্ষ্য করিবারই যোগ্য নহে। আমি এ দোষ কদাচ লক্ষ্য করিব না। রাজা লোক ভাল, দেখিতেও বেশ। আমি আমার এই মত আজি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

১৮ই। শরীর ও মন বড় অবসন্ন বোধ হওয়ায় আমি অত্য দ্বিপ্রহরকালেই বাটীর বাহিরে একবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। যে পথ দিয়া তারার খামারে যাওয়া যায়, সেই পথেই আমি চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে আমি বিস্ময় সহকারে দেখিতে পাইলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জন এই অসময়ে তারার খামারের দিক্ হইতে বেগে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া আসিতেছেন। আমরা নিকটস্থ হইলে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, তাঁহার এখানে শেষ আগমনের পর তারা মুক্তকেশীর আর কোন সন্ধান পাইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তিনি তারার খামারে গমন করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম,—"তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই, বোধ হয়?"

তিনি বলিলেন,—"কিছুই না, আমার বড়ই ভয় হইতেছে, বুঝি বা আর তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

পরে আমার মুখের দিকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সেই মাষ্টার দেবেন্দ্রবাবুর নিকট কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে কি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"শক্তিপুর হইতে

যাওয়ার পর তিনি মুক্তকেশীকে দেখিতেও পান নাই, তাহার কোন সংবাদও জানেন না।”

রাজা যেন হতাশ-জনিত দুঃখিত অথচ চিন্তা-বিদূরিতভাবে বলিলেন,—“বড়ই দুখের বিষয়। না জানি. অভাগিনী কতই কষ্ট পাইতেছে। তাহাকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য আমি যত যত্ন করিতেছি, সকলই নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।”

এবার তাঁহাকে বস্তুতই কাতর বলিয়া বোধ হইল। আমি তাঁহাকে দুই একটি সান্ত্বনার কথা বলিতে বলিতে বাটী ফিরিলাম। অদ্যকার ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের একটি অপূর্ব্ব ভূষণ সন্দেহ কি? বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে লীলার সহিত পরমানন্দে কালাতিবাহিত না করিয়া, দুঃখিনী মুক্তকেশীর সন্ধানার্থ কষ্ট স্বীকার করিয়া, তিনি তারার খামার পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছেন, ইহা বিশেষ প্রশংসার কথা।

১৯শে। রাজার অক্ষয় গুণ-ভাণ্ডারস্থ একটি গুণ অদ্য আমার চক্ষে পড়িল। বিবাহের পর তাঁহারা পশ্চিম হইতে আসিলে আমি তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার ভবনে একত্রাবস্থান করিব, এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবামাত্র তিনি বলিলেন যে, তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে সেই কথাই বলিয়াছি। আমি যাহাতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত একত্র থাকি, ইহাই তাঁহার অন্তরের বাসনা। তিনি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে আমি যেমন লীলার সঙ্গিনী ছিলাম, বিবাহের পরেও সেইরূপ থাকিলে তিনি আমার নিকট অচ্ছেদ্য ঋণ-জালে আবদ্ধ থাকিবেন এবং অসীম উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। এ কথার এইরূপ অবসান হইলে, বিবাহের পর পশ্চিম-পর্য্যটনকালে কোথায় কোথায় যাওয়া হইবে এবং কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে লীলার আলাপ ঘটিবে, তাহা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজা অনেক বন্ধু-বান্ধবের নাম করিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই প্রায় কলিকাতা অঞ্চলের লোক। সেই এক ব্যক্তি জগদীশনাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রঙ্গমতি দেবীর সহিত লীলার সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তজ্জন্য হয় তো বহুদিনের পারিবারিক অকৌশলের অবসান হইয়া যাইবে মনে করিয়া লীলার বর্ত্তমান বিবাহ শুভঘটনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লীলা জীবিত থাকিতে পিতৃকুলের সম্পত্তির কিঞ্চিন্মাত্র অংশ-লাভেও এক প্রকার হতাশ হইয়া রঙ্গমতি দেবী এ কাল পর্য্যন্ত লীলার সহিত কদাচ আপনার লোকের ন্যায় ব্যবহার করেন নাই। অতঃপর বোধ হয়, আর সে ভাব থাকিবে না। রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের চিরকালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব; সুতরাং তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ের মধ্যেও ভদ্রজনোচিত সদ্ভাবের অবশ্যই অসদ্ভাব ঘটিবে না। রঙ্গমতি দেবী কুমারীকালে বড়ই অহঙ্কৃতা, একজেদা ও দুষ্ট-স্বভাবা ছিলেন। এখন যদি তাঁহার স্বভাব ভাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্বামী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। চৌধুরী মহাশয় লোকটি কেমন, জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। তিনি লীলার স্বামীর পরম বন্ধু। লীলা কিংবা আমি তাঁহাকে কখনই দেখি নাই। শুনিয়াছি, রাজা একবার লাহোরে ডাকাইতের হস্তে পড়িয়া বড় বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময় চৌধুরী মহাশয় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া রাজাকে আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর যখন স্বর্গীয় মেসো মহাশয় রঙ্গমতি দেবীর বিবাহে অন্যায়রূপে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে অতি ধীরভাবে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। লজ্জার কথা সে পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এ ছাড়া চৌধুরী মহাশয়ের আর কোন সংবাদই আমি জানি না। এ দেশে তিনি কখন ফিরিয়া আসিবেন কি না এবং দেখা হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারিব কি না, কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, লীলার স্বামী আমাকে লীলার সহিত একত্রাবস্থান-প্রসঙ্গে সততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি আবার বলিতেছি, তিনি বড় ভাল লোক। কি আশ্চর্য্য, আমি ক্রমেই রাজার মহাস্তাবক হইয়া পড়িতেছি!

২০শে। আমি রাজাকে ঘৃণা করি। তিনি অতি মন্দস্বভাব, করুণা ও সততা-বিরহিত জঘন্য লোক বলিয়া আমি মনে করি। কল্য রাত্রিতে তিনি লীলার কানে কানে কি কথা বলিবামাত্র লীলা বিবর্ণ হইয়া গেল ও কাঁপিতে লাগিল। কথাটা কি, লীলা তাহা আমাকে বলে নাই—কখন বলিবে কি না সন্দেহ। তাঁহার কথায় লীলার যে এত কষ্ট হইল, তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অসভ্য মূর্খ! পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে আমার যেমন শত্রুতাভাব ছিল, আবার

তেমনই হইয়া পড়িল দেখিতেছি। সংক্ষেপতঃ আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি।

২১ শে। এখন মনে হইতেছে, যেন কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া এ বিবাহ ঘটিতে দিবে না। কেন এ আশ্চর্য্য ধারণা জন্মিল, তাহা কে জানে? লীলার ভবিষ্যতের আশঙ্কা হইতেই কি এ বিশ্বাসের উৎপত্তি? অথবা যতই বিবাহ নিকটস্থ হইতেছে, ততই রাজার ব্যস্ততা ও ক্রুদ্ধভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া আমার মনের এরূপ ভাব জন্মিয়াছে? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কত চেষ্টাই করিতেছি, কিছুতেই এ ভাব অন্তরিত হইতেছে না। মনের অগ্য বড়ই বিশৃঙ্খল ভাব। কি লিখিব? যাহা হয় লিখি। চুপ করিয়া ভাবা যায় না।

প্রাতে আমাদের হর্ষে বিষাদ ঘটিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এই বৃদ্ধবয়সে স্বহস্তে অতি পরিশ্রমে লীলার বিবাহ উপলক্ষে দিবার নিমিত্ত একখানি কাপড়ে চমৎকার ফুল কাটিয়াছিলেন। প্রাতে তিনি সেই কাপড় লীলাকে পরিধান করিতে বলিলেন। লীলা তাহা পরিধানান্তে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, মাতৃহীনা লীলা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর পরম স্নেহের ধন। ঠাকুরাণীও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমি স্বয়ং নেত্র-মার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে যাইব, এমন সময়ে রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আমি রায় মহাশয়ের ঘরে গিয়া বসিলে, বিবাহের সময় তিনি কেমন করিয়া শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিবেন, তাহারই ব্যবস্থা, বক্তৃতা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি জ্বালাতনের একশেষ হইলাম। কথার মধ্যে সহস্রবার স্নেহের ধন লীলার উল্লেখ; আর কেবল কেহ যেন না গোল করে, কেহ যেন না চীৎকার করে, কেহ যেন না কাঁদে, আর কোন সংবাদ কোন ক্রমে তাঁহার কাছে যেন না পৌছে, ইহাই তাঁহার অনুরোধ এবং প্রধান পরামর্শ।

দিনটা যে কি গোলে কাটিল, তাহা আর কি বলিব? কলিকাতা হইতে আচার্য্য, গায়ক ও অন্যান্য লোকজন আসিবার গোল, জিনিস-পত্র আনা ও বুঝিয়া লওয়ার গোল, বিদেশ হইতে বন্ধু-বান্ধব আসার গোল ইত্যাদি সহস্র গোলে ভবন পরিপূর্ণ! রাজার ভাব বড় অস্থিরতাময়। তিনি তিলার্দ্ধকালও এক কার্য্যে ও এক স্থানে থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি কখন বাহিরে, কখন ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল গোলযোগের মধ্যে লীলার ও আমার মনের যে অবক্তব্য যাতনাময় অবস্থা, তাহার কথা আর কি বলিব। কল্য প্রাতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইব; সর্ব্বোপরি এই বিবাহ আমাদের উভয়েরই চিরকালের ক্লেশের কারণ হইবে, এই অব্যক্ত চিন্তা আমাদের মনকে নিয়ত পেষিত করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর একবার লীলার শয্যাসন্নিধানে গমন করিলাম। সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বালিকা স্থিরভাবে পড়িয়া আছে। ক্ষীণ আলোক-জ্যোতিঃ তাহার বদনমণ্ডল আলোকিত করিয়াছে। বালিকার মুদিত-নয়ন ভেদ করিয়া অশ্রু-কণা মুক্তাফলের ন্যায় লোচন-প্রান্তে সংলগ্ন রহিয়াছে। কতক্ষণ অতৃপ্ত নয়নে সেই স্নেহ-পুত্তলীকে দেখিলাম; দেখিলাম, তাহার হস্ত-সমীপে তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সেই প্রতিমূর্ত্তি এবং আমার প্রদত্ত একটি পশমের ফুল রহিয়াছে। কতক্ষণই দেখিলাম—আর যেন দেখিতে পারিব না, এই ভাবে কত অপেক্ষাই করিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। ভাবিলাম, আমার প্রাণের লীলা, আজি তোমার অতুল সম্পত্তি, অপরিমেয় রূপরাশি থাকিতে তুমি ইহ-জগতে বান্ধববিহীন। যে এক ব্যক্তি তোমার কল্যাণের জন্য অকাতরে জীবন দান করিতে পারিত, হায়, সে এক্ষণে কোথায়? সুদূরে শত্রু-বেষ্টিত, অনভ্যস্ত, অপরিচিত যুদ্ধক্ষেত্রে। আর তোমার কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নহে—কেবল এই নিঃসহায়া বিধবা অবলা দিন-রাত্রি তোমার ঐ মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। ওঃ! কল্য প্রাতে ঐ ব্যক্তির হস্তে কি দেব-দুর্ল্লভ রত্ন সমর্পিত হইবে! যদি সে তাহা ভুলিয়া যায়—যদি সে তাহার সদ্ব্যবহার না করে—যদি সে তাহার কেশাগ্রও নষ্ট করে—

২২শে অগ্রহায়ণ—বেলা ৮টা। লীলা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াছে। তাহার অদ্যকার অবস্থা এ কয়দিনের অপেক্ষা ভাল। আজি সে পূর্ণভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছে। বেলা ৫টার সময় বিবাহ। লোক-জন আয়োজন করিতে ব্যতিব্যস্ত।

বেলা ১২টা। আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। বরকন্যা প্রস্তুত। আচার্য্য ও প্রচারক মহাশয়েরা উপস্থিত।

বেলা ৪টা। লীলাকে আমি চুম্বন করিলাম, সেও আমাকে চুম্বন করিল। অঞ্চলে তাহার নয়নের অশ্রু-চিহ্ন মুছাইয়া দিলাম। এখনও আমার

মনে হইতেছে, বুঝি বিবাহ হইবে না, অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধক হইবে। কি ভ্রান্তি—কি বাতুলতা! রাজা এত চঞ্চল, এত অস্থির কেন? বিবাহ সুনির্ব্বাহিত হওয়ার বিষয়ে তাঁহারও কি কোন সন্দেহ আছে? থাকিলে নিশ্চয়ই তিনিও ভ্রান্ত। আর এক ঘণ্টা পরে সকলেই স্ব স্ব ভ্রান্তি হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

বেলা ৬টা। সকল আশঙ্কার শেষ হইল। ব্রাহ্ম-মতে রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত লীলাবতীর বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

রাত্রি ৮টা। বরকন্যা চলিয়া গেল। রোদনে আমি অন্ধ হইয়াছি—আর লিখিতে পারি না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

শুক্লবসনা সুন্দরী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীমতী মনোরমা দেবীর দিনলিপির অপরাংশ।

কালিকাপুর—হুগলী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭। ছয় মাস—সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল অতীত হইয়া গেল, লীলার চাঁদমুখ চক্ষে দেখি নাই। আর একটি দিন কাটিলে লীলাকে দেখিতে পাইব। ১২ই সকলে দেশে ফিরিবেন কথা আছে। আর একটি দিন—২৪ ঘণ্টা পরে সত্যই কি লীলাকে দেখিতে পাইব? কতক্ষণে এ দিনটা ফুরাইবে?

সমস্ত শীতটা লীলা ও তাঁহার স্বামী আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করিয়াছেন। গ্রীষ্ম পড়িলে তাঁহারা সিমলা-শৈলে ছিলেন। এক্ষণে বাটী ফিরিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রঙ্গমতি দেবীও আসিতেছেন। ইঁহারা কলিকাতা-সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থান করিবেন কথা আছে। যত দিন স্থান ও বাসা মনোনীত না হয়, তত দিন তাঁহারা রাজার কালিকাপুরস্থ ভবনে বাস করিবেন স্থির হইয়াছে। যাহার ইচ্ছা হয় আসুক, যত লোক ইচ্ছা সঙ্গে আনিয়া রাজা ভবন পরিপূর্ণ করুন, আমার তাহাতে ইষ্টাপত্তি নাই—কেবল লীলা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে ও তাহার সঙ্গে আমি থাকিতে পারিলেই আমি চরিতার্থ হই।

মুঙ্গের হইতে লিখিত লীলার পত্র পাইয়া কল্য আমি শক্তিপুর ত্যাগ করিয়াছি। রাজা দেশে ফিরিয়া কলিকাতায় থাকিবেন কি বাটী আসিবেন, তাহা পূর্ব্বে স্থির ছিল না, এ জন্য আমি পূর্ব্বে আসিতে পারি নাই। লীলার পত্র পাইয়া জানিলাম, দেশভ্রমণে রাজার এত অধিক অর্থব্যয় ঘটিয়াছে যে, কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইবে; সুতরাং কলিকাতায় না গিয়া বাটীতে আসাই তিনি সৎপরামর্শ মনে করিয়াছেন। কলিকাতাতে হউক, আর কালিকাপুরেই হউক, লীলার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইলেই হয়। নানা কারণে কালিকাপুরে পৌছিতে আমার রাত্রি হইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে রাজার বাটী দেখিতে পাইলাম না; মোটামুটি বুঝিলাম, রাজবাটী ভাল নয়। প্রাসাদের চারিদিকে অসংখ্য বড় বড় গাছ বাটীকে ঢাকিয়া বায়ুর চলাচল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে দ্বারবান্ আমাকে দ্বার খুলিয়া দিল এবং যে দাসী আমাকে অভ্যর্থনা করিল, তাহারা লোক মন্দ নহে। অন্যান্য দাস-দাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল না। আমার জন্য যে ঘরটি নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা অতি সুন্দর।

শুনিলাম, কালিকাপুরের রাজবাটী অতি প্রাচীন। তাহার একাংশ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এই রাজবাটী-সংলগ্ন একটি প্রাচীন বিল আছে। তাহার নাম কালিকাসাগর।

১১টা বাজিয়া গেল। চাকর-বাকরের সাড়া-শব্দ ক্রমে থামিয়া গেল; বোধ হয়, তাহারা নিদ্রার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। আমিও কি তাহাই করিব? ঘুমাইব? ঘুম কি মনে

আছে? কালি লীলার মুখখানি দেখিব, তাঁহার সেই মধুমাখা কথা শুনিব, এ আনন্দে ঘুম কি আসিতে পারে? যদি স্ত্রীলোক না হইতাম, তাহা হইলে রাজার অশ্বশালা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া ক্রমশঃ মুঙ্গেরের দিকে ছুটিতাম। কি করিব—অধম স্ত্রীলোক নিন্দার ভয়েই অবসন্ন—সুতরাং সকলই সহ্য করিতে বাধ্য। তবে এখন করিব কি? পড়িব? পুস্তকে মনঃসংযোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে লিখি—দেখি লিখিতে লিখিতে ক্লান্তি ও নিদ্রা আইসে কি না।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁহার এক পত্র পাইয়াছিলাম। সে পত্র অপেক্ষাকৃত সুস্থমনে লিখিত। তাহার পর এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন পত্র পাই নাই। মুক্তকেশীর বিবরণ সেইরূপই তমসাচ্ছন্ন। তাঁহার আত্মীয়া রোহিণী দেবীর কোন সংবাদ পাই নাই। তাঁহারা কোথায় আছেন, আছেন কি না আছেন, তাহা কে বলিবে?

আমাদের পরম বন্ধু উকীল উমেশবাবু বড় পীড়িত। নিয়ত অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম হেতু তিনি বহুদিনাবধি শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে এককালে শ্রম করিতে নিষেধ করেন। অবশেষে নিদারুণ মূর্চ্ছা-রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি এক্ষণে বায়ু-পরিবর্ত্তন ও বিশ্রামের নিমিত্ত দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায়ের অংশীদার এক্ষণে তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং দৈব-নিগ্রহে আপাততঃ এই এক জন পরমাত্মীয়ের সহায়তায় আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

লীলা এবং আমি উভয়েই আনন্দধাম ত্যাগ করায়, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার এক ভগ্নী বাস করেন। ঠাকুরাণী সেই ভগ্নীর আলয়ে বাস করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। লীলাকে ঠাকুরাণী সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। লীলা নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিতেছে, সুতরাং যখন ইচ্ছা আবার তিনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।

যিনি যাহাই বলুন, আমার বোধ হয়, বাটী স্ত্রীলোক-বিহীন হওয়ায় রায় মহাশয় বড়ই খুসী। মুখে যতই দুঃখ প্রকাশ করুন, মনে মনে যে তিনি অপার আনন্দিত, ইহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি সেই প্রাচীন পুস্তক-সমূহ, চিত্রাবলী, গন্ধদ্রব্য ও বালিস-বেষ্টিত হইয়া নির্জ্জন পুরীতে নিষ্কণ্টকে নিদ্রা দিতেছেন আর কারণে ও অকারণে নিরীহ চাকর-চাকরাণীগুলাকে প্রাণপণে খাটাইয়া মারিতেছেন।

যাহার যাহার কথা আমার স্মৃতির প্রধান সহচর, তাহা তো বলিলাম। কিন্তু যে আমার জীবনের জীবন, সেই লীলা এ ছয় মাস কেমন করিয়া কাটাইল, তাহা একবার মনে করিয়া দেখি। এ ছয় মাসকাল লীলার অনেক পত্র পাইয়াছি; কিন্তু জ্ঞাতব্য কোন কথাই সে সকল পত্রে পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি কি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন? বিবাহের দিনে, বিদায়কালে তাহার যে ভাব দেখিয়াছিলাম, এখন কি সে তাহা অপেক্ষা সুখে আছে? আমার প্রত্যেক পত্রেই আমি নানা ভঙ্গীতে এই দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু লীলা কোন পত্রেই ইহার উত্তর দেয় নাই, সে যাহা লিখিয়াছে, তাহা কেবল স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। ক্রমে এই বিবাহ যে তাহার মনের সহিত মিলিয়াছে, বিগত ২২শে অগ্রহায়ণের কথা মনে হইলে সে যে আর কাতর হয় না, এরূপ উক্তি তাহার কোন পত্রেই নাই। পত্রমধ্যে যেখানে রাজার কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, লীলা সেখানে তাঁহাকে মাননীয় বন্ধুরূপে উল্লেখ করিয়াছে; কুত্রাপি তাঁহাকে পরম প্রণয়াস্পদ হৃদয়েশ্বররূপে উল্লেখ করে নাই। বিবাহ হেতু লীলার কোন প্রকার মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইল না। বিবাহের পূর্ব্বে যে লীলা ছিল, বিবাহের পরেও সেই লীলা রহিয়াছে। লীলার স্বামী ও তাঁহার হৃদয়-সখা চৌধুরী মহাশয় উভয়েরই স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে লীলা সমান নির্ব্বাক্। লীলা তাহার পিসী-মা রঙ্গমতি দেবীর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা লিখিয়াছে। পূর্ব্বকালে তিনি যেমন উগ্রস্বভাব ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার প্রকৃতি তেমনই কোমল হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্র লীলার দুর্জ্ঞেয় ও বুদ্ধির অতীত। যতক্ষণ তাঁহাকে আমি স্বয়ং দেখিয়া কোন মত স্থির না করিতেছি, ততক্ষণ লীলা আর তাঁহার চরিত্রের কোন বর্ণনা করিবে না বলিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে লীলার এই সকল উক্তি আমার বড় ভাল বলিয়া বোধ হইল না। লীলা আত্মীয় ও অনাত্মীয় নির্ব্বাচনে বিশেষ নিপুণা বলিয়া আমার জ্ঞান আছে। চৌধুরী মহাশয়ের প্রকৃতি নিশ্চয়ই লীলার সন্তোষজনক নহে। লীলার কথায়, স্বয়ং না দেখিয়াও, চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমারও বড় ভাল অভিপ্রায় জন্মিল না। কিন্তু এখন ধৈর্য্যই

সৎপরামর্শ। কল্য চক্ষুকর্ণের বিবাদের অবসান হইবে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। একবার জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইলাম। চারিদিকে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী যেন পাহাড়শ্রেণীর ন্যায় দেখাইতেছে। দিনে এ রাজভবন না জানি কেমন দেখাইবে।

১২ই। আজকার দিন ভাল। আশার অতীত অনেক নূতন কথা আজি জানিতে পারিলাম। প্রাতে উঠিয়াই রাজভবন দেখিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, বাটী বহুকালের এবং বহুবিস্তৃত। তাহার অনেক শাখা-প্রশাখা—অনেক বৈঠকখানা, অনেক শয়নকক্ষ। ভবনের বহু অংশই অনধিকৃত—লোকবিহীন। একাংশমাত্র সংপ্রতি নবীনা রমণীর অবস্থানের নিমিত্ত সংস্কৃত ও সুসজ্জিত হইয়াছে। তাহারই মধ্যে দুইটি প্রকোষ্ঠ আমার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজার দাস-দাসী ব্যতীত অন্য পরিজন নাই। সুতরাং এই সুবৃহৎ ভবনের অধিকাংশই জনশূন্য। রাজপ্রাসাদের প্রাচীনত্ব ও বহুবিস্তৃতি ব্যতীত তাহার প্রশংসার অন্য কোন কারণ আমার উপলব্ধি হইল না। প্রাতে বাটীর অভ্যন্তরভাগ দর্শন করিলাম, বিকালে ভবন-সন্নিহিত উদ্যানাদি দেখিতে বাহির হইলাম। রাত্রে যাহা যাহা ভাবিয়াছিলাম, দিনে দেখিলাম, তাহা ঠিক—কলিকাপুরের রাজভবনের চারিদিকে গাছের সংখ্যা বড় অধিক। গাছপালা ও বাগানের মধ্য দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটা পথাবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, এক প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি-পরিশূন্য ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলাম। এই ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে একটি প্রায় শুষ্ক বিল—এই বিলের নাম কালিকাসাগর। সহজেই বুঝিতে পারিলাম, এই বিল পূর্ব্বকালে বহুদূর বিস্তৃত ছিল, কালে ক্রমে ক্রমে বুজিয়া গিয়া ক্ষুদ্র হইয়াছে। এই জনহীন স্থানে বহুসংখ্যক ইন্দুর ও ভেকের নিবাস। বিলের এক প্রান্তে একখানি ভগ্ন নৌকা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার এক দিকের ছায়ায় একটি সর্প কুণ্ডলিত হইয়া রহিয়াছে। এক দিকে একটি ক্ষুদ্র ও জীর্ণ দারুময় গৃহ। তন্মধ্যে কয়েকখানি টুল ও একটি টেবিল পড়িয়া আছে। আমি এই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামের জন্য একখানি টুলে উপবেশন করিলাম। তথায় কিয়ৎকালমাত্র অবস্থান করিতে না করিতেই শুনিতে পাইলাম, আসনের নিম্নভাগ হইতে আমার নিশ্বাসের অবিকল প্রতিধ্বনি নির্গত হইতেছে। আমি কখনই সহজে ভীত হই না; কিন্তু অদ্য এই ব্যাপারে আমি নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া 'কে? কে?' বলিয়া বারংবার চীৎকার করিলাম; কোনই উত্তর পাইলাম না। সাহসে ভর করিয়া আসনের নিম্নে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলাম, আমার ভয়ের কারণ—একটি ছোট বিলাতী কুকুর টুলের নিম্নে শুইয়া আছে। আমি তাহাকে বার বার আদর করিয়া ডাকিলাম, সে অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতে লাগিল মাত্র। তখন আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলাম, তাহার শরীরের এক স্থানে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। নিরীহ ক্ষুদ্র প্রাণীর এই যাতনা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। তখন আমি অঞ্চল-বস্ত্র একত্র করিয়া সাবধানতা সহকারে কুকুরটিকে তাহার উপর স্থাপন করিলাম এবং যত্ন সহকারে তাহাকে লইয়া অবিলম্বে গৃহে ফিরিলাম। আমার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আমি দাসীকে ডাকিলাম। যে দাসী আমার আজ্ঞা পালন করিতে আসিল, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং তাহার দয়া-প্রবৃত্তি বড়ই কম। তাহার দ্বারা কোন উপকার বা সাহায্যের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, আমি আর এক জন দাসীর জন্য চীৎকার করিলাম। এবার প্রধানা দাসী বিশেষ বিবেচনা সহকারে একটু দুগ্ধ ও গরম জল লইয়া উপস্থিত হইল। এই দাসী 'গিন্নী ঝি' নামে পরিচিতা। গিন্নী ঝি কুকুরটিকে দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিল এবং বলিল, "গুরুদেব, রক্ষা কর। এ কি! এ যে হরিমতি ঠাকুরাণীর কুকুর দেখিতেছি।"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাহার?"

"হরিমতি ঠাকুরাণী—কেন, আপনি তাঁহাকে জানেন না কি?"

"প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই—তবে আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি বটে! তিনি কি নিকটেই বাস করেন? তিনি তাঁহার কন্যার কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

"না মা, তিনি এখানে সেই সংবাদই জানিতে আসিয়াছিলেন।"

"কবে?"

"এই কালি। তিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার মেয়ের মত আকৃতি-প্রকৃতির একটি স্ত্রীলোককে এ অঞ্চলে কোন স্থানে কেহ কেহ দেখিয়াছে। আমরা এ সংবাদ কিছুই জানি না; গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করা গেল, তাহারাও কিছুই জানে না। সেই হরিমতি ঠাকুরাণীর সঙ্গে এই কুকুরটি আমি দেখিয়াছিলাম। বোধ করি, কোন প্রকারে কুকুরটি তাঁহার কাছ-ছাড়া হওয়ার পর ঘটনাক্রমে কেহ

ইহাকে মারিয়া থাকিবে। মা ঠাক্‌রুণ, আপনি এঁকে কোথায় পাইলেন?"

"বিলের নিকট ভাঙ্গা কাঠের ঘরে।"

"আহা! বোধ করি, কেহ উহাকে গুলী করার পর কষ্টে-সৃষ্টে এ সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আপনি ইহাকে একটু দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করুন, এ বাঁচিবে না—তবু দেখা যাউক।"

"হরিমতি!" নামটি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। কুকুরকে যখন বাঁচাইবার যত্ন করিতেছি, তখন দেবেন্দ্রবাবুর কথা আমার মনে পড়িল। দেবেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন, যদি কখনও মুক্তকেশী আপনার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে আপনি সে সুযোগ কদাচ অবহেলা করিবেন না। কুকুরের ঘটনা উপলক্ষে হরিমতির এ স্থানে আগমন সংবাদ পাওয়া গেল, আবার সে ঘটনা হইতে হয় তো আরও কোন নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যাউক, কত দূর সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "হরিমতি কি নিকটেই থাকেন?"

গিন্নী ঝি উত্তর দিল,—"না মা, তাঁর বাড়ী রামনগর, এখানে থেকে ১০।১২ ক্রোশ দূর।"

"আমার বোধ হয়, তুমি হরিমতিকে অনেক দিনাবধি দেখিতেছ।"

"না মা, আমি জীবনরে মধ্যে কেবল কালি তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমাদের রাজা দয়া করিয়া তাঁহার কন্যার জন্য যত্ন করিয়াছেন, এই উপলক্ষে আমি অনেকবার তাহার নাম শুনিয়াছি। হরিমতির আকৃতি ও প্রকৃতি বেশ ভদ্রলোকের মত। তাঁহার কন্যার এ দিকে আসার কোন সংবাদ আমরা দিতে না পারায় তিনি কেমন এক রকম উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।"

এই প্রসঙ্গই চালাইবার অভিপ্রায়ে আমি বলিলাম,—"হরিমতির বিষয় জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আমি যদি আর একটু অগ্রে আসিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তিনি এখানে অনেকক্ষণ ছিলেন?"

গিন্নী ঝি বলিল,—"হাঁ, অনেকক্ষণ ছিলেন বটে। রাজা কখন্ ফিরিবেন, এই কথা জানিবার জন্য অপর একটি ভদ্রলোক সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। অনুরোধ করিলেন, তিনি যে এখন আসিয়াছিলেন, রাজা তাহা জানিতে না পারেন। এ অনুরোধের অর্থ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার আগমন-সংবাদ লুকাইয়া রাখিবার তাৎপর্য্য কি? আমি বলিলাম,—"বোধ হয়, তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইলে তাঁহার কথা মনে পড়ায়, রাজা হয় ত জ্বালাতন হইয়া উঠিবেন, এই ভয়ে তিনি এত সাবধান হইয়াছিলেন। তিনি কি তাঁহার কন্যার বিষয়ে অধিক কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?"

গিন্নী ঝি উত্তর দিল,—"বড় অল্প। তিনি কেবলই রাজা কোথায় কোথায় বেড়াইতেছেন, রাণী-মা দেখিতে কেমন ইত্যাদি রাজার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কন্যার কোন সন্ধান না পাওয়ায় কাতর না হইয়া তিনি যেন বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। 'তাহার ভরসা আমি ত্যাগ করিয়াছি', কন্যার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়া, তিনি রাজার ও রাণীর কথা আরম্ভ করিলেন। রাণীর সম্বন্ধে তিনি কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেখুন মা, কুকুরটির শেস হইয়া গেল।"

কুকুরটি সহসা মরিয়া গেল। এত শীঘ্র তার জীবলীলা ফুরাইবে, এ কথা আমার মনে হয় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রিটা বড় ক্লেশ-জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একাকী এই প্রকাণ্ড ভবনে কেবল অপরিচিত লোক-বেষ্টিত হইয়া থাকা বড় অসুখদায়ক। কতক্ষণে না জানি লীলা ফিরিবে। তাহাদের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখনও আসিতেছে না। রাত্রি তো আটটা বাজিয়া গেল। কি করি—আমার দিনলিপি পাঠ করি।

রাজভবনে আমার প্রথম দিনেই মৃত্যু দেখিতে না হইলেই ভাল হইত। কুকুরই হউক আর যাহাই হউক, মৃত্যু তো বটেই।

রামনগরে হরিমতির নিবাস। হরিমতির চিঠিখানি এখনও আমার নিকটে রহিয়াছে। সময় ও সুবিধা হইলে আমি এক দিন হরিমতির পত্র সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব। দেখিব, তাঁহার সহিত সাক্ষাতে কি বুঝা যায়। তাঁহার এখানে আগমন-সংবাদ রাজার নিকট লুকাইয়া রাখিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার কন্যা এ অঞ্চলে আইসে নাই বলিয়া গিন্নী ঝির যেরূপ বিশ্বাস, আমার সেরূপ নয়। এ সমস্যার দেবেন্দ্রবাবু না জানি কি মীমাংসা করিতেন? কোথায় দেবেন্দ্র, তোমার উপদেশ ও পরামর্শের অভাব আমি এখনই অনুভব করিতেছি।

এ কি শব্দ? কিসের গোল? এই যে অশ্বের পদধ্বনি—এই যে চাকার ঘর্ঘর শব্দ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৫ই। ফিরিয়া আসার গোলযোগ থামিয়া গিয়াছে। জিনিস-পত্র যেখানে যাহা থাকা উচিত, তাহা ঠিকঠাক রাখা হইয়াছে। লোকজন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। স্বচ্ছন্দভাবে সকলের জীবন-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি কয় দিন লিপি স্পর্শ করিতে সময় পাই নাই। আজি কয় দিনের কথা লিখিব স্থির করিয়াছি।

লীলার সহিত প্রথম সাক্ষাতে যে আনন্দ, লিখিয়া তাহা আর কি বুঝাইব? তখন কথার সময় নহে—কথা তখন হয় নাই। প্রথম আনন্দ-বেগ কথঞ্চিৎ হ্রস্ব হইয়া গেল, তবে কথাবার্ত্তা হইল। আমি দেখিলাম, লীলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; লীলা দেখিল, আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। লীলার পরিবর্ত্তন দ্বিবিধ;—কতকটা শরীরগত, কতকটা চরিত্রগত। প্রথমে শরীর-পরিবর্ত্তনের কথা বলি। লীলার আকৃতি অন্যের চক্ষে এখন হয় তো পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে—বদনশ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমি তাহার বর্ত্তমান আকৃতিতে কি যেন নাই নাই দেখিতে লাগিলাম; কুমারী লীলার যাহা যাহা ছিল, রাণী লীলাবতীতে যেন তাহার কোন কোনটির অভাব দেখিলাম। কুমারীকালে কি ছিল, আর এখনই বা কি নাই, তাহা বুঝান যায় না—ধরাও যায় না; তথাপি আমার চক্ষু যেন বুঝিল, লীলার আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আকৃতির যে পরিবর্ত্তনই হউক,এই কয় মাস অদর্শনের পর আমার প্রাণের লীলা আমার চক্ষে আরও অপূর্ব্ব হইয়াছে।

লীলার চরিত্রগত পরিবর্ত্তনের কথা সহজেই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব। লীলা যত পত্র লিখিয়াছে, কিছুতেই তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা লিখে নাই। ভাবিয়াছিলাম, পত্রে যাহা লিখিতে ইচ্ছা করে নাই, সাক্ষাতে নিশ্চয়ই তাহা বলিবে। সাক্ষাৎ হইল, বিবাহের পর তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, আমি তাহা জানিতে চাহিলাম, লীলা তাহা বলিল না। জীবনে লীলা কোন কথা বা কাজ আমাকে লুকাইতে জানিত না। এখন সে লুকাইতেছে, ইহা অবশ্যই তাহার চরিত্রগত পরিবর্ত্তন। ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্বকালের বালিকার ন্যায় দুই হস্তে আমার মুখ চাপিয়া বলিল,—"না দিদি, সে কথার কোন প্রয়োজন নাই। যখন তুমি এবং আমি মিলিত হইয়াছি, তখন আমরা উভয়েই সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিব সন্দেহ নাই। আমার জীবনের প্রসঙ্গ যত উত্থাপিত না হয়, ততই ভাল।" তাহার পর সহসা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল,—"দিদি, বেশ, বেশ! তোমার সঙ্গে অনেক পরিচিত বন্ধু আসিয়াছে দেখিতেছি। তোমার সেই পুরাতন কাগজের মলাট-লাগান সাদা-কালো-মিশান বই-গুলি আসিয়াছে, আর তোমার সেই সাধের বার্ণিস করা তোরঙ্গটি আসিয়াছে, আর সর্ব্বোপরি তোমার সেই সোহাগ-মাখা গোলগাল মুখখানি আবার সেই আগেকার মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ঠিক যেন আমরা সেই বাটীতে সেই ভাবেই আছি। বেশ হইয়াছে।" তাহার পর বালিকা আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল,—"বল, কখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না?" বালিকা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর উভয় হস্তে আমার হস্তধারণ করিয়া বলিল,—"দিদি, গত কয়েক মাসের মধ্যে তুমি অনেককে পত্র লিখিয়াছ ও অনেকের পত্র পাইয়াছ কি?" আমি বুঝিলাম, লীলার অভিপ্রায় কি; কিন্তু এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিলে অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া বিবেচনায় চুপ করিয়া থাকিলাম। লীলা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি তাঁহার সংবাদ পাইয়াছ কি?" বালিকা আমার হস্ত লইয়া আপনার বদন আবৃত করিল। তাহার পর আবার বলিল,—"তিনি ভাল আছেন, সুখে আছেন তো? তাঁহার কাজকর্ম্ম আছে তো? এখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন কি? আমাকে তিনি ভুলিয়াছেন তো দিদি?"

এ সকল লীলার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। যখন রাজা তাহার সহিত বিবাহের কৃতসঙ্কল্পতা ব্যক্ত করিলেন, তাহার পর লীলা দেবেন্দ্রবাবুর হস্ত-লিখিত পুস্তক আমার হস্তে প্রদানকালে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষ কবে কোথায় চিরকাল সমানভাবে স্বীয় সঙ্কল্প পালন করিতে পারিয়াছে? কবে কোন্ স্ত্রীলোক প্রকৃত প্রেমতুলিকায় চিত্রিত হৃদয়স্থিত চিত্র বিচ্ছিন্ন

করিতে সমর্থ হইয়াছে? পুস্তকে তাদৃশ অমানুষ-বৃত্তান্ত বর্ণিত দেখা যায় বটে, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা পুস্তকোক্তির কি উত্তর প্রদান করে?

আমি তাহাকে কোনরূপ তিরস্কার করিলাম না। এরূপ অবস্থায় কে সহজে জ্বলন্ত হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলিতে পারে? আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমি ইদানীং তাঁহাকে কোন পত্রও লিখি নাই এবং তাঁহার কোন সংবাদও পাই নাই। অতঃপর আমি অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। লীলার সহিত সাক্ষাতে আমি কিয়ৎপরিমাণে মনস্তাপ পাইলাম। প্রথমতঃ, যে লীলার আমার নিকট গোপন করিবার এ কাল পর্য্যন্ত কোন কথাই ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, লীলা বলুক আর নাই বলুক, তাহার কথাবার্ত্তার ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, স্ত্রীর সহিত স্বামীর যেরূপ সহানুভূতি হওয়া আবশ্যক এবং উভয়ের সদ্ভাবের যেরূপ গাঢ়তা হওয়া উচিত, তাহা এ ক্ষেত্রে হয় নাই; তৃতীয়তঃ, যে ভাবেই হউক, সেই আশাহীন মূল প্রণয় লীলার হৃদয়ে এখনও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি; আমার পক্ষে এ সকলই কষ্টজনক সংবাদ। কিন্তু যাহাই হউক, লীলাকে দেখিতে পাইয়া যে আনন্দ জন্মিয়াছে, কোন কষ্টজনক বিষয়ই আর তাহা দূরীভূত করিতে পারিতেছে না। আমি পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করিতেছি।

তাহার পর লীলার স্বামীর কথা। বাটী ফিরিয়া আসার পর হইতেই তাঁহাকে যেন সর্ব্বদাই কিছু ত্যক্ত ও বিরক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার বোধ হয়, তিনি কিছু কৃশ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফিরিয়া আসার পর আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের আলাপটা বড় ভাঙ্গাভাঙ্গি রকম বোধ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, মনোরমা দিদি! ভাল তো? বেশ বেশ।" আমার বোধ হয়, তাঁহার মনে যেন একটা বিরক্তিজনক কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাই তাঁহার এতাদৃশ ব্যবহারের কারণ। বস্তুতঃ বহুকাল বিদেশে অবস্থানের পর বাটীতে ফিরিবামাত্র বিরক্তির কোন কারণ ঘটিলে প্রকৃতিকে স্থির রাখা বড়ই কঠিন কথা। রাজার পক্ষে এরূপ বিরক্তিজনক কারণ যখন ঘটিয়াছিল, তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। রাজবাটী আসিবামাত্র অন্যান্য দাস-দাসী ছাড়া গিন্নী-ঝিও দ্বারসমীপে রাজা ও রাণীকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিল। ইদানীং দুই দশ দিনের মধ্যে কোন লোক তাঁহার সন্ধান করিতে আসিয়াছিল কি না, রাজা দাসদাসীগণকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কখন্ কোথায় আছেন এবং কোন্ সময় ফিরিবেন না ফিরিবেন, গিন্নী-ঝি সমস্ত দাস-দাসীর মধ্যে বুদ্ধিমতী বলিয়া তাহার নিকটেই এ সকল সংবাদ পাঠাইতেন। সুতরাং কেহ কোন বিষয় জানিতে আসিলে, অন্য ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গিন্নী-ঝির নিকট লইয়া যাইত। সুতরাং এক্ষণে সকলেই রাজার প্রশ্ন শুনিয়া গিন্নী-ঝির মুখের দিকে চাহিল। গিন্নী-ঝি রাজাকে জানাইল যে, এক ব্যক্তি রাজা কবে ফিরিয়া আসিবেন, তাহা জানিতে আসিয়াছিল। রাজা সে ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সে নাম বলে নাই; সুতরাং গিন্নী-ঝি তাহা বলিতে পারিল না। লোকটি কি ব্যবসায়ী? তাহাও সে বলে নাই। লোকটি দেখিতে কেমন? গিন্নী-ঝি তাহার আকৃতির বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু যাহা বলিল, তাহাতে রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাজা বড়ই বিরক্ত হইলেন, মাটীতে বারংবার পদাঘাত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সামান্য ঘটনায় কেন যে তিনি এত বিরক্ত হইলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি যে বিশেষ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন, তাহার আর ভুল নাই। তাঁহার এই বিরক্তিভাব যত দিন বিদূরিত না হয়, তত দিন তাঁহার সম্বন্ধে কোন একটা পাকাপাকি মত স্থির না করাই ভাল এবং আমি তাহা করিব না।

তাহার পর তাঁহাদের দুই জন সঙ্গী—জগদীশনাথ চৌধুরী ও রঙ্গমতি দেবীর কথা। আগে রঙ্গমতি দেবীর কথই বলি। লীলা যে বলিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে সেই তিনি, ইহা আমি সহজে বুঝিতে পারিব না, এ কথা ঠিক। বিবাহ হেতু চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর স্বভাবের যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কোন স্ত্রীলোকের স্বভাবের এমন পরিবর্ত্তন হইতে আমি আর কখন দেখি নাই।

রঙ্গমতি দেবীর অনেক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল; বিবাহ হইয়াছেও.অনেক দিন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩৬ বৎসর। যখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে দুই চারিবার দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সে সময়ের ভাব আমার অনেক মনে আছে, অন্যান্য লোকের নিকটেও অনেক শুনিয়াছি। তিনি সে সময় বড় ভয়ানক লোক ছিলেন; তাঁহাকে তখন

কেহই ভালবাসিত না। রূপের গর্ব্বে ও ধনের গর্ব্বে তিনি তখন ফাটিয়া পড়িতেন। এখন তাঁহার আশ্চর্য্য স্বভাব দেখিলাম; শান্ত, শিষ্ট, নিরহঙ্কৃত —তিনি এখন একটি চমৎকার লোক। মানুষের যে এরূপ পরিবর্ত্তন সহজে হয়, ইহা আমার কখনও জ্ঞান ছিল না। বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর ক্ষমতায় রঙ্গমতি দেবীর এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর নাই। উগ্রতা, ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা সে সকল তো দূরের কথা—তিনি এখন সর্ব্বক্ষণ তদ্গতচিত্তে স্বামিসেবায় নিরত। স্বামীর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত না হইলেও তিনি স্বামীর প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করিতে নিযুক্ত। স্বামীর বস্ত্রাদি ঠিক করিয়া রাখা, সর্ব্বদা স্বামীর খাদ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার ব্রত হইয়াছে। যখন কোন কার্য্য না থাকে, তখন তিনি নিরন্তর স্বামীর বদনের প্রতি চাহিয়া কালাতিবাহিত করেন। অন্য কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে বড় মিশিতে দেখি না। নিতান্ত হাস্যের অবসর উপস্থিত হইলে তাঁহার অধরের এক প্রান্ত একটু কুঞ্চিত হয় মাত্র। তাঁহার নয়নের ভাব সর্ব্বদাই প্রশান্ত, কিন্তু যখন তাঁহার স্বামী—কোন ঝিই হউক বা যে কেহ হউক—অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত একটু ভালমুখে বা হাসিমুখে কথা কহেন, তখন রঙ্গমতি দেবীর সেই প্রশান্ত নয়ন ঈর্ষায় বাঘিনীর ন্যায় ভাব ধারণ করে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাঁহার প্রশান্ত ভাবের কোন বিপর্য্যয় লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিয়া লওয়া অসাধ্য—তাঁহার মন সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়। দুই একবার বাক্য-কথন-কালে তাঁহার স্বরের পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং এক আধবার তাঁহার ওষ্ঠাধরের একটু ভাবান্তর দেখিয়াছি। অনুমান করিয়াছি, হয় তো তাঁহার বাহ্য প্রশান্তভাব হৃদয়স্থিত দারুণ অসৌজন্যের আবরণ মাত্র; হয় তো এই আবরণমধ্যে সর্ব্বনাশসাধিনী মনোবৃত্তি লুকাইয়া আছে। যাহাই হউক, বাহ্যতঃ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর কিছু দিন পরীক্ষা করিলেই অবশ্যই এই রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

সেই যাদুকর—রঙ্গমতির সেই বাঙ্গাল স্বামী, যিনি এই স্ত্রীকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কেমন লোক? তিনি অসাধারণ লোক। তিনি সকলকেই বশ করিতে সমর্থ। তিনি যদি কোন বাঘিনীকে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে সে-ও এমনই বশ হইত। যদি আমাকে বিবাহ করিতেন, আমিও অমনই করিয়া তাঁহার তামাক সাজিতাম, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দিন কাটাইতাম এবং তাঁহার ইচ্ছার দাসী হইয়া থাকিতাম।

আমার এই গুপ্ত দিনলিপির পৃষ্ঠায় লিখিতেও শঙ্কা হইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয়কে আমার ভাল লোক বলিয়া বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে। দুইটি দিনমাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি, অথচ এই অল্পবয়সের মধ্যেই তাঁহার সম্বন্ধে আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে। কেমন করিয়া এ আশ্চর্য্য ভাব জন্মিল, তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর।

বিস্ময়ের বিষয়, আমি এখনও মনশ্চক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের মূর্ত্তি সুন্দররূপে দেখিতে পাইতেছি। লীলা ব্যতীত চক্ষুসমক্ষে অনুপস্থিত আর কোন ব্যক্তির মূর্ত্তি এমন সুন্দররূপে দেখিতে পাই নাই তো? রায় মহাশয় আছেন, দেবেন্দ্রবাবু আছেন, কাহারও মূর্ত্তি এমন ভাবে কল্পনা-সমক্ষে কখনই উপস্থিত হয় না তো? চৌধুরী মহাশয়ের কথা আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, কল্য তাঁহার যে কথা শুনিয়াছি, আজি এখনও তাহা শুনিতেছি। কেমন করিয়া তাঁহার কথা বর্ণনা করিব? তাঁহার আকৃতিতে, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কথোপকথনে ও হাস্যপরিহাসে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা অন্যের হইলে আমি বিশেষরূপ নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতাম। তাঁহার সম্বন্ধে সে সকল বিষয়ে আমি নিন্দা বা বিদ্রূপ করিতে পারিতেছি না কেন?

তিনি বেজায় মোটা। ইহার পূর্ব্বে চিরকাল আমি স্থূলকায় ব্যক্তিদিগকে বিশেষ অপ্রীতির চক্ষে দেখিতাম। আমার চিরকালের বিশ্বাস, স্থূলকায় ব্যক্তি প্রায়ই নিষ্ঠুর, নীচাশয়, পাপাসক্ত এবং ঘৃণার্হ, এরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও আজি অতি স্থূল জগদীশনাথ চৌধুরীর মূর্ত্তি আমার চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। বস্তুতঃই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার মুখ দেখিয়া কি তাঁহার সম্বন্ধে আমার এরূপ মত জন্মিয়াছে? তাঁহার মুখশ্রী বড়ই সুন্দর বটে। এই পঞ্চান্ন বর্ষ বয়সেও সে মুখে একটি কালিমা পড়ে নাই, একটি কেশ, একগাছি গুম্ফ শাদা হয় নাই—নবীন যুবকের ন্যায় সেই উজ্জ্বল বদন শোভার সামগ্রী সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার নয়নযুগলই পরম রমণীয়। তাহা অপরিজ্ঞেয় রহস্যের নিকেতন। আমি তাঁহার সেই নয়নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ চাহিয়া দেখিয়া থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে এক অপূর্ব্বভাবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার বর্ণ, তাঁহার গঠন

সকলই আশ্চর্য্য। আপাততঃ যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে তাঁহার নয়নদ্বয়ই অনন্যসাধারণ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং হয় ত সেই জন্যই আমার চক্ষে তাঁহার মূর্ত্তি ভাল লাগিয়াছে।

তাঁহার কথাবার্ত্তায় পূর্ব্ববঙ্গের গন্ধও নাই, ইহাও তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা। স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার, বিনীতভাব ও আগ্রহ-সহকারে স্ত্রীলোকের কথায় কর্ণপাত করা সকলই বড়ই সুন্দর এবং নারী-হৃদয়ে অনুরাগ-উদ্দীপক।

চৌধুরী মহাশয়ের কার্য্য-কলাপ অনেক স্থলেই বিস্ময়জনক। তিনি এত স্থূলকায়, তথাপি তাঁহার গতিবিধি বালকের ন্যায় দ্রুত ও সহজ। তাঁহার সকল কার্য্যই কোমলতাপূর্ণ ও মধুরতাময়। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুর বড়ই অনুরাগী। তাঁহার অনেকগুলি পালিত প্রাণী আছে; তাহার অধিকাংশই তিনি মুঙ্গেরে ফেলিয়া আসিয়াছেন—কেবল একটা কাকাতুয়া, এক খাঁচা মনুয়া ও কতকগুলা বিলাতী ইঁদুর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। এই সকল প্রাণীর সমস্ত সেবা-শুশ্রূষা তিনি স্বহস্তেই করিয়া থাকেন। ইহারাও আশ্চর্য্য পোষ মানিয়াছে। কাকাতুয়াটা বড় দুষ্ট, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহাকে বড় ভালবাসে। তিনি যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেন, তখন সে তাঁহার গায়ে বসে, তাঁহার মুখে আপনার মুখ ঘসিতে থাকে এবং বড়ই প্রীতি প্রকাশ করে। যখন মনুয়ার খাঁচা খুলিয়া দেন, তখন তাহারা মহানন্দে তাঁহার সুবিস্তৃত দেহের উপর উড়িয়া আইসে এবং তিনি অঙ্গুলী বিস্তার করিয়া ধরিলে তাহারা একে একে সেই অঙ্গুলীর উপর নাচিয়া বেড়ায়; তিনি আজ্ঞা করিলে তাহারা শব্দ করিতে থাকে এবং নিষেধ করিলে নিস্তব্ধ হয়। আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তাঁহার ইঁদুরগুলি তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত সুরঞ্জিত অতি সুন্দর মন্দিরাকৃতি এক তারের খাঁচায় বাস করে। ছাড়িয়া দিলে তাহারা তাঁহার জামার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কখন বা তাঁহার মাথায় আশ্রয় লয়। তিনি অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর অপেক্ষা এই ইঁদুরগুলিকে বেশী ভাল বাসেন; তাহাদিগকে চুম্বন করেন এবং সতত তাহাদিগকে নানা প্রকার আদরের কথা বলিয়া সোহাগ করেন। অন্য লোক হইলে হয় তো এ সকল কার্য্য নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া লজ্জিত হইত। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় কাহারও বিদ্রূপ বা তিরস্কারে কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে ইঁদুর ও পাখীকে সোহাগ করিয়া দিন কাটাইয়া আসিতেছেন।

পাখী ও ইঁদুর লইয়া যে চৌধুরী মহাশয় এত ব্যস্ত, কোন স্থানে আবশ্যক হইলে ও প্রসঙ্গ উঠিলে, তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেও সমর্থ। সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় তাঁহার অপরিজ্ঞাত পুস্তক অতি বিরল। যাবতীয় সভ্য-সমাজের প্রথা তাঁহার অভ্যস্ত এবং এই জন্যই সকল সভাতেই অনতিদীর্ঘকালমধ্যে তিনি স্বীয় আধিপত্য-স্থাপনে সমর্থ। রাজার মুখে শুনিয়াছি, এই পাখী-যাদুকর, ইঁদুর-বশকারক, খাঁচা-নিৰ্ম্মাণকারী ব্যক্তি রসায়ন-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত এবং তৎসম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। মৃত্যুর পর মানব-দেহ অনন্তকালের নিমিত্ত প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া রাখা ঐ সকল আবিষ্ক্রিয়ার অন্যতম। এই নারী-জনোচিত কোমল ও কাতর-স্বভাব ব্যক্তি অদ্য প্রাতে রাজার আস্তাবলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজার একটি অতি দুর্দ্দান্ত পাহাড়ী কুকুর সেই আস্তাবলে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তফাতে রাখা হইত। চৌধুরী মহাশয় যখন সেখানে গিয়াছিলেন, তখন আমি ও রঙ্গমতি দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কুকুর-রক্ষক বলিল,—"খবরদার মহাশয়! বড় কাছে যাইবেন না। কুকুরটা তাড়াইয়া কামড়ায়।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"লোকে ভয় করে বলিয়া ও ঐরূপ করে। দেখা যাক্, আমাকে তাড়াইয়া কামড়ায় কি না।" এই বলিয়া দশ মিনিট পূর্ব্বে যে আঙ্গুলের উপর মনুয়া পাখী নাচিতেছিল, সেই অঙ্গুলি এই ব্যাঘ্রবৎ ভয়ানক পশুর মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং তীক্ষ্ণভাবে তাহার চক্ষুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "হতভাগ্য কুকুর, যে তোমার ভয়ে ভীত, তাহারই কাছে তোমার যত বলবিক্রম। যে তোমার প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া, রক্ত-লোলুপ মুখ দেখিয়া, তোমার ভয়ানক দাঁত দেখিয়া বড় ভয় পায়, তুমি তাহারই সর্ব্বনাশ করিতে বড় মজবুত। কিন্তু আমি তোমাকে ভ্রূক্ষেপও করি না, এই জন্য তুমি আমার মুখের প্রতি চাহিতেও সাহস করিতেছ না। আমার এই মোটা গলায় একবার দাঁত ফুটাইয়া দেও না দেখি—হোঃ হোঃ; তোমার পোড়ামুখ—ভীরু, কাপুরুষ!" এই বলিয়া চৌধুরী মহাশয় সেই ভয়ানক বন্য ও অতি হিংস্র কুকুরের নিকট আপনার গলা পাতিয়া ধরিলেন। তাহার পর উঠিয়া বলিলেন,—"ও হো, আমার ভাল

জামাটায় হতভাগ্য কুকুরের লাল লাগিয়া গিয়াছে। চৌধুরী নানা প্রকার কাপড় ও পরিচ্ছদের বড় অনুরাগী। ইহাও তাঁহার আর একটা ছেলেমানুষীর পরিচয়।

তিনি যত দিন এইখানে থাকিবেন, তত দিন যে আমাদের সহিত সদ্ভাব সহকারে কাল কাটাইবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। লীলা আমাকে বলিয়াছিল যে, সে তাঁহাকে দেখিতে পারে না। চৌধুরী মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লীলা বড় ফুল ভালবাসে। যখন লীলা একটা ফুলের সন্ধান করে, তখন চৌধুরী মহাশয় তাহা হস্তে লইয়া উপস্থিত। আরও আশ্চর্য্য—তিনি যেমন তোড়াটি রাণীর হস্তে দেন, অবিকল সেইরূপ আর একটি তোড়া স্বীয় নির্ব্বাক্ অথচ হিংসা-জর্জ্জরিত পত্নীর হস্তে দিয়া তাঁহাকেও শান্ত করেন। এ সকলই সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকে। প্রকাশ্যরূপে তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার বিষয় বটে। তিনি সতত তাঁহাকে 'দেবি,' 'প্রিয়তমে' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং বিহিতবিধানে প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। যে প্রতাপশালী লৌহদণ্ডের প্রভাবে এই দুর্দ্দমনীয় রমণীকে তিনি এরূপ সুশাসনের অধীনে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার কার্য্য-প্রণালী অবশ্যই সাধারণ নয়নের বহির্ভূত।

আমার সহিত তাঁহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোষামোদের দ্বারা তিনি আমার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে আমি যখন উপস্থিত না থাকি, তখন এ কথা আমি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু যেই আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হই, তখনই আবার তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যজালে পড়ি—সকলই ভুলিয়া যাই। পাহাড়ী কুকুর, রঙ্গমতি দেবী, লীলা, রাজা সকলকেই তিনি যেমন চালাইয়া লইয়া বেড়ান, আমাকেও ঠিক তেমনই চালাইয়া থাকেন। রাজাকে তিনি নাম ধরিয়া ডাকেন। রাজা যতই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, সমস্তই তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দেন। "প্রমোদ! তোমার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করি।" "প্রমোদ, তোমার রহস্যে আমি সন্তুষ্ট।" এইরূপ বাক্যে সংস্বভাব পিতা উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সহিত যেরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, তিনি রাজার সহিত সেইরূপভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যক্তির অতীত ইতিহাস জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল, এ জন্য আমি রাজাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজা হয় তো বিশেষ সংবাদ জানেন না, হয় তো আমাকে সমস্ত কথা বলিবেন না। লাহোরে যেরূপে রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাহার পর হইতে তাঁহারা উভয়ে নিরন্তর একত্র নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কখনই গমন করেন নাই। চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নিবাস-ভূমির সীমায় প্রবেশ করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক; জানি না, ইহার কারণ কি? কিন্তু স্বকীয় প্রদেশস্থ লোক কোথায় কে আছে, তাহা জানিতে এবং তাহার সন্ধান লইতে তিনি সততই ব্যস্ত। তিনি যে দিন প্রথমে আসিয়া পৌছিলেন, সে দিন আমাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, গ্রামসন্নিধানে পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক বাস করে কি না? তাঁহার জীবনে অবশ্যই কোন গুরুতর রহস্য নিহিত আছে। সে রহস্য কি, তাহা আমার সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়।

চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছি, মোট কথা, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, তাঁহাকে আমার কতকটা ভাল লাগিয়াছে। রাজার উপর তাহার যেরূপ আধিপত্য, আমার উপরও তদ্রূপ। রাজা যত তামাসাই করুণ আর শক্ত কথাই বলুন, তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক বিরক্ত করিতে যে বিশেষ শঙ্কিত হন, তাহা আমি বেশ জানি। আমিও কোন অংশে কদাপি চৌধুরী মহাশয়কে শত্রু করিতে চাহি না। তাঁহাকে আমি ভয় করি, না ভালবাসি বলিয়া আমার এ ভাব? কে জানে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। এ কয়দিন কেবল নিজের মনের ভাব ভিন্ন আর কিছু লিখিবার ছিল না; আজি লিখিবার মত একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আজি এক জন লোক আসিয়াছেন, তিনি লীলারও অপরিচিত, আমারও অপরিচিত এবং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাজা তাঁহার আসিবার কোন সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময় সর্দ্দার-খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল, "খোদাবন্দ, মণিবাবু আসিয়াছেন, তিনি এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

রাজা চমকিয়া উঠিলেন এবং খানসামার মুখের দিকে যুগপৎ ক্রোধ ও ভীতি-সহকৃত দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কে? মণিবাবু?"

"হাঁ হুজুর, মণিবাবু—কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।"

"কোথায় আছেন ?"

"খোদাবন্দ, নীচে, কেতাবঘরে ."

শেষ উত্তর শুনিবামাত্র তিনি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া এবং কাহার দিকে লক্ষ না করিয়া বেগে সেই দিকে প্রস্থান করিলেন।

লীলা সভয়ে ও আগ্রহের সহিত আমার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"মণিবাবু কে দিদি!"

আমি বলিলাম,—"আমি তাহার কিছুই তো জানি না।"

জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় কোন দিকে মন না দিয়া ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার দুরন্ত কাকাতুয়ার সহিত খেলা করিতেছিলেন; কাকাতুয়াটা তাঁহার স্কন্ধদেশে বসিয়া তদীয় পরিপুষ্ট গ্রীবায় স্বীয় চঞ্চু বুলাইতেছিল; তিনি এইরূপ ভাবে আমাদের সমীপস্থ হইয়া প্রশান্তভাবে বলিলেন,—"মণিবাবু রাজার উকীল।"

লীলা যাহা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার উত্তর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু উত্তরটা সন্তোষজনক হইল না। যদি উকীল মহাশয় মক্কেলের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই বটে; কিন্তু যদি তিনি আহ্বানে আপনার কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এতদুর আসিয়া থাকেন এবং তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গৃহস্বামী যখন এতাদৃশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি যে জন্য আসিয়াছেন, তাহা সহজ ও সামান্য কথা নহে। লীলা ও আমি উদ্বিগ্নভাবে বহুক্ষণ রাজার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। রাজার প্রত্যাগমনের কোন লক্ষণই না দেখিতে পাইয়া, আমরা উভয়েই অগত্যা গাত্রোত্থান করিলাম। চৌধুরী মহাশয় তখন ঘরের অন্য দিকে দাঁড়াইয়া আপন মনে কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়াইতেছিলেন। আমরা গৃহত্যাগ করিতেছি বুঝিতে পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের দরজা টানিয়া ধরিলেন। প্রথমে রঙ্গমতি ঠাকুরাণী ও লীলা বাহির হইলেন। আমিও বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে চৌধুরী মহাশয় আমার মনের কথা টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"হাঁ, মনোরমা দেবি, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে।"

আমি মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম বটে, কিন্তু মুখে তো কোন কথাই ব্যক্ত করি নাই। আমি চৌধুরী মহাশয়ের কথায় একটা উত্তর দিব মনে করিলাম, কিন্তু তখনই কাকাতুয়াটা এমন বিকট ও কর্কশভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল যে, আমার সর্ব্বাঙ্গ কিলবিল করিয়া উঠিল এবং আমি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিলাম। লীলার সহিত মিলিত হইলাম, তাহার মনের অবস্থা অবিকল আমারই মত। চৌধুরী মহাশয় আমার মনের ভাব টানিয়া যে যে কথা বলিয়াছিলেন, লীলাও এখন তাহারই প্রতিধ্বনি করিল। সে-ও আমাকে নির্জ্জনে বলিল যে, তাহার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে। লীলা আপনার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল, আমি নিজের ঘরে বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টা দুই পরে একবার বাগানে বেড়াইতে ইচ্ছা হওয়ায় একা বাহির হইলাম। সিঁড়ি হইতে নামিব, এমন সময়ে রাজা এবং মণিবাবু কেতাবঘর হইতে বাহির হইলেন বুঝিতে পারিলাম। ভাবিলাম, তাঁহারা অবশ্যই কোন দৃঢ় পরামর্শে নিযুক্ত আছেন, এ সময়ে তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইয়া বিরক্তি উৎপাদন করা ভাল নয়, অতএব তাঁহারা যতক্ষণ মাঝের কামরা হইতে চলিয়া না যান, ততক্ষণ আমি নামিব না। যদিও তাঁহারা বিশেষ সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের একটা কথা বেশ স্পষ্টই আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি শুনিতে পাইলাম, উকীল বলিতেছেন,—"আপনি মন ঠিক করুন রাজা। সমস্ত ব্যাপারই আপনার রাণীর উপর নির্ভর করিতেছে।"

আমি নিজগৃহে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এক জন অপরিচিত ব্যক্তির মুখে রাজার রাণী, সুতরাং লীলার উল্লেখ শুনিয়া আর নড়িতে পারিলাম না। আমি স্বীকার করি, এরূপে গোপনে অপরের কথোপকথন শ্রবণ করা নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি কেন, সমগ্র নারীজাতির মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি সূক্ষ্ম ন্যায়ের প্ররোচনায় স্বীয় জীবনসর্ব্বস্বের স্বার্থানুসন্ধানে অন্ধ হইয়া থাকিতে পারেন ? অন্যে পারেন পারুন, আমি তাহা পারিলাম না, কখন পারিবও না এবং আবশ্যক হইলে এতদপেক্ষা অন্যায় উপায়েও এরূপ কথাবার্ত্তা না শুনিয়া ক্ষান্ত হইব না। উৎকর্ণ হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। উকীল বলিতে লাগিলেন,—"বুঝিলেন, রাজা, রাণীকে এক-জন—আর আপনি যদি বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করিতে চাহেন, তাহা হইলে না হয় দুই জন—সাক্ষীর সম্মুখে উহাতে নামসহি করিতে হইবে; আর তাহা

যে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আপনি ইহা করিতে পারেন, তাহা হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে এবং ভাবনার আর কোনই কারণ থাকিবে না, কিন্তু যদি –"

রাজা রাগত স্বরে বাধা দিয়া বলিলেন,—"কিন্তু যদি কি ? যদি ইহা করিতেই হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ইহা করা হইবে। তোমাকে এ কথা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি মণিবাবু।"

উকীল বলিলেন,—"ঠিক কথা, তবে কি জানেন রাজা, সকল বিষয়েরই ছুদিক্ আছে। আমরা উকীল মানুষ, আমরা কোন কথাই ছুদিক্ বিচার না করিয়া ছাড়িতে পারি না। সেই জন্যই বলিতেছি যে, যদিই কোন বিশেষ কারণে এ ব্যবস্থামত কার্য্য না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে বিশেষ চেষ্টা-চরিত্র করিয়া আমি বড় জোর না হয়, তিন মাস সময় লইতে পারিব। কিন্তু তাহার পর—সেই তিন মাস হইয়া গেলে—"

"আঃ, কিসের তিন মাস! টাকা সংগ্রহ করবার কেবল একই উপায়। আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, ঠিক সেই উপায়েই টাকা সংগ্রহ করা হইবেই হইবে। সে কথা যাউক, এ বেলা খাওয়া-দাওয়া না করিয়া যাওয়া হইবে না মণিবাবু।"

"না রাজা, আমাকে মাপ করিবেন। আমার আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করিলে চলিবে না। অতএব আমি আপাততঃ বিদায় হইতেছি। নমস্কার।"

"বটে, এত তাড়াতাড়ি! তবে অন্য গাড়ীতে না গিয়া বগীতে যাও।" এই বলিয়া তিনি শীঘ্র বগী তৈয়ার করিতে আদেশ করিলেন। বগী তৈয়ার হইলে মণিবাবু তাহাতে উঠিলেন। রাজা বলিলেন, "দেখো, তাড়াতাড়ি বগী চালাইতে যেন ঠক্কর খাইয়া উল্‌টাইয়া পড়িয়া কৃষ্ণলাভ করিও না।" মণিবাবু চলিয়া গেলেন। রাজা আসিয়া পুনরায় পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেন।

আগাগোড়া সমস্ত কথা আমি শুনিতে পাই নাই বটে, তথাপি যতটুকু শুনিলাম, তাহাতেই আমাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত করিল। নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম, তাহা ভয়ানক রকম একটা টাকার হাঙ্গামা এবং তাহা হইতে রাজার নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় লীলা। রাজার অর্থঘটিত হাঙ্গামার মধ্যে লীলাকে পড়িতে হইবে ভাবিয়া আমি বড় আকুল হইয়া উঠিলাম এবং রাজার প্রতি আমার বদ্ধ অবিশ্বাস হেতু সেই ভীতি আরও বর্দ্ধিত হইল। বাহিরে বেড়াইতে না গিয়া আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিবার নিমিত্ত লীলার প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। লীলা এ সকল কুসংবাদ এতাদৃশ অবিচলিতভাবে শ্রবণ করিল যে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। আমি সহজেই বুঝিলাম যে, লীলা তাহার স্বামীর চরিত্র ও তাহার বৈষয়িক বিশৃঙ্খলার অনেক রহস্য সবিশেষ জ্ঞাত আছে। লীলা বলিল, "সেই ভদ্রলোক আমরা আসার আগে যিনি এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু নাম বলিতে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার বৃত্তান্ত যখন আমি শুনিয়াছিলাম, তখনই আমার মনে এই আশঙ্কাই হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তবে কে সে ভদ্রলোক?"

লীলা উত্তর দিল, "কোন মহাজন—রাজার নিকট অনেক টাকা পাইবে। তাহারই জন্য আজি এখানে মণিবাবুর আগমন।"

"এই সকল দেনার কথা তুমি কিছু জান?"

"না, আমি বিশেষ কিছুই জানি না।"

"লীলা, তুমি স্বচক্ষে না পড়িয়া কিছুতে নামসহি করিবে না তো?"

"কখনই না দিদি। তোমার ও আমার সুখ ও শান্তির জন্য ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আমি তাঁহার যে কিছু সাহায্য করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিব। কিন্তু না জানিয়া, অথবা হয় তো যে জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে, এমন কোন কার্য্যই আমি করিব না। এখন আর এ বিষয়ে কোন কথায় কাজ নাই। তুমি আজি বেড়াইতে যাইবে না দিদি? চল, বিলের দিকে বাগানে বেড়াইতে যাই।"

আমরা বাহির হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে দেখিতে পাইলাম, চৌধুরী মহাশয় একটা গাছের নীচে লোহার চৌকীতে বসিয়া মৃদুস্বরে গান করিতেছেন। তাঁহার যে আজি বেশ-ভূষার ঘটা, তাহা আর কি বলিব? নিতান্ত বিলাসী যুবকও তাঁহার নিকট পোষাকে হারি মানিয়া যায়। যুবকের সাজে এই বৃদ্ধকে যেন বস্তুতই যুবকের ন্যায় দেখাইতেছে। তিনি দূর হইতে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া বিশিষ্ট ইংরাজী কায়দায় সম্মান সহকারে মস্তকান্দোলন করিলেন। আমি বলিলাম, "লীলা, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই লোকটা রাজার টাকাকড়ি-ঘটিত গোলমালের কথা অনেকটা জানেন।"

লীলা জিজ্ঞাসিল,—"কেন তুমি এরূপ মনে করিতেছ?"

আমি বলিলাম,—"তাহা না হইলে কেমন করিয়া

উনি জানিলেন যে, মণিবাবু রাজার উকীল, আর মণিবাবু আসার পর যখন আমি তোমাদের পশ্চাতে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতেছিলাম, তখন আমি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, তথাপি উনি বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে, স্থির জানিও, ও লোকটা আমাদের অপেক্ষা অধিক খবর রাখে।"

"জানুক আর যাই হউক, উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না দিদি। আমাদের পরামর্শের ভিতরে উহাকে কদাচ আসিতে দিও না।"

"দেখিতেছি, উহার উপর তোমার বড় বিরাগ। উনি এমন কি করিয়াছেন বা বলিয়াছেন যে, তোমার এত বিরাগ ?"

"কিছু না দিদি। বরং যখন আমরা পশ্চিম হইতে বাটী ফিরিয়া আসি, তখন পথে উনি বড়ই সদয় ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া উপকৃত করিয়াছেন, আর সময়ে সময়ে আমার প্রতি রাজার অসঙ্গত ক্রোধ উনি থামাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, আমার স্বামীর উপর আমার অপেক্ষা উহার আধিপত্য বড় প্রবল, এই জন্যই বা আমি উহার উপর বিরক্ত।"

আমরা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম; রাজা চৌধুরী মহাশয়, পিসী-মা ঠাকুরাণী, লীলা ও আমি নানা প্রকার গল্প-গুজব করিয়া দিনটা কাটাইলাম মন্দ নহে। কেন ভগবান্ জানেন, রাজা কিন্তু আজি আমাদের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বিবাহের পূর্ব্বে রাজা যখন আনন্দধামে যাইতেন, তখন আমাদের সহিত যেমন সদয় ও উদার ব্যবহার করিতেন, আজি যেন সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা আমি কতকটা অনুমান করিতে পারিলাম, আর আমার বোধ হয়, লীলাও যেন কতকটা বুঝিতে পারিল। চৌধুরী মহাশয় যে এরূপ ব্যবহারের কারণ জ্ঞাত আছেন, তাহা স্থির-নিশ্চয়। কারণ, আমি দেখিলাম, রাজা আমাদের প্রতি এইরূপ কোমল, সদয় ও উদার ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের দিকে, যেন তাঁহার অনুমোদনের নিমিত্ত চাহিয়া দেখিতেছেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ। নানা ঘটনাপূর্ণ ভয়ানক দিন। লীলার নামসহি-সংক্রান্ত কি যে কাণ্ডের কথা রাজার উকীল বলিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই অনুষ্ঠান দেখিলাম না। লীলা ও আমি বিলের দিকে বেড়াইতে যাইব স্থির করিয়া চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি; কারণ, তাঁহারাও বেড়াইতে যাইবেন কথা ছিল। এমন সময় রাজা চৌধুরী মহাশয়ের সন্ধানার্থ তথায় আগমন করিলেন। আমি বলিলাম,—"তিনি এখনই আসিতে পারেন, আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

তখন রাজা কিছু চঞ্চলভাবে গৃহমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন,—"কথাটা কি, একটা সামান্য কাজের জন্য জগদীশনাথ ও তাঁহার স্ত্রীকে পুস্তকাগারে একবার দরকার আছে। লীলা, তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য সেখানে যাইতে হইবে।" তাহার পর তিনি হঠাৎ আমাদের পরিচ্ছদাদির ভাব দেখিয়া বলিলেন,—"কিন্তু তোমরা কি এখন বেড়াইতে যাইতেছ, না বেড়াইয়া ফিরিলে ?"

লীলা বলিল,—"আমরা সকলে বিলের দিকে বেড়াইতে যাইব মনে করিতেছি। কিন্তু তোমার যদি কোন কাজ থাকে—"

রাজা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন,—"না না, এখন না হয়, আহারাদির পর সে কাজ শেষ করিলেই চলিবে। তবে সকলেই বিলের দিকে বেড়াইতে যাইতেছ ? বেশ বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গী হইব।"

সেই গোপনীয় কাণ্ডের প্রসঙ্গ এতক্ষণে উত্থাপিত হইল। রাজার কার্য্যের অনুরোধে লীলা বেড়ান বন্ধ করিতে স্বীকার করিল, কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তবেই রাজা কোন সূত্র পাইয়া কাজটি পিছাইয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচেন। আমার মনে তো বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। না জানি কি কাণ্ড!

চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়া জুটিলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বহস্ত-নির্ম্মিত মন্দিরাকার ইন্দুর-ভবন তারের খাঁচা হাতে করিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি আমার এই নিরীহ পরিবারগণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহি—আমার এ সাধের—সোহাগের ইন্দুরগুলি। বাটীতে অনেক বিড়াল। আমি কি আমার ছেলে-মেয়েগুলিকে বিড়ালের হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারি ?—কখনই না।"

তিনি খাঁচাখানি মুখের নিকট উঠাইয়া ইন্দুরদের সোহাগ করিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। খানিক দূর গিয়া

রাজা বনের ফুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, গাছের গায় ছড়ি মারিতে মারিতে আর একদিকে চলিয়া গেলেন। এটি তাঁহার স্বভাব। গাছের ফুল দেখিলেই তিনি ছিঁড়িতে ভালবাসেন; ছিঁড়িয়া একবার হাতে করিয়া তুলেন, তাহার পরে তখনই ফেলিয়া দেন—আর তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখেন না। ভাঙ্গা কাঠের ঘরে তিনি আবার আমাদের সঙ্গে মিশিলেন। ঘরের ভিতর আমাদের স্থান-সংকুলান হইল—আমরা সকলে তথায় উপবেশন করিলাম। কেবল রাজা তাহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে ক্ষুদ্র একখানি ছুরি বাহির করিলেন এবং তদ্দ্বারা সন্নিহিত একটি ডাল কাটিতে লাগিলেন। আমরা তিন জন স্ত্রীলোক একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলাম। চৌধুরী মহাশয় একখানি অতি ক্ষুদ্রকায় টুলের উপর বসিয়া দুলিতে লাগিলেন। একবার কাঠের ঘরে দেয়ালে তাঁহার পিঠের ভার লাগিতে থাকিল—তখন জীর্ণ ঘর মড়-মড় করিতে লাগিল—আর একবার তিনি সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি খাঁচা আপনার ক্রোড়ের উপর লইয়া তাহার কবাট খুলিয়া দিলেন। তখন তন্মধ্যস্থ জীবগণ মহানন্দে বাহির হইয়া তাঁহার গায় হিলিবিলি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মা গো! তাহা দেখিয়া আমার গা কেমন করিতে লাগিল। কৃমিসংকুলিতাঙ্গ নরকবাসীর যে বিবরণ শুনিয়াছি, এ দৃশ্য দর্শনে আমার তাহাই মনে পড়িতে থাকিল।

এই সময়ে রাজা স্বহস্ত-কর্ত্তিত বৃক্ষ-শাখা ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—"কোন কোন লোক এই দৃশ্যকে পরম রমণীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, এ স্থানটি আমার সম্পত্তির মধ্যে কলঙ্ক। আমার প্রপিতামহের সময়ে বিলের জল এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর এখন ইহার অবস্থা দেখ। ইহা এক্ষণে কাদা ও বনজঙ্গলে পূর্ণ! ইহার কোথাও এক হাতের অধিক জল নাই। আমি যদি কোন সুযোগে এই জলটা বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে এখানে আবাদ করিব ইচ্ছা আছে, আমার দেওয়ান এক জন নেহাৎ আহাম্মুখ সেকেলে লোক। সে বলে, এ বিলের উপর দেবতাদের অভিসম্পাত আছে। জগদীশনাথ, তুমি কি বল? এ জায়গাটা কি ঠিক খুনের জায়গার মত দেখায়—নয়?"

চৌধুরী মহাশয় তিরস্কারের স্বরে বলিলেন,—"প্রমোদ! তোমার দক্ষিণদেশী পাকা বুদ্ধি ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিল? এখানে জল অতি অল্প লাস লুকান কঠিন। আর চারিদিকে বালি তাহাতে হত্যাকারীর পায়ের দাগ পড়িবে। মোটের উপর খুনের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অনুপযুক্ত জঘন্য স্থান আমি আর কোথায়ও দেখি নাই।"

রাজা হস্তস্থিত বৃক্ষ-শাখা দ্বারা সজোরে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বলিলেন,—"আরে ছ্যাঃ! আমি যাহা বলিলাম, তুমি ছাই তাহা বুঝিতেও পারিলে না। আমি বলিতেছি, এই ভয়ানক স্থান—এই নির্জ্জনতা—এখানকার সকলই হত্যা-কার্য্যের অনুকূল। বুঝিয়াছ কি? না আরও খোলসা করিয়া বলিতে হইবে?"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"তোমার মত যদি আমারও বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইত, তাহা হইলে ঐ রকমই বুঝিতাম বটে। যদি কোন নির্ব্বোধ হত্যাকারীর চক্ষে এ বিল পড়ে, সে ইহা হত্যাকার্য্যের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিবে; আর যদি কোন সুবোধ হত্যাকারী স্থান অন্বেষণ করে, তাহা হইলে তোমার এ বিল মোটেই উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়া সে পিছাইয়া যাইবে। এই তোমাকে সার কথা বলিলাম। এ কথা বুঝিয়া দেখ।"

লীলা অত্যন্ত ঘৃণাসূচক দৃষ্টির সহিত চৌধুরী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এই বিল দর্শনে খুনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় আমি বড় দুঃখিত হইতেছি। আর পিসে মহাশয় যদি হত্যাকারীদের শ্রেণীবিভাগ করিতেই ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ স্থলে তাঁহার উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের কেবল নির্ব্বোধ বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহাদের প্রতি বড়ই উদারতা দেখান হয়, সেরূপ কৃপালাভ করিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। আর তাহাদের সুবোধ বলিয়া উল্লেখ করিলে শব্দের যতদূর সম্ভব অপব্যবহার করা হয়। আমি চিরদিন শুনিয়াছি, যথার্থ সুবোধ লোকেরা যথার্থ ধর্ম্মভীত সৎস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"রাণি, আপনার কথাগুলি শুনিতে ভাল এবং আমি দেখিয়াছি, শিশুদের পড়িবার পুথিতে ঐ রকম কথা লেখা থাকে।" তাহার পর একটা ইন্দুর হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার আদরের ইন্দুর! তোর জন্য আজি

ভারী একটা উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছি। যে ইন্দুর যথার্থ সুবোধ, সে ইন্দুর যথার্থই ধর্ম্ম-ভীত ও সৎস্বভাব। বুঝিয়াছিস্? এখন যা, তোর সঙ্গীদের এই উপদেশ শিখাইয়া দে—আর খবরদার, যত দিন বাঁচিবি, কখন খাঁচার তার কাটিবার চেষ্টা করিস্ না।"

নছোড়বান্দা লীলা আবার বলিল,—"সকল কথাই তামাসা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সোজা কাজ; কিন্তু চৌধুরী মহাশয়, এক জন যথার্থ সুবোধ ব্যক্তি মহাপাপানুরক্ত, এরূপ একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া তত সোজা কাজ নহে।"

চৌধুরী মহাশয় অতি প্রশান্তভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ঠিক কথা। নির্ব্বোধের কৃত পাপই ধরা পড়ে, আর সুবোধের কৃত পাপ কখনই ধরা পড়ে না। সুতরাং যদিই আমি কোন দৃষ্টান্ত দেখাই, তাহা হইলে সুবোধের দৃষ্টান্ত না হইয়া নির্ব্বোধেরই দৃষ্টান্ত হইবে। কেমন রাণি, আমি তর্কে হারিয়া গিয়াছি, না?"

রাজা প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি এখন বলিয়া উঠিলেন,—"লীলা, তুমি তোমার তোজদান-বন্দুক লইয়া সাবধান হইয়া দাঁড়াও। তুমি বল, পাপমাত্রেই ধরা পড়ে। এ কথাও পুথিতে লেখা থাকে জগদীশ! ছাড় কেন রাণি, তুমিও এই পুথির মন্ত্র ছাড়িয়া দেও। পাপ আপনি ধরা পড়ে—কি ঘৃণার কথা।"

লীলা ধীরভাবে বলিল,—"আমি সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।"

রাজা এমন বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন যে, আমরা সকলেই, বিশেষতঃ চৌধুরী মহাশয় বড়ই চমকিয়া উঠিলেন। লীলার সহায়তা করিবার জন্য আমিও বলিয়া উঠিলাম,—"আমারও তাহাই বিশ্বাস।" লীলার কথায় রাজা যেমন বেজায় হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, আমার কথায় তেমনই বিরক্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা বালুকাপৃষ্ঠে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আহা, রাগই বেচারাকে খাইল! যাহা হউক, মনোরমা দেবি এবং রাণী ঠাকুরাণি, আপনারা কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, পাপ আপনি ধরা পড়ে?" তাহার পর আপনার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আর আমার হৃদয়েশ্বরি, তোমারও কি ঐ মত?"

লীলা এবং আমাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে রঙ্গমতি ঠাকুরাণী বিশেষ ব্যঙ্গজনক স্বরে উত্তর দিলেন,—"আমি সুপণ্ডিত লোকের সমক্ষে কোন বিষয়ে মত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং তাহা শিক্ষা করিতে চাহি।"

আমি বলিলাম,—"সত্য না কি? কিন্তু যে সময়ে আপনি স্ত্রীলোকের মনের স্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ে সমর্থন করিতেন, সে সময়ের কথা আমি ভুলি নাই।"

আমার কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি বলিলেন,—"চৌধুরী, তোমার কি মত?"

চৌধুরী মহাশয় চিন্তিতভাবে একটা ইন্দুরের গায়ে একটা টোকা মারিলেন; তাহার পর বলিলেন, "মনুষ্য-সমাজ কেমন সুকৌশলে আপনার অক্ষমতার কথা চাপা দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। পাপকার্য্য ধরিবার জন্য মনুষ্যেরা যে সকল কল খাড়া করিয়াছে, তাহা কোন কর্ম্মেরই নহে; কিন্তু সমাজ সে কথা কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া একটা অর্থহীন নীতিবাক্য বলিয়া সকলের চক্ষে ধূলা দিতেছে। পাপ আপনি ধরা পড়ে, সত্য কি? আর একটা অর্থহীন নীতিকথা, হত্যাকাণ্ড কখন চাপা থাকে না। থাকে না কি? বড় বড় সহরে যাহারা হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করেন, এ কথা সত্য কি না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি রাণী ঠাকুরাণি! দেশের সব খবরের কাগজ পড়ুন দেখি মনোরমা দেবি! যে দুই চারিটা খুনের সংবাদ কাগজে স্থান পায়, তাহার মধ্যে লাস পাওয়া গিয়াছে, অথচ কে খুন করিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এমন খবর থাকে না কি? এখন ভাবিয়া দেখুন, সকল খুনের কথা কাগজে উঠে না এবং সকল লাসও পাওয়া যায় না। যে সকল খুনের কথা কাগজে উঠে এবং যে সকল খুনের লাস পাওয়া যায়, তাহার সহিত যে সকল হত্যাকাণ্ড খবরের কাগজে উঠে না ও যাহার লাস পাওয়া যায় না, তাহা মনে ঠিক দিয়া বলুন দেখি, কি মীমাংসা সঙ্গত? ইহার একই মীমাংসা; যাহারা বোকা খুনে, তাহারাই ধরা পড়ে এবং যাহারা বিজ্ঞ খুনে, তাহারা এড়াইয়া যায়। খুন লুকান এবং খুন ধরা পড়া ব্যাপার তো আর কিছুই নয়, কেবল এক দিকে পুলিস এবং আর এক দিকে ব্যক্তিগত কৌশলের পরীক্ষা মাত্র। যে যে স্থলে হত্যাকারী মূর্খ, নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন, তাদৃশ দশ জায়গায় পুলিসেরই জয় হয়। কিন্তু যেখানে হত্যাকারী শিক্ষিত, সুবোধ ও স্থির-প্রতিজ্ঞ, তেমন দশ জায়গার মধ্যে নয় জায়গায় পুলিসের হারি হয়। যখন পুলিস জিতে, তখন আপনারা তাহার সমস্ত

বৃত্তান্ত শুনিতে পান; কিন্তু যদি পুলিস হারে, তাহা হইলে আপনারা তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন না। আপনারা এই নিতান্ত ভঙ্গুর ভিত্তির উপর পাপমাত্রই আপনি প্রকাশিত হয়, এই সন্তোষ-প্রদ নীতি-কথা সংগঠিত করিয়াছেন। যে সকল পাপের সংবাদ আপনারা জানিতে পারেন, তাহার পক্ষে এ কথা সত্য বটে; কিন্তু বাকীর কি?"

কাঠের ঘরের দরজার নিকট হইতে এক জন বলিয়া উঠিল,—"কথা ঠিক, আর বলিয়াছও বেশ।" রাজা প্রমোদ এতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতেছিলেন; তিনিই এ বাক্যের বক্তা।

আমি বলিলাম,—"কতকটা ঠিক কথা হইতে পারে এবং সমস্তটাই বেশ বলা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেন চৌধুরী মহাশয় গৌরবের সহিত সমাজের উপর পাপীর বিজয়-ঘোষণা করিতেছেন এবং কেনই বা রাজা এই কার্য্যের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন,—"শুনিলে জগদীশ? আমার কথা শুন, তুমি তোমার শ্রোতাদের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেল। তুমি তাঁহাদের বল যে, ধর্ম্মটা বড় উত্তম জিনিস; তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাঁহারা বড়ই খুসী হইবেন।"

চৌধুরী মহাশয় শব্দ না করিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। দুইটা সাদা ইন্দুর তাঁহার জামার ভিতর ঢুকিয়া গায়ের উপর বেড়াইতেছিল। চৌধুরী মহাশয়ের হাসির চোটে তাহারা কি জানি কি মহাপ্রলয় উপস্থিত ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিয়া খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"প্রমোদ, রমণীগণই আমাকে ধর্ম্মের কথা বলুন। আমার অপেক্ষা এ সম্বন্ধে তাঁহারাই বিশেষ অভিজ্ঞ। কারণ, ধর্ম্মটা যে কি, তাহা তাঁহারাই জানেন ভাল; আমি তাহা বড় একটা বুঝি না।"

রাজা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"শুনিলেন আপনারা? ভয়ানক কথা নয় কি?"

প্রশান্তভাবে চৌধুরী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"আমি এই জীবনের মধ্যে অনেক দেশে বেড়াইয়াছি এবং নানা স্থানে নানা ধর্ম্ম দেখিয়া আমার মাথা এখন এমন বেঠিক হইয়া গিয়াছে যে, আমি এই বুড়ো বয়সে কোন্‌টা সত্য ধর্ম্ম, আর কোন্‌টা মিথ্যা ধর্ম্ম, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। এই আমাদের বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এক রকম ধর্ম্ম, আর ঐ মুসলমানজাতির মধ্যে আর এক রকম ধর্ম্ম। রামকৃষ্ণ শিরোমণি নামাবলী গায়ে দিয়া, 'আর্ক-ফলা' নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মই ঠিক। আবার ওদিকে হোসেন আলি মৌলবী, মাথায় টুপী দিয়া দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মই ঠিক। কাহাকে কি জবাব দিব, তাহা তো আমার বুদ্ধিতে আইসে না। এখন বল তো আমার সোহাগের ইন্দুরগুলি, ধার্ম্মিক লোকের বিষয়ে তোমাদের মত কি? তোমরা আমাকেই বলিবে, যে ব্যক্তি তোমাদের ভাল করিয়া রাখে, ভাল করিয়া খাইতে দেয়, সেই ধার্ম্মিক। তোমাদের এ উত্তর মন্দ নয়। কারণ, আর কিছু হউক না হউক, তোমাদের কথাটার একটা মানে আছে।"

এই বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই খাঁচা হাতে লইয়া, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তাহার পর খাঁচার ইন্দুর গণিতে আরম্ভ করিলেন। "এক, দুই, তিন, চারি—অ্যাঁ! কি হলো? আর একটা ইন্দুর কই? যেটি সকলের চেয়ে ছোট, সকলের চেয়ে ভাল, আমার সে সোনার যাদু পদ্মলোচন ইন্দুরটি কোথা গেল?"

আজিকার কথাবার্ত্তায় চৌধুরী মহাশয়ের হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে লীলা এবং আমি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং তাঁহার ইন্দুর-সম্বন্ধীয় রসিকতা শুনিয়া আমার একটুও আমোদ হইল না। তথাপি এই সুবিপুলকায় ব্যক্তির একটা অতি ক্ষুদ্র মূষিকের জন্য এরূপ কৌতুকজনক কাতরতা দেখিয়া, আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেই গৃহের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিবার সুযোগ হইবে মনে করিয়া রঙ্গমতি দেবী গাত্রোত্থান করিলে, আমরাও উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দুই এক পদ আসিতে না আসিতে আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, সেই বেঞ্চের নীচে চৌধুরী মহাশয় ইন্দুর দেখিতে পাইলেন। তিনি বেঞ্চ সরাইয়া ইন্দুর তুলিয়া লইলেন। তাহার পর সেই স্থানে জানু পাতিয়া অবনত-মস্তকে সম্মুখস্থ ভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার মুখ নিতান্ত বিবর্ণ এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর এরূপ কম্পান্বিত যে, তাঁহাকে অতি কষ্টে মূষিককে তাহার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে হইল। তখন তিনি নিতান্ত অস্ফুটস্বরে ডাকিলেন,—"প্রমোদ, রাজা, এ দিকে আইস।"

রাজা এতক্ষণ কোন দিকে মনোযোগ না দিয়া

ছড়ির অগ্রভাগ দ্বারা বালির উপর দাগ পাড়িতেছিলেন। তিনি চৌধুরী মহাশয়ের ডাক শুনিয়া ঘরের দিকে আসিতে আসিতে বলিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

চৌধুরী মহাশয় এক হস্ত রাজার কাঁধে দিয়া এবং অপর হস্ত যে স্থানে ইন্দুর পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিকে নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখিতেছ না, ওখানে কি ?"

রাজা বলিলেন,—"কতকগুলি ধুলা আর বালি, তাহার মধ্যে একটা ময়লা দাগ, এই তো।"

চৌধুরী মহাশয় তখন কাঁপিতে কাঁপিতে উভয় হস্তে রাজাকে চাপিয়া ধরিয়া, নিতান্ত ভীতভাবে বলিলেন,—"না না, ময়লা দাগ নহে,—রক্ত !"

লীলা আমার পাশেই ছিল। সে চৌধুরী মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া, নিতান্ত ভয়-চকিতভাবে আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম,—"কি জ্বালা, ইহাতে ভয়ের কোনই কথা নাই। ওটা একটা বিলাতী কুকুরের রক্তের দাগ।"

তখন সকলেই কৌতূহলের সহিত আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং রাজাই প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"যে দিন আপনারা সকলে বিদেশ হইতে বাটীতে ফিরিয়া আইসেন, সেই দিন আমি মরণাপন্ন একটা বিলাতী কুকুরকে এই স্থানে দেখিতে পাই। কেমন করিয়া কুকুরটা এই বিলের মধ্যে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহার পর আপনারই মালী তাহাকে গুলী করিয়াছিল।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার সে কুকুর ? আমাদের কোন কুকুর নয় তো ?"

লীলা বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিল, "আহা! তুমি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে, নিশ্চয়ই তুমি তাহার জন্য যত্নের ত্রুটি কর নাই দিদি।"

আমি বলিলাম, "আমি আর গিন্নী-ঝি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার আঘাত বড়ই সাংঘাতিক হইয়াছিল, কিছুতেই বাঁচিল না।"

রাজা একটু বিরক্তভাবে এবং একটু জোরে আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার সে কুকুর ? আমার নয় তো ?"

আমি বলিলাম,—"না, আপনার নয়।"

"তবে কাহার, গিন্নী-ঝি জানে কি ?"

আমি গিন্নী-ঝির মুখে শুনিয়াছিলাম, হরিমতির আগমন-সংবাদ যাহাতে রাজার কর্ণগোচর না হয়, ইহাই তাহার বিশেষ অনুরোধ। সে কথা এখন আর চাপিয়া রাখিলে চলে না। কাজেই আমাকে বলিতে হইল,—"গিন্নী-ঝি জানে। সেই আমাকে বলিয়াছিল, সে কুকুর হরিমতির।"

এই কথা যেই আমার মুখ হইতে বাহির হওয়া, সেই রাজা তাড়াতাড়ি চৌধুরী মহাশয়কে অসভ্যভাবে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আমার ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাগত দৃষ্টির সহিত আমার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সেটা হরিমতির কুকুর, তাহা গিন্নী-ঝি জানিল কিরূপে ?"

তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বিরক্ত ও বিচলিত হইলেও আমি ধীরভাবে উত্তর দিলাম,---"হরিমতি সেই কুকুর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, সেই জন্যই গিন্নী-ঝি তাহা জানে।"

"সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল ? কোথায় আসিয়াছিল ?"

"এই বাটীতে।"

"এই বাটীতে হরিমতির কি ঘোড়ার ডিমের দরকার ছিল ! সে এখানে কেন আসিয়াছিল ?"

এই প্রশ্নের ভাষার অপেক্ষাও ইহা বলিবার ভঙ্গী নিতান্ত কদর্য্য ও অতিশয় বিরক্তিজনক। আমি কোন উত্তর না দিয়া ঘৃণার সহিত সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে গমন করিলাম। তখন চৌধুরী মহাশয় রাজার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে থাবড়া দিতে দিতে মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ঠাণ্ডাভাবে—ছি প্রমোদ, শান্তভাবে।"

রাজা নিতান্ত রাগতভাবে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় একটু হাসির সহিত প্রশান্তভাবে আবার বলিলেন,—"ধীরভাবে বল। ছি ছি !"

রাজা কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমার পশ্চাতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন এবং আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। তিনি বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, ইদানীং আমার শরীর ও মনটা বড়ই মন্দ যাইতেছে; এ জন্য আমি সময়ে সময়ে সামান্য কারণেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পড়ি। সে জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। যাহা হউক, হরিমতি এখানে কেন আসিয়াছিল, আমি জানিতে চাহি। কখন্ সে আসিয়াছিল ? গিন্নী-ঝি ছাড়া আর কেহই কি তাহাকে দেখে নাই ?"

আমি বলিলাম,—"আমি যত দূর জানি, আর কেহই তাহাকে দেখে নাই।"

এই সময় চৌধুরী মহাশয় মধ্যস্থতা করিয়া

বলিলেন,—"তবে সেই গিন্নী-ঝিকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? সংবাদের সেই মূলস্থানে গিয়া সব জান না কেন?"

রাজা বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। গিন্নী-ঝিকেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। এতক্ষণ এ কথা আমার মনে উদয় না হওয়াই আহাম্মকী।"

এই বলিয়া তিনি প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যস্থতার কারণ বেশ বুঝিতে পারা গেল। হরিমতির বিষয়ে এবং তাহার এখানে আসিবার কারণ সম্বন্ধে তিনি তখন উপর্য্যুপরি অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজার সমক্ষে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাঁহার সুবিধা হইত না। মনের কথা তাঁহাকে জানাইয়া, তাঁহার সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে বাসনা ছিল না। এ জন্য আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। লীলা কিন্তু না জানিয়া ও না বুঝিয়া আপনার কৌতূহলনিবারণের জন্য আমাকে হরিমতির সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কাজেই আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কথা বলিতে হইল। ফল এই দাঁড়াইল যে, ১০ মিনিটের মধ্যে হরিমতি এবং তাহার কন্যা মুক্তকেশী-সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও দেবেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধবিষয়ক ব্যাপারের আমি যাহা জানিতাম, চৌধুরী মহাশয়ও তাহা জানিয়া ফেলিলেন। রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের যেরূপ প্রগাঢ় আত্মীয়তা এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ গুপ্ত ব্যাপারে চৌধুরী মহাশয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা, তাহাতে মুক্তকেশী-সংক্রান্ত রহস্য তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকা বস্তুতই নিতান্ত বিস্ময়জনক। জগতের মধ্যে যিনি রাজার প্রধানতম বন্ধু, তাঁহাকেও যখন রাজা এ ব্যাপার জানান নাই, তখন এই অভাগিনী রমণী-সংক্রান্ত রহস্য যৎপরোনাস্তি সন্দেহজনক বলিয়া আমার প্রতীতি হইল। চৌধুরী মহাশয় যে এ বিষয়ের কিছুই জানিতেন না, এ কথা তাঁহার মুখের ভাব ও আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া অতি সহজেই অনুমান করা গেল। এই প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা ক্রমশঃ আবাদের মধ্য দিয়া প্রাসাদের অভিমুখে ফিরিতেছিলাম। আমরা বাটী ফিরিয়া প্রথমেই দেখিলাম, ঘোড়াজোতা রাজার এক টমটম-গাড়ী তৈয়ারী অবস্থায় প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে। বোধ হয়, গিন্নী-ঝির নিকট রাজা যাহা যাহা শুনিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাহারই সন্ধানের জন্য এই গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। সহিস ঘোড়ার মুখ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চৌধুরী মহাশয় নিতান্ত আত্মীয়বৎ কোমল-স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাঃ বাঃ! খাসা ঘোড়াটি! রাজা আজি কোন্ দিকে বেড়াইতে যাইবেন বাবা?"

সহিস বলিল,—"তাহা আমি এখনও জানিতে পাই নাই।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"এমন সুন্দর ঘোড়াটিকে বেশী খাটাইয়া মাটী না করিলেই ভাল হয়।"

সহিস বলিল,—ধর্ম্মাবতার, এ ঘোড়াটা বড়ই ভাল। কিন্তু এ যেমন খাটিতে পারে, রাজার আস্তাবলে তেমন আর একটিও নাই। রাজার যে দিন দূরে যাইবার ইচ্ছা থাকে, সেই দিনই এই ঘোড়া গাড়ীতে জোতা হয়।"

চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—রাজা তবে আজি দূরে যাইবেন। কি বলেন মনোরমা দেবি?"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না। আমি যাহা জানিতাম ও যাহা দেখিলাম, তাহা হইতে যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত, তাহা আমার ঠিক করিতে বাকী ছিল না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে মনের কথা বলিব কেন? আমি মনে মনে বুঝিলাম, রাজা যখন আনন্দধামে ছিলেন, তখন মুক্তকেশীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি বহুদূরে তারার খামার পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি এখানে। এখানেও কি তিনি সেই মুক্তকেশীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দূর গ্রামান্তরে হরিমতির বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ী চালাইতেছেন না? আমরা ভবনে আরোহণ করিলাম। প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার পর রাজা পাঠাগারের মধ্য হইতে আসিয়া, আমাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুলচিত্ত বোধ হইল। তাঁহার বর্ণ বড়ই পাণ্ডু। তাহা হইলেও তিনি বিশেষ বিনয়, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার সহিত আমাদিগকে বলিলেন,—"একটা গুরুতর কাজের অনুরোধে আমাকে আপনাদের ছাড়িয়া আজি একবার গ্রামান্তরে যাইতে হইতেছে। আমি কালি ফিরিব। আপাততঃ আমি যাত্রা করার পূর্ব্বে প্রাতে যে একটু কাজের জন্য বলিয়াছিলাম, সেইটুকু শেষ হইলে ভাল হয়। রাণি, তুমি একবার কেতাব-ঘরে আইস—অতি সামান্য কাজ, এক মিনিটও লাগিবে না। পিসী-মা, আপনিও একটু কষ্ট করিবেন কি? জগদীশ, তুমি এবং চৌধুরাণী ঠাকুরাণী একটা দস্তখতের সাক্ষী

হওয়া আবশ্যক। আইস সকলে, কাজটা শেষ হইয়া যাউক।"

যতক্ষণ সকলে কেতাবঘরে প্রবেশ না করিলেন, ততক্ষণ রাজা তাহার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে গৃহমধ্যস্থ হইলে তিনি ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। আমি নিতান্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইয়া কিয়ৎকাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকার পর ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠিয়া আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ।—ঘরে গিয়া বসিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলাম, রাজা নীচে হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার নীচে আসিতে হইতেছে। দোষ সম্পূর্ণই জগদীশের, তিনি তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষী হওয়ার পক্ষে কতকগুলি অন্যায় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কাজেই আপনাকে কষ্ট দিতে হইল।"

আমি পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লীলা টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে টেবিলের উপরস্থিত একখানি পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতেছে। রঙ্গমতি ঠাকুরাণী তাহার নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া নিতান্ত প্রশংসা ও গৌরবের দৃষ্টিতে আপনার স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। চৌধুরী মহাশয় জানালার নিকট দাঁড়াইয়া, সেখানে টবের উপর যে সকল ফুলগাছ ছিল, তাহা হইতে শুষ্ক পাতা বাছিয়া ফেলিতেছিলেন। আমি গৃহাগত হইবামাত্র তিনি আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আপনাকে কষ্ট দিতে হইল বলিয়া আমি বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু জানেনই তো আপনি, 'বাঙ্গাল বড় হিঁয়ান।' আমিও এক জন বাঙ্গাল, কাজেই আমিও হিঁয়ান। আমি হিঁয়ান বলিয়াই যে দলীলে আমি এক জন সাক্ষী, তাহাতে আমার স্ত্রীরও সাক্ষী হওয়া বড় দোষের কথা বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"এ কথার কোনই মানে নাই। আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি, স্বামী ও স্ত্রী এক দলীলের সাক্ষী হইলে কোন দোষ হয় না। তথাপি উনি বুঝিবেন না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"ঠিক কথা। আপন বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল, তবু পরের বুদ্ধিতে রাজা হওয়াও কিছু নয়। আমি একজেদা হিঁয়ান বাঙ্গাল। যতক্ষণ আমার প্রাণ না বুঝিবে, ততক্ষণ তোমার তর্ক-যুক্তি কিছুই আমি শুনিব না। রাণী যে দলীলে এখনই নাম সহি করিবেন, তাহাতে কি আছে, তাহা আমি জানি না, জানিতে আমার কোন বাসনাও নাই। আমার বক্তব্য এই যে ভবিষ্যতে এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন রাজার অথবা রাজার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দস্তখতের সাক্ষী দুই জনের মত লইবার আবশ্যক হইবে। সেরূপ স্থলে সাক্ষী দুই জনের পরস্পর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মত থাকা আবশ্যক। আমার স্ত্রী এবং আমি সাক্ষী হইলে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইবে; কারণ, আমাদের মধ্যে এক মত ভিন্ন দুই মত নাই এবং সে মত আমারই। আমার স্ত্রী দায়ে পড়িয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে, এরূপ আপত্তি ভবিষ্যতে জন্মিতে পারে। আমি তাহা শুনিতে চাহি না। রাজার ভালর জন্যই বলিতেছি যে, আমি স্বামীর আসন্ন বন্ধুরূপে সাক্ষী থাকি, আর মনোরমা দেবি, আপনি স্ত্রীর আসন্ন বন্ধুরূপে সাক্ষী থাকুন। আমি এই রকম বুঝিয়াছি। তা আপনারা যাহাই বলুন, আমি সহজে আমার বুদ্ধি ছাড়িব না।"

চৌধুরী মহাশয়ের এরূপ সাবধানতার কোন মানে থাকুক আর নাই থাকুক, আমার মনে কিন্তু বড়ই সন্দেহ জন্মিল এবং আমারও সাক্ষী হইতে নিতান্ত অনিচ্ছা হইল। কিন্তু লীলাকে ছাড়িয়া তো যাইতে পারিব না। ঘটনা কিরূপ দাঁড়ায়, দেখিবার জন্য অপেক্ষায় রহিলাম এবং বলিলাম,—"আমি এখানেই থাকিতেছি; যদি কোন আপত্তি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সাক্ষী হইব।"

রাজা আমাকে কিছু বলিবেন ভাবিয়া আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু সেই সময়ে পিসী-মা ঠাকুরাণী গাত্রোত্থান করায় তাঁহাকে সেই দিকে মনোযোগী হইতে হইল। স্পষ্টই বুঝা গেল, চৌধুরী মহাশয় নয়নে নয়নে স্ত্রীর প্রতি গৃহত্যাগের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তিনি উঠিতেছেন দেখিয়া রাজা বলিলেন,—"আপনি যান কেন? থাকুন না।"

ঠাকুরাণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিলেন

এবং আবার আদেশ পাইলেন। তখন আমাদের কাজের সময় তাঁহার অনর্থক দরকার নাই বলিয়া, তিনি জেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। চৌধুরী মহাশয় একটা পেন্সিলের আগা দিয়া জানালার নিকটস্থ ফুলের টবের মাটী খুঁড়িয়া দিতেছিলেন। উদ্বেগ ও সাবধানতার সীমা নাই—গাছের গোড়ায় যে পিঁপ্‌ড়ে লাগিয়াছিল, তাহাদের গায়ে আঘাত না লাগে বা মরিয়া না যায়।

এ দিকে রাজা দেরাজের ভিতর হইতে একটি ছোট বাক্স বাহির করিয়া ছোট একটি রূপার চাবী দিয়া খুলিলেন; তাহার পর তাহার মধ্য হইতে অনেক ভাঁজ করা এক দলীল বাহির করিয়া তাহার শেষ ভাঁজটি মাত্র খুলিলেন। সে ভাঁজটি সাদা, সুতরাং দলীলে যাহা লেখা আছে, তাহার এক বর্ণও দেখা গেল না। লীলা এবং আমি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। লীলা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেও ভয় এবং অস্থিরতার কোন চিহ্ন তাহার মুখে দেখিলাম না। রাজা কালিতে কলম ডুবাইয়া আপনার স্ত্রীর হস্তে দিলেন এবং দলীলের সেই সাদা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই স্থানে তোমার নাম সহি কর। মনোরমা দেবি এবং জগদীশ, আপনারা এই এই স্থানে নাম সহি করিবেন। জগদীশ, এ কি ছেলেমানুষী না কি? এ দিকে এস, দস্তখতের সাক্ষী হওয়া ইয়ারকীর কর্ম্ম নহে।"

চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পেন্সিলটি পকেটে ফেলিয়া রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমাদের নিকটস্থ হইলেন। লীলা কলম হাতে লইয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে। আবার দলীলের সেই স্থানটি দেখাইয়া বলিলেন,—"এইখানে সহি কর।"

লীলা ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার যাহাতে নাম সহি করিতে হইবে, সেটা কি?"

রাজা বলিলেন,—"আমার এখন বুঝাইয়া বলিবার সময় নাই। গাড়ী তৈয়ারি রহিয়াছে, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আর সময় থাকিলেও তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না, ইহা কেবল লম্বা লম্বা আইনের বাজে কথায় পূর্ণ। এস, শীঘ্র নাম দস্তখত করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কাজটা শেষ করিয়া দেও।"

লীলা বলিল,—"রাজা, যাহাতে আমার নাম সহি করিতে হইবে, দস্তখত করিবার পূর্ব্বে সেটা কি, এ কথা জানা আমার পক্ষে অবশ্যই আবশ্যক।"

"দূর কর ছাই! কাগজের কথা জানিতে মেয়েমানুষের কি দরকার? আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না।"

"কিন্তু যাই হউক, আমার বুঝিতে চেষ্টা করাও তো আবশ্যক। যখন উমেশবাবুর এইরূপ কাজের দরকার উপস্থিত হইত, তখন তিনি প্রথমেই আমাকে তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমিও বুঝিতে পারিতাম তো।"

"তিনি করিতেন, আমার কি তা? তিনি তোমার চাকর ছিলেন, তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য নহি। আর কতক্ষণ তুমি আমাকে এখানে অনর্থক আট্‌কাইয়া রাখিবে? আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, এখন আর বোঝাবুঝির সময় নাই, গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে, সাদা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সহি করিবে কি না?"

তথাপি লীলা কলম হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সহি করিতে অগ্রসর হইল না। বলিল,—"যদি আমাকে সহি করিয়া কোন বিষয়ের জন্য বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে সেটা কি, তাহা জানিতে অবশ্যই আমার একটুও অধিকার আছে।"

রাজা সজোরে টেবিলে আঘাত করিয়া বিশেষ রাগের সহিত বলিলেন,—"অত কথা আমি শুনিতে চাহি না। এখানে তোমার দিদি আছেন, চৌধুরী মহাশয় আছেন বলিয়া আর লজ্জায় কাজ নাই। সোজা কথা বল না, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

চৌধুরী মহাশয় সেই সময় আস্তে আস্তে রাজার কাঁধের উপর হাত দিলেন। রাজা রাগের সহিত তাহা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। চৌধুরী মহাশয় প্রশান্তভাবে আবার রাজার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"প্রমোদ, প্রমোদ, কর কি? অন্যায় রাগ দমন কর। এ ক্ষেত্রে রাণীই ঠিক!"

রাজা চীৎকারস্বরে বলিলেন,—"রাণীই ঠিক! স্বামীকে অবিশ্বাস করা স্ত্রীর পক্ষে ঠিক কাজ?"

লীলা বলিল,—"আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি বলিয়া অভিযোগ করা নিতান্ত অন্যায় ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা। দিদিকে জিজ্ঞাসা কর, সহি করিবার আগে ইহাতে কি আছে জানিতে ইচ্ছা করা ন্যায়সঙ্গত কি না?"

রাজা উদ্ধতভাবে বলিলেন,—"দিদিকে জিজ্ঞাসা করিবার কোনই দরকার নাই। এ বিষয়ের সহিত তোমার দিদির কোন সম্পর্ক নাই।"

আমি এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই, এখনও কোন কথা কহিতাম না; কিন্তু লীলার মুখের বিষণ্ণ ও কাতর ভাব দেখিয়া এবং তাহার স্বামীর অন্যায় অবিচার দেখিয়া আমার মত ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"রাজা, আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমি যখন দস্তখতের এক জন সাক্ষী, তখন আমি এ বিষয়ে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহি। আমার বিবেচনায় লীলার আপত্তি সম্পূর্ণই সঙ্গত। লীলা যাহাতে সহি করিবে, তাহাতে কি আছে, তাহা সে অগ্রে না বুঝিলে আমি তো সাক্ষীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত নহি।"

রাজা বলিলেন,—"অতি উত্তম কথা! আবার যদি কখন মনোরমা দেবি, আপনাকে কাহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমি উপদেশ দিতেছি, যে বিষয়ের জন্য আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সে বিষয়ে তাহায় স্ত্রীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহার আশ্রিতপালন গুণের কদাচ এমন করিয়া প্রতিশোধ দিবেন না।"

তিনি আমাকে প্রহার করিলে আমার মনের যেরূপ ভাব হইত, এ কথা শুনিয়া আমার চিত্তের তেমনই ভাব হইল। যদি আমি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে তদ্দণ্ডে তাঁহারই ঘরে তাঁহাকে মারিয়া অচেতন করিয়া ছাড়িতাম এবং কোন কারণে কদাপি তাঁহার বাটীতে পদার্পণও করিতাম না। কিন্তু আমি স্ত্রীলোক এবং আমি তাঁহার স্ত্রীকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি। সেই ভালবাসারই জন্য আমি একটিও কথা না কহিয়া স্থির রহিলাম। লীলা বুঝিল, কত কষ্টই আজি আমার হৃদয়ে সহিল এবং কত জ্বালাই তাহা চাপিয়া রাখিল। সে গলদশ্রু-লোচনে আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিল এবং উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,—"দিদি, মা যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও আমার জন্য এত সহ্য করিতেন না।"

রাজা আবার চীৎকার করিলেন,—"রাণি, এ দিকে এস, শীঘ্র নাম সহি কর।"

লীলা আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল,—"সহি করিব কি? তুমি যদি বল তো করি।"

আমি বলিলাম,—"না। তুমি যাহা ধরিয়াছ, তাহা সঙ্গত এবং সত্য। যতক্ষণ উহা পড়িতে না পাইবে, ততক্ষণ উহাতে কখনই নাম সহি করিও না।"

রাজা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এস, শীঘ্র সহি কর।"

লীলা ও আমার ভাব চৌধুরী মহাশয় বেশ করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন, তিনি এক্ষণে আবার একবার মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—"প্রমোদ, স্ত্রীলোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহা কি তুমি জান না? ছি ছি!"

রাজা অতিশয় রাগের সহিত তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় ধীরে ধীরে রাজার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন,—"ছি ছি!"

উভয়েই পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ধীরে ধীরে চৌধুরী মহাশয়ের হাতের নীচে হইতে আপনার কাঁধ সরাইয়া লইলেন। ধীরে ধীরে চৌধুরী মহাশয়ের নয়ন-সম্মুখ হইতে আপনার মুখ ফিরাইলেন। নিতান্ত স্বার্থময়ভাবে দলীলখানার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায়, যেন বাধ্য হইয়া বলিলেন,—"কাহাকেও গালি দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে, তবে আমার স্ত্রীর একগুঁয়েমিতে মুনি-ঋষিরও ধৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, আমি বলিয়াছি, এ একখানি সামান্য দলীল মাত্র। ইহার অপেক্ষা বেশী কথা তোমার আর জানিবার দরকার কি? তুমি যাহাই বল, জগদীশ, স্বামীর কার্য্যে এরূপ প্রতিবাদ করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে। সে যাহা হউক, রাণি, আমি তোমাকে আবার বলিতেছি—শেষবার—তুমি সহি করিবে কি না?"

লীলা টেবিলের নিকটস্থ হইল। আবার কলম হাতে তুলিল, তাহার পর বলিল,—"আমি একটা দায়িত্বযুক্ত মানুষ ভাবিয়া যদি তুমি আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে নাম সহি করিব। আমার যতই কেন ক্ষতি হউক না, আমি সকলই সহ্য করিতে পারি, যদি আমার কৃত কার্য্যের জন্য আর কাহারও স্বার্থের হানি না হয় এবং কোন মন্দ ফল না ঘটে।"

রাজা আবার পূর্ব্বের মত রাগিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ভাব যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন করিয়া বলিলেন,—"তোমাকে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, এ কথা কে বলিল?"

লীলা আবার বলিল,—"আমার অভিপ্রায় এই

যে, আমার দ্বারা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যাহা কিছু হইতে পারে, আমি সকলই করিতে সম্মত আছি। যদিই এ দলীলে আমার নাম সহি করিতে একটু সঙ্কোচ থাকে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সে জন্য কেন তুমি আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেছ? পিসীমা সাক্ষী হওয়ার সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয় সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে তুমি কথাটিও কহিলে না, আর আমার বেলায় এত কঠোর ব্যবহার করিতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।"

এই কথা যেই বলা, সেই রাজা ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত কর্কশ-স্বরে বলিলেন,—"সঙ্কোচ! তোমার আবার সঙ্কোচ! সঙ্কোচের সময় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে জান? আমি মনে করিয়াছিলাম, যখন তুমি দায়ে পড়িয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছ, তখন হইতে তুমি ও সকল ভাব একেবারে ত্যাগ করিয়াছ।"

কথাটি শুনিবামাত্র লীলা সজোরে হস্তের লেখনী ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিল এবং রাজার প্রতি এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, আমি জীবনে কখন তেমন দৃষ্টি তাহার চক্ষে দেখি নাই। লীলা তখনই রাজার দিক্ হইতে ফিরিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিল। রাজার কথাটা ভারী মর্ম্মভেদী সত্য, কিন্তু এই কথার পর রাজার প্রতি লীলার এই বিজাতীয় ও ভয়ানক ঘৃণা এবং ক্রোধের ভাব দেখিয়া আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে, নিশ্চয়ই এ কথার মধ্যে আরও কোন অতি ভয়ানক অপমানের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। আমি তাহার কিছুই জানি না, লীলা হয় তো আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাহা আমাকে বলে নাই। লীলার ভাব দেখিয়া আমার মনে যেমন সন্দেহ হইল, চৌধুরী মহাশয়ের মনেও বোধ করি তেমনই হইল। কারণ, আমি লীলার সঙ্গে সে গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার সময় শুনিতে পাইলাম, তিনি রাজাকে নিতান্ত অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন,—"পাগল কোথাকার!"

লীলা ও আমি দ্বার-সন্নিহিত হইলে রাজা বলিলেন,—"তবে কোন ক্রমেই তুমি নাম সহি করিবে না?" আপনার বেকুবীতে আপনি মাটী হইলে লোকের যেমন কণ্ঠস্বর হইয়া থাকে, রাজার স্বরও তেমনই।

লীলা অবিচলিতভাবে উত্তর দিল,—"তুমি এখনই যে কথা বলিয়াছ, তাহার পর ঐ দলীলের প্রথম অক্ষর হইতে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত না পড়িয়া আমি কখনই উহাতে নাম সহি করিব না। এস দিদি, আমরা এখানে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি।"

রাজা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চৌধুরী মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—"এক মুহূর্ত্ত, রাণি, আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আর এক মুহূর্ত্ত।"

লীলা তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে থামাইয়া তাহার কানে কানে বলিলাম,—"চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কখন শত্রুতা করিও না; আর যাই হউক, চৌধুরী মহাশয় যেন আমাদের শত্রু না হন।" লীলা আমার কথা রাখিল।

তখন চৌধুরী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"রাণী মাতা, আমাকে ক্ষমা করুন; আপনি এই গৃহের কর্ত্রী ও সর্ব্বেশ্বরী; আপনার প্রতি প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এ স্থলে একটি কথা বলিতে বাসনা করি।" তাহার পর রাজার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা, আজি উহাতে নাম সহি না হইলে কোনমতেই চলিতে পারে না কি?"

রাজা গোঁ গোঁ করিয়া বলিলেন,—"আমার যেরূপ মতলব, তাহাতে উহার আজই দরকার আছে, কিন্তু দেখিলেই তো তুমি, আমার দরকারে রাণীর কিছুই যায় আসে না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমার কথার সাদা উত্তর দেও। দস্তখত কালি পর্য্যন্ত না হইলে চলিবে কি না? হাঁ কি না বল।"

"হাঁ।"

"তবে তুমি অকারণ এখানে সময় নষ্ট করিতেছ কেন? কালি পর্য্যন্ত—যতক্ষণ তুমি ফিরিয়া না আইস, ততক্ষণ পর্য্যন্ত—উহা তবে থাকিতে দেও।"

রাজা বিরক্তির সহিত চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি যেরূপ ভাবে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছ, আমার তাহা ভাল লাগিতেছে না। আমি অমন ভাবে কথা কাহারও নিকট হইতে শুনিতে চাহি না।"

চৌধুরী ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তোমার ভালর জন্যই আমি বলিতেছি। এ উপায়ে তুমিও সময় পাইবে, রাণীও সময় পাইবেন। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে? আমার কথা তোমার ভাল লাগিতেছে না, বটে? আমি তোমার মত কখনও রাগিতে জানি না, কাজেই আমার কথা তোমার ভাল লাগিবে কেন? এ পর্য্যন্ত তোমাকে কতই সদুপদেশ দিয়াছি, কিন্তু বল দেখি, কখন কি আমি

ভুল কথা বলিয়াছি? আর কথায় কাজ নাই। কি কাজে যাইতেছ, যাও এখন। তুমি ফিরিয়া আসার পর দস্তখতের কথা তুলিলেই হইবে। এখন উহা থাকিতে দেও।”

রাজা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া একবার ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন। যে গুরুতর কাজের জন্য তিনি কাহাকেও উদ্দেশ্য না জানাইয়া কোথায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাহার চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে লীলার নাম স্বাক্ষরের জন্য চিন্তা তাঁহাকে যেন কতকটা অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি একটু চিন্তার পর চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন,—“আমাকে কথায় হারাইয়া দেওয়া সোজা কাজ। আমার এখন জবাব দিবার সময় নাই। তোমার কথা মানি বা না মানি, শুনি বা না শুনি, এখন তোমার উপদেশমতই আমাকে কাজ করিতে হইতেছে। কারণ, আর এখানে অপেক্ষা করিলে চলিতেছে না।” তাহার পর লীলার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“কিন্তু শুন রাণি! কালি আমি ফিরিয়া আসার পর যদি নাম সহি না কর, তাহা হইলে—” দেরাজ খুলিয়া তাহার মধ্যে দলীল রাখিবার শব্দে কথার শেষ অংশ ভাল শুনা গেল না। তাহার পর তিনি বেগে বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় তিনি আবার তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—“মনে থাকে যেন—কালি।”

রাজা চলিয়া গেলে চৌধুরী মহাশয় আমার ও লীলার নিকট আসিয়া বলিলেন,—“মনোরমা দেবি, আজি আপনারা রাজার স্বভাবের চূড়ান্ত জঘন্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনেক দিনের বন্ধু—তাঁহার এই কদর্য্য ব্যবহারের নিমিত্ত আমি নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইতেছি। আমি অনেক দিনের প্রাচীন বন্ধু বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, কালি তিনি কখনই এরূপ লজ্জাজনক ব্যবহার করিতে পাইবেন না।”

লীলা আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয়ের কথা সাঙ্গ হইলে সে আমার হাত টিপিল। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের পক্ষে এতদপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? স্বামীর কোন মন্দ ব্যবহারের জন্য নিজ বাটীতেই স্বামীর এক জন পুরুষ বন্ধু উপস্থিত হইয়া, আহা, উহু ও দুঃখ প্রকাশ করিলে স্ত্রীলোকের সকল গৌরবই নষ্ট হইয়া যায়। চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একটু শিষ্টাচার করিয়া আমি লীলাকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিলাম। দুঃখ ও হীনতার কথা কি বলিব? রাজা যে কথা এখনই আমাকে বলিয়াছেন, অন্যে হইলে সে কথার পর কি আর এক দণ্ডও এখানে থাকিত? কিন্তু সে অভিমান, সে তেজ দূরে থাকুক, আমার এখন ভাবনা, পাছে আমি এখানে থাকিতে না পাই! কি সর্ব্বনাশের কথা! লীলার এই দুঃসময়ে আমি যদি তাহার কাছে থাকিতে না পাই! যেমন করিয়া হউক, আমার লীলার কাছে থাকিতেই হইবে। আমি বেশ বুঝিয়াছি, চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে আমার এখানে থাকিতে পাওয়া অসম্ভব হইবে।

আমরা বাহিরে আসিয়া রাজার গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইলাম। লীলা জিজ্ঞাসিল,—“দিদি, রাজা কোথায় যাইতেছেন বোধ হয়? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমার বড় ভয় হইতেছে।”

তাহার কোমল প্রাণ আজ অনেক কষ্ট সহিয়াছে, এ জন্য তাহাকে আমার সন্দেহের কথা বলিতে ইচ্ছা না হওয়ায় উত্তর দিলাম “তা আমি কেমন করিয়া জানিব দিদি!”

লীলা বলিল,—“গিন্নী-ঝি নিশ্চয়ই জানে।”

আমি বলিলাম—“নিশ্চয়ই না; সেও আমাদের মত কিছুই জানে না।”

“তুমি গিন্নী-ঝির কাছে শুন নাই কি, মুক্তকেশীকে ইহার মধ্যে এ অঞ্চলে দেখা গিয়াছিল? তুমি বুঝিতেছ না কি, তিনি হয় তো তাহারই সন্ধানে যাইতেছেন?”

“যাহাই হউক লীলা, এখন আর সে ভাবনায় কাজ নাই। আমার ঘরে এস, দুই ভগ্নীতে একটু ঠাণ্ডা হইয়া বসি চল।”

আমরা দুই জনে জানালার কাছে বসিলাম। তখন লীলা বলিল,—“দিদি, আমার জন্য তোমাকে যে কষ্ট সহিতে হইয়াছে, তাহা আমার মনে হইতেছে, আর তোমার মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা হইতেছে; আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু দিদি, যেমন করিয়া হউক, তোমার মন যাহাতে আবার শান্ত হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব।”

আমি বলিলাম,—“ছি দিদি, ও কথা ভাবিতেছ কেন? তোমার সুখ ও শান্তি যে ভয়ানকরূপে বিধ্বংসিত হইতেছে, তাহার তুলনায় আমার তুচ্ছ মানসিক ক্লেশ অতি সামান্য।”

লীলা অতি দ্রুত ও সজোরে বলিতে লাগিল,—“শুনিলে, তিনি আজ আমাকে কি বলিলেন? কিন্তু তুমি সে কথার ভাব কি জান না; কেন আমি কলম ফেলিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার

চেষ্টা করিলাম, তাহা তুমি জান না। তুমি কাতর হইবে জানিয়া, দিদি, আমি তোমাকে সকল কথা বলি নাই। আজ রাজা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দেখিয়াই বোধ হয়, তোমার প্রাণ আমার দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত কথা শুনিলে না জানি তোমার কি অসহ্য যাতনাই হইবে। তোমার যত কষ্ট হউক, তোমাকে সকল কথা না বলিলে আর চলিতেছে না। কিন্তু আমি এক্ষণে সে সকল কথা বলিতে অক্ষম। সমস্ত কথা মনে করিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছি না, আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। সে কথায় আর কাজ নাই—অন্য কথা কহ। যে দস্তখতের জন্য আজি এত কাণ্ড হইল, তাহা করিলেই হইত। কালি নাম সহি করিব কি? তুমি আমার পক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছ, এখন যদি আমি স্বাক্ষর না করি, তাহা হইলে সমস্ত দোষ তোমারই ঘাড়ে পড়িবে। এখন করা যায় কি? হায়, এ অবস্থায় আমাদের হিতৈষী উপদেশ দিবার কোন এক জন বিশ্বস্ত প্রকৃত আত্মীয় থাকিলে বড়ই ভাল হইত।"

লীলা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে যে এখন দেবেন্দ্রবাবুর কথাই ভাবিতেছে, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। লীলার কথার শেষভাগ শুনিয়া আমারও দেবেন্দ্রবাবুকে মনে পড়িল। দেবেন্দ্রবাবু বিদায়কালে আমাদের যখন তাঁহার নিকট কোন সাহায্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, কৃতার্থ হইয়া তখনই তাহা সম্পন্ন করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, লীলার বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই সেই প্রস্তাবিত সাহায্যের আবশ্যকতা উপস্থিত।

আমি বলিলাম,—"আমাদের সাধ্য যত দূর হইতে পারে, তাহার ত্রুটি করা হইবে না। কি করিলে ভাল হয়, লীলা, তাহাই এখন ধীরভাবে স্থির কর।"

লীলা তাহার স্বামীর অর্থঘটিত যেরূপ অপ্রতুলতার কথা জানিত এবং রাজা ও উকীলের যে সকল পরামর্শ আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাহা মিলাইয়া আমরা স্থির করিলাম যে, সে দলীল নিশ্চয়ই টাকা ধার করিবার খত এবং তাহাতে লীলার নাম স্বাক্ষর থাকা রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণই আবশ্যক। সে দলীলের মর্ম্ম কি এবং তদনুযায়ী সর্ত্তে লীলাকে কতদূর বাধ্য থাকিতে হইবে, এ সকল প্রশ্নের আমরা কোনই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই সে দলীল নিতান্ত নীচজনোচিত শঠতা ও প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ। রাজা দলীল দেখাইতে চাহেন নাই, অথবা তাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করেন নাই বলিয়াই যে আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে, এমন নহে। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি যতবার আনন্দধামে গতিবিধি করিতেন, সে সকল সময়ে যেরূপ ভাবে লীলা ও অন্যান্য সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, উকীল মণিবাবু আসার পর হইতে তাঁহার ব্যবহার সেইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনই তাঁহার সততা সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মাইয়াছে। লীলাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার উদ্দেশে তিনি আনন্দধামে নিরন্তর আপনাকে সম্পূর্ণ সততার আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিহিতবিধানে আমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হইল, অমনই তাঁহার সেই অলীক আবরণ উন্মুক্ত হইল এবং তাঁহার ঘৃণার্হ পাশব-প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সুতরাং তাঁহাকে আর বিশ্বাস করিতে মন যায় না। লীলার অদৃষ্ট যে কতই মন্দ, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। কিন্তু সে যাহাই হউক, না দেখিয়া ও না বুঝিয়া লীলাকে কখনই আমি সে দলীলে নাম সহি করিতে দিব না। অতএব কালি যখন নাম সহি করিবার কথা উঠিবে, তখন এমন একটা আইন ও ব্যবস্থাসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে যে, রাজার সঙ্কল্প তাহাতে উল্টাইয়া যাইবে এবং তিনি বুঝিবেন যে, মেয়েমানুষ হইলেও আইন-কানুন তিনিও যেমন বুঝেন, আমরা দুই জনও তেমনই বুঝিয়া থাকি। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমরা আমাদের উকীলের নিকট সমস্ত কথা লিখিয়া তাঁহার পরামর্শ লওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আমাদের প্রধান আত্মীয় উমেশবাবু শারীরিক অসুস্থতার জন্য কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়ায় করালীবাবু নামে আর এক জন ভদ্র উকীল তাঁহার কাজ নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোন আবশ্যক উপস্থিত হইলে করালীবাবুকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি, এ কথা উমেশবাবু আমাকে বলিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমি করালীবাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম সকল কথা যথাযথরূপে লিখিলাম। তাহার পর এরূপ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহার উপদেশ চাহিলাম। বাজে কথা একটিও না লিখিয়া, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে পত্র সমাপ্ত করিলাম। আমি যখন চিঠি শেষ করিয়া খামের উপর শিরোনাম লিখিতেছি, তখন লীলা বলিল,—"কিন্তু

কল্যকার সময়ের মধ্যে উত্তর পাইবে কিরূপে? তোমার এ পত্র কালি প্রাতে কলিকাতায় পৌছিবে, তাহার পর কাল্‌ই যদি ইহার উত্তর সেখানে ডাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পরশু সকালে আমাদের হাতে আসিতে পারে। তাহার উপায় কি?"

ঠিক কথা। এতক্ষণ এ কথা আমার মনে উদয় হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। যদি কোন লোক ইহার উত্তর হাতে করিয়া লইয়া আইসে, তাহা হইলে আমরা যথাসময়ের মধ্যে উকীলবাবুর উপদেশ পাইতে পারি, নচেৎ অন্য উপায় নাই। পত্রে একটা পুনশ্চ নিবেদন বলিয়া লোকের দ্বারা উত্তর পাঠাইবার কথা লিখিয়া দিলাম এবং সে লোক যেন আমার হাত ছাড়া কাহারও হাতে পত্র না দেয়, এ কথাও লিখিলাম। তাহার পর লীলাকে বলিলাম, —"এ অবস্থায় কালি বেলা ২টার সময়ে আমরা করালীবাবুর উত্তর পাইব, সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে কর, রাজা যদি ২টার পূর্ব্বেই বাটী ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য-বিষয়ে কোন উপদেশ পাইবার পূর্ব্বেই হয় ত দস্তখতের কথা তুলিবেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বিষম গোলে পড়িতে হইবে। অতএব কালি বেলা ১০টার পরই তুমি একখানি কেতাব হাতে করিয়া বিলের দিকে কাঠের ঘরে বসিয়া থাকিবে এবং ২টার আগে বাটী ফিরিবে না। এ দিকে আমি করালীবাবুর উত্তরের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিব। তাহা হইলে তাহাতে কোন গোল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। চল, এখন আমরা অন্য ঘরে যাই। এতক্ষণ আমরা দুই জনে এক ঘরে একত্রে থাকিলে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে।"

লীলা বলিল,—"সন্দেহ? রাজা তো বাটী নাই, তবে কাহার সন্দেহ? তুমি কি চৌধুরী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছ?"

"মনে কর তাই।"

"তাহা হইলে তাঁহার উপর আমারও যেমন অশ্রদ্ধা, তোমারও দেখিতেছি, ক্রমে সেইরূপ হই-তেছে।"

"না, না, অশ্রদ্ধার কথা নহে। অশ্রদ্ধা বলিলে সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘৃণার ভাব মিশিয়া থাকে। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে ঘৃণা করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই না।

"তা হউক, তুমি তাঁহাকে ভয় কর কি না, বল।"

"তা বোধ হয় কতকটা করি।"

"তিনি আমাদের পক্ষ হইয়া আজি এত মধ্যস্থতা করিলেন, তবু তুমি তাঁকে ভয় কর?"

"হাঁ, রাজার ঔদ্ধত্য অপেক্ষা চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যস্থতাকে আমি বেশী ভয় করি। আমি তোমাকে তখন যে কথা বলিয়াছি, তাহা মনে করিয়া দেখ। লীলা, আর যাহাই কেন কর না, চৌধুরী মহাশয়কে কখন শত্রু করিও না।"

আমরা নীচে আসিলাম। লীলা অন্য এক ঘরে চলিয়া গেল; বারান্দায় যে চিঠির থলিয়া ঝুলান থাকে, তাহারই মধ্যে আমি চিঠিখানি ফেলিয়া দিব বলিয়া সেই দিকে চলিলাম। যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম, চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে দেখিতে দেখিতে কি কথা বলাবলি করিতেছেন। আমি নিকটস্থ হইলে রঙ্গমতি ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া আমাকে একটা গোপনীয় কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় লোকের মুখে এরূপ প্রার্থনা শুনিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। তাহার পর থলিয়ায় আমার পত্র ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ভাবে আমার হাত ধরিয়া আমাকে ক্রমে ক্রমে প্রাসাদ-পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর তীরে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। না জানি কি কথাই তিনি বলিবেন! তিনি বলিলেন, আজ রাজা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট শুনিয়াছেন। তিনি সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর কখন যদি এরূপ কাণ্ড ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। পিসী ঠাকুরাণীর ন্যায় চাপা লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ আজি প্রাতে বিলের ঘরে একটু ঠোকামুকির পরও তাঁহার এ ব্যবহার নিতান্তই আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক, শিষ্টাচারের উত্তরে শিষ্টাচার করাই সঙ্গত মনে করিয়া আমি উপযুক্তভাবে তাঁহার উত্তর দিলাম। তাহার পর আমি চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কথা আজি আর ফুরায় না; তিনি আজি আমাকে ছাড়িতে চাহেন না। নিতান্ত বন্ধুভাবে হাত ধরিয়া পুকুরের চারিদিকে বেড়াইত বেড়াইতে তিনি যে কত গল্পই করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার আর কি বলিব? এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টাধিক কাল আমাকে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি একবার বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর হঠাৎ যে তিনি, সেই

তিনি! কথা নাই, বার্ত্তা নাই! সহসা তিনি আমার হস্তত্যাগ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তি চিরদিন যেমন গম্ভীর থাকে, তেমনই গম্ভীর করিয়া তুলিলেন। আমি পলাইয়া আসিলাম; প্রাসাদে আসিয়া প্রথম প্রকোষ্ঠের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলাম, চৌধুরী মহাশয় চিঠির থলিয়ার ভিতরে একখানি পত্র ফেলিয়া দিতেছেন। তিনি চিঠির থলিয়া বন্ধ করিয়া, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কোথায় আছেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথার ভাব ও মুখের আকৃতি দেখিয়া আমার বোধ হইল, হয় তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, না হয় মনের বিশেষ ভাবান্তর জন্মিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে, কেন বলিতে পারি না, থলিয়ায় আমি যে চিঠি দিয়াছিলাম, তাহা বাহির করিয়া আমার দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা দেখিয়া তাহার উপর গালার মোহর করিতে ইচ্ছা হইল। সকলেই জানেন, স্ত্রী-প্রকৃতি দুজ্ঞেয়। হয় তো আমার তাদৃশ দুরবগম্য স্ত্রী-প্রকৃতিই এ ইচ্ছার কারণ। যাহা হউক, পত্রখানি লইয়া আমি নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। খামারে গায়ে যে আঁঠা থাকে, তাহাতেই জল দিয়া আমি চিঠি আঁটিয়াছিলাম। এখন মোহর করিতে গিয়া দেখি, সহজেই তাহা খুলিয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে এরূপে চিঠি খুলিয়া যাওয়া বড় আশ্চর্য্য। হয় তো আঁঠাটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল; অথবা হয় তো,—না না, সে সন্দেহ মনে করিতেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। সে সন্দেহ লিখিবারও অযোগ্য।

এখন কালি কি হইবে? কালিকার জন্য অনেক কৌশল চাই। দুইটি বিষয়ে আমাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রথম, চৌধুরী মহাশয়ের সহিত খুব বন্ধুভাব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে; দ্বিতীয়, উকীলের আফিস হইতে যখন লোক আসিবে, তখন আমাকে খুব সাবধান থাকিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ।—বিকালে চৌধুরী মহাশয় নানা প্রকার মিষ্ট গল্পে আমাদিগকে বড়ই আমোদিত করিলেন। নানা দেশের নানা প্রকার লোকের, নিজের বালককালের নানা সরস বৃত্তান্ত তিনি এমনই মিষ্টভাবে ও আমোদ সহকারে গল্প করিতে লাগিলেন যে, আমরা আমোদিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ গল্প করার পর তিনি পাঠ করিবার জন্য পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেন। লীলা তখন বিলের দিকে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল। শিষ্টাচারের অনুরোধে আমরা পিসী-মা ঠাকুরাণীকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলাম। বোধ হয়, তাঁহার স্বামীর নয়ন সম্মতিসূচক আদেশ প্রচার করে নাই, কাজেই তিনি একটা ওজর করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। তখন লীলা ও আমি বেড়াইতে চলিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ দিকে যাইতে হইবে?"

লীলা উত্তর দিল,—"চল, বিলের দিকেই যাওয়া যাউক।"

"লীলা, সেই ভয়ানক বিলটা তোমার বড় ভাল লাগে?"

"না দিদি, বিলটার চেয়ে তার চারিদিকের দৃশ্য আমার বড় ভাল লাগে। সেখানকার গাছপালা দেখিয়া আমার আনন্দধামের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তোমার যদি সে দিকে যাইতে মন না হয়, তবে চল, অন্য দিকেই যাওয়া যাউক।"

"আমার পক্ষে সকল দিক্‌ই সমান। চল বিলের দিকেই যাই সে দিক্‌টা হয় তো একটু ঠাণ্ডা হইবে।"

আমরা আবাদের ভিতর দিয়া নিঃশব্দে বিলের দিকে চলিলাম এবং কাঠের ঘরে গিয়া বসিলাম। আকাশে বড় মেঘ হইয়া আসিল; সন্ধ্যারও অধিক বিলম্ব নাই। বোধ হইল, সন্ধ্যার পর খুব বৃষ্টি হইবে।

লীলা বলিল,—"এ স্থানটা নিতান্ত জনহীন ও ভয়ানক হইলেও এখানে আমাদের নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমার বিবাহিত জীবনের প্রকৃত অবস্থা তোমাকে এক দিন জানাইতে চাহিয়াছিলাম। দিদি, জীবনের মধ্যে তোমার কাছে কখন কিছু লুকাই নাই, কেবল এই বিষয়টা লুকাইয়াছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন কোন কথা তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিব না। তোমারই জন্য, কতকটা আমার নিজেরও জন্য, আমি এত দিন নির্ব্বাক্ ছিলাম। যাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করা হইয়াছে, সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না, এ কথা স্বীকার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই কঠিন। দিদি, যদি নিতান্ত অসময়ে তোমার স্বামীর মৃত্যু নাই হইত এবং যদি তাঁহার সহিত তোমার প্রাণের ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে তুমি আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতে।"

আমি কি উত্তর দিব? উভয় হস্তে তাহার

হস্ত ধারণ করিয়া আমি অতীব উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লীলা আবার বলিতে লাগিল,—"কত সময়েই তোমার নিজের নির্ধনতার কথা তোমার মুখে আমি শুনিয়াছি, কত সময়েই আমার ধনসম্পত্তির জন্য তোমাকে আনন্দ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও দিদি, যে নির্ধনতা হেতু তোমার স্বাধীনতা ধ্বংস হয় নাই এবং সম্পত্তির জন্য আমার অদৃষ্টের যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহা তোমার হয় নাই।

নব-বিবাহিতা কামিনীর মুখে এ কথা নিতান্তই বিষাদ-জনক সন্দেহ নাই। বিবাহের পর এই রাজ-বাটীতে একত্রাবস্থান করায় তাহার স্বামী যে লোভে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন তাহা আর আমার বুঝিতে বাকী ছিল না। লীলা বলিতে লাগিল,—"কত অল্প সময়ের মধ্যেই এবং কিরূপ ভাবে আমার যাতনা ও মর্ম্মব্যথা আরম্ভ হয়, তাহা শুনিয়া তুমি কাতর হইও না দিদি। আগ্রা নগরে রাজার সহিত একত্রে আমি তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম। পৃথিবীর মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ সৌধ স্ত্রীর স্মরনার্থ স্বামীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে মনে হওয়ায় আমারও নিজ স্বামীর প্রতি তখন বড় ভক্তি, মমতা ও প্রেমের উদ্রেক হইল তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, 'রাজা, আমার মরণের পর আমার স্মৃতির জন্য তুমিও একটা সৌধ নির্ম্মাণ করিবে না কি? আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে তুমি বলিতে, আমাকে বড়ই ভালবাস। কিন্তু বিবাহের পর হইতে,'—আমার আর বলা হইল না। দিদি, বলিব কি তোমাকে, তিনি আমার দিকে চাহিয়াও ছিলেন না। আমার চোখের জল তিনি দেখিতে না পান ভাবিয়া আমি মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলাম। আমার কথা তিনি শুনেন নাই মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে। তিনি সব শুনিয়া-ছিলেন। কারণ, গাড়ীতে উঠিয়া তিনি বলিলেন,—'যদিই তোমার স্মরণার্থই কোন চিহ্ন স্থাপন করি, তাহা তোমার টাকাতেই করিব। মমতাজ বিবির রোজা তাঁহার নিজের টাকায় হয় নাই বোধ হয়। কিন্তু আমি তখন কাঁদিতেছি, উত্তর দিব কি? তিনি বলিলেন,—'এই সব বই-পড়া মেয়েমানুষ-গুলা কেমন এক রকম! তুমি চাও কি? দুটা মিষ্ট কথা, দুটা উপন্যাসের মত প্রেমের আলাপ! মনে কর না কেন, তাহাই হইল। সে জন্য গোল কিসের?' আমি আর কাঁদিলাম না। তখন হইতে দেবেন্দ্রবাবুর কথা মনে হইলে আমি আর সে চিন্তা হইতে কদাপি চিত্তকে বিরত করি নাই। যে সময়ে আমরা গোপনে উভয়ে উভ-য়কে ভালবাসিতাম, সেই সময়ের স্মৃতি আসিয়া তখন হইতে আমার চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিল। আর এ হৃদয়-জ্বালা-নিবারণের উপায় কি ছিল? তুমি যদি কাছে থাকিতে দিদি, তাহা হইলে হয় তো চিত্ত কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত। আমি জানি, তাদৃশ চিন্তা ন্যায়পথ-বিবর্জ্জিত। কিন্তু বল তুমি, তখন আমি করি কি?"

আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম,—"আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার প্রাণে যে জ্বালা হইয়াছে, তাহা কি আমার হইয়াছে? তবে এ বিচারে আমার কি অধিকার?"

লীলা বলিতে লাগিল,—"যখন রাজা নাচ-তামাসা দেখিবার জন্য বেড়াইতে যাইতেন, তখন আমি একা বসিয়া কেবল দেবেন্দ্রবাবুর কথাই ভাবি-তাম। যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে এত ধন না দিতেন, যদি আমি দরিদ্র হইতাম, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে তাঁহার পত্নী হওয়া ঘটিত, আর তাহা হইলে আমার কি সুখই হইত। সেরূপ দরিদ্রের গৃহিণী হইলে আমার যেমন বসন-ভূষণ হইত, তাহা আমি মনে মনে কল্পনা করিতাম, আর ভাবিতাম, যখন কঠোর পরিশ্রমের পর আমার দরিদ্র স্বামী আমাদের পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিতেন, তখন কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিব, কেমন করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিব ও কেমন করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিব, তাঁহার জন্য স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিব এবং তিনি যতক্ষণ আহার করিবেন, ততক্ষণ কেমন করিয়া পাখা হাতে লইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাকিব, ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিতাম। ঈশ্বর করুন, তাঁহার জন্য আমার যত ভাবনা হয় এবং মনের চক্ষে সর্ব্বদা তাঁহাকে আমি যেমন দেখিতে পাই, আমার জন্য তাঁহার যেন কখন তেমন না হয়।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে লীলার বিলুপ্ত কোমলতা যেন আবার ফিরিয়া আসিল, যেন তাহার বিলুপ্ত সৌন্দর্য্যরেখা সকল আবার তাহার বদনে দেখা দিতে লাগিল। আবার তাহার দৃষ্টিতে যেন সেই ভূতপূর্ব্ব মধুরতার আবির্ভাব হইল। আমি বলি-লাম,—"দেবেন্দ্রের কথা আর বলিও না; সে কথার আর কাজ নাই লীলা।"

অতীব স্নেহের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লীলা বলিল,—"তোমার যদি তাহাতে কষ্ট হয়, তবে সে কথা আর কখনই বলিব না দিদি।"

আমি বলিলাম, "তোমারই ভালর জন্য আমি তোমাকে সাবধান করিতেছি। মনে কর, যদি তোমার স্বামী তোমার এই কথা শুনিতে পান,—"

"তাহা হইলে তিনি একটুও বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন না।"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম,—"বল কি লীলা, তিনি বিস্মিত হইবেন না? তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে।"

লীলা বলিল,—"তাহাই তো তোমাকে বলিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। যখন আমি আনন্দধামে রাজার নিকট মনের কথা ব্যক্ত করি, তখন কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট লুকাই নাই, তাহা তো তুমি জান। কেবল নামটি তাঁহাকে বলি নাই, তাহাও তিনি জানিয়াছেন।"

তাহার কথা শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না। লীলা বলিতে লাগিল,—"বিবাহের পর যখন আমরা দিল্লী নগরে গিয়াছিলাম, তখন সেইখানে এক জন পূর্ব্ব-পরিচিত বড় জমীদার সপরিবারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর লেখাপড়ায় বিশেষ যত্ন এবং তিনি কবিতা লিখিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি স্বামীর সহিত সতত বাহিরে বেড়াইতেন এবং প্রকাশ্যরূপে লোকসমাজে কথাবার্ত্তা কহিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক রাত্রে তাঁহাদের বাসায় রাজার ও আমার এবং আরও কোন কোন লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। জমীদারণী বিশেষ অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া সেই সভায় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। আমি সে কবিতার বিশেষ প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুশিক্ষাকে ধন্যবাদ দিই। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাকে বড় ভালবাসিতেন; সে দিন আমার প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—"ভগ্নি, আমার যদি কোন শিক্ষা হইয়া থাকে, সে জন্য আমার অপেক্ষা আমি যাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছি, তিনিই অধিকতর প্রশংসা-ভাজন। আমার উন্নতির জন্য তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার সীমা ছিল না। তাঁহার বিদ্যা এবং শিক্ষা দিবার কৌশল যথেষ্ট। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ বসু। ভগ্নি, তোমার লেখা-পড়ায় যেরূপ অনুরাগ এবং বুদ্ধির যেরূপ প্রাখর্য্য, তাহাতে তুমি কিছুকাল যদি তাঁহার নিকটে শিক্ষা করিতে পাও, তাহা হইলে তোমার যে কত উন্নতি হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার চিত্তের যে ভাব হইল, তাহা তোমাকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। দেবেন্দ্রবাবুকে আমি দেবতা জ্ঞান করি, এক জন অপর স্ত্রীলোকের মুখে তাঁহারই প্রশংসা শুনিয়া আমার শত-সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াও আমার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং আমি নিরুত্তরে অধোমুখ হইয়া রহিলাম। আমার স্বামী নিকটেই ছিলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন এবং আমার ভাবান্তরও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমরা বাসায় ফিরিয়া আসার পর, তিনি প্রথমেই আমাকে টানিয়া বিছানায় ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার পর আমার গলায় হাত দিয়া বলিলেন,—'এত দিনে তোমার গুপ্ত প্রণয়ী কে, তাহা জানিতে পারিয়াছি। যে দিন তুমি আনন্দধামে তোমার হৃদয়ের অন্য প্রেমিক আছে স্বীকার করিয়াছ, সেই দিন হইতে আমি নিরন্তর তোমার প্রাণবল্লভের নাম কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতেছি। এত দিন পরে আজি জানিতে পারিয়াছি, তোমার মাষ্টার দেবেন্দ্রবাবুই তোমার মনচোরা নাগর। কলিকাতায় তো ফিরিয়া যাই আগে, তাহার পর দেখিব, তোমাকে ও তোমার সেই প্রাণবল্লভকে আজীবনকাল নাকে কাঁদিতে হয় কি না। এখন আমার চাবুকের চোটে রক্তাক্তকলেবর তোমার সেই মনচোরা মাষ্টারকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রা যাও।' সেই অবধি যখন তিনি আমার উপর বিরক্ত হন, তখনই ঐ উপলক্ষে আমাকে ভৎ'সনা বা তীব্র বিদ্রূপ না করিয়া ছাড়েন না। আজি যখন তিনি, তাঁহাকে আমি দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তখন সে কথা শুনিয়া, দিদি, তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলে। কিন্তু দিদি, সেরূপ কথা আমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে। আমি যুক্তি-তর্ক, বিনয়-প্রকাশ, সততার প্রমাণ-প্রদর্শন এবং তাঁহার অনুরাগ লাভের চেষ্টা করিতে কোনরূপ ক্রটি করি নাই। কিন্তু বলিব আর কি? আমার কপালগুণে আমার প্রতি তিনি চিরদিনই বাম।"

হায়, কি দুষ্কর্ম্মই আমি করিয়াছি! আমি যদি যথাকালে এ বিবাহের প্রতিকুলতা করিতাম, তাহা হইলে এ স্বর্ণলতার কখনই এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।

হায়, যে দিন আমি আনন্দধামে নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় দেবেন্দ্রকে এ বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলাম, তখন তাঁহার সেই হতাশ বদনের কাতরভাব এখনও আমার মনে উদয় হইয়া আমাকে নিতান্ত ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। হায়, কেন, আমি দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া লীলাকে তাহার প্রাণের প্রাণের বক্ষে তুলিয়া না দিয়া, ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে তাহার নিকট হইতে দূর হইতে দুরান্তরে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম? কাহার জন্য এ কার্য্য আমি করিয়াছি? রাজা প্রমোদের জন্য! ধিক আমাকে! অসহ্য মনস্তাপে তখন আমার হৃদয় ব্যথিত। লীলা আমাকে চুম্বন করিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্তর্জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল,—"অনেক দেরী হইয়াছে। চল দিদি, আরও দেরী হইলে অন্ধকার হইয়া পড়িবে।"

বস্তুতই তখন কতকটা অন্ধকার হইয়াছিল। দূরে বিলের ধারে বাষ্প ও শিশির মিলিয়া যেন ধোঁয়ার মত দেখাইতেছিল। তাহারই সহিত সন্ধ্যার অন্ধকার মিশিয়া কেমন এক রকম দেখাইতেছিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম,—"চল তবে।"

লীলা অগ্রে ও আমি তাহার পশ্চাতে চলিলাম। দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে লীলা ভয়ানক কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "দিদি, দিদি, দেখ দেখ,—ও কি?"

আমি বলিমাম,—"কোথায় কি?"

লীলা 'ঐ যে, ঐ যে' বলিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল। আমি দেখিলাম, সেই ধূমাচ্ছন্ন প্রদেশে, আমাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া এক নিতান্ত অস্পষ্ট সজীব মনুষ্য-মূর্ত্তি। সজীব, কারণ, কিয়ৎকাল আমাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া অবস্থিতি করার পর মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল এবং অবিলম্বে পার্শ্বস্থ বনান্তরালে অদৃশ্য হইল। আমরা কিয়ৎকাল দারুণ চলৎশক্তিবিরহিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমরা ভবনোদ্দেশে চলিতে আরম্ভ করিলে লালা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসিল,—"দিদি মেয়েমানুষ না পুরুষমানুষ?"

"ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

"যেন মেয়েমানুষই মনে হইল।"

"আমার যেন বোধ হয়, একটা লম্বা জামা গায়ে দেওয়া পুরুষমানুষ।"

"তাই হবে। কিন্তু কিছুই ভাল করিয়া বুঝা গেল না। মনে কর দিদি, ঐ মূর্ত্তি যদি আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আইসে?"

"না লীলা, সে রকম ভয়ের কোনই কারণ নাই। নিকটে গ্রাম হইতে এ বিল ত অধিক দূর নহে, হয় তো গ্রাম হইতেই কোন লোক এ দিকে আসিয়া থাকিবে। এত দিনের মধ্যে কখনও যে আমরা এ দিকে লোকজন দেখি নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।"

আমরা তখন বিলের অঞ্চল ছাড়াইয়া আবাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। পথ বড় অন্ধকার। আমরা দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া যতদূর সাধ্য বেগে চলিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসার পর লীলা আপনি থামিল এবং আমাকেও থামাইয়া বলিল,—"কথা কহিও না। দিদি, কিছু শুনিতে পাইতেছ কি?"

আমি তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম,—"ও কিছু নয়। বাতাসে শুক্‌না পাতা-নড়ার শব্দ।"

"না দিদি, ঐ শুন। বাতাসের নাম নাই, পাতা নড়িবে কেন?"

আমিও শুনিতে পাইলাম, যেন আমাদের পশ্চাতে অতি মৃদুপাদবিক্ষেপের শব্দ হইতেছে। বলিলাম,—"যাহাই কেন হউক না, খানিকটা দূর গেলেই আমরা চীৎকার করিলে বাড়ীর লোক শুনিতে পাইবে, চল।"

আমরা বেগে দৌড়িতে লাগিলাম, লীলা প্রায় রুদ্ধশ্বাসা হইয়া পড়িল। এ দিকে প্রাসাদের আলোকিত জানালাও দেখিতে পাওয়া গেল। লীলাকে একটু জিরাইতে দিবার জন্য আমরা সেখানে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলাম। তখন লীলা আবার আমাকে কান পাতিয়া শুনিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিল। তখন আমরা উভয়েই আমাদের পশ্চাতের বৃক্ষাবলীর মধ্য হইতে সুদীর্ঘ কাতর নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম। আমি সজোরে জিজ্ঞাসিলাম,—"কে ওখানে?"

কোন উত্তর নাই। আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"কে ওখানে?"

কিয়ৎকাল কোনই শব্দ শুনা গেল না। তাহার পর যেন ধীরে ধীরে মৃদুপাদক্ষেপধ্বনি নিঃশব্দতার সহিত মিশিয়া গেল। আমরা আর কথাটিও না কহিয়া বেগে চলিতে লাগিলাম এবং অবিলম্বে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! সেখানে আলোকিত প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া লীলা

আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দিদি, ভয়ে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। এখন কে লোকটা, অনুমান কর দেখি।"

আমি বলিলাম,—"কালি তাহার বিচার করিব। আপাততঃ এ কথা আর কাহাকেও বলিও না।"

"কেন?"

"কারণ, বোবার শত্রু নাই। আর এ বাটীতে আমাদের বিশেষ সাবধান থাকাই আবশ্যক।"

লীলাকে বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিলাম এবং নিজে কিছু কাল সেখানে দাঁড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলাম, তাহার পর এই বিষয়ে যতদূর সম্ভব সন্দেহ মিটাইবার জন্য একখানি পুস্তকের ওজরে কেতাব-ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সেখানে চৌধুরী মহাশয় একখানি কৌচের উপর অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় পড়িয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সহিত একখানি বই পড়িতেছেন। তাঁহার স্ত্রী পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিয়া স্বামীর জন্য এক জোড়া মোজা বুনিতেছেন। তাঁহারা যে বাহিরে গিয়াছিলেন এবং এখনই ব্যস্ত ভাবে বাটী ফিরিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিয়া এমন কোন লক্ষণই বোধ হইল না। আমাকে দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় সন্নিহিত একখানি হাতপাখা টানিয়া লইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিলেন,—"মনোরমা দেবী, মোটা মানুষ হওয়াটা কি বিড়ম্বনা! দেখুন দেখি, গরমে আমার প্রাণ যায়, আর আমার স্ত্রীকে দেখুন, এত গরমেও যেন পুকুরের মাছ।"

রঙ্গমতি ঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে সগৌরবে ও রসিকতার ভাবে বলিলেন,—"আমি কখনই গরম হই না।"

চৌধুরী মহাশয় আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"মনোরমা দেবী, আপনি একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন কি?"

প্রয়োজন না থাকিলেও আমি তখন উদ্দেশ্য ঠিক রাখিবার জন্য আলমারী হইতে একখানি বই খুঁজিতে খুঁজিতে উত্তর দিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ, আমরা একটু হাওয়া খাইতে গিয়াছিলাম।"

"কোন্ দিকে?"

"বিলের দিকে,—কাঠের ঘর পর্য্যন্ত।"

"ওঃ! অত দূর?"

অন্য সময় হইলে আমি তাঁহার এত জিজ্ঞাসায় মনে মনে বিরক্ত হইতাম, কিন্তু আজি বিরক্ত না হইয়া সন্তোষের সহিত মীমাংসা করিলাম যে, তিনি কিংবা তাঁহার স্ত্রী, আমরা বিলের নিকট যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহার সহিত কোন ক্রমেই সংসৃষ্ট নহেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আপনি সে দিকে গেলেই একটা কাণ্ড না দেখিয়া ফিরেন না। আজি আবার সেই আহত বিলাতী কুকুরের মত কোন কাণ্ড আপনার চক্ষে পড়ে নাই তো?"

প্রশ্নসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার দুরবগম্য, তীক্ষ্ণ, অস্থিরকারী দৃষ্টি আমার নয়নের সহিত সম্মিলিত করিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টিতে আমি নিতান্ত বিচলিত হই এবং তিনি আমার অন্তরের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। অন্তও তাহাই হইল। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—"না—কোন কাণ্ডই তো ঘটে নাই।"

সে দিক্ হইতে নয়ন ফিরাইয়া আমি গৃহত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলাম। সেই সময়ে রঙ্গমতি ঠাকুরাণী কথা না কহিলে চৌধুরী মহাশয়ের সেই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ হইতে আমি সরিয়া যাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। চৌধুরাণী বলিলেন,—"বেশ মনোরমা দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?"

চৌধুরী মহাশয় সেই কথায় তাঁহার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইলেন; আমিও সেই অবকাশে একটা ওজর করিয়া চলিয়া আসিলাম; লীলার নিকটে কিছু কাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে লীলার এক জন দাসী তথায় উপস্থিত হইল। তাহার কাছে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় ভাবিয়া আমি এ কথা ও কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"ওঃ আজি কি গরম! আমার প্রাণ যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তোমাদের নিচেকার ঘরে কেমন গরম ঝি?"

"কই না; বিশেষ কি গরম মাসী-মা!"

"তবে বুঝি তোমরা আবাদের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলে, তাই বেশী গরম টের পাও নাই।"

"আমরা কেহ কেহ তাই মনে করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বামুন ঠাকরুণ উঠানে মাদুর বিছাইয়া রূপকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কাজেই সেখান হইতে কাহারও নড়া হইল না।"

এখন একবার গিন্নী-ঝির কাছে সন্ধান করিতে পারিলেই এ দিকের সন্ধান শেষ হয়, ভাবিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসিলাম,—"গিন্নী-ঝি এতক্ষণ শুইয়াছেন কি?"

ঝি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল,—"শোওয়া

দূরে থাক্, তিনি হয় তো এখন উঠিবার যোগাড় দেখিতেছেন।”

“কেন? তিনি কি দিনেই ঘুমাইয়াছেন না কি?”

“না মাসী-মা', তিনি সন্ধ্যার সময় হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এখনও হয় তো ঘুমাইতেছেন।”

তবেই দাঁড়াইতেছে, বিলের নিকট লীলা ও আমি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহা রঙ্গমতি দেবীর, তাহার স্বামীর, অথবা বাটীর কোন দাসীর মূর্ত্তি নহে। তবে সে কে? স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। মূর্ত্তিটা পুরুষ কি স্ত্রীমূর্ত্তি, তাহাই আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে অক্ষম। আমার যেন বোধ হয়, তাহা স্ত্রী-মূর্ত্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ।—রাত্রে শয়ন করার পর লীলার সকল কষ্টের কারণস্বরূপ বর্ত্তমান বিবাহের সহায়তা করায় বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত কাতর-হৃদয়ে ভূতকালের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে লাগিলাম। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আমার তৎকালীন কার্য্যের ফল যতই মন্দ হউক, আমি সকলই সৎ ও শুভ অভিপ্রায়েই করিয়াছি। তখন এই অপ্রতিবিধেয় দুর্দ্দশার কথা বিচার করিতে করিতে আমি না কান্দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই ক্রন্দনে আমার বিশেষ উপকার হইল। স্থির-প্রতিজ্ঞার সহিত গাত্রোত্থান করিলাম যে, রাজা যতই অপমান বা তিরস্কার করুন, আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপও করিব না। আমি লীলার জন্যই এখানে আছি, লীলার জন্যই থাকিব এবং তাহারই জন্য সকলই অকাতরে সহ্য করিব।

সকালে উঠিয়া কালিকার সেই মূর্ত্তি ও পদধ্বনির বিষয় ভাবিব কি, লীলার এক ভয়ানক দুঃখের কারণ উপস্থিত হওয়ায় কিছুই হইল না। আমি লীলার বিবাহের সময় তাহাকে একগাছি সোনার চিক দিয়াছিলাম। লীলা এই দরিদ্র ভগ্নীপ্রদত্ত সেই চিকগাছটিকে প্রাণের মত ভালবাসিত। তাহার হীরামতিখচিত কত রকমেরই জড়াও চিক ছিল, কিন্তু লীলা সে সকল উপেক্ষা করিয়া আমার এই চিকগাছিটি সর্ব্বদা ব্যবহার করিত। সে গাছটি হারাইয়া যাওয়ায় লীলা বড়ই দুঃখিত হইল। আমরা অনুমান করিলাম, হয় কাঠের ঘরে, না হয় আমাদের মধ্যের পথে তাহা পড়িয়া গিয়াছে। লোকজন পাঠাইয়া দেওয়া হইল না। শেষে বেলা বারোটার সময় লীলা নিজে তাহার সন্ধান করিতে গেল। সে তাহা পায় না পায়, উকীলের পত্র হস্তগত হইবার পূর্ব্বে তাহার এই ওজরে বাহিরে থাকা হইবে, সুতরাং রাজা ইহার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেও তাহাকে দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

একটা বাজিল। উকীলের লোক আসিবার সময় তো হইল। এখন তাহার অপেক্ষায় আমি এখানেই থাকিব, কি প্রাসাদের বাহিরে ফটকের পার্শ্বে গিয়া দাড়াইয়া থাকিব? এ বাটীর সকলের উপরেই আমার যে প্রকার সন্দেহ, তাহাতে সকলের চক্ষু ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করাই ভাল মনে হইল। চৌধুরী মহাশয় মনুয়া পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন, তাহাদের সহিত সিস্ দিতেছেন, নাম ধরিয়া এক একটাকে ডাকিতেছেন, সে সকল শব্দ স্পষ্টই শুনা যাইতেছে, সুতরাং তাহার জন্য কোন ভয় নাই। আর দেখিলাম, রঙ্গমতি ঠাকুরাণী ঘরে বসিয়া মোজা সেলাই করিতেছেন। এই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া আমি নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

প্রাসাদ হইতে যে রাস্তা রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে বাহির হইয়াছে, কিয়দ্দূর সোজা আসার পর তাহা বাঁকিয়া গিয়াছে। যে স্থলে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে, সে মোড়ের উপর এক জন দ্বারবান্ থাকিবার জন্য একটি ছোট কুঠুরী দিল। আমি সেই কুঠুরীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উকীলের লোকের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতিকালমধ্যেই গাড়ীর শব্দ পাইয়া বুঝিলাম, ষ্টেশনের দিক্ হইতে অবশ্যই কেহ আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি ভাড়াটিয়া ছক্কর আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি কোচ্ম্যানকে থামিতে সঙ্কেত করিলাম। গাড়ী থামিলে একটি ভদ্রলোক, কেন হঠাৎ গাড়ী থামিল, দেখিবার জন্য মুখ বাহির করিলেন। আমি বলিলাম,—“মহাশয় বোধ হয়, এই কৃষ্ণসরোবরের রাজবাটীতেই গমন করিতেছেন?”

“হাঁ দেবি!”

“কাহারও জন্য কোন চিঠি লইয়া যাইতেছেন কি?”

“শ্রীমতী মনোরমা দেবীর জন্য একখানি চিঠি লইয়া যাইতেছি।”

“আমিই মনোরমা, আপনি আমাকে পত্র দিতে পারেন।”

ভদ্রলোক বিনীতভাবে আমাকে নমস্কার করিয়া, তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং আমার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। আমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র খাম ছিঁড়িয়া পত্রপাঠে নিযুক্ত হইলাম। সাবধানতার অনুরোধে মূল পত্র নষ্ট করিয়া এ স্থলে তাহার নকল রাখিলাম।

"বিহিত বিনয় সহকারে নিবেদন—

অদ্য প্রাতে আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। যত দূর সম্ভব সরলভাবে ও সংক্ষেপে আমি তাহার উত্তর দিতেছি।

বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলাম রাণী লীলাবতী দেবীর যে দুই লক্ষ টাকার স্বাধীন সম্পত্তি আছে, তাহাই আবদ্ধ রাখিয়া কিছু টাকা ধার করিবার জন্য এই কাণ্ড হইতেছে। এক্ষণে সে সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে রাণীর অধীন। এ জন্য তাঁহার স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। ইহাতে অন্য কোন অনিষ্ট না হইলেও রাণীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিবে, তাহাদের স্বার্থের হানি হওয়া সম্ভাবিত। তদ্ব্যতীত তাহাতে আপত্তির এবং আশঙ্কার আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে।

এই সকল গুরুতর কারণে প্রথমে দলীল আমাকে না দেখাইয়া এবং আমার সম্মতি না লইয়া রাণী যেন কদাপি তাহাতে নাম স্বাক্ষর না করেন। এ প্রস্তাবে কোনই আপত্তি উত্থাপিত হওয়া অসঙ্গত। কারণ, দলীল যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে তাহা দেখাইতে কোনই সঙ্কোচ হইতে পারে না।

এ বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে যখন যে পরামর্শ জিজ্ঞাসিবেন, আমি তাহারই যথাসম্ভব সদ্যুক্তি সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করিব। ইতি—

অনুগত

শ্রীকরালীপ্রসন্ন ঠাকুর।"

পত্র পাঠ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আর কিছু হউক না হউক, লীলাকে নাম সহি করিবার জন্য আবার জেদ করিলে একটা জবাব দিবার উপায় হইল। পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে আমি পত্রবাহক মহাশয়কে বলিলাম,—"আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন যে, পত্রের মর্ম্ম আমি প্রণিধান করিয়াছি এবং বড় বাধিত হইয়াছি। আপাততঃ অন্য উত্তরের প্রয়োজন নাই।"

যখন আমি সেই উন্মুক্ত পত্র হস্তে ধরিয়া ভদ্রলোকটিকে এই সকল কথা বলিতেছি, তখন রাস্তার মোড়ের দিক্ হইতে চৌধুরী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ সহসা তিনি উপস্থিত হইলেন যে, ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া যেন তিনি সমাগত হইলেন বলিয়া আমার বোধ হইল। তাঁহার এরূপ অসম্ভাবিতভাবে এরূপ স্থলে আবির্ভাব দেখিয়া আমি এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম যে, লোকটি বিদায় হইয়া নমস্কারান্তে শকটে আরোহণ করিল, কিন্তু আমি তাঁহার সহিত সামান্য শিষ্টাচার ও সৌজন্যও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অন্য কোন লোক নহে— চৌধুরী মহাশয় আমার অভিসন্ধি নিশ্চয়ই জ্ঞাত হইয়াছেন, এ চিন্তা আমাকে পাষাণবৎ অচল ও সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তুলিল।

অণুমাত্র বিস্ময় বা কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া এবং সেই শকট বা তাহার আরোহীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চৌধুরী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,— "মনোরমা দেবি, আপনি কি বাড়ীর দিকে ফিরিতেছেন?"

আমি চিত্তকে যথাসাধ্য প্রকৃতিস্থ করিয়া সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলাম। তিনি আবার বলিলেন,—"চলুন, আমিও ফিরিতেছি। আপনি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন না কি?"

আমি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি। তাঁহার শত্রুতা করিব না, ইহা স্থির। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে দেখিয়া আপনি আশ্চর্য্য মনে করিতেছেন কেন?"

আমি আমার বিকম্পিত কণ্ঠস্বর স্থির করিয়া উত্তর দিলাম,—"আমি এখনই শুনিয়া আসিলাম, আপনি আপনার পাখী লইয়া আমোদ করিতেছেন। তাহার পর কেমন করিয়া হঠাৎ এখানে আসিলেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"না আসিয়া থাকি কিরূপে? দেখিলাম, আপনি বাটীতে নাই। বুঝিলাম, আপনি অবশ্যই কোন কাজের জন্য বাহিরে আসিয়াছেন এবং কেহই আপনার সঙ্গে নাই বুঝিয়া আমি স্থির থাকিতে পারি কি? আমি তৎক্ষণাৎ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আপনার সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু কোথাও আপনার সন্ধান না পাইয়া হতাশভাবে বাটী ফিরিতেছিলাম, এমন সময় বিধাতা পথের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিলেন।"

এইরূপে আমার প্রতি অযথা কৃপা ব্যক্ত করিতে করিতে তিনি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, আমি কোন কথা বলিবারই অবসর পাইলাম না। এত কথা তিনি বলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু একবারও আমার হস্তে তখনও যে পত্র রহিয়াছে,

তাহার সম্বন্ধে কোনই কৌতূহল প্রকাশ বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না, এ সম্বন্ধে তাঁহার এতাদৃশ ধৈর্য্য দেখিয়া আমি স্পষ্টই অনুমান করিলাম যে, লীলার হিতার্থ আমি উকীলের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তাহার মর্ম্ম তিনি কোন অসদুপায়ে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আর আমি উকীলের নিকট হইতে যে তাহার উত্তর পাইলাম, ইহাও তিনি গোপনে অবস্থান করিয়া দেখিলেন। সুতরাং তাঁহার অভীষ্ট বিলক্ষণ সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা বাটীতে ফিরিয়া দেখিলাম, সহিস আস্তাবলে টম্‌টম্ ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেখিয়া রাজা ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন, আর কিছু হউক না হউক্, তাঁহার নিতান্ত রুক্ষ-ভাবটা যেন একটু কমিয়াছে বোধ হইল। তিনি বলিলেন,—"তোমরা দুই জনে ফিরিয়া আসিলে, সেও ভাল। পালানে ধাড়ীর মত সকলেই বাড়ী ছাড়িয়া থাকার মানে কি? রাণী কোথায়?"

লীলার চিক হারাইয়া গিয়াছে এবং চিকের সন্ধানে সে স্বয়ং বিলের দিকে গিয়াছে, এ কথা আমি তাঁহাকে জানাইলে তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন,—"চিক্‌ফিক্ আমি বুঝি না। আজি যে কাজের বন্দো-বস্ত আছে, তাহা যেন তিনি না ভুলেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে কাজের জন্য তাঁহাকে চাই।"

আমি অন্য কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। শুনিতে পাই-লাম, চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বলিতেছেন,—"অনেক দূর গিয়াছিলে প্রমোদ? দেখিলাম, ঘোড়াটা আধমরা করিয়া আনিয়াছ।"

রাজা বলিলেন,—"ঘোড়ার কপালে আগুন! আপাততঃ ক্ষুধার জ্বালায় ওষ্ঠাগত। আমি এখন আহার চাই।"

চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—"আর আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার সহিত পাঁচ মিনিট কথা কহিতে চাই। এইখানে দাঁড়াইয়া, কেবল পাঁচ মিনিট কাল মাত্র ভাই।"

"কি বিষয়ে?"

"তোমারই কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে।"

কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য আমি খুব দেরী করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম। রাজা বলিলেন, "যদি তুমি মিছা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ কর, তাহা হইলে আমি শুনিতে চাহি না, এ কথা বলিয়া রাখিতেছি। আমার ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিতেছে।"

তাহার পর তাঁহাদের যে কথা হইল, তাহার এক বর্ণও আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু শুনিতে পাই বা না পাই, কথাটা যে দলীলের নাম সহিসংক্রান্ত, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইল। কিন্তু উপায় কিছুই নাই তো।

আমি আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। উকী-লের চিঠিখানা এখন লীলাকে দেখাইতে পারিলে বাঁচি। ইচ্ছা হইতেছে, লীলার সন্ধানে বিলের ধারে কাঠের ঘরে যাই। বড় ক্লান্ত হইয়াছি; যাইতে পারি-তেছি না। একটু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করি। আমি শয়ন করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ধীরে ধীরে আমার ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং চৌধুরী মহাশয় ভিতরে উঁকি দিয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবি,আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমি শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি, এজন্য ক্ষমার্হ। প্রমোদের মনের ভাব-গতি আপনি জানেন তো। এখন তাঁহার মতলব বদলাইয়াছে। নামস্বাক্ষরের ব্যাপার আপাততঃ বন্ধ থাকিল। আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, এ সংবাদে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া-ছেন। আমার আশীর্ব্বাদসহ রাণীমাতাকে এই সংবাদ জানাইয়া তাঁহার উদ্বেগের শান্তি করিবেন।"

কথা সমাপ্ত হইবামাত্র এবং আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রস্থান করিলেন। নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কল্য আমি এ জন্য উকীলকে পত্র লিখিয়াছি এবং অদ্য তাঁহার পত্রও পাইয়াছি, এতদুভয় ঘটনাই তাঁহার জানা ছিল বলিয়া তিনি সহজেই রাজার মতপরিবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছেন। যাহা হউক, এ সংবাদ বহন করিয়া আমার লীলার নিকটে দৌড়িয়া যাইতে বাসনা হইল, কিন্তু শরীর বড় ক্লান্ত ও কাতর, এ জন্য যাইতে পারিলাম না; সেই পালঙ্কেই পড়িয়া রহিলাম। এইরূপ অবস্থায় ক্রমে ক্রমে একটু তন্দ্রা আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিল এবং ধীরে ধীরে আমার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তখন মধ্যাহ্নকালে আমি নিদ্রার আবেশে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমার সম্মুখে দেবেন্দ্রনাথ বসু। আমি আজি প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে এ পর্য্যন্ত একবারও তাঁহার কথা আলো-চনা করি নাই; লীলাও বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁহার কোনই প্রসঙ্গ করে নাই; তথাপি আমি স্বপ্নের মহিমায় সুস্পষ্টরূপে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি বহুলোকের সঙ্গে একটা সুবৃহৎ

দেবমন্দিরের সোপানসমীপে নিপতিত রহিয়াছেন। অগণ্য নানাজাতীয় সমুন্নত সুবিস্তৃত বৃক্ষাবলী সন্নিহিত প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিদারুণ মহামারীর বীজ তত্রত্য বায়ুকে কলুষিত করিয়া রহিয়াছে। সেই বিষাক্ত বায়ু সেবন করিয়া একে একে দেবেন্দ্রের সঙ্গিগণ শমনসদনে প্রয়াণ করিতেছে। তাহাদের এই দুরবস্থা দর্শনে, দেবেন্দ্রের জন্য দারুণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া আমি বলিয়া উঠিলাম,—'ফিরিয়া আইস, ফিরিয়া আইস! তাহার নিকট এবং আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর। মহামারী তোমাকে স্পর্শ করিয়া তোমার সঙ্গিগণের ন্যায় জীবনবিহীন করিবার পূর্ব্বে তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আইস।' স্বর্গীয় শান্তিপূর্ণ বদনে তিনি আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"অপেক্ষা করুন, আমি ফিরিয়া যাইব। সেই গভীর রজনীকালে যখন রাজপথে পথভ্রষ্টা কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তখন হইতে আমার জীবন অনাগত ভবিষ্যৎ-গর্ভস্থ কোন রহস্য উদ্ভেদের যন্ত্রস্বরূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে এই বনভূমির মধ্যে লুক্কায়িতই বা থাকি অথবা সেখানে আমার জন্মভূমির মধ্যেই বা অবস্থিত হই, আমি আপনার পরম প্রেমাস্পদ ভগ্নীর সহিত অপরিচ্ছেদ্য ন্যায়-বিচারের এবং অপরিহার্য্য পরিণামের উদ্দেশে তমসাচ্ছন্ন পথে পর্য্যটন করিতেছি। স্থির হইয়া দেখুন। যে মহামারী সকলকে ধ্বংস করিতেছে, আমাকে তাহা স্পর্শও করিবে না।"

আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। এখনও তিনি ঘোরারণ্যমধ্যে অবস্থিত এবং তাঁহার সঙ্গিগণ সংখ্যায় নিতান্ত হীন। এখন আর সেখানে দেবমন্দির নাই। বহুসংখ্যক কদাকার, উগ্রপ্রকৃতি, তীর ও ধনুকধারী বর্ব্বর তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অনবরত তীরাঘাতে তাঁহার সঙ্গিগণকে বিনষ্ট করিতেছে। আবার আমার দেবেন্দ্রের জন্য দারুণ ভয় জন্মিল এবং আমি তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য আবার চীৎকার করিলাম। আবার তিনি সেই অপরিবর্ত্তনসহ শান্তিপূর্ণ-বদনে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'সেই তমসাচ্ছন্ন পথে আর এক পদ অগ্রসর হওয়া গেল। স্থির হইয়া দেখুন। যে তীর সকলকে বিনষ্ট করিতেছে, তাহা আমার নিকটস্থ হইবে না।'

তৃতীয়বার তাঁহাকে দেখিলাম। এবার তিনি ঘোর তরঙ্গমালাসঙ্কুল সাগরবক্ষে বাত্যাঘূর্ণিত এক মজ্জমান অর্ণবপোতে সমাসীন। অন্যান্য আরোহিগণ পোতের বিপন্নদশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর আশ্রয়ে পলায়নপরায়ণ হইয়াছে। কেবল দেবেন্দ্র একাকী সেই দুস্তর সলিলরাশির গর্ভে সমাহিত হইবার জন্য উপবিষ্ট। আবার আমি ভয়-বিহ্বলভাবে চীৎকার করিয়া,যে কোন উপায়াবলম্বনে জীবনরক্ষার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলাম। আবার তিনি আমার দিকে অবিকৃত প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—'সেই দুর্জ্ঞেয় পথে আর এক পদ অগ্রসর হওয়া গেল, স্থির হইয়া দেখুন। যে উন্মত্ত সমুদ্র বদনব্যাদান করিয়া সকলকে গ্রাস করিতেছে, তাহা আমার কোনই অনিষ্ট করিবে না।'

শেষবার তাঁহাকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম, তিনি ধবল মর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত এক পরলোকগতা কামিনীর প্রতিমূর্ত্তিপার্শ্বে অবনত-মস্তকে উপবিষ্ট। দেখিলাম, সহসা সেই পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সজীব হইল এবং এক অবগুণ্ঠনবতী নারীর আকার পরিগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেবেন্দ্রের বদনমণ্ডল স্বর্গীয় শান্তি-শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অপার্থিব বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি বলিলেন,—"এখনও অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকার এবং দূর হইতে অধিকতর দূর। মৃত্যু পুণ্যাত্মা, সুন্দর ও নবীনকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু আমাকে রক্ষা করিতেছে। যে দুর্জ্ঞেয় পথে পর্য্যটন করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ পরিণামফলের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ধ্বংসকারী মহামারী, জীবনাশকারী শত্রুর অস্ত্র, সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্র এবং প্রেম ও আশার বিলোপকারী মৃত্যু দ্বারা তাহা স্থানে স্থানে আকীর্ণ।"

অব্যক্ত ভয়ে আমার হৃদয় অবসন্ন হইল এবং হীন বিষাদে আমার হৃদয় মথিত হইল। সেই পাষাণমূর্ত্তির সমীপোপবিষ্ট পর্য্যটককে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল; সেই অবগুণ্ঠনবতী কামিনীকে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল; সেই স্বপ্নদর্শনকারীকে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল! আর আমি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলাম না।

আমার স্কন্ধদেশে কাহার করস্পর্শ হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম, লীলা আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার মুখের ভাব উত্তেজিত, উৎসাহময় ও অস্থির। আমি তাহার এই ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"এ কি? কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

লীলা ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর আমার কর্ণের নিকট বদন আনত করিয়া

ফুস্-ফুস্ করিয়া বলিল,—"দিদি, বিলের ধারের সেই মূর্ত্তি—সেই পা ফেলার শব্দ—আমি তাহাকে এখনই দেখিয়াছি—তাহার সহিত কথা কহিয়াছি।"

"অ্যাঁ। বল কি? কে সে?"

"মুক্তকেশী।"

এই স্বপ্নের পর জাগরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলার এই ভাব, তাহার পর তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া, আমি বেগে শয্যাত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলাম। কি করিব ও কি বলিব, স্থির করিতে না পারিয়া রুদ্ধশ্বাসে লীলার বদনের প্রতি চাহিয়া সেই স্থানে স্থির হইয়া রহিলাম।

লীলা স্বয়ং এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, তাহার কথায় আমার যে ভাবান্তর হইয়াছিল, তাহা সে লক্ষ্য করিতে পারিল না। আমি তাহার কথা শুনিতে পাই নাই মনে করিয়া সে আবার বলিল,—"আমি মুক্তকেশীকে দেখিয়াছি। আমি মুক্তকেশীর সহিত কথা কহিয়াছি। দিদি, কত কথাই তোমাকে বলিবার আছে! চল দিদি, এখানে হয় ত বাধা জন্মিতে পারে—চল আমার ঘরে যাই।"

এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া চলিল। সেখানে তাহার আলাহিদা ঝি ভিন্ন অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি লীলা উত্তমরূপে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং দরজার ভিতরে যে ছিটের পর্দ্দা ছিল, তাহাও টানিয়া দিল। আমার বিচলিতভাব এখনও সম্পূর্ণরূপ বিদূরিত হয় নাই। আমি নিজে নিজে বলিলাম,—"মুক্তকেশী—অ্যাঁ মুক্তকেশী!"

লীলা আমাকে টানিয়া একখানি আসনে বসাইল এবং আপনার গলায় হাত দিয়া বলিল,—"দেখ।"

আমি দেখিলাম, যে চিক হারাইয়া গিয়াছিল, তাহাই আবার লীলার গলায় উঠিয়াছে। আমি এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলাম,—"তোমার এ চিক কোথায় পাইলে?"

"সে-ই ইহা পরাইয়াছিল দিদি।"

"কোথায়?"

"কাঠের ঘরে। কেমন করিয়া তোমাকে সকল কথা বলিব, কোথা হইতে আরম্ভ করিব? তাহার কথাবার্ত্তা এমনই বিশৃঙ্খল—সে এমনই ভয়ানক কৃশ ও পীড়িত, সে এমনই সহসা চলিয়া গেল—"

বলিতে বলিতে উৎসাহে লীলার স্বর উচ্চ হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—"আস্তে বল। জানালা খোলা রহিয়াছে, আর ঐ জানালার নীচে দিয়াই লোকজন যাওয়া আসার পথ। প্রথম হইতে বলিতে আরম্ভ কর। যে কথার পর যে কথা, আমাকে ঠিক করিয়া বল।"

"জানালা আগে বন্ধ করিব কি দিদি?"

"না, আস্তে বলিলেই হইবে। মনে থাকে যেন, তোমার স্বামীর বাটীতে মুক্তকেশীর প্রসঙ্গ বড়ই বিপজ্জনক। তুমি তাহাকে প্রথমে কোথায় দেখিতে পাইলে?"

"কাঠের ঘরে দিদি। জানই তো তুমি, আমি চিক খুঁজিতে গিয়াছিলাম। আবাদের মধ্য দিয়া যাইবার সময় পথ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে দেখিতে যাওয়ায় আমার কাঠের ঘরে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। ঘরের ভিতরে গিয়া আমি মাটীতে বসিয়া ঘরের মেজে ও বেঞ্চের নীচে বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া আমি এইরূপে অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় কে অপরিচিত-স্বরে আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে ধীরে ধীরে ডাকিল,—'লীলাবতী দেবি!' আমি চমকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, দ্বারের নিকটে আমার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া, এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে।"

"তাহার গায়ে কি রকম কাপড়-চোপড়?"

"তাহার গায়ের কাপড়-চোপড় সাদা ও পরিষ্কার, কিন্তু বড় ছেঁড়া। আমি তাহার পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে বলিল,—'আমার সব সাদা কাপড়। সাদা ছাড়া আর কিছু আমি পরিতে পারি?' আমি আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে সে হাত বাড়াইল, আমি দেখিলাম, তাহার হাতে আমার চিক। আমার এমনই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা হইল যে, আমি তাই বলিবার নিমিত্ত তাহার খুব নিকটে আসিলাম। সে বলিল,—'তুমি যদি আমাকে একটু কৃপা কর, তাহা হইলে আমার সন্তোষ হয়।' আমি বলিলাম,—'কি কৃপা, বল। আমার সাধ্য যাহা আছে, তাহাই আমি সন্তুষ্টচিত্তে করিব।' 'তবে তোমার গলায় এই চিকগাছটি পরাইয়া দিতে দেও।' এতই আগ্রহের সহিত এবং এরূপ সহসা সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিল যে, আমি কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া পশ্চাতের দিকে এক পদ সরিয়া আসিলাম। তখন সে বলিল,—'হায়, তোমার মা হইলে আমাকে চিক গলায় পরাইয়া দিতে দিতেন।' তাহার কথা শুনিয়া এবং আমার জননীর উল্লেখ শুনিয়া আমি কিছু লজ্জিত লইয়া পড়িলাম। তখন আমি তাহার হাত

ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা আমার গলায় উঠাইলাম। সে যখন আমাকে চিক পরাইয়া দিতেছে, তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—'তুমি আমার মাকে জানিতে?' সে তখন চিকের ফাঁস লাগাইতেছিল, সে কার্য্য বন্ধ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—'এক দিন প্রাতে তোমার মনে পড়ে না বোধ হয়—এক দিন প্রাতে তোমার মাতৃদেবী পথে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার দুই দিকে দুইটি বালিকা। আমার তাহা বেশ মনে আছে। সেই দুই বালিকার এক জন তুমি, আর এক জন আমি। সুন্দরী বুদ্ধিমতী লীলাবতী এবং বুদ্ধিহীনা সামান্যা মুক্তকেশী এখন পরস্পর যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন তেমন ছিল না।'

"এ সকল কথা যখন সে বলিল, তাহা শুনিয়া তোমার তাহাকে মনে পড়িল কি?"

"তুমি যে একবার আনন্দধামে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং সে দেখিতে যে আমারই মত ছিল বলিয়াছিলে, তাহা আমার মনে পড়িল।"

"কিসে এ কথা মনে পড়িল?"

"আমার খুব কাছাকাছি হওয়ার পর হঠাৎ আমার মনে হইল, আমরা দুই জনেই দেখিতে সমান। তাহার মুখ কিছু পাণ্ডু, চিন্তিত ও ক্লিষ্ট; কিন্তু তাহার সেই মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, সুদীর্ঘ কালব্যাপী কঠিন পীড়া-ভোগের পর আমি যেন দর্পণে নিজমুখ দেখিতেছি, এরূপ বোধের উদয় হওয়ায়, কেন বলিতে পারি না, আমি এমন কাতর হইয়া উঠিলাম যে, কিয়ৎকাল তাহার সহিত কোনই কথা বলিতে পারিলাম না।"

"তোমাকে এরূপ নির্ব্বাক্ দেখিয়া সে দুঃখিত হইল না?"

"আমার বোধ হয়, সে দুঃখিত হইল। কারণ, সে বলিল,—'তোমার মায়ের মত তোমার মুখও নহে, তোমার মায়ের মত তোমার মনও নহে। তোমার মায়ের মুখ এত সুশ্রী ছিল না, কিন্তু লীলাবতী দেবি, দেবতার ন্যায় তাঁহার হৃদয় ছিল।' আমি বলিলাম, 'তোমার প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি জন্মিয়াছে; তবে আমি কথায় তত ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু তুমি আমাকে লীলাবতী বলিয়া ভাবিতেছ কেন, এখন তো সকলেই আমাকে রাণী বলে।' সে উগ্রভাবে বলিয়া উঠিল,—'তুমি যে জন্য রাণী হইয়াছ, তাহা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তাই তোমাকে তোমার পূর্ব্বনামে ডাকিতেছি।' এতক্ষণ তাহার কোন উন্মাদ-লক্ষণ আমি দেখিতে পাই নাই, এখন তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। বলিলাম,—'আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা হয় ত তুমি জান না।' সে বিষণ্ণভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—'তোমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমি জানি না? তোমার বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। পরলোকে তোমার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট আমার ত্রুটিসংশোধন করিতে বাসনা করি বলিয়া এখানে আসিয়াছি।' সে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সরিয়া গেল এবং সতর্কভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কান পাতিয়া কিয়ৎকাল কি শুনিল। যখন সে আবার কথা কহিবার জন্য ফিরিল, তখন সে পূর্ব্বে যেখানে ছিল, তত দূর আর ফিরিয়া না আসিয়া দূর হইতেই জিজ্ঞাসিল,—'কাল রাত্রে কি তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে? বনের মধ্যে তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আমি গিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি শুনিতে পাইয়াছিলে? আমি কত দিনই তোমার সহিত নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। জগতে আমার একমাত্র অকৃত্রিম পরমাত্মীয়কেও আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি—পুনরায় পাগলা গারদে আবদ্ধ হইবার ভয়ও করি নাই এ সকলই, লীলাবতী দেবি, তোমারই জন্য—কেবল তোমারই জন্য—আমি করিয়াছি।' তাহার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল দিদি। তথাপি তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া তাহার প্রতি কেন একটু করুণা হইল। আমি তাহাকে ঘরের ভিতর আনিয়া আমার পাশে বসিতে অনুরোধ করিলাম।"

"সে বসিল?"

"না দিদি। সে ঘাড় নাড়িয়া, কোন তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে না পায়, এই অভিপ্রায়ে সেই স্থানেই সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিল। তাহার পর হইতে সে বরাবরই সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, কখন বা একটু নত হইতে হইতে, কখন বা সহসা একটু পিছাইয়া গিয়া সতর্কভাবে চারিদিকে লক্ষ্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল—'কালি অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে এখানে আসিয়া তুমি আর একটি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে শুনিয়াছিলাম।

তুমি তোমার স্বামীর কথা কহিতেছিলে। শুনিলাম, তুমি বলিতেছিলে. তোমার কথা তিনি শুনেন না, তোমাকে তিনি বিশ্বাসও করেন না। হায়! কেন এ বিবাহ ঘটিতে দিয়াছিলাম? হায়! আমার ভয়—আমার অকারণ বিষম ভয়।'—সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কি বলিতে লাগিল। আমার ভয় হইতে লাগিল, হয় তো তাহার ভয়ানক মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া এখনই সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমি বলিলাম, 'স্থির হও। বল আমাকে, কেমন করিয়া তুমি আমার বিবাহ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিতে?' সে মুখের কাপড় খুলিয়া আমার মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'আমার সাহসের সহিত আনন্দধামে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। তাহার আগমন-সংবাদ শুনিয়া আমার তত ভীত হওয়া উচিত হয় নাই। কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে আমার সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। হায়, একখানি চিঠি লেখা ছাড়া অন্য কার্য্যে আমার সাহস হইল না কেন? তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইল। হায় হায়! আমার বিষম ভয়ই সকল অনর্থের মূল।' সে বারংবার ঐ কথা বলিতে লাগিল এবং কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া রহিল। তাহার সে অবস্থা দেখা এবং তাহার এই সকল কথা শুনা বড়ই ভয়ানক।"

"তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, কেন ভয়ের কথা সে বারংবার উল্লেখ করিতেছে?"

"হাঁ, আমি তাহাই জিজ্ঞাসিলাম।"

"সে কি উত্তর দিল?"

"সে তাহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিল, 'যদি কেহ আমাকে গারদে পূরিয়া রাখে, এবং সুযোগ পাইলে আবারও পূরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমি তাহাতে ভয় করি না।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'তুমি এখন কি ভয় করিতেছ? যদি তোমার এখনও সে ভয় থাকিত, তাহা হইলে তুমি কখনই এখানে আসিতে না।' সে বলিল,—'না, আর আমার ভয় নাই।' আমি কারণ জিজ্ঞাসিলে সে বলিল,—'তুমি অনুমান করিতে পারিতেছ না?' আমি ঘাড় নাড়িলে সে আবার বলিল,—'আমার এই শরীরের প্রতি চাহিয়া দেখ।' আমি তাহার শরীরে কাতরতা ও কৃশতা হেতু দুঃখপ্রকাশ করিলে, সে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—'কৃশ? আমি মরিতে বসিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখ, কেন আমি তাঁহাকে ভয় করি না। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, তোমার জননীর সহিত স্বর্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিবে? যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন কি?' আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে আবার বলিতে লাগিল,—'যত দিন আমি রোগে পড়িয়া আছি এবং তোমার স্বামীর কাছ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছি, তত দিন কেবল ঐ কথাই ভাবিতেছি। আমার সেই চিন্তা আমাকে এখানে আনিয়াছে। আমি এখন যত দূর সম্ভব আমার ত্রুটি সংশোধন করিতে চাই। আমি তাহাকে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। সে আমার প্রতি স্থির ও শূন্যভাবে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসিল,—'অনিষ্টের সংশোধন করিতে পারিব কি? তোমার পক্ষাবলম্বন করিবার উপযুক্ত বন্ধু-বান্ধব আছেন। এখন যদি তুমি রাজার গোপনীয় রহস্যটা জানিতে পাও, তাহা হইলেই তিনি তোমার কাছে ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিবেন। আমার প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তোমার প্রতি কখনই সেরূপ করিতে পারিবেন না। তোমার বন্ধু-বান্ধবের ভয়ে তোমার প্রতি তাঁহার ভাল ব্যবহার করিতেই হইবে। যদি তিনি তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন এবং যদি বুঝিতে পারি যে, আমারই যত্নে এ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—' আমি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য হাঁ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল।"

"তুমি তাহাকে কথা কহাইতে চেষ্টা করিলে?"

"করিলাম বৈ কি? কিন্তু সে একটু সরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল,—'যেখানে তোমার মাতার প্রতিমূর্ত্তি ও নাম লেখা আছে, যদি তাঁহারই পাশে চিরদিনের জন্য আমারও একটা নাম লেখা থাকে, তাহা হইলে সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু আমার ন্যায় লোকের সে আশা কেন? আমি স্বহস্তে যে শ্বেত-পাথর পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি, তাহারই পাশে কি আমার নাম থাকা সম্ভব? না।' নিতান্ত কোমল স্বরে সে এই সকল কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল—'এখনই কি বলিতেছিলাম?' আমি তাহাকে সমস্ত কথা মনে করাইয়া দিলে সে বলিল,—'হাঁ হাঁ, মন্দ স্বামীর হাতে পড়িয়া তুমি বড় কষ্টে আছ। হাঁ, আমি যে জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহাই এখন করিতে হইবে। উপযুক্ত সময়ে ভয়ে আমি যাহা করিতে পারি নাই, এখন তাহা করিব।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'কি কথা তুমি আমাকে বলিবে বলিতেছিলে?' সে উত্তর দিল, 'একটা

গোপনীয় কথা, শুনিলে তোমার স্বামী জড়সড় হইয়া থাকিবেন; আমি একবার সেই লুকান কথা বলিব বলিয়া তোমার স্বামীকে ভয় দেখাইয়াছিলাম। তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তুমিও সেই কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবে। আমার মা সে রহস্য জানেন, আমি বড় হইলে তিনি এক দিন আমাকে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন। পরদিন তোমার স্বামী'—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে আবার চুপ করিল।"

"আর কিছু বলিল না?"

"না, সে কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। তাহার পর চলিতে চলিতে এবং হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'চুপ চুপ।' ক্রমে সে কাঠের ঘরের পার্শ্বে গিয়া অদৃশ্য হইল।"

"তুমিও উঠিয়া গেলে তো?"

"হাঁ, উদ্বেগ হেতু আমিও উঠিলাম। কিন্তু একটু যাইতে না যাইতে সে ফিরিয়া আসিল; আমি ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসিলাম,—'সে গোপনীয় কথাটা কি? থাক একটু, কথাটা আমাকে বলিয়া যাও।' সে আমার হাত চাপিয়া ধরিল এবং নিতান্ত ভীতভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'এখন নহে, আমরা একা নহি—এখানে আরও লোক আছে। কালি এখানে আসিও—এই সময়ে—একা—মনে থাকে যেন—একা।' তাহার পর আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না?"

"লীলা, হায় হায়, আবার একটা সুযোগ হাতছাড়া হইয়া গেল। যদি আমি তোমার নিকট থাকিতাম, তাহা হইলে সে কখন এমন করিয়া হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারিত না; কোন্ দিকে গিয়া সে চক্ষুছাড়া হইল?"

"বামদিকে যে দিকে খুব ঘন বন।"

"তুমি ছুটিয়া বাহির হইলে না কেন? তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে না কেন?"

"ভয়ে আমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না; করিব কি?"

"তখনই না হউক, যখন তুমি উঠিতে ও নড়িতে পারিলে, তখন—"

"তখন তোমাকে সব কথা বলিবার জন্য আমি দৌড়িয়া আসিলাম।"

"আবাদের ও দিকে কাহাকেও দেখিতে বা কাহারও আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলে কি?"

"কিছু না—যখন আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম, তখন সর্ব্বত্র নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ বলিয়াই বোধ হইল।"

আমি মনে মনে প্রশ্ন করিলাম, মুক্তকেশী তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ভয় পাইয়াছিল; বাস্তবিকই সেখানে কোন লোক গিয়াছিল, না তাহা তাহার উত্তেজিত মনের কল্পনা? স্থির করা অসম্ভব। যাহা হউক, মুক্তকেশী কালি যদি কথিত ও নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে রহস্যটা জানিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হওয়ার পরও হয় তো চিরদিনের নিমিত্ত তাহা আমাদের হাতছাড়া হইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি আমাকে সব কথা ঠিক বলিয়াছ তো? কিছুই ভুল হয় নাই তো লীলা?"

লীলা বলিল,—"আমার তো আর কিছুই মনে হইতেছে না। তোমার মত আমার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ নয় দিদি, কিন্তু এ বিষয় আমি এমনই মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত শুনিয়াছি যে, কোন কাজের কথা ভুল হওয়া অসম্ভব।"

আমি বলিলাম,—"দেখ ভাই, মুক্তকেশী-সংক্রান্ত অতি সামান্য কথাও অবহেলা করা উচিত নহে। আবার মনে করিয়া দেখ। আচ্ছা, সে এখন কোথায় থাকে, প্রসঙ্গতঃ সে সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই তো?"

"আমার তো সেরূপ কোন কথা মনে হইতেছে না।"

"আচ্ছা, তা হউক, কোন আত্মীয়ের—রোহিণী কি অন্য কোন আত্মীয়ের নাম সে কি একবারও উল্লেখ করে নাই?"

"হাঁ হাঁ, আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, রোহিণী তাহার সঙ্গে বিল পর্য্যন্ত আসিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এ স্থলে তাহাকে একা আসিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন।"

"রোহিণীর সম্বন্ধে এ ছাড়া আর কিছু বলে নাই?"

"কৈ, আর কিছু বলে নাই বোধ হয়।"

"আচ্ছা, তারার খামার ছাড়িয়া আসার পর তাহারা কোথায় ছিল, সে কথা কিছু বলিয়াছিল কি?"

"কই, না।"

"ভাল, কোথায় সে এত দিন ছিল, কিংবা তাহার কি পীড়া, এরূপ বিষয়ের কোন কথা হইয়াছিল কি?"

"না দিদি, সে সব কোন কথা হয় নাই। এখন বল তুমি, এ সব শুনিয়া কি বুঝিলে? আমি তো কি করিব, কি হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে ভাই। কালি ঠিক সময়ে তোমাকে কাঠের ঘরে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তাহার সহিত দেখা হওয়ায় কত যে উপকার হইতে পারে, তাহা বলা ভার। দ্বিতীয় সঙ্কেতের সময় তোমার একা থাকা হইবে না। আমি তোমার পশ্চাতে গিয়া খুব দূরে থাকিব, তোমরা কেহই আমাকে দেখিতে পাইবে না। মুক্তকেশী দেবেন্দ্রের হাত ছাড়াইয়াছে; তোমারও হাত ছাড়াইয়াছে; কিন্তু যাই হউক, সে কখনই আমার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

লীলা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার স্বামীর ভয়জনক এই রহস্যের বিষয়ে তোমার কি মনে হয় দিদি? মনে কর, ইহা কেবল মুক্তকেশীর উন্মত্ত কল্পনারই একটা কার্য্য। মনে কর, মুক্তকেশী কেবল পূর্ব্বস্মৃতির অনুরোধে আমার সহিত দেখা করিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়াছিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। তাহাকে কি বিশ্বাস করা যায়?"

"লীলা, আমি স্বয়ং তোমার স্বামীর যে সকল ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সহিত মুক্তকেশীর কথা মিলাইয়া আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, মূলে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে।"

আর কিছু না বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। যে নানাবিধ চিন্তা চিত্তকে বিব্রত করিতেছে, আর কিয়ৎকাল বসিয়া লীলার সহিত কথোপকথন করিলে হয় তো তাহার পক্ষে তাহার ফল বড়ই ভয়ানক হইত, সেই অতি ভয়ানক স্বপ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে লীলার এই কাহিনী আমার মনকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করিয়াছে। আমার যেন বোধ হইতেছে, সেই বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ বড়ই নিকটস্থ হইয়া আমাকে দারুণ ভয়ে অভিভূত করিতেছে। বস্তুতই যেন কি দুরভিসন্ধি,—যেন কি দুষ্ট মন্ত্রণা আমাদিগকে ক্রমশঃ বেষ্টন করিতেছে। এ বিপত্তিকালে কোথায় দেবেন্দ্র?

মুক্তকেশী যেরূপ ভাবে এবং যে কারণে প্রস্থান করিয়াছে, তাহা শুনিলাম। এক্ষণে চৌধুরী মহাশয় কি করিতেছেন, জানিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইল, চারিদিক্ সন্ধান করিয়া দেখিলাম, রাজা ও চৌধুরী কেহই বাড়ী নাই। শেষে রঙ্গমতি ঠাকুরাণীর সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, চৌধুরী মহাশয় ও রাজা দুই জনে অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন। পায়ে হাঁটিয়া রৌদ্র থাকিতে থাকিতে দু'জনে মিলিয়া অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন। আর তো কখন এ দুই জনকে মিলিয়া এমন করিয়া বেড়াইতে দেখি নাই।

যখন আমি পুনরায় আসিয়া লীলার সহিত মিলিত হইলাম, তখন সে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, এতক্ষণ নিতান্ত অন্যমনস্ক থাকায় একটা প্রধান কাজের কথাই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। সে দলীলে নাম সহি করার গোল এখনও উঠিল না কেন?"

আমি বলিলাম,—"আপাততঃ সে জন্য কোন ভয় নাই। রাজার মত্‌লব ফিরিয়া গিয়াছে। আপাততঃ সে কাজ বন্ধ থাকিল।"

নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত লীলা বলিল,—"বন্ধ থাকিল? এ কথা তোমায় কে বলিল?"

"চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তাহারই চেষ্টায় তোমার স্বামীর এরূপ মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"কিন্তু দিদি, কথাটা বড় অসম্ভব। রাজার ভয়ানক টাকার দরকারের জন্য যদি দলীলে নাম সহি আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা এখন বন্ধ থাকিবে কি প্রকারে?"

"তোমার কি মনে নাই লীলা, যখন রাজার উকীল মণিবাবু এই টাকার জন্য রাজার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি নিতান্তই রাণীর নাম স্বাক্ষর এখন না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে অতি কষ্টে, না হয় বড় জোর তিন মাস ঠেলিয়া রাখা যাইতে পারে, এখন সেই শেষ প্রস্তাব অনুসারেই কাজ করা হইবে বোধ হইতেছে। অতএব আপাততঃ তিন মাস কাল আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।"

"তোমার স্মরণশক্তি ভাল বলিয়া দিদি, তুমি এত কথা মনে রাখিতে পারিয়াছ। কিন্তু দিদি, এটা এতই সুসংবাদ যে, আমার সহসা প্রত্যয় হইতেছে না।"

"আমার দিনলিপিতে সমস্ত কথাই লেখা থাকে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে দিনলিপি আনিয়া দেখাইয়া দিতেছি।"

তখনই আমার দিনলিপি আনিয়া লীলার সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া দিলাম। আমার কথার সঙ্গে দিনলিপির ঐক্য হওয়ায় আমাদের উভয়েরই

অনেকটা ভরসা হইল। উভয়েরই মনে হইল, যেন এ দিনলিপিও আমাদের এক জন অসময়ের বন্ধু। আমরা এমনই বিপন্ন—এমনই নিঃসহায়। লীলা আপন ঘরে চলিয়া গেল—আমি দিনলিপি লিখিতে বসিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইল। বিশেষ কোন অনৈসর্গিক কাণ্ড দেখিলাম না বটে, কিন্তু রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহার দেখিয়া, মুক্তকেশীর সম্বন্ধে এবং না জানি কালি কি ঘটিবে, তাহা ভাবিয়া আমার মনে বড় আশঙ্কা হইল। রাজার ব্যবহার, বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্টাচার যে ভয়ানক অলীক ও নিতান্ত শঠতাপূর্ণ, তাহা আমি বেশ জানি। আজি বন্ধুর সহিত অনেক দূর বেড়াইয়া আসার পর হইতে সকলের প্রতিই, বিশেষতঃ লীলার প্রতি রাজার বড়ই উদার ব্যবহার দেখিতেছি। তিনি আজ লীলাকে নানা মিষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি লীলাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, সে তাহার কাকার কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসিতেছেন, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কোন্ সময়ে এখানে বেড়াইতে আসিবেন, তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং আরও কত স্নেহানুরাগই দেখাইয়া সেই আনন্দধামে বিবাহের পূর্ব্বাবস্থা মনে করাইয়া দিতেছেন। নিশ্চয়ই এ বড় কুলক্ষণ। তিনি আহারের পরই পাশের ঘরে নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। আমার মনে হইল, ইহা আরও কুলক্ষণ; এ দিকে তাঁহার ধূর্ত্ত নয়ন, যেন আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ভাবিয়া, কেবল লীলা ও আমার গতিবিধি দেখিতে নিযুক্ত রহিল। কালি তিনি যখন একাকী গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তখন যে তিনি মুক্তকেশীর মাতা হরিমতির নিবাসগ্রাম রাজপুরে তাহার নিকট তাহার কন্যার সংবাদ জানিতে গিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। আজিও দুই জনে যে সেই তত্ত্বেই বাহির হইয়াছিলেন, তাহাও স্থির। মুক্তকেশী কোথায় থাকে, তাহা যদি আমি জানিতাম, তাহা হইলে কাল প্রাতে উঠিয়াই আমি সেখানে গিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতাম। যাহা হউক, রাজা আজি রাত্রে যে মূর্ত্তিতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা আমার বেশ জানা আছে, সুতরাং আমার তাহাতে ঠকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই নূতন। আজি তিনি অতি ভাবুক—মহাকবি! আজি তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইতে যথার্থই ভাব উছলাইয়া পড়িতেছে। আজি তিনি মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত। আজি তিনি নিতান্ত অল্পভাষী—ভাবভরে আজি তাঁহার চক্ষু ও কণ্ঠস্বর অবসন্ন। তাঁহার ঈষৎ হাস্য আজি স্নেহ ও বাৎসল্যে পূর্ণ। আজি তিনি লীলাকে হারমোনিয়ম বাজাইয়া তাঁহার অদম্য সঙ্গীতলালসার পরিতৃপ্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। লীলা সবিস্ময়ে তাঁহার অনুরোধ পালন করিল। তিনি হারমোনিয়মের সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। ভাবভরে তাঁহার সুবিশাল মস্তক এক দিকে নত হইয়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বাম-হস্তের উপর দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলির আঘাত করিয়া তাল দিতে লাগিলেন। সায়ংকাল সমাগত হইলে তিনি তত্রত্য বাতায়ন ও দ্বারপথ-প্রবাহী মধুর, আনন্দময় ও পরম পবিত্র নৈসর্গিক আলোক-শোভিত প্রকোষ্ঠের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য কৃত্রিম আলোক দ্বারা বিধ্বংসিত করিতে মিনতি করিয়া নিষেধ করিলেন, আমি তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রান্তে এক গবাক্ষ-সমীপে আসিলাম। আমাকে তিনি আলোকে আনয়নের বিরুদ্ধে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। যদি আলো আনিয়া তাঁহাকে পুড়াইবার কেহ ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলেও আমি নিজে নীচে হইতে আলো আনিয়া দিতাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"এই মৃদু মন্দ-বিকম্পিত জ্যোৎস্নালোক অবশ্যই আপনি ভালবাসেন। আহা! আমি ইহা বড়ই ভালবাসি। অন্ধকার ন্যায় সুপবিত্র রজনীতে স্বর্গীয় সুরভি-শোভিত প্রত্যেক পদার্থই আমার চক্ষে পরম রমণীয়। নিসর্গ-সুন্দরী আমার চক্ষে চিরদিনই পরম শোভার নিকেতন, অক্ষয় মধুরতার ভাণ্ডার। আহা! দেখুন, দেখুন দেবি. কি অপূর্ব্ব শোভাময় আলোক ক্রমশঃ ঐ বৃক্ষচূড়া হইতে অপসারিত হইতেছে। এ দৃশ্য আমার হৃদয়-কন্দরে যে ভাবে নৃত্য করিতেছে, আপনার অন্তরেও সেইরূপ করিতেছে কি?"

তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া কিয়ৎকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হেলিতে দুলিতে নৈষধের সন্ধ্যাবর্ণনার শ্লোকগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমি এ কি পাগ্‌লামী করিয়া আপনাদিগের সকলকে উত্ত্যক্ত করিতেছি! আসুন, আমরা হৃদয়ের গবাক্ষসমূহ নিরুদ্ধ করিয়া কার্য্যময় জগতে প্রবেশ করি। আলো আন—আর আমি আপত্তি করিব না। রাণি, মনোরমা দেবি, প্রিয়ে

রঙ্গমতি, আমি এক বাজি তাস খেলিতে চাহি, আমার সঙ্গে কে খেলিতে সম্মত আছ, বল।” তিনি আমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু লীলার দিকেই চাহিয়া থাকিলেন।

লীলাও তাঁহাকে আমারই মত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে তাঁহার সহিত বিন্তী খেলিতে সম্মত হইল। আমার চিত্তের তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার সমীপে আমার বসিয়া থাকা অসম্ভব। আমার যেন বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই অত্যল্প আলোকেও আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পাইতেছে। তাহার কণ্ঠস্বর যেন আমার সমস্ত শরীরকে অবসাদগ্রস্ত করিতেছে, সেই দিবাস্বপ্নের স্মৃতি সমস্ত দিন আমাকে নিতান্ত বিচলিত ক'রয়াছে, এখন যেন তাহা আগত-প্রায় বিপদের সূত্রপাত বলিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতে লাগিল। আমি যেন স্বপ্নদৃষ্ট তাবৎ ঘটনা-পুঞ্জ এখন সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। লীলা যখন আমার কাছ দিয়া খেলিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল, তখন আমি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ পেষণ করিলাম এবং যেন এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ বোধে তাহার বদনচুম্বন করিলাম। যখন সকলেই সবিস্ময়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, আমি তখন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিম্নে অন্ধকারময় প্রাঙ্গণে পলায়ন করিলাম।

অনেক রাত্রিতে তাঁহাদের খেলা ভাঙ্গিল ও সকলে নিদ্রার জন্য স্ব স্ব শয্যায় গমন করা আবশ্যক মনে করিলেন। আমি তাহার পূর্ব্বেই চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রশান্ত করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে পুনঃ প্রবেশ করিলাম। সহসা তৎকালে বড় সতেজ ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। এই বায়ুর পরিবর্ত্তন আমরা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সকলের আগে চৌধুরী মহাশয় বায়ুর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন,—“শুনুন, কালি একটা গোল-মাল ঘটিবে।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ। কল্যকার ঘটনাবলী আমাকে অদ্য অধিকতর দুর্ঘটনার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে সতর্ক করিয়া দিতেছে। এখনও অদ্যকার দিন অতিবাহিত হইয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে।

লীলা এবং আমি দুই জনে মিলিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম, মুক্তকেশী কালি বেলা আড়াইটার সময় কাঠের ঘরে আসিয়াছিল। এই জন্য স্থির করিলাম, লীলা আজি একটু আগেই সে দিকে চলিয়া যাইবে; আমি বাড়ীতে থাকিয়া সকলের সন্দেহভঞ্জন করিব ও তাহার অনুপস্থিতির হেতু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বিহিত উত্তর দিব। তাহার পর সময় বুঝিয়া যত শীঘ্র সম্ভব তাহার অনুসরণ করিব।

কল্য রাত্রে যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল গেল না। প্রাতঃকাল হইতে ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হইল; কিন্তু বেলা ১২টার সময় আকাশ বেশ খোলসা হইয়া গেল। সেই দারুণ বৃষ্টিতে প্রাতঃকালে রাজা একাকী বেড়াইতে বাহির হইলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কখন্ বা ফিরিবেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া গেলেন না। চৌধুরী মহাশয় বড় ধীর-ভাবে বাড়ীতেই বসিয়া থাকিলেন। কখন পুস্তকা-লয় মধ্যে, কখন বা বাদ্য-যন্ত্রের সহায়তায় তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবুকতা ও কবিত্ব যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্কন্ধ ত্যাগ করিয়াছে, এমন বোধ হইল না। এখনও তিনি নির্ব্বাকভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ও অল্পেই বিচলিত হইতেছেন।

লীলা যথাসময়ে চলিয়া গেল। আমারও এক-সঙ্গে যাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে; আর তা ছাড়া মুক্তকেশী যদি দেখে যে, লীলার সঙ্গে আর এক জন তাহার অপরিচিত নূতন লোক আসিয়াছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমাদের উপর তাহার চিরদিনের মত অবিশ্বাস হইয়া যাইবে। কাজেই আমাকে সহিষ্ণু-তার সহিত অপেক্ষা করিতে হইল। কিছু কাল পরে যখন আমি কাঠের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করি-লাম, তখনও রাজা ফিরিয়া আইসেন নাই। আমি যাইবার সময় দেখিলাম, দুষ্ট কাকাতুয়াটাকে লইয়া চৌধুরী মহাশয় খেলা করিতেছেন আর রঙ্গমতি দেবী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বামী ও পাখীর রঙ্গ এমনই তদ্গতভাবে দর্শন করিতেছেন, যেন এমন কাণ্ড তিনি জীবনে আর কখন দেখেন নাই। অতি সাবধানে আমি আবাদের মধ্য দিয়া চলিলাম। কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে, এমন বোধ হইল না। তখন তিনটা বাজিতে ১৫ মিনিট বাকী আছে।

বনের মধ্যে গিয়া আমি খুব বেগে চলিতে

লাগিলাম। অর্দ্ধাধিক পথ দৌড়িয়া যাওয়ার পর আমি আবার আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কোথাও মানুষ দেখিলাম ন । ক্রমে কাঠের ঘরের কাছে পৌঁছিলাম, তখনও কোন শব্দ পাইলাম না। খুব নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঘরের ভিতরে কেহ কথ কহিলে সেখান হইতে অবশ্যই শুনিতে পাই-তাম। সমান নিস্তব্ধতা। কোথায়ও কোন মনুষ্যের চিহ্ন নাই। আমি কোন দিকে কিছুই দেখিতে ও শুনিতে না পাইয়া শেষে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেখানেও কেহ নাই তো! প্রথমে মৃদুস্বরে, শেষে উচ্চস্বরে আমি ডাকিতে লাগিলাম, -"লীলা!" কেহই দেখা দিল না; কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। আমি ছাড়া সেখানে আর দ্বিতীয় মনুষ্যমূর্ত্তি নাই! আমার বড় ভয় হইল। আমি হৃদয়কে বলবান্ করিয়া প্রথমে কাঠের ঘরের ভিতর, পরে তাহার সম্মুখস্থ ভূমিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরের ভিতরে কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু বাহিরে, বালির উপর আমি কতকগুলা পায়ের দাগ দেখিতে পাইলাম।

বালির উপর আমি দুই রকম পায়ের দাগ দেখিলাম। পুরুষমানুষের মত বড় বড় পায়ের দাগ, আর মেয়েমানুষের মত ছোট ছোট পায়ের দাগ। শেষের দাগের সঙ্গে আমার পায়ের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিলাম, সে দাগ নিশ্চয়ই লীলার পায়ের। কাঠের ঘরের সম্মুখস্থ ভূমি এইরূপ দ্বিবিধ পায়ের দাগে সমাচ্ছন্ন। ঘরের নিকটেই একটা ছোট গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। এ গর্ত্ত যে কেহ ইচ্ছা করিয়া করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার পর পায়ের দাগের অনুসরণে যে দিকে যাওয়া যায়, আমি সেই দিকে যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। সকল স্থানে পদাঙ্ক ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারা গেল না। দেখিলাম, আবাদের মধ্য দিয়া যাতায়াতের যে পথ আছে, সেখান দিয়া পায়ের দাগ দেখা যায় না, দাগ বনের ভিতর দিয়া পথ করিয়া গিয়াছে বোধ হইল। আমিও সেই দিক্ দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথায়ও বা পায়ের দাগ, কোথায়ও বা ভাঙ্গা ছোট গাছ, কোথায়ও বা নতমুখ গুল্ম দেখিয়া আমি পথ স্থির করিয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তথাপি যাইতে লাগিলাম। এক স্থানে একটা গাছের গায়ে একটু ছেঁড়া কাপড় দেখিতে পাইলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম, সেটুকু লীলারই কাপড় ছেঁড়া। যে স্থানে কাপড় ছেঁড়া দেখিলাম, সেই স্থান হইতে যেই নিষ্ক্রান্ত হইলাম, সেই সম্মুখে প্রাসাদ দেখিতে পাইয়া মনে অনেক ভরসা হইল। সাহস হইল, লীলা হয় তো কোন কারণে এই নূতন পথ দিয়া বাটী ফিরিয়াছে। আমিও তাড়াতাড়ি বাটীতে ফিরিলাম। প্রথমেই গিন্নী-ঝির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি জান কি, রাণী বাড়ী ফিরিয়াছেন কি?"

গিন্নী-ঝি বলিল,—"রাণী-মা এখনই রাজার সহিত বাটী ফিরিয়াছেন। কিন্তু মা, আমার বোধ হয়, একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে!"

আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—"কোন আঘাত লাগে নাই তো?"

"না না, ভগবানের কৃপায় সেরূপ কিছু ঘটে নাই। রাণী-মা কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে গেলেন। আর রাণীর নিজের ঝি গিরিবালাকে রাজা জবাব দিয়া এখনই চলিয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"গিরিবালা এখন কোথায়?"

"আমার ঘরে বসিয়া আছে। আহা তাহার কান্নার আর সীমা নাই! আমি তাহাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া আমার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছি।"

আমি গিন্নী-ঝির ঘরে গিয়া দেখিলাম, গিরিবালা তাহার পেঁট্‌রা লইয়া বসিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। কেন হঠাৎ তাহার জবাব হইল, তাহা সে বলিতে পারিল না। রাজা তাহাকে জবাব দিবার সময় কোন কারণও ব্যক্ত করেন নাই, কোন দোষের কথাও বলেন নাই। রাণীর সঙ্গে পুনরায় দেখা করিতে অথবা রাণীর নিকট কাজের জন্য দরবার করিতেও তাহার হুকুম নাই। তাহাকে তখনই চলিয়া যাইতে হইবে, ইহাই রাজার হুকুম। আমি তাহাকে দুই চারিটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, রাত্রিতে সে কোথায় থাকিবে, তাহার সন্ধান লইলাম। সে বলিল, গ্রামের মধ্যে এক বৃদ্ধা আছে, এখানকার সকল লোক-জনকেই সে খুব যত্ন করে, তাহারই ঘরে রাত্রিটা কাটাইতে হইবে। কালি প্রাতে সে শক্তিপুর যাইয়া সেখানকার আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবে। কলিকাতায় সে যাইবে না, কারণ, কলিকাতায় কাহাকেও সে জানে না। আমার মনে হইল, নিশ্চয়ই গিরিবালার দ্বারা আনন্দধামে

সংবাদ পাঠাইবার আমাদের বেশ সুযোগ হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম, 'হয় আমার নিকট হইতে, না হয় রাণীর নিকট হইতে সে রাত্রের মধ্যেই সংবাদ পাইবে, আর তাহার হিতার্থে আমাদের যাহা সাধ্য, আমরা তাহা করিব।' এই বলিয়া আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া উপরে উঠিলাম।

লীলার ঘরের দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া দেখিলাম, তাহা ভিতরদিক্ হইতে বন্ধ। আমি তাহাতে আঘাত করিলে সেই কদাকার, অসভ্য, দারুণ হৃদয়হীন ঝিটা—যাহার কুব্যবহারে আমি এখানে আসিয়া প্রথমেই জ্বালাতন হইয়াছিলাম—সেই ঝিটা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দ্বার খুলিয়াই সে চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং জিহ্বা বাহির করিতে করিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? বুঝিতেছ না, আমি ভিতরে যাইতে চাই?'

সে আবার প্রথমে হাঁ করিয়া, পরে জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল,—'কিন্তু তোমাকে তো কখনই ভিতরে যাইতে দিব না।'

"কোন্ সাহসে তুই আমার সহিত এমন করিয়া কথা কহিতেছিস্? সরিয়া যা এখনই!"

সে তখন তাহার মোটা মোটা হাত দুখানি দুই দিকে বাহির করিয়া দরজা আট্‌কাইল এবং বিকট হাঁ করিয়া বলিল,—"মুনিবের হুকুম।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু তাহার সহিত বিবাদে কি ফল? যাহা বলিতে হইবে, তাহা তাহার মনিবকেই বলা আবশ্যক। আমি তৎক্ষণাৎ রাজার সন্ধানে নীচে আসিলাম। রাজার শত সহস্র দুর্ব্ব্যবহারেও আমি রাগ করিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। পুস্তকালয়ে গিয়া রাজা, চৌধুরী মহাশয় ও রঙ্গমতি ঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইলাম। রাজার হাতে একটু কাগজ। আমি নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বে শুনিতে পাইলাম, চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বলিতেছেন,—"না—হাজারবার না!"

আমি বরাবর রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহার মুখে সতেজ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম,—"আমাকে কি বুঝিতে হইবে রাজা, যে,আপনার স্ত্রীর ঘর এখন কারাগার এবং আপনার দাসী তাহার কারারক্ষিণী?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ, ঠিক তাহাই আপনাকে বুঝিতে হইবে। আর সাবধান থাকিবেন, যেন আমার কারারক্ষিণীর দুই কারাগার রক্ষা করিতে না হয়—দেখিবেন, আপনার ঘরও যেন কারাগার না হইয়া পড়ে।"

অতি ক্রোধের সহিত আমি বলিলাম,—"আর আপনার স্ত্রীর প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহার এবং আমার প্রতি এই শাসনের কি ফল ফলে, আপনি তাহার জন্য সাবধান থাকিবেন। এ দেশে আইন আছে, আদালত আছে। লীলার মাথার এক গাছি চুলেও যদি আপনি আঘাত করেন, তাহা হইলে আপনার কি দশা ঘটিবে, তাহা তখন জানিতে পারিবেন।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি চৌধুরী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কি বলিতেছিলাম? তুমি এখনই কি বলিলে?"

চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—"যা আগে বলিতেছিলাম—না।"

চৌধুরী মহাশয় প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাহিলেন। আমার এমন উত্তেজিত অবস্থাতেও সে দৃষ্টি অসহ্য হইল। তিনি তাহার পর উদ্দেশ্যপূর্ণ-নয়নে তাঁহার পত্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রঙ্গমতি ঠাকুরাণী তখনই আমার পাশে সরিয়া আসিলেন এবং সেইরূপে দাঁড়াইয়া, আর কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কৃপা করিয়া এক মুহূর্ত্ত আমার কথায় মনোযোগ করুন। আপনার বাটীতে এত দিন অবস্থান করিতেছি, এ জন্য রাজা, আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু আর আমার এখানে থাকা ঘটিতেছে না। আপনার পত্নী এবং মনোরমার প্রতি অদ্য আপনি যেরূপ মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যে বাটীতে স্ত্রীলোকের প্রতি তাদৃশ কুব্যবহার করা হয়, সেখানে আমি কখনই থাকিব না।"

রাজা এক পদ পিছাইয়া গিয়া নীরবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। চৌধুরাণীর এই উক্তি যে তাঁহার স্বামীর অনুমোদিত, তাহা রাজাও বুঝেন, আমি বুঝি। যাহা হউক, তাঁহার সতেজ উক্তি শুনিয়া রাজা যেন কিয়ৎকাল বিস্ময়ে পাষাণবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। চৌধুরী মহাশয় অতিশয় প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে আপনার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; তাহার পর স্বীয় পত্নীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,- "রঙ্গমতি, তুমি ধন্য! আমি তোমার সাহায্যার্থে সকলই করিব। আর মনোরমা দেবী যদি কৃপা করিয়া আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহার হিতার্থে আমার

যাহা সাধ্য, আমি তাহা সম্পন্ন করিতে সম্মত আছি।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া দ্বারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তখন রাজা নিতান্ত বিরক্তভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তোমাদের রকমটা কি? তোমাদের মতলব কি?"

সেই দুর্জ্জেয় বাঙ্গাল তখন উত্তর দিলেন,—"অন্যান্য সময়ে আমি যাহা বলি, তাহাই আমার মতলব। এক্ষণে আমার স্ত্রী যাহা বলিতেছেন, তাহাই আমার মতলব জানিবে। আমরা আজি আমাদের পদের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আজি আমার স্ত্রীর যাহা মত, আমারও তাহাই মত।"

রাগে গস্-গস্ করিতে করিতে রাজা হাতের সেই ছোট কাগজটুকু ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বেগে গিয়া চৌধুরী-দম্পতিকে ছাড়াইয়া দ্বার-সন্নিধানে দাঁড়াইলেন। গোঁ গোঁ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। দেখিও, তাহাতে কি ফল দাঁড়াইবে।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কৌতূহলের সহিত স্বামীর প্রতি চাহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা হঠাৎ চলিয়া গেলেন,—ইহার মানে কি?"

চৌধুরী বলিলেন,—"ইহার মানে, তুমি ও আমি দুই জনে মিলিয়া আজি সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে এক জন অতি দুরন্ত লোকের চৈতন্য জন্মাইয়া দিলাম। মনোরমা দেবী ও রাণীমাতা আজি ভয়ানক অপমানের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। মনোরমা দেবি, অতি উপযুক্ত সময়ে আপনি যথেষ্ট সৎসাহস ও তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরাণী যেন ঠাকুরটির ভ্রম-সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"আন্তরিক প্রশংসা।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির ন্যায় ঠাকুরটিও বলিলেন,—"আন্তরিক প্রশংসা।"

আমার রাগের প্রাবল্য এখন কমিয়া গিয়াছে। লীলার সহিত এখনও দেখা করিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল। কাঠের ঘরে কি হইয়াছিল, কেনই বা এ কাণ্ড ঘটিল, তাহা জানিবার জন্য আমি এখন অস্থির। চৌধুরী-দম্পতির সহিত দুইটা শিষ্টাচার করা আবশ্যক হইলেও আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না। চৌধুরী মহাশয় বোধ হয়, আমার হৃদয়ের ভাব অনুমান করিতে পারিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে রাজা ধপ ধপ শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন, শুনিতে পাইলাম; তাহার পর দুই বন্ধুতে ফুস্-ফুস্ করিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী সে সময়ে আমাকে নানারূপ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে চৌধুরী মহাশয় আবার ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আমি সন্তোষের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, রাণী-মাতা আবার আপনার বাটীতে আপনি কর্ত্রী হইয়াছেন। আমি মনে করিলাম যে, এ সংবাদ আপনি আমার মুখে শুনিলে অধিক সন্তুষ্ট হইবেন, এ জন্য আমিই ইহা বলিতে আসিলাম।"

আমি তাড়াতাড়ি লীলার সহিত সাক্ষাতের আশায় ধাবিত হইলাম, রাজা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলাম, রাজা চৌধুরী মহাশয়কে বলিতেছেন,—"ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? এ দিকে এস, আমি তোমাকে একটা কথা বলিতে চাহি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আর একটু আমি আপন মনে ভাবিতে চাহি। থাক না এখন; পরে হইবে।"

আর কেহ কোন কথা বলিলেন না। আমি বেগে গিয়া লীলার ঘরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, লীলা টেবিলের উপর হাত ছড়াইয়া এবং মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই সে আনন্দের ধ্বনি করিয়া লাফাইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসিল,—"তুমি এখানে আসিলে কিরূপে? কে তোমাকে আসিতে দিল? রাজা কখনই অনুমতি দেন নাই।"

লীলার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য উদ্বেগের আতিশয্যে আমি তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবলই তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। লীলাও নীচে কি কি ঘটিয়াছে, জানিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আগ্রহে বার বার কে আমাকে আসিতে দিল, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন কাজেই আমাকে বলিতে হইল,—"চৌধুরী মহাশয়। এ বাটীতে তাঁহার তুল্য ক্ষমতা কার?"

লীলা মহাবিরক্তি হেতু মুখ বিকৃত করিয়া আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিল,—"দিদি, তাঁহার কথা আর বলিও না। চৌধুরীর ন্যায় জঘন্য নীচ লোক আর জগতে নাই। চৌধুরী অতি ঘৃণিত গুপ্তচর—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারে মৃদু শব্দ হইল। তখনই দ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আমার টাকা-পয়সা রাখিবার

ছোট থলিয়াটি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন,—"আপনি এটা নীচে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। ভাবিলাম, এটা আপনাকে দিয়া আসি।"

তাঁহার স্বভাবতঃ পাণ্ডুবর্ণ এতই পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে যে, আমি দেখিয়া চমকিত হইলাম। আর দেখিলাম, থলিয়াটি আমার হস্তে দিবার সময় তাঁহার হাত কাঁপিতেছে, আর তাঁহার চক্ষু বাঘিনীর মত আমার মুখ ছাড়িয়া লীলার দিকে ফিরিল। সর্ব্বনাশ হইয়াছে আর কি! এ সকল লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বে তিনি চৌধুরী মহাশয়-সম্বন্ধীয় লীলার সমস্ত কথাই শুনিয়াছেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া লীলাকে বলিলাম,—"চৌধুরী মহাশয়কে এই সকল কথা বলিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছ।"

"আমি যাহা জানি, তাহা যদি দিদি, তুমিও জানিতে, তাহা হইলে তুমিও ঐ সকল কথা বলিতে। মুক্তকেশী ঠিক বলিয়াছিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি কালি সেখানে লুকাইয়া ছিল এবং সেই তৃতীয় ব্যক্তি—"

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ কি চৌধুরী?"

"তাহার আর সন্দেহ নাই। সে-ই রাজার গুপ্তচর, সে-ই রাজার ভগ্নদূত, তাহারই কথায় রাজা প্রাতঃকাল হইতে মুক্তকেশী ও আমার অপেক্ষায় সেখানে ছিলেন।"

"মুক্তকেশী কি ধরা পড়িয়াছে? তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলে?"

"না। সে সে দিকে না আসিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল। আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন সেখানে কেহ ছিল না।"

"তার পর?"

"তার পর আমি ভিতরে গিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলাম। অল্পক্ষণেই বড় অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন একটু নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার জন্য বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিবার সময় কাঠের ঘরের সম্মুখে বালির উপর কয়েকটা দাগ দেখিতে পাইলাম। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, বালির উপর বড় বড় করিয়া 'দেখ' এই কথা লেখা রহিয়াছে।"

"তার পর তুমি সেখানকার বালি সরাইয়া গর্ত্ত করিয়া ফেলিলে?"

"তুমি জানিলে কিরূপে দিদি?"

"আমি তোমার পরেই যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন তাহা দেখিয়াছি। তার পর?"

"আমি বালি খুঁড়িয়া এক টুক্‌রা কাগজ পাইলাম। সেই কাগজটুকু হাতের লেখায় পূর্ণ এবং লেখার নীচে 'মু' লেখা।"

"কৈ, সে কাগজ দেখি?"

"রাজা তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন।"

"কি তাহাতে লেখা ছিল, মনে পড়ে কি? কথাগুলা মনে করিয়া বলিতে পার কি?"

"ভাবটা বলিতে পারি। খুব অল্প লেখা। তুমি হইলে তাহার সব কথা মনে করিয়া রাখিতে পারিতে।"

"আচ্ছা, অন্য কথার আগে তাহার ভাবটা যত দূর পার, বল দেখি।"

লীলা যাহা বলিল, আমি এ স্থলে ঠিক তাহা লিখিয়া রাখিতেছি;—

"কালি যখন তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, তখন এক মোটা লম্বা বুড়ামানুষ আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাকে দৌড়িয়া বাঁচিতে হইয়াছিল। সে লোকটা ভাল দৌড়িতে পারে না বলিয়া আমাকে ধরিতে পারে নাই। আজ আর সে সময়ে আসিতে আমার ভরসা হইতেছে না। তোমাকে এই সকল কথা জানাইবার জন্য অতি প্রত্যূষে সব বৃত্তান্ত কাগজে লিখিয়া বালির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। আবার যখন আমরা তোমার জঘন্য স্বামীর গোপনীয় বৃত্তান্তের কথা কহিব, তখন সে কথা খুব গোপনে কহিতে হইবে, তেমন সুযোগ না হইলে সে কথা আর হইবে না। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আবার শীঘ্রই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।—মু।"

"মোটা লম্বা বুড়ামানুষ" শুনিয়া কে সে গুপ্তচর, তাহা বুঝিতে আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। আমি কালি চৌধুরী মহাশয়ের সাক্ষাতে 'লীলা কাঠের ঘরে চিক খুঁজিতে গিয়াছে,' এ কথা বলিয়াছিলাম। এখন বোধ হইতেছে, দলীলে আপাততঃ নাম সহি করিতে হইবে না, এই কথা বলিয়া লীলাকে নিশ্চিন্ত ও আপ্যায়িত করিয়া বাহবা লইবার জন্য তিনিও হয় ত কাঠের ঘরে গিয়াছিলেন। কাঠের ঘরের নিকটে যাওয়ার পরই হয় ত মুক্তকেশী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পলায়ন করে। তাহাকে এরূপ সন্দেহজনকভাবে

পলায়ন করিতে দেখিয়া তিনি হয় ত তাহার অনুসরণ করেন। বোধ হয়, তাহাদের কথাবার্ত্তার কিছুই তিনি শুনিতে পান নাই। আমি লীলাকে আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"সে যাহা হউক, চিঠি তোমার হাতছাড়া হইল কি প্রকারে? বালির মধ্যে চিঠি পাওয়ার পর তুমি কি করিলে?"

সে উত্তর দিল,—"একবার তাহা পাঠ করার পর কাঠের ঘরের মধ্যে বসিয়া আবার তাহা পড়িতে লাগিলাম। যখন আমি তাহা পড়িতেছি, তখন তাহার উপর একটা ছায়া পড়িল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম, ঘরের দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া রাজা আমার প্রতি চাহিয়া আছেন।"

"তুমি চিঠিখানি লুকাইবার চেষ্টা করিলে না?"

"করিলাম বৈ কি? কিন্তু রাজা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—'উহা লুকাইবার জন্য তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না। আমি উহা পড়িয়াছি।' আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না—কেবল কাতরভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—'বুঝিলে, আমি উহা পড়িয়াছি। দুই ঘণ্টা আগে আমি উহা বালি হইতে তুলিয়া পড়িয়াছি। তাহার পর আবার বালির মধ্যে পুতিয়া, তোমার হাতে পড়িবে বলিয়া, উপরে যাহা লেখা ছিল, তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছি। আর মিছা কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। মুক্তকেশীর সঙ্গে কালি তোমার গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাকে এখনও আমি ধরিতে পারি নাই, কিন্তু তোমাকে ধরিয়াছি। আমাকে চিঠিখানি দেও।' তখন আর উপায় কি?—আমি চিঠিখানি তাঁহাকে দিলাম।"

"চিঠি দেওয়ার পর তিনি কি বলিলেন?"

"কোন কথা না বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে আনিলেন। তাহার পর কোন দিকে কেহ আছে কি না, কেহ আমাদের দেখিতে বা আমাদের কথা শুনিতে পায় কি না, সন্ধান করিয়া অতি জোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—'কালি মুক্তকেশী তোমাকে কি বলিয়াছে, বল। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথা বলিতে হইবে'।"

"তুমি বলিলে?"

"আমি একা দিদি, আর তাঁহার হাতের চাপে আমার হাত যেন কাটিয়া যাইতেছে—আমি করিব কি?"

"তোমার হাতের সে দাগ আছে? আমাকে দেখাও।"

"কেন দিদি, তাহা দেখিতে চাহিতেছ?"

"তোমার সেই আঘাত-চিহ্ন দেখিলে এই অত্যাচারের বিহিত প্রতীকারার্থে আমার আর শক্তি ও তেজের অভাব হইবে না। সেই চিহ্নই তাঁহাকে দমন করিবার যন্ত্র হইবে। দেখাও আমাকে—হয় তো এ কথা আমাকে ভবিষ্যতে হলপ করিয়া বলিতে হইবে।"

"না দিদি, সে জন্য অত কাতর হইও না। আমার তো এখন আর বেদনা নাই।"

"আমাকে তাহা দেখাও।"

লীলা সেই সকল আঘাতের দাগ দেখাইল। আমার তখন শোক নাই, ক্রন্দন নাই, কাতরতা নাই। আমার অন্তরের যে তীব্র জ্বালা—বাক্যে তাহা ব্যক্ত হইবার নহে। সরলস্বভাব নিষ্পাপহৃদয় লীলা ভাবিতেছে, দুঃখেই বুঝি আমার এমন ভাবান্তর হইয়াছে। ধিক্ দুঃখে! ইহার পরেও আবার দুঃখ!

লীলা কাতরভাবে বলিল,—"এ জন্য এত দুঃখ করিও না। দিদি! আমার আর এখন কোন বেদনা নাই।"

"তোমারই অনুরোধে আমি এ জন্য আর দুঃখ করিব না। আচ্ছা, তার পর মুক্তকেশীর কথাবার্ত্তা আমাকে যেমন যেমন বলিলে, তাঁহাকে তেমনই সব বলিলে?"

"হাঁ, সব। তিনি জেদ করিতে লাগিলেন। আমি একা, কিছুই লুকাইতে পারিলাম না।"

"তোমার কথা শুনিয়া তিনি কিছু বলিলেন কি?"

"তিনি আমার প্রতি চাহিয়া তীব্র পরিহাসের সহিত হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—'তোমার নিকট হইতে সব কথা শুনিতে চাই। শুনিতেছ কি? সব কথা।' আমি শপথ করিয়া বলিলাম,—'যাহা আমি জানিতাম, সমস্তই বলিয়াছি।' তিনি বলিলেন,—'না—আরও কথা তুমি জান। বলিবে না তুমি? তোমাকে বলিতেই হইবে। এখানে তোমার নিকট তাহা আদায় করিতে পারিতেছি না, বাড়ী গিয়া তোমার নিকট সব কথা আদায় করিয়া তবে ছাড়িব।' আর কোন কথা না বলিয়া, তোমার সহিত বা কাহারও সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনাশূন্য এক নূতন পথ দিয়া তিনি আমাকে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া তিনি আবার

বলিলেন,—'দেখ, এখনও দেখ। যদি ভাল চাও, তবে এখনও সব কথা বল।' আমি আগেও যাহা বলিয়াছিলাম, এখনও তাহাই বলিলাম। তিনি আমাকে একগুঁয়েমীর জন্য গালি দিতে দিতে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বলিলেন,—'তুমি আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। তুমি নিশ্চয়ই আরও কথা জান। আমি সব কথা তোমার নিকট এবং তোমার ভগ্নার নিকট শুনিয়া তবে ছাড়িব। তোমাদের দুই ভগ্নীর কু-মত্‌লব, ফুস্‌ফুসানি সকলই আমি বন্ধ করিয়া দিব। যত দিন তুমি সত্য কথা না বলিবে, তত দিন মনোরমার সহিত আর তোমার দেখা হইবে না। যত দিন সত্য কথা ব্যক্ত না করিবে, তত দিন নিয়ত তোমার উপর পাহারা থাকিবে।' আমার কোন কথা কানেও ঠাঁই দিলেন না। বরাবর তিনি আমাকে আমার ঘরে লইয়া আসিলেন। গিরিবালা সেখানে বসিয়া কি কাজ করিতেছিল। তিনি তাহাকে তখনই চলিয়া যাইতে হুকুম দিলেন। বলিলেন,—'এই চক্রান্তের মধ্যে তুইও যাহাতে না থাকিস্, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। তোরে আজি এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। যদি তোর মুনিবনীর কোন আ া-হিদা ঝির দরকার হয়, আমি তাহা ঠিক করিয়া দিব।' তাহার পর আমাকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া তিনি তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ঐ ভয়ানক ঝিটাকে আনিয়া পাহারা দিতে বসাইয়া দিলেন। বলিব কি তোমাকে দিদি, তাঁহাকে ঠিক পাগলের মত দেখাইতে লাগিল। তুমি হয় ত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।"

"লীলা, আমি সব বুঝিতে পারিতেছি। পাপাসক্ত মনের স্বাভাবিক আশঙ্কায় তিনি বস্তুতই পাগল হইয়াছেন। তুমি যত কথা বলিতেছ, ততই আমার দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, মুক্তকেশীর যদি আরও কিয়ৎকাল তোমার নিকট থাকা ঘটিত, তাহা হইলে এমন কথা সে ব্যক্ত করিত যে, তাহাতে তোমার দুরাত্মা স্বামীর সর্ব্বনাশ হইত। তিনি মনে করিতেছেন, সে কথা তুমি জানিতে পারিয়াছ। যাহাই বল বা যাহাই কর, তাঁহার পাপজনিত অবিশ্বাস কিছুতেই বিদূরিত হইবে না এবং তাঁহার মিথ্যাসক্ত প্রকৃতি তোমার সত্য কথা কদাপি বিশ্বাস করিবে না। সে কথা যাউক, এক্ষণে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা আবশ্যক। চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টাতেই আজি তোমার কাছে আমি আসিতে পাইয়াছি; কে জানে, কালি যদি তিনি এরূপ চেষ্টা আর না করেন। গিরিবালাকে রাজা জবাব দিয়াছেন; কারণ, সে বড় চালাক-চতুর এবং তোমার খুব অনুগত। যাহাকে তিনি তাহার কাজে বসাইয়াছেন, তোমার মঙ্গলামঙ্গলের সে ধারও ধারে না এবং সে এমই নির্ব্বোধ যে, তাহাকে জানোয়ার বলিলেও হয়। আমরা যদি শীঘ্র সাবধান হইয়া বিহিত ব্যবস্থা না করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যে আরও কত কঠিন উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে?"

"কিন্তু দিদি, আমরা কি করিতে পারি? হায়! আর কখন আসিতে না হয়, এমনই ভাবে যদি এ বাড়ী একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারা যাইত!"

আমি বলিলাম, "ভাবিয়া দেখ, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে আছি, ততক্ষণ তুমি সম্পূর্ণ নিঃসহায় নও।"

"তাহা আমি জানি এবং ভাবি। দিদি, কেবল আমার ভাবনায় গিরিবালার ভাবনা তুমি ভুলিও না; তাহার একটা উপায় করিয়া দেও।"

"আমি তাহার কথা ভুলি নাই। তোমার কাছে আসিবার আগে আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি, আর আজ রাত্রেও তাহার কাছে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। এখানকার ডাকের থলিয়ার চিঠি নিরাপদ্ নহে। আজি তোমার জন্য দুইখানি পত্র লিখিব, তাহা গিরিবালার হাত দিয়াই যাইবে।"

"কাহাকে লিখিবে?"

"করালীবাবু যে কোন বিষয়ে আবশ্যক হইলে আমাদের সাহায্য করিবার আশ্বাস দিয়াছেন; তাই তাঁহাকে এক পত্র লিখিব। আইন-কানুনের আমি কিছু জানি না বটে, কিন্তু ইহা আমার বিশ্বাস, ঐ পাষণ্ড আজি তোমার উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, আইনের বলে স্ত্রীলোক সেরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। মুক্তকেশী-সংক্রান্ত কোন বিশেষ কথা আমি লিখিব না; কারণ, সে সম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আজি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তোমার গায়ে যে সকল আঘাত লাগিয়াছে এবং তোমার উপর এই প্রকোষ্ঠে যে অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত উকীলকে না জানাইয়া আমি ছাড়িব না।"

"কিন্তু ভাবিয়া দেখ, দিদি, আইনের আশ্রয় লইতে গেলে বড় গোল হইবে না কি?"

"গোল হইবে, কিন্তু সে গোলে রাজারই ভীত হইবার কথা, আমাদের কি? আর কিছুতে না

হউক, এই গোলের ভয়েই তাঁহাকে আমাদের সহিত মিটমাট করিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমি উঠিলাম। কিন্তু লীলা ছাড়িতে চাহে না, কাজেই আবার বসিতে হইল।

লীলা বলিল,—"এ প্রকারে তুমি হয় ত তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিবে; তাহাতে আমাদের কষ্ট হয় ত দশগুণ বাড়িয়া যাইবে।"

কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু লীলা ভীত হইবে বলিয়া আমি তাহার কাছে তাহা স্বীকার করিলাম না। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল মাত্র—কোন তর্ক করিল না। দ্বিতীয় পত্র কাহাকে লিখিতেছি, এ কথা সে জিজ্ঞাসা করিলে আমি উত্তর দিলাম,—"রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট। তিনি তোমার অতি নিকট-আত্মীয় এবং তিনিই তোমার পিতৃকুলের মস্তক। তাঁহাকে অবশ্যই এ বিষয়ের মধ্যে মাথা দিতে হইবে।"

লীলা দুঃখিতভাবে মস্তকান্দোলন করিল। আমি বলিলাম,—"সত্য বটে, তোমার কাকা নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত, স্বার্থপর ও মন্দ লোক; কিন্তু তিনি রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ও নহেন এবং তাঁহার জগদীশনাথ চৌধুরীর মত কোন বন্ধুও নাই। আমার প্রতি বা তোমার প্রতি তাঁহার মমতা বা স্নেহের জন্য কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশা আমি করি না। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কেমন করিয়া কাজ আদায় করিতে হয়, তাহা আমি জানি। আমি তাঁহাকে বলিব, এই সময়ে মনোযোগী ও সাবধান না হইলে, পরে তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, অনেক ভোগ ভুগিতে হইবে এবং অনেক দায় তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। এ কথা তাঁহাকে যদি আমি বুঝাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যেরূপ আলস্যপ্রিয় ও স্বার্থপর, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে ইচ্ছামত কাজ পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে না বোধ হয়।"

"আর কিছু হউক না হউক, যদি কিছু দিনের জন্য আমার আনন্দধামে থাকায় তাঁহার মত করিতে পার, আর যদি দিদি, সেখানে কয়েক দিন তোমার সহিত আবার নিরুদ্বেগে থাকিতে পাই, তাহা হইলে আমি বিবাহের পূর্ব্বে যেমন সুখী ছিলাম, আবার প্রায় তেমনই সুখী হই।"

এই কয়টি কথা আমার চিত্তকে অন্য পথে লইয়া চলিল রাজা হয় আইনের চক্রে পড়িয়া মহা গোলে হাবুডুবু খাউন, না হয় স্ত্রীকে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ী যাওয়ার ওজরে তফাৎ হইতে দেন। শেষ প্রস্তাবে রাজা সহজে সম্মত হইবেন কি? বড় সন্দেহ। যাই হউক, চেষ্টা করিয়া তো দেখা যাউক। লীলাকে বলিলাম,—"তুমি এখনই যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহা তোমার কাকাকে জানাইব এবং এ সম্বন্ধে উকীলের মত কি, তাহাও জিজ্ঞাসা করিব। আশা করি যে, এ উপায়ে ভালই হইবে।"

আমি আবার উঠিলাম। লীলা আবার আমাকে বসাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"মনের এরূপ অবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া যাইও না দিদি। এখানেও তো লিখিবার সরঞ্জাম রহিয়াছে। যাহা লিখিতে হয়, এখানে বসিয়া লেখ।"

তাহার নিজের কাজের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ একত্রে রহিয়াছি। আমাদের পুনরায় দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া না হওয়া, আমাদের নূতন সন্দেহ উৎপাদন না করার উপর নির্ভর করিতেছে। নীচে যে দুরাচারেরা এখন আমাদের কথাই কহিতেছে এবং আমাদেরই ভাবনা ভাবিতেছে, তাহাদের নিকট এক্ষণে নির্লিপ্ত ও অকাতরভাবে আমার দেখা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমি এ কথা লীলাকে বুঝাইয়া দিলাম,—"এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরিব দিদি। যত দূর হইবার, তাহা আজি হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোন ভয় নাই।"

"আমি কেন ভিতরদিক্ হইতে দরজা বন্ধ করিয়া থাকি না দিদি?"

"বেশ তো, তাই কর। আমি আবার ফিরিয়া আসিয়া না ডাকিলে কাহাকেও দরজা খুলিয়া দিও না।"

আমি বাহিরে আসিলে লীলা দরজা বন্ধ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ। খানিকটা দূর চলিয়া আসার পর লীলার দরজা বন্ধ করার কথা মনে পড়ায়, আমারও আপনার ঘরের দরজায় চাবী দিয়া সেই চাবীটা সঙ্গে লইয়া আসিতে ইচ্ছা হইল। আমার দিনলিপি দেরাজের মধ্যেই চাবী দেওয়া ছিল, কেবল লিখিবার সাজসরঞ্জামগুলা বাহিরে পড়িয়া ছিল। ব্লটিং কাগজগুলা বাহিরে ছিল, কালি রাত্রি দিনলিপিতে যাহা লিখিয়াছি, তাহার শেষ কয়েক ছত্রের উলটা ছাপ একখানি ব্লটিং কাগজে লাগিয়াছিল। আজিকালি সন্দেহটা আমার এতই প্রবল হইয়াছে

যে, এই সকল সামান্য সামগ্রীও অসাবধানভাবে রাখিতে আমার আর মন সরিল না। এখন ঘরে আসিয়া দেখিলাম, যতক্ষণ আমি লীলার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, তাহার মধ্যে কেহ আমার ঘরে আসিয়াছিল, এমন বোধ হইল না লিখিবার জিনিসপত্র টেবিলের উপর যেরূপ ভাবে ছড়ান থাকে, প্রায় তেমনই রহিয়াছে দেখিলাম। কেবল একটা . বিশেষ দেখিলাম, আমার মোহরটা কলমদানের উপরে রহিয়াছে। কিন্তু আমি হাজার অসাবধান হইলেও কখন তাহা সেখানে রাখি না। যাহাই হউক, আজি সমস্ত দিন নানা কারণে এতই উদ্বিগ্ন আছি যে, আবার এই তুচ্ছ বিষয় মনে করিয়া সে উদ্বেগের ভার বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না। দরজা বন্ধ করিয়া এবং চাবীটা আপনার সঙ্গে লইয়া নীচে আসিলাম।

নীচে বড় ঘরে রঙ্গমতি ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"এখনও পড়িতেছে—বোধ হয়, আজি আরও বৃষ্টি পড়িবে।"

দেখিলাম, তাঁহার মুখ-চোখের স্বাভাবিক ভাব ও বর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে বটে; কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছেন, এমন বোধ হইল না।

তখন যে লীলা আমার নিকট চৌধুরী মহাশয়কে জঘন্য 'গুপ্তচর' বলিয়াছিল, সে কথা নিশ্চয় চৌধুরাণী ঠাকুরাণী গোপনে শুনিয়াছিলেন। আচ্ছা, সে কথা কি তিনি তাঁহার স্বামীকে বলিয়া দিয়াছেন? নিশ্চয়ই বলিয়া দিয়াছেন। লীলা না থাকিলে তিনি লীলার পিতার কৃত উইল অনুসারে লক্ষ মুদ্রার উত্তরাধিকারিণী হইবেন। ইহাই তাঁহার চক্ষে লীলার অমার্জ্জনীয় অপরাধরূপে পরিগণিত; তাহার উপর আবার লীলার দুর্ব্বাক্য! এ সকল কথা আমার আজি মনে পড়িল এবং তিনি যে এক জন লীলার প্রবল শত্রু, তাহাও আমার মনে হইল। এমন স্থলে তিনি যে লীলার কটূক্তি তাঁহার স্বামীকে বলিয়া দেন নাই, ইহা অসম্ভব। অন্তরে যাহাই হউক, অন্ততঃ বাহ্য সদ্ভাব যত দূর সম্ভব বজায় রাখিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক বোধে আমি নিতান্ত বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলাম,—"একটা অতিশয় কষ্টকর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহাতে কর্ণপাত করিবেন কি?"

অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বিনা বাক্যে গম্ভীরভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

আমি বলিতে লাগিলাম,—"যখন আপনি কৃপা করিয়া আমার মুদ্রাধার লইয়া গিয়াছিলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তখন আপনি লীলার মুখ হইতে এমন দুটা একটা কথা শুনিয়াছিলেন, যাহার পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রতিবাদার্হ। আমি ভরসা করিতেছি, নিতান্ত তুচ্ছবোধে আপনি সে সকল কথা আপনার স্বামীর নিকট ব্যক্ত করেন নাই।"

তীব্রস্বরে তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তাহা অতিশয় তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিয়াছি। কিন্তু অতি তুচ্ছ বিষয়ও আমি আমার স্বামীর নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিতে জানি না। যখন তিনি আমার বদনের কাতরভ ব লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখনই আমাকে সকল কথা ব্যক্ত করিতে হইয়াছে।"

এ কথা আমি জানিতাম, তথাপি তাঁহার মুখে কথাটা শুনিয়া বড় ভয় হইল। আবার বলিলাম,—"আমি কাতরভাবে আপনাকে ও চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যখন এ কথা বলিয়াছে, তখন বিজাতীয় অপমান ও নিদারুণ মনস্তাপে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল। আমি ভরসা করিতেছি, এই সকল বিচার করিয়া, আপনারা উদারতা সহকারে তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে স্থির-গম্ভীর-শব্দে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"নিশ্চয়ই।" তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে আমার পশ্চাতে আসিয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "রাণী-মা ঐ সকল কথা দ্বারা আমার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি দুঃখিত হইলেও তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতেছি। মনোরমা দেবি, এই মুহূর্ত্ত হইতেই ও প্রসঙ্গ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাউক; আর কদাপি উহার উল্লেখও না হয়।"

আমি বলিলাম,—"আপনি কৃপা করিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা—" আমি আর বলিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয় তখন সর্ব্বভাবপ্রচ্ছন্নকারী, সর্ব্বনাশসাধক ঈষৎ হাস্যের সহিত এমনই প্রশান্তমুখে আমার প্রতি চাহিলেন যে, আমি কি বলিতেছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। তাঁহার অপরিমেয় কপটতার জন্য তাঁহার প্রতি

আমার ঘোর অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার উপর আবার তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করায় আমার আপনাকে আপনি এতই হীন ও ইতর বোধ হইল যে, আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম এবং আর কোন কথা কহিতে না পারিয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আমি করযোড়ে বলিতেছি, এ সম্বন্ধে আপনি আর কোন কথা বলিবেন না। এই তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া আপনি এত কথা বলিতেছেন বলিয়া আমি নিতান্ত লজ্জিত ও কাতর হইতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি উভয় হস্তে আমার দক্ষিণ-হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি, তাহা ভগবান্‌ই বলিতে পারেন। ফলতঃ যাহা মনে করিয়াই হউক এবং যে ভাবেই হউক, তিনি আমার হাত ধরিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন বলিয়া উঠিলেন,— "চৌধুরী! তোমার ও সব বাঙ্গালে শিষ্টাচার এ দেশের মেয়েমানুষে পছন্দ করে না।"

অমনই চৌধুরী মহাশয় আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তা করুক আর নাই করুক, আমার যে দেবী এ দেশের সকল মেয়েমানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই পছন্দ করেন।" কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উভয় হস্তে আপনার স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিলেন।

আমি এই সুযোগে চলিয়া আসিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। চিঠি দুখানা এখনও লেখা হয় নাই। আমি আর কালব্য.জ না করিয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। এ জগতে আমাদের পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, তবে আর কাহাকে আমাদের বিপদের কথা জানাইব? কে আসিয়া আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবে? কাজেই এ দারুণ দুঃসময়ে এই দুখানি পত্রের উপর আমাদের সকল আশা নির্ভর করিতেছে। ইহাতেই বা ফল কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আর উপায় কি? যদি লীলা ও আমি এখান হইতে পলাইয়া যাই, তাহা হইলে উপকার না হইয়া অপকার হইবে এবং তাহাতে ভবিষ্যতে আমাদিগকে বড়ই ঠকিতে হইবে। কঠোর শারীরিক অত্যাচারের সম্ভাবনা না হইলে সে কাজ কখনই কর্ত্তব্য নহে। আগে চিঠি দুখানি লিখিয়া দেখা যাউক। চিঠি লিখিলাম

উকীলকে আমি মুক্তকেশীর কোন কথা লিখিলাম না, কারণ, তাহার সহিত যে একটা রহস্য জড়িত আছে, আমরা তাহার কথা এখনও কিছু জানি না। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, রাণীর উপর রাজা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরে যাওয়া বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। যদিই রাজা আমাদের দিন কয়েকের জন্য আনন্দধামে যাইতে না দেন, তাহা হইলে আমরা আইনের আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারি কি না, এ কথাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম। যত শীঘ্র সম্ভব, বিহিত উপদেশ দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে আমি খুব ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলাম। উকীলকে যে পত্র লিখিলাম, তাহার একটা নকল রায় মহাশয়ের পত্রমধ্যে দিয়া লিখিলাম, দেখিবেন, মামলা বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সময়ে তিনি মনোযোগী হইয়া দিন কয়েকের জন্য আমাদিগকে আনন্দধামে লইয়া যাইতে না পারিলে শেষে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইবে। লেখা শেষ হইলে খামের উপর শিরোনামা লিখিয়া এবং গালামোহর করিয়া লীলাকে বলিবার জন্য লীলার ঘরে চলিলাম।

লীলা আমাকে দ্বার খুলিয়া দিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"কেহ তোমাকে ত্যক্ত করে নাই তো?"

সে বলিল,—"কেহ আমার ঘরে আঘাত করে নাই বটে, কিন্তু পাশের ঘরে কে আসিয়াছিল।"

"পুরুষ কি মেয়েমানুষ?"

"মেয়েমানুষই বোধ হয়। কারণ, আমি চেলীর কাপড়ের মত খস্-খস্ শব্দ শুনিতে পাইয়াছি।"

"তবেই চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এ দিকে আসিয়াছিলেন ভুল নাই। তিনি নিজে কোন অনিষ্ট করিতে পারুন আর নাই পারুন,—তিনি তাঁহার স্বামীর হাতের কল কি না,—সুতরাং কোন্ অনিষ্ট তাঁহার দ্বারা না ঘটিতে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তার পর সে খস্-খস্ শব্দের কি হইল? তোমার ঘরের দেয়ালের পাশে সে শব্দ হইয়াছিল কি?"

"হাঁ দিদি, আমি চুপ করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম।"

"কোন্ দিকে শব্দটা গেল?"

"তোমার ঘরের দিকে।"

শব্দটা কিন্তু আমার কানে যায় নাই। বোধ

হয়, আমি তখন চিঠি লিখিতে অন্যমনস্ক ছিলাম এবং সেখানেও খস্‌-খস্‌ করিয়া শব্দ হইতেছিল। তাহাতেই বোধ হয়, আমি কিছু শুনিতে পাই নাই, কিন্তু চৌধুরাণীর কাপড়ের শব্দ আমি শুনিতে না পাইলেও আমার লেখার শব্দ তাঁহার শুনিতে পাওয়ার খুব সম্ভাবনা। এত সন্দেহও যেখানে মনে হয়, সেখানে কি কখন ডাকের থলিয়ার ভিতর চিঠি দেওয়া চলে?

পাঁচটা বাজিতে আর একটু দেরী আছে। গিরিবালা যেখানে আছে, গ্রামের ভিতর সে খুড়ীর বাড়ীতে এখন গিয়া আবার সাতটার মধ্যে অনায়াসে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। আরও বিলম্ব করিলে হয় তো কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। লীলাকে বলিলাম,—"ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া রাখ; আমার জন্য কোন ভয় করিও না। যদি কেহ আমার খোঁজ করে, তাহা হইলে দরজা না খুলিয়া ভিতর হইতেই বলিও যে, আমি বেড়াইতে গিয়াছি।"

"কখন্‌ তুমি ফিরিবে?"

"সাতটার আগে নিশ্চয়ই ফিরিব। ভয় কি দিদি? কালি এমন সময়ে অতি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকের উপদেশ পাইবে। উমেশবাবু এখন উপস্থিত নাই—এখন করালীবাবুই আমাদের প্রধান আত্মীয়।"

নীচে আসিয়া পাখীর আওয়াজ এবং তামাকের গন্ধ পাইয়া বুঝিলাম, চৌধুরী মহাশয় পুস্তকালয়ে রহিয়াছেন। সে দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, তাঁহার পাখী সব কেমন পোষমানা, তাহাই তিনি গিন্নীঝিকে দেখাইতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে তামাসা দেখাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, নহিলে সে কি কখন ইচ্ছা করিয়া পুস্তকালয়ে আইসে? লোকটা যাহা কিছু করে, তাহারই ভিতরে একটা না একটা মতলব থাকে। এ কার্য্যে তাহার কি মতলব? কিন্তু তাঁহার মতলব অনুসন্ধান করিবার সময় নাই। চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর সন্ধান করিয়া দেখিলাম, তিনি কাজ না থাকিলে যেমন করেন, এখনও তেমনই সেই ছোট পুকুরের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এখনই আমাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ভয়ানক ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছিল; আবার আমাকে দেখিয়া না জানি, তাঁহার কি ভাব হইবে, মনে করিয়া আমি ভীত হইলাম। দেখা হইলে বুঝিলাম, তাঁহার স্বামী আবার তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। তিনি সতত আমার সহিত যেরূপ সৌজন্য করিয়া থাকেন, এবার তেমনই করিলেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়, যদি তাঁহার নিকট রাজার কোন সংবাদ জানা যায়। আমি সুকৌশলে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। ঠাকুরাণী নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ব্যক্ত করিলেন, "রাজা বাহিরে গিয়াছেন," আমিও সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত উদাসীনভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজা কোন্‌ ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন?"

ঠাকুরাণী উত্তর দিলেন,—"কোন ঘোড়াতেই নহে। দুই ঘণ্টা হইল, তিনি হাঁটিয়া বেড়াইতে গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি মুক্তকেশী নামে সেই স্ত্রীলোকের সন্ধানে গিয়াছেন। আচ্ছা, মনোরমা দেবি, জানেন কি আপনি, সে মুক্তকেশী কি ভয়ানক পাগল?"

"না মা, আমি কিছুই জানি না।"

"এখন কি আপনি বাড়ীর মধ্যে যাইবেন?"

"হাঁ।"

আমরা উভয়ে একত্রে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

রঙ্গমতি ঠাকুরাণী বেড়াইতে বেড়াইতে পুস্তকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। আমি মনে করিলাম, গিরিবালার নিকট যাইবার এই উত্তম সুযোগ; অতএব আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করা অন্যায়। নিজের ঘর হইতে যাত্রার জন্য ঠিকঠাক হইয়া নীচে আসিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহই নাই। পুস্তকালয় হইতে চৌধুরী মহাশয়েরও আওয়াজ বন্ধ হইয়াছে। যাহাই হউক, কে কোথায় আছেন, সে অনুসন্ধানে আমার এখন আর কাজ নাই। আমি পত্র দুইখানি সাবধানে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম। গ্রামে যাইতে যাইতে পথের মধ্যে রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। যদি তিনি একা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি একটুও ভয় করি না। যে স্ত্রীলোকের আপনার বিবেচনাশক্তি স্থির আছে, সে যে পুরুষের ধৈর্য্য নাই, তাহার নিকটে অক্লেশে জিতিয়া যাইতে পারে। চৌধুরী মহাশয়কে আমি যতটা ভয় করি, রাজাকে আমি ততটা ডরাই না। রাজা যে কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি একটুও চঞ্চল হইলাম না। মুক্তকেশীর সন্ধান করাই এখন রাজার প্রধান চিন্তা; সুতরাং যতক্ষণ তাঁহার মনের এই গতি থাকিবে, ততক্ষণ লীলা ও আমি তৎকৃত অভিনব অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব সন্দেহ নাই। আমাদের স্বার্থের জন্য এবং মুক্তকেশীরও মঙ্গলের জন্য এক্ষণে আমার প্রার্থনা, যেন

শীঘ্র রাজা তাহার সন্ধান না পান। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে আমি খুব দ্রুত চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে কি না, জানিবার জন্য আমি একবার পিছন দিকে চাহিতে লাগিলাম। আমার পশ্চাতে কতকগুলা বস্তা-বোঝাই একখানি গরুর গাড়ী ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাহার চাকার ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ আমাকে নিতান্ত জ্বালাতন করিতে লাগিল। এ জন্য গাড়ীখানা আমাকে ছাড়াইয়া বহু দূর চলিয়া যাউক, তাহার পর যাইব, এরূপ অভিপ্রায় করিয়া, আমি পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর গাড়ীখানার দিকে অধিকতর মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করায় আমার যেন বোধ হইল, তাহার ঠিক পিছনে একটি মানুষ হাঁটিয়া আসিতেছে; আমি একবার গাড়ীর ফাঁক দিয়া যেন তাহার পা দেখিতে পাইলাম। গাড়োয়ান গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া আছে। আমি রাস্তার যে জায়গায় দাঁড়াইয়াছি, সে স্থানটা নিতান্ত সরু। গাড়ী যাইতে হইলে সেখানে রাস্তার দুই দিকে যে বেড়া আছে, তাহাতে গাড়ী ঘেঁসিয়া যাইবে। অতএব গাড়ী চলিয়া গেলেই ঠিক বুঝিতে পারিব, আমার সন্দেহ সত্য কি না। গাড়ী চলিয়া গেল, কিন্তু কৈ, তাহার পিছনে তো মনুষ্যের চিহ্নও নাই। তবে নিশ্চয়ই আমার সন্দেহ অমূলক।

রাস্তায় কাহারও সহিত দেখা হইল না এবং অন্য কোন সন্দেহজনক ঘটনাও লক্ষিত হইল না। যে বৃদ্ধার বাটীতে গিরিবালা রাত্রিযাপন করিবে স্থির ছিল, আমি সেখানে উপনীত হইলাম। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বৃদ্ধা গিরিবালাকে বড় যত্নে রাখিয়াছে। তাহার জন্য সে একটি স্বতন্ত্র ঘর ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার শুইবার জন্য একটি মাদুর ও একটি পরিষ্কার বালিস দিয়াছে এবং তাহার রাত্রের আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। গিরিবালা আমাকে দেখিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, বিনা দোষে তাহাকে আশ্রয়হীন ও জীবিকাহীন হইতে হইল। তাহার যে কি দোষ, তাহা সে তো নিজে জানেই না; তাহার প্রভু তাহাকে তাড়িত করিলেন বটে, কিন্তু তিনিও তাহা জানেন না। আহা! বেচারার কথাও যথার্থ এবং তাহার অবস্থাও বড় শোচনীয়।

আমি বলিলাম,—"বিধাতা যেরূপ ঘটাইবেন, সেইরূপই ঘটিবে। গিরিবালা, সুতরাং সে জন্য আর আক্ষেপ করায় কোন ফল নাই। তোমার প্রভুপত্নী এবং আমি আমরা উভয়ে তোমার যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব। এখন আমার কথা শুন। আমার এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় নাই। আমি তোমার হাতে একটি অতিশয় বিশ্বাসের কাজ সমর্পণ করিতেছি। তুমি এই চিঠি দুইখানি বিশেষ যত্নের সহিত রাখিয়া দেও। যে চিঠিখানির উপর টিকিট দেওয়া আছে, সেখানি তোমাকে কালি কলিকাতা পৌঁছিয়াই ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দিতে হইবে। অন্যখানি আনন্দধামে পৌঁছিয়াই তোমাকে স্বয়ং রাধিকাবাবুর হাতে দিতে হইবে। চিঠি দুইখানি অতিশয় সাবধাননতার সহিত আপন আঁচলে বাঁধিয়া রাখ এবং আর কাহারও হাতে দিও না। ঐ চিঠি দুইখানির মধ্যে রাণীর যার-পর-নাই দরকারী কথা আছে জানিবে।"

গিরিবালা পত্র দুইখানি পরিধান-বস্ত্রের কোলের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া বলিল,—"যতক্ষণ আপনার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সময় না আসিবে, ততক্ষণ চিঠিখানি এখানেই থাকিবে।"

তাহার পর আমি বলিলাম,—"সাবধান, কালি তোমাকে খুব ভোরে ষ্টেশনে যাইতে হইবে, নহিলে গাড়ী পাইবে না। আনন্দধামে গিয়া সেখানকার গিন্নী-ঝিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে যে, যত দিন রাণী তোমাকে পুনরায় নিজ কর্ম্মে না নিযুক্ত করিতে পারেন, তত দিন তুমি আমার নিকট বেতন পাইয়া আনন্দধামে থাকিবে। শীঘ্রই আবার আমার সঙ্গে দেখা হইবে; সে জন্য দুঃখ করিও না। এখন আমি আসি।"

গিরিবালা বলিল,—"আপনার কথা শুনিয়া আমার প্রাণে আবার ভরসা হইল। আহা! না জানি, আজি আমি কাছে না থাকায় রাণী-মার কতই অসুবিধা হইবে; কিন্তু কি করিব মা, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি আপনারই দাসী, যেখানেই থাকি আর যা-ই করি, যেন আপনাদের সেবা করিতে করিতেই আমার দিন যায়।"

আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি বাটী ফিরিয়া লীলার ঘরে প্রবেশ করিলাম। লীলার কানে কানে অস্ফুটস্বরে বলিলাম,—"চিঠি গিরিবালার হাতে দেওয়া হইয়াছে। নীচে যাইতেছি, তুমি যাইবে কি?"

"না না—কোনক্রমেই না।"

"কিছু হইয়াছে কি? কেহ এ দিকে আসিয়াছিল কি?"

"হাঁ—খানিকটা আগে রাজা—"

"তিনি ঘরের ভিতর আসিয়াছিলেন কি ?"

"না। তিনি দরজায় ঘা মারিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে ওখানে?' তিনি বলিলেন, 'বুঝিতে পারিতেছ না কে? এখনও আমাকে বাকী কথা বলিবে কি না বল। তোমাকে বলিতেই হইবে। এখন না হয়, যখন হউক, সে সকল কথা তোমার নিকট আদায় করিয়া তবে ছাড়িব। মুক্তকেশী এখন কোথায় আছে, নিশ্চয়ই তাহা তুমি জান।' আমি বলিলাম,—'আমি সত্য বলিতেছি, তাহা আমি জানি না।' তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'সে কথা আমি শুনিতে চাহি না, তুমি নিশ্চয়ই জান। মনে রাখিও, আমি তোমার একগুঁয়েমী ভাঙ্গিয়া দিবই দিব, তোমার নিকট হইতে সমস্ত রহস্য আদায় করিবই করিব!' এই কথা বলিয়া দিদি, তিনি এই চলিয়া যাইতেছেন—এখনও পাঁচ মিনিটও হয় নাই।"

তবেই বুঝা যাইতেছে, রাজা এখনও মুক্তকেশীর সন্ধান পান নাই। সুতরাং আজি রাত্রিটা আমাদের নির্ব্বিঘ্নে কাটিবে সন্দেহ নাই।

লীলা জিজ্ঞাসিল,—"তুমি এখন নীচে যাইতেছ কি দিদি? যাও, কিন্তু শীঘ্র আসিও।"

"সন্ধ্যার একটু পরেই আমি আবার উপরে উঠিব। নিতান্ত শীঘ্র আসিলে সকলে রাগও করিতে পারে, তাহাদের মনে নানা সন্দেহও জন্মিতে পারে। দুদণ্ড বসিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা না কহিলে ভাল দেখাইবে কেন? আমি শীঘ্রই আসিব, সে জন্য কোন ভয় নাই।"

নীচে আসিলাম। দেখিলাম, পিসী ঠাকুরাণী কেতাব-ঘরে বসিয়া তাঁহার স্বামীর ব্যবহারের জন্য একখানি রুমালে রেশমের ফুল তুলিতেছেন। তাঁহার অনতিদূরে রাজা নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে একদৃষ্টে জানালার দিকে চহিয়া আছেন। আর চৌধুরী মহাশয় বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসিয়া আস্তে আস্তে দুলিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র রঙ্গমতি দেবী বলিয়া উঠিলেন, "মনোরমা দেবী আসিয়াছেন—ভালই হইয়াছে। চলুন, এ সন্ধ্যার সময়টা আর ঘরের ভিতরে বসিয়া কাজ নাই, বাহিরে বারান্দায় যাওয়া হউক।"

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন এবং বাহিরে আসিতেছি দেখিয়া তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাহিরে চৌধুরী মহাশয়ের নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তিনি নিতান্ত ঘর্ম্মাক্ত এবং ক্লান্ত। আর প্রতিদিন বৈকালে তাঁহার যেরূপ পরিচ্ছদ-পারিপাট্য দেখা যায়, আজি সেরূপ নাই। তবে কি তিনিও এতক্ষণ আমার মত দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন? কিংবা অন্য দিনের অপেক্ষা আজি তাঁহার গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় এরূপ হইয়াছে কি? সে যাহাই হউক, তাঁহাকে আজি বিশেষ উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হইল। ছলনার অপরিমেয় উপায়াবলী তাঁহার আয়ত্তাধীন সত্য, তথাপি আজি তিনি তাঁহার ব্যাকুলিত ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে আর রাজার মুখে আজি কথাটিও নাই বলিলেই হয়। আর চৌধুরী মহাশয় থাকিয়া থাকিয়া বিষম উদ্বেগের সহিত তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার এরূপ ভাব আমি আর কখন দেখি নাই। তাঁহার যাহাই কেন হউক না, আমার প্রতি শিষ্টাচারে তিনি কখনই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এরূপ সৌজন্যের অভ্যন্তরে কি দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা আমি এখনও নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। কিন্তু অভিসন্ধি যাহাই হউক, আমার সম্বন্ধে অযথা শিষ্ট ব্যবহার, লীলার সহিত সর্ব্বদা বিনীত ব্যবহার এবং যেরূপেই হউক, রাজার ঘৃণিত ও উদ্ধত ব্যবহারের নিরোধ, এই ত্রিবিধ উপায় এই ভবনে পদার্পণ করার পর হইতে তিনি স্বীয় মনোভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সতত পালন করিয়া আসিতেছেন। যে দিন পুস্তকালয়ে প্রথমে দলীল বাহির করা হইয়াছিল, সেই দিনে তাঁহারা আমাদের পক্ষাবলম্বন দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এখন আমার সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। আজি চৌধুরী মহাশয় ও রাজার যেরূপ ভাব, তাহাতে কথাবার্ত্তার বিশেষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি যাইবার একটা ওজর খুঁজিতেছিলাম। এমন সময়ে রঙ্গমতি ঠাকুরাণী উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া আমিও সেই পক্ষে যোগ দিলাম। আমরা উভয়ে প্রস্থানের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলে চৌধুরী মহাশয় উঠিলেন।

তখন রাজা বলিলেন, "আরে জগদীশ! তুমি যাও কেন?"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমার শরীরটা খারাপ আছে, আমি আজি উঠি।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার কপালে আগুন! বইসো এখানে—দুদণ্ড ঠাণ্ডা হইয়া গল্প করা যাউক।"

চৌধুরী বলিলেন—"দুদণ্ড আমি গল্পে খুব রাজি আছি, কিন্তু এখন নয়, আর একটু পরে।"

রাজা অসভ্যভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা! বেশ, এমন শিষ্টাচার কোথায় শিখিয়াছিলে?"

যতক্ষণ আমরা নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া ছিলাম, তাহার মধ্যে রাজা অনেকবার চৌধুরী মহাশয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; চৌধুরী কিন্তু সযত্নে রাজার দৃষ্টির সহিত আপন দৃষ্টি একবারও মিলিত হইতে দেন নাই। এই ঘটনা এবং দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কহিতে রাজার একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ অথচ চৌধুরী মহাশয়ের তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি আমাকে মনে করাইয়া দিল যে, রাজা আজি আরও একবার চৌধুরী মহাশয়কে পুস্তকালয় হইতে বাহিরে আসিয়া দুদণ্ড কথা কহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। অতএব তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় যাহাই হউক, রাজার আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হয়,তাহা তাঁহার বিবেচনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, আর চৌধুরী মহাশয়ের অনিচ্ছা বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনায় বড় বিপজ্জনক বিষয়।

আমি এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রঙ্গমতি দেবীর সহিত উপরে উঠিলাম এবং শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলাম। চৌধুরী মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, রাজার অনিচ্ছায় চলিয়া আসার জন্য রাজা যে বিরক্তিভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, চৌধুরী মহাশয় তাহাতে একটুও বিচলিত বা কাতর হন নাই। তিনি একটুখানি ঘরের মধ্যে থাকিয়া আবার বাহিরে আসিলেন এবং তখনই আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মনোরমা দেবি, ডাকের চিঠি সকল চলিয়া যাইতেছে। আপনার কোন চিঠি থাকে তো এই সময় দিতে পারেন।"

প্রতিদিন এইরূপ সময়ে রাজবাটী হইতে শেষবার চিঠির থলিয়া ষ্টেশনের ডাকঘরে পৌঁছিবার নিমিত্ত লোক যায় বটে।

চৌধুরী মহাশয়ের জন্য তাঁহার গৃহিণী এতক্ষণ পান তৈয়ার করিতেছিলেন। তখন আমি কি জবাব দিই, তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার হাত কর্ম্মে বিরত হইল।

আমি বলিলাম,—"না চৌধুরী মহাশয়, আমার আজি কোনই পত্র নাই।"

তখন চৌধুরী মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া পিয়ানোর নিকট বসিলেন এবং তাহার সহিত গলা মিলাইয়া একটা হিন্দী গান ধরিলেন। গান সমাপ্ত হইলে তাঁহার পত্নী ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লীলার ঘরে না জানি আবার কি কাণ্ড ঘটিবে মনে করিয়া এবং চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একাকী এক ঘরে থাকিতে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা বলিয়া আমিও উঠিলাম। তখন চৌধুরী মহাশয় আমাকে সেজটা কৃপা করিয়া তাঁহার পিয়ানোর উপরে উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলে তিনি বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আপনার নিকট আমার এক নালিস আছে এবং আমার সম্পূর্ণ আশা আছে, আপনার নিকট তাহার যথাবিহিত সুবিচার হইবে।"

কাজেই তাঁহার নালিশ শুনিবার জন্য আমাকে সেখানে অধোবদনে অপেক্ষা করিতে হইল। ভাবিলাম, এ আবার কি নূতন ভাব! না জানি, কি কথাই তিনি উত্থাপন করিবেন। তখন তিনি বলিলেন,—"দেবি! আমরা বাঙ্গাল। আপনারা বলিয়া থাকেন, 'বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু, লাফ দিয়া গাছে উঠে লেজ নেই কিন্তু।' উড়েরা মানুষ কি না এবং তাহাদের লেজ আছে কি না, তাহার বিচারে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বাঙ্গাল—বাঙ্গালের মনুষ্যত্ব আছে কি না, তাহারই জন্য আমি আপনার মহামান্য আদালতে বিচারপ্রার্থী। আমাদের যে লেজ নাই, ভরসা করি, এ কথা আপনি জ্ঞাত আছেন এবং ইহার সমর্থনের জন্য আমাকে কোন প্রমাণপ্রয়োগ করিতে আদেশ করিবেন না। লেজ নাই বটে, তথাপি মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি কেন, ইহাই এখানে আলোচ্য। আমাদের হস্তপদাদি সকলই আপনাদের সমান এবং আহার-ব্যবহার আপনাদের অনুরূপ। লাফ দিয়া আমরা যে গাছে উঠি না এবং তাদৃশ কার্য্যে আপনারা যেমন অশক্ত, আমরাও যে তেমনই অসমর্থ, তাহা বোধ হয়, আপনার অগোচর নাই। তথাপি আমাদের কোন্ অপরাধ হেতু আপনারা আমাদের মনুষ্যত্ব বিলোপ করিয়া থাকেন, তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। শুনিতে পাই, আপনারা আমাদিগকে বিদ্যাবুদ্ধিতে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যই আমাদিগের প্রতি এইরূপ হীনতা আরোপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি ধর্ম্ম, ন্যায় ও সত্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলুন দেখি, আমরা কি বস্তুতই আপনাদের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে নিতান্তই হীন? যদিই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন হীনতা থাকে, সে হীনতা অতি সামান্য এবং তাদৃশ সামান্য বৈষম্য হেতু তাদৃশ অবজ্ঞা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেহ কেহ

বলিয়া থাকেন, আমরা সঙ্গীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং আমাদের দেশের কোন কবিই এ কাল পর্য্যন্ত কোনই উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। এ কথার উত্তরে আমার বিনীত নিবেদন যে, সংপ্রতি আমাদের দেশের এক জন অতি শ্রদ্ধাস্পদ কবি যে এক গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাকে শুনিতে হইবে এবং তাহা শুনিয়া যদি এতৎপ্রদেশীয় সকল কবির সকল গীতের অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ, মধুর, ললিত ও ভাবময় বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে অদ্য হইতে আপনারা আমাদের পশু কেন, কীট বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আমরা সে কলঙ্ক অবনত-মস্তকে বহন করিব। অতএব দেবি! কৃপা করিয়া মনোযোগ সহকারে সে গীত শ্রবণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

এ কি ব্যাপার! এ কি ঢঙ্গ! গীতে আমার কোনই আসক্তি নাই এবং কাব্য ও সঙ্গীতের বিচার ও আলোচনায় আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, ইত্যাদি নানা ওজর উপস্থিত করিলাম, কিন্তু কে তখন আমার কথা শুনে? তিনি পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিয়া দিলেন। তাঁহার উৎসাহের সীমা নাই। ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে, দেহ দুলাইতে দুলাইতে এবং তাল দেওয়ার জন্য সেই স্থূল চরণে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে তিনি জোরে গান চালাইতে চালাইতে ঘর তোলপাড় করিতে লাগিলেন। না জানি, এ কি পৈশাচিক অনুষ্ঠানের সূচনা! এই দুরবগম্য ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যই সন্দেহজনক। আজি তাঁহার এই অকারণ বক্তৃতা, আত্মকৃত সঙ্গীতে এতাদৃশ আনন্দ ও উৎসাহ অবশ্যই কোন ভয়ানক কাণ্ডের পূর্ব্বাভাষ। অনন্যোপায় হইয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে রাজা সেই স্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি সেই ঘোর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—"ব্যাপার কি? এ কিসের বিকট গোল?" চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "যখন প্রমোদ এখানে আসিয়াছেন, তাল-মান-লয় সকলকেই এ স্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে। তবে আর উৎসাহীন স্থানে আমার অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন, অতএব আমি বারান্দায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে চলিলাম।" তিনি আর কোন কথাটিও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে গিয়া 'এ দিকে এস' 'এ দিকে এস' বলিয়া তাঁহাকে নীচে পুস্তকালয়ে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বারংবার তাঁহার সহিত নির্জ্জনে কথা কহিবার জন্য রাজা যে এত চেষ্টা করিতেছেন, চৌধুরী মহাশয় এখনও তাহাতে অসম্মত।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী প্রস্থান করার পর এইরূপে চৌধুরী মহাশয় আমাকে লইয়া সেই স্থানে অর্দ্ধঘণ্টাধিক কাল আটকাইয়া রাখিলেন। এতক্ষণ ঠাকুরাণী কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন, কে বলিতে পারে? যাহা হউক, লীলা কিছু টের পাইয়াছে কি না, জানিবার জন্য আমি উপরে উঠিলাম। লীলাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, সে কিছুই শুনিতে পায় নাই; কেহ তাহাকে ত্যক্তও করে নাই, কাপড়ের কোন খসখসানি শব্দও তাহার কানে যায় নাই। আমি আমার ঘর হইতে দিনলিপির খাতাখানা লইয়া লীলার ঘরে আসিলাম এবং অন্যূন এক ঘণ্টা কাল সেখানে বসিয়া খানিক বা গল্প, খানিক বা লিখিয়া কাটাইলাম। তাহার পর লীলাকে সাহস দিয়া ও উত্তমরূপে সুস্থ করিয়া আপনার ঘরে আসিলাম। লীলা ঘরের দরজা ভিতর হইতে ভাল করিয়া বন্ধ করিল। দেখিলাম, রাজা, চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী এক জায়গায় বসিয়া আছেন। রাজা একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন, চৌধুরী মহাশয় আলোর নিকটে বসিয়া একখানা বহি পড়িতেছেন, আর ঠাকুরাণী একখানা পাখা হাতে করিয়া বাতাস খাইতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মেও যাঁহার কখন একটু ঘাম বা কাতরতার লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, আজি সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনি গ্রীষ্ম হেতু বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"আমার আশঙ্কা হইয়াছে পিসী-মা, আপনার হয় তো শরীর ভাল নাই।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"ঠিক ঐ কথাই আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি। তোমাকে আজি বড় বিবর্ণ দেখাইতেছে বাছা।"

'তোমাকে,' আবার 'বাছা' এরূপ আদরের এবং আত্মীয়তার উক্তি তাঁহার মুখে আর কখন শুনি নাই। দেখিলাম, বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে একটু স্নেহের হাসিও ছিল। আমি বলিলাম,—"আমি আজি মাথা ধরায় বড় কষ্ট

তিনি অমনই বলিলেন,—"বটে? শারীরিক

পরিশ্রমের অভাবই এরূপ ঘটিবার কারণ নয় কি? বৈকালে অনেকখানি করিয়া পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার উপকার হয়।" 'বেড়াইতে' এই কথার উপর তিনি একটু বিশেষ জোর দিয়া আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি যখন বাহিরে গিয়াছিলাম, তখন কি তিনি দেখিয়াছিলেন? দেখিয়া থাকেন দেখিয়াছেন, আমার চিঠি তো আমি নির্ব্বিঘ্নে গিরিবালার হাতে দিয়া আসিয়াছি।

এই সময় রাজা গাত্রোত্থান করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যাকুল দৃষ্টি সহকারে বলিলেন, "এস জগদীশ, বারান্দায় বসিয়া তামাক খাওয়া যাউক।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—'আমি তোমার মত অত তামাক-ভক্ত নই যে এক জায়গা হইতে উঠিয়া আর এক জায়গায় তামাক খাইতে যাইব।" তাহার পর আমাদের দেখাইয়া বলিলেন,—"ইহাদের সকলকে ফেলিয়া আমরা দুজনে এখান হইতে চলিয়া যাইব, কোন্ দেশী কথা? এস এ দিকে।"

এই সময় আমি বলিলাম,—"আমার যেরূপ মাথা ধরিয়াছে পিসী-মা, নিদ্রাই তাহার ঔষধ। অতএব অনুমতি করেন তো আমি ঘুমাইতে যাই।"

ঠাকুরাণীর মুখে সেইরূপ তীব্র বিদ্রূপের হাসি! রাজা মনে করিয়াছিলেন, চৌধুরাণী অবশ্যই আমার সঙ্গে গাত্রোত্থান করিবেন। কিন্তু তিনি আদৌ তাহার উদ্যোগ করিতেছেন না দেখিয়া রাজা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় কেতাব মুখে দিয়া হাসিতে লাগিলেন। চৌধুরীর সহিত রাজার নির্জ্জনে আলাপের এখনও আবার বিলম্ব ঘটিল। এবারকার বিলম্বের কারণ চৌধুরাণী ঠাকুরাণী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ।—নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া অদ্যকার ঘটনাবলীর যে অংশ লিখিতে বাকী ছিল, তাহাই লিখিতে বসিলাম। প্রায় মিনিট দশেক কাল কলম হাতে লইয়া গত বারো ঘণ্টার ঘটনাবলী আলোচনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন স্থির হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিব মনে করিলাম, তখনও কিছুতেই তাহাতে চিত্ত লাগাইতে পারিলাম না। কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের কথা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নির্জ্জন সময়ে তাঁহাদের প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বিষয় আমার চিত্তকে নিতান্ত অধিকৃত করিয়া ফেলিল। এরূপ অবস্থায় প্রাতঃকাল হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যথাযথরূপে মনে করা কখনই সম্ভব নহে; অগত্যা খাতা বন্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। শুইবার ঘর হইতে আমি বসিবার ঘরে আসিলাম। সে ঘর অন্ধকার। জানালার নিকটে আসিয়া আমি বাহ্যপ্রকৃতির নিবিড় অন্ধকারময় বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। কি ভয়ানক অন্ধকার! আকাশে একটি চন্দ্র-তারা কিছুই নাই, বড় মেঘ হইয়াছে বৃষ্টি পড়িতেছে না কি? বৃষ্টির সূচনা বটে। পনর মিনিট কাল অন্যমনস্কভাবে আমি জানালা হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। নিবিড় অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না এবং নিম্নতলে কদাচিৎ দুই এক জন ভৃত্যের কণ্ঠস্বর বা দ্বার রুদ্ধ করার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই আমার কর্ণগোচর হইল না। কেবল দাঁড়াইয়া আর কতক্ষণ থাকিব? জানালার নিকট হইতে শুইবার ঘরে আসিবার নিমিত্ত যখন ফিরিতেছি, তখন আমার নাসিকায় চুরুটের গন্ধ আসিল। আমি যেমন বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনই দেখিতে পাইলাম, দূর হইতে একটি ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দু ভয়ানক অন্ধকাররাশির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই অগ্নিবিন্দু নিকটস্থ হইল এবং আমি যে জানালায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া ক্রমে আমার শুইবার ঘরের জানালার নিম্নে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে ঘরে তখন আলো জ্বলিতেছিল। অগ্নিবিন্দু অত্যল্পকালমাত্র তথায় অপেক্ষা করিয়া, যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, পুনরায় সেই দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল। অগ্নিবিন্দু কোন্ দিকে যায় দেখিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, দূর হইতে আর একটি বৃহত্তর অগ্নিবিন্দু সেই ক্ষুদ্র বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দুই বিন্দু ক্রমে নিকটস্থ হইল। চুরুট মুখে দিয়া দুই ব্যক্তি এই অন্ধকার রাত্রে অঙ্গনে বাহির হইয়াছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। প্রথমে যে ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দু দেখা গিয়াছিল, তাহা যে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের চুরুট, তাহার সংশয় নাই। কারণ, তিনি সরু সরু ছোট ছোট চুরুটই খাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজা।

কারণ, তিনি বড় বড় মোটা চুরুটই খাইয়া থাকেন। আমি তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, এ ঘনান্ধকারে তাঁহারা কেহই আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। আমি নিঃশব্দে সেই জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

শুনিতে পাইলাম, অস্ফুটস্বরে রাজা বলিতেছেন,—"ব্যাপারটা কি? চল, ভিতরে গিয়া বসা যাউক।"

সেইরূপ অস্ফুট-স্বরে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, —"দাঁড়াও, আগে মনোরমার ঘরে আলো নিবিয়া যাউক।"

"কেন, ও আলোয় তোমার কি ক্ষতি করিতেছে?"

"উহাতে বুঝা যাইতেছে, মনোরমা এখনও শয়ন করে নাই। সে যেরূপ চালাক মেয়ে, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ তাহার মনে উদয় হওয়া বিচিত্র নহে এবং যেরূপ তাহার সাহস, তাহাতে কৌশলে নীচে নামিয়া আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। সাবধান, প্রমোদ, সাবধান।"

"আরে যাও। তোমায় কথার মধ্যে কেবলই সাবধান।"

"দাঁড়াও—আমি অল্পকালের মধ্যে তোমাকে অন্য কথাও শুনাইব। আপাততঃ ঘোরতর পারিবারিক অশান্তি-অগ্নি তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এ সময়ে যদি স্ত্রীলোকে আবার কোন সুযোগ পায়, তাহা হইলে তোমাকে সেই আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে।"

"বল কি তুমি?"

"আমি যাহা বলি, তাহা তোমাকে শীঘ্র বুঝাইয়া দিব। আপাততঃ প্রথমে ঐ আলোটা নিবিয়া যাইতে দেও, তাহার পর আমি ভিতরে গিয়া সিঁড়ির দুই ধারের ঘর দুইটা উঁকি দিয়া দেখিব, তাহার পর যাহা বলিবার বলিব।"

ধীরে ধীরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা আর বুঝা গেল না। তাহা যাউক আর নাই যাউক, যতটুকু কথাবার্ত্তা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাতে আমার স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছে যে, আমার চতুরতা ও সাহসের সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয় যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাকে তাহার যথার্থতা সপ্রমাণ করিতেই হইবে। স্থির করিলাম, তাঁহারা যতই সাবধান হউন না, আমাকে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেই হইবে। লীলার মন, লীলার সুখ, হয় ত লীলার জীবন পর্য্যন্ত, অন্ত রজনীর কাণ্ডে, আমার তীক্ষ্ণ শ্রুতি ও প্রখর স্মৃতির উপর নির্ভর করিতেছে।

চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন, কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি একবার সিঁড়ির দুই দিকে ঘর দুইটা দেখিবেন। তবেই অনুমান করা যাইতেছে, পুস্তকালয়ে বসিয়াই তাঁহারা কথোপকোথন চালাইবেন। আমি তখনই তাঁহাদের সকল সাবধানতা সত্বেও আদৌ নীচে নামিয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিবার উপায় স্থির করিলাম। সমস্ত বাড়ীটা ঘেরিয়া একটা কাঠের বারান্দা আছে। সে বারান্দার কখন কোন ব্যবহার হয় না। সেটা কেবল শোভার জন্যই আছে। কিন্তু সেখানে যে মোটেই যাওয়া যায় না, এমন নহে; জানালার উপর দিয়া সেখানে যাইতে হয়, এ জন্য সে বারন্দা ব্যবহারে আইসে না। এই ঘোরান্ধকার রাত্রিকালে আমি সেই বারান্দায় যাইয়া পুস্তকালয়ের জানালার উপরে তাহার যে অংশ আছে, নিঃশব্দে সেই পর্য্যন্ত যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। আমি অনেক দিন দেখিয়াছি, রাজা ও চৌধুরী মহাশয় পুস্তকালয়ে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হইলে প্রায়ই জানালার নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহেন। আজ যদি তাঁহারা পূর্ব্ববৎ জানালার নিকটে বসিয়া কথোপকথন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যতই কেন ফুস্‌ফুস্ করিয়া কথা কহুন না, বারান্দার উপরে বসিয়া থাকিতে পারিলে আমার তাহা কর্ণগোচর হইবেই হইবে। অধিকক্ষণ লোকে ফুস্-ফুস্ করিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে পারে না, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যদি তাঁহারা জানালার নিকট না বসিয়া ঘরের মধ্যস্থলে বা অন্য কোন দিকে বসেন, তাহা হইলে তো আমি ছাইও শুনিতে পাইব না। তাহা হইলে কাজেই আমাকে সাহসে ভর করিয়া নীচে নামিতে হইবে। দেখি তো বারান্দা হইতে কি ফল হয়, তাহার পর অন্য বিবেচনা। এই মনে করিয়া আমি নিঃশব্দে আমার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিলাম, শরীরের কাপড়-চোপড় যতদূর সম্ভব আঁটিয়া বাঁধিলাম। যদি দৈবাৎ কিছু পড়িয়া যায়, যদি দৈবাৎ কোন রকম শব্দ হইয়া পড়ে, তবেই সর্ব্বনাশ! যা করেন ভগবান্, দিয়েশলাইয়ের বাক্স বাতীর নিকটে রাখিয়া আলো নিভাইয়া দিলাম এবং আস্তে আস্তে শুইবার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া আমি নিঃশব্দে জানালা অতিক্রম করিয়া সেই সরু বারান্দায় পা দিলাম। পুস্তকালয়ের উপর পর্য্যন্ত যাইতে আমাকে পাঁচটি জানালার কাছ দিয়া যাইতে হইবে। প্রথম জানালাটা একটা খালি ঘরের, দ্বিতীয় ও

তৃতীয় জানালা লীলার ঘরের, পঞ্চম জানালা রঙ্গমতি দেবীর ঘরের। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই নিবিড় ঘনান্ধকারমধ্যে সন্তর্পণে পা বাড়াইতে লাগিলাম। এক, দুই, তিন, চারি জানালা বিনা ব্যাঘাতে অতিক্রম করিলাম; কিন্তু পঞ্চম জানালার নিকটস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলাম, সে ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে, তবেই ত চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এখনও শয়ন করেন নাই। কি সর্ব্বনাশ! আর তো ফিরিয়া যাওয়া যায় না। এখানেও তো আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। তখন লীলার মুখ মনে করিয়া অসমসাহসের সহিত আমি হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলাম। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে জানালাও পার হইলাম। বুঝিতে পারিলাম, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তখনও ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছেন। সেইভাবে যথাস্থানে সমুপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে বারান্দার রেলের উপর মাথা রাখিয়া বসিলাম।

কিয়ৎকালমাত্র তথায় বসিয়া থাকার পর দরজা খোলার শব্দ কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম, চৌধুরী মহাশয় সিঁড়ির পাশের ঘর দেখিবেন বলিয়াছিলেন, তাহাই এখন শেষ হইল। তাহার পর দেখিলাম, ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দুটা বাহিরে আসিল এবং আস্তে আস্তে আমার ঘরের নিম্নভাগে গিয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, আমার ঘরের আলো নিবিয়াছে কি না, চৌধুরী মহাশয় তাহা দেখিয়া গেলেন।

শুনিতে পাইলাম, রাজা নিতান্ত কর্কশ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'বড় জ্বালাতন করিলে যে দেখিতেছি। কখন্ এসে বসিবে বল দেখি?' শব্দটা ঠিক আমার নীচ হইতে আসিল।

চৌধুরী জোরে লম্বা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"ওঃ, কি গরম!" সঙ্গে সঙ্গে নীচের চেয়ারে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, চৌধুরী মহাশয় আসনগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জানালার নিকটেই বসিলেন, সন্দেহ নাই। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই, বুঝিতে পারিলাম। কারণ, তাঁহার ঘরে এখনও ছায়া নড়িতেছে এবং একটু একটু পায়ের শব্দ হইতেছে।

এ দিকে রাজা এবং চৌধুরী মহাশয়ের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। সময়ে সময়ে তাঁহারা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শুনা যায় না, এমন একবারও হইল না। যেরূপ দুঃসাহসিক কাজ আমি করিয়াছি, তাহার জন্য ভাবনা, সামান্য অসাবধানতায় যেরূপ বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাহার চিন্তা এবং সর্ব্বোপরি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী যদি দৈবাৎ জানালা খুলেন, তাহা হইলে আমার কি দুর্গতি হইবে, সে আশঙ্কা আমাকে এমন বিচলিত করিয়া রাখিল যে, আমি কিয়ৎকাল তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হইলাম না। কেবল বুঝিলাম, চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বুঝাইতেছেন যে, এতক্ষণে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ হইয়াছে; আর কোন বিঘ্নের আশঙ্কা নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত দিন রাজার কথায় আদৌ কর্ণপাত না করিয়া নানা ওজরে কাটাইয়াছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমাদের অধুনা নিতান্ত বিপন্ন দশা। ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আমাদিগের এই সময় হইতেই অত্যন্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন পরামর্শ স্থির করিতে হইলে নিতান্ত গোপনভাবে ও ভয়শূন্য অবস্থায় তাহা করা আবশ্যক। সমস্ত দিনের পর এখন সেইরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে কথাবার্ত্তা থাকে, এখন তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।" চৌধুরী মহাশয়ের এই কথার পর হইতে আমি অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ সহকারে তাঁহাদের তাবৎ কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

রাজা বলিলেন,—"বিপন্ন দশা! ওঃ, তুমি তার জান কি? সমস্ত অবস্থা শুনিলে তুমি হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে।"

চৌধুরী উত্তর দিলেন,—"তোমার গত দিন দুইয়ের ব্যবহার দেখিয়া আমারও তাহাই মনে হইয়াছে; কিন্তু থাম একটু। যাহা আমি জানি না, তদ্বিষয়ের আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যাহা আমরা ঠিক জানি, তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ভবিষ্যতের চিন্তা করিবার পূর্ব্বে অতীতের চিন্তা করা বিধেয়। শুন প্রমোদ, আমাদের অবস্থা আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। সমস্ত কথা শুনিয়া আমার যদি কোন ভুল দেখ, তাহা ধরিয়া দেও। তুমি এবং আমি নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় পশ্চিম হইতে এখানে ফিরিয়া আসি।"

"আহা, অত কথায় কাজ কি? আমার কয়েক হাজার আর তোমার কয়েক শত টাকার অত্যন্ত দরকার উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে টাকা না পাইলে আমাদের উভয়েরই একসঙ্গে সর্ব্বনাশ হইবার কথা, এই তো আমাদের অবস্থা; এখন কি বলিতে চাহ, বল।"

"বেশ কথা। এ গরিবের সামান্য কয়েক শত টাকা সংেত তোমার সেই দরকার মিটাইবার জন্য সমস্ত টাকা তোমার স্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত হস্তগত হইবার আর কোনও উপায় ছিল না। পশ্চিম হইতে আসিবার সময় পথে তোমাকে তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলাম? তার পর যখন এখানে আসিয়া স্বচক্ষে মনোরমা কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহা জানিতে পারিয়াছি, তখন আবার তোমাকে সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছি, তাহা তোমার মনে আছে তো?"

"এত কথা আমি মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। তোমার সারাদিনের বক্তৃতা মনে করিয়া রাখিতে হইলেই সর্ব্বনাশ আর কি।"

"ভাল, তোমার যদি সে কথা মনে না থাকে, তাহা হইলে আমি আবার তাহা বলিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম, ভাই, এ পর্য্যন্ত মানব-বুদ্ধি স্ত্রীলোককে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত কেবলমাত্র দ্বিবিধ উপায় অবধারণ করিয়াছে। এক উপায়, তাহাকে নিরন্তর গলা টিপিয়া রাখা। নিম্ন-শ্রেণীর পশুপ্রকৃতি মানবেরা প্রায়ই এই উপায়ের পক্ষপাতী; কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীভুক্ত জনগণ এ উপায়ের নিতান্ত বিরোধী। দ্বিতীয় উপায় বহুকালসাপেক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও সমানই ফলপ্রদ। সে উপায় আর কিছুই নহে, কদাচ স্ত্রীলোকের কথায় রাগ করিতে নাই। এই উপায়ে ইতর পশুকে, শিশুগণকে এবং শিশুরই বর্দ্ধিত রূপান্তরস্বরূপ স্ত্রীলোকগণকে বশীভূত করা যাইতে পারে। স্থির-প্রকৃতি সাহায্যে পশু, শিশু এবং স্ত্রী এ তিনকেই ফাঁদে ফেলা যায়। যদি তাহারা কখন তাহাদের প্রভুর স্থিরমতিত্ব বিচলিত করিতে পারে, তাহা হইলেই ঘাড়ে চড়িয়া বসে। অর্থের জন্য যখন তোমার স্ত্রীর সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তোমাকে এই সার কথা মনে রাখিবার জন্য আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। তোমাকে আরও বলিয়াছিলাম, তোমার স্ত্রীর ভগ্নী মনোরমার সমক্ষে এ কথা অধিকতর স্মরণে রাখিবে। তুমি কি তাহা মনে রাখিয়াছিলে? এ বাটীতে আগমন করার পর এ পর্য্যন্ত আমাদের যত বিপদ্ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোন সময়েই তুমি আমার এ উপদেশের অনুরূপ কার্য্য কর নাই। এইরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি দলীলে তোমার স্ত্রীর নাম সহি করাইতে পারিলে না, উপস্থিত টাকা তোমার হাতছাড়া হইয়া গেল এবং মনোরমা প্রথমবার উকীলের নিকট পত্র—"

প্রথমবার পত্র কি? আরও পত্র লিখিয়াছে না কি?"

"হাঁ, আজি আবার এক পত্র লিখিয়াছে।" নীচে ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল; বোধ হয়, যেন রাজা ক্রুদ্ধভাবে ভূমিতলে পদাঘাত করিলেন। আবার আমার চিঠির কথা ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া আমি এমনই চমকিয়া উঠিলাম যে, যে রেলটার উপর আমি মাথা রাখিয়াছিলাম, সেটা একটু নড়িয়া উঠিল এবং সেই জন্য একটুকু শব্দও হইল। কিন্তু এ পত্রের কথা চৌধুরী মহাশয় জানিতে পারিলেন কি প্রকারে? তিনি কি আমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন? অথবা ডাকের থলিয়ায় কোন চিঠি দেই নাই বলিয়া কি তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, তবে অবশ্যই আমি গিরিবালার দ্বারা চিঠি পাঠাইয়াছি? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে চিঠি যখন আমার হাত হইতে একেবারে গিরিবালার বস্ত্রমধ্যগত হইয়াছে, তখন চৌধুরী মহাশয়ের তাহা দেখিবার সম্ভাবনা কি আছে?

চৌধুরী মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অদৃষ্ট ভাল যে, আমি এখানে আছি। তুমি অনিষ্ট করিতে যেমন নিপুণ, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহা সংশোধন করিতে তেমনই তৎপর। তোমার অদৃষ্ট ভাল যে, যখন তুমি মত্ত বুদ্ধির প্রাবল্যে তোমার স্ত্রীর ঘরে চাবী দিয়া মনোরমার ঘরেও চাবী দিতে চাহিয়াছিলে, তখন আমি তাহা করিতে দিই নাই। তোমার কি চক্ষু নাই? মনোরমাকে দেখিয়া তুমি কি বুঝিতে পার না যে, তাহার পুরুষের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে সাহস ও সাবধানতা আছে? উহাকে যদি আমি সহায় পাই, তাহা হইলে না করিতে পারি কি, জানি না। আর ঐ স্ত্রীলোক যদি আমার শত্রু হয়, তাহা হইলে আমি তোমার দ্বারা শতাধিকবার সমর্থিত চতুরচূড়ামণি জগদীশনাথ রায় চৌধুরী আমাকেও বিপদ্সাগরে হাবুডুবু খাইতে হয়। এই অত্যদ্ভুত স্ত্রীলোক, এই অতি সাহসসম্পন্না নারী স্নেহের জন্য সাহসে নির্ভর করিয়া, এক দিকে তাহার ক্ষীণস্বভাবা ভগ্নী এবং অপর দিকে আমরা দুই জন এই উভয় পক্ষের মধ্যে বিরাট গিরির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্বার্থের অনুরোধে বটে, কিন্তু তুমি তাহাকে যেরূপ উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছ, তাহাতে নিতান্ত বিষময় ফল ফলিবে এবং সে ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রমোদ, তোমার সমস্ত মন্ত্রণা ব্যর্থ হওয়াই উচিত এবং তাহাই হইতেছে।"

কিয়ৎকাল উভয় পক্ষই নীরব থাকিলেন। এই দুরাত্মার মৎসম্বন্ধীয় এই সকল উক্তি আমাকে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইতেছে। কি করি, যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত, তাহাতে প্রত্যেক কথাই স্থায়িরূপে লিখিতে না থাকিলে, হয় তো ভবিষ্যতে সমস্ত ঘটনার অবিকল ধারা স্মরণে না আসিতে পারে।

রাজা বলিলেন,—"বল আমাকে, যত পার বল; মুখের কথা বলা খুবই সোজা কাজ। কেবলই যদি টাকার ভাবনা ছাড়া আর কোন গোলের কথা না থাকিত, তাহা হইলে সকল কথাই মিষ্ট লাগিত। কিন্তু সকল কথা যদি জানিতে, তাহা হইলে তুমিও স্ত্রীলোকদিগের উপর আমার মত কঠিন ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিতে না।"

চৌধুরী বলিলেন,—"ভাল, তোমার অপর গোলের বিষয় ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ টাকার কথা উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসা আগে শেষ হউক। তুমি নানা কথা সঙ্গে তুলিয়া যত গোল করিতে পার, কর, আমি কিন্তু গোলে ভুলিবার ছেলে নই।"

রাজা বলিলেন,—"বুঝিলাম, তুমি খুব পাকা লোক। বাজে কথা লইয়া বাহাদুরী করা খুব সোজা কথা, কিন্তু এ স্থলে সদ্‌যুক্তি স্থির করা তত সোজা কথা নহে। বল দেখি, এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য স্থির করার ভাবনা কি? আজি হইতে তুমি সমস্ত ভার আমার উপর দেও; দেখ, আমি সব ঠিক করিতে পারি কি না।"

"ভাল, যদিই তোমার হাতে সব ভার সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তুমি প্রথমে কি করিবে, বল?"

"আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। আমার হাতে সমস্ত ভার দিলে? বল?"

"ভাল, তোমার হাতেই সমস্ত ভার দেওয়া গেল; তাহার পর?"

"আমি প্রথমে বর্ত্তমান ঘটনাবলী বেশ করিয়া জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া ও আলোচনা করিয়া তবে মতলব ঠিক করিব। একটুও সময় নষ্ট করা হইবে না। দেখ, মনোরমা দেবী আজি আবার উকীলের নিকট পত্র লিখিয়াছেন, এ কথা তোমাকে আমি বলিয়াছি।"

"তুমি এ কথা জানিলে কিরূপে? তাহাতে লিখিয়াছে কি?"

"তাহা আমি জানিলাম কিরূপে, তাহা তোমার জানিবার কোনই দরকার দেখিতেছি না। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, তাহা জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্য আমি সমস্ত দিন উদ্বিগ্ন আছি বলিয়া তোমার সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতে সুযোগ পাই নাই। যাউক, এখন মূলপ্রসঙ্গ ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। তোমার স্ত্রীর দস্তখত না পাইয়া অগত্যা অন্য উপায়ে, তিন মাসের মুদ্দতে টাকা ধার করিয়া উপস্থিত দায় উদ্ধার করা হইয়াছে। সে ভয়ানক উপায়ের কথা মনে করিতে হইলে আমার দরিদ্র দেহ ভয়ে কম্পান্বিত হয়। যাহা হউক, সেই তিন মাস হইয়া গেলে কি হইবে? বাস্তবিকই কি তোমার স্ত্রীর স্বাক্ষর ব্যতীত সে সময়ে সে টাকা পরিশোধের আর কোন উপায় নাই?

"কিছু না।"

"বল কি? ব্যাঙ্কে কি তোমার কিছু টাকা জমা নাই?"

"কয়েক শ মাত্র, কিন্তু আমার তত হাজারের দরকার।"

"বন্ধক দিয়া ধার করিবার মত কোন সম্পত্তিও নাই কি?"

"এক টুকরাও নাই।"

"তোমার স্ত্রীর নিকট এখন আছে কি?"

"কিছুই না; কেবল তার দুই লাখ টাকার সুদ, তাতেই কায়ক্লেশে আমাদের সংসারখরচ চলিতেছে।"

"স্ত্রীর নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা কর কত?"

"তার খুড়া মরিয়া গেলে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে।"

"যথেষ্ট সম্পত্তি প্রমোদ! সে খুড়া লোকটা কেমন? খুব বুড়া কি?"

"না—বুড়াও নয়, জোয়ানও নয়।"

"কি রকম স্বভাবের লোক? বিবাহিত কি? না না, আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি, যেন তিনি বিবাহ করেন নাই।"

"যদি সে বিবাহ করিত এবং তাহার সন্তান থাকিত, তাহা হইলে আমার স্ত্রী কখনই তাহার উত্তরাধিকারিণী হইত না। সে একটা স্বার্থপর পাগলাটে গোছের মানুষ, কেহ তাহার নিকট গেলেই সে আপনার শরীরের কথায় তাহাকে জ্বালাতন করিয়া মারে।"

"ঐ রকমের মানুষ কিন্তু অনেক দিন বাঁচে এবং জেদ করিয়া হঠাৎ বিবাহ করিয়াও বইসে। সে খুড়ার দরুণ ত্রিশ হাজার টাকার ভরসা এখন ছাড়িয়া

দেও। তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে আর কিছুই কি তোমার পাইবার সম্ভাবনা নাই?"

"কিছু না।"

"আদবে কিছুই না?"

"তার মৃত্যু পর্য্যন্ত আদবে কিছুই না।"

"ওহো! বুঝিয়াছি।"

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব। চৌধুরী চেয়ার হইতে উঠিয়া বারান্দায় ঘুরিতে লাগিলেন; তাঁহার আওয়াজ শুনিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন,—"বৃষ্টি আসিয়াছে দেখিতেছি।" বাস্তবিকই অনেকক্ষণ অবধি বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার কাপড়চোপড় ভিজিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, আবার তাঁহার ভারে কাষ্ঠাসন শব্দিত হইল। তিনি বলিলেন,—"তার পর প্রমোদ,—হাঁ—তোমার রাণীর মৃত্যুর পর কি পাইবে?"

"যদি সন্তান না থাকে—"

"থাকার সম্ভাবনা নয় কি?"

"মোটে না।"

"বটে? তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা?"

"আমি তাহা হইলে তাহার দুই লক্ষ টাকা পাইব।"

"নগদ টাকা—তখনই?"

"নগদ টাকা—তখনই।"

আবার তাঁহারা উভয়েই নীরব। তাঁহাদের কথা-সমাপ্তির সঙ্গে এ দিকে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যদি তিনিও আমাকে দেখিতে পান? আমি তো প্রায় তাঁহার সম্মুখেই রহিয়াছি বলিলে হয়। ঘনান্ধকার এবং অত্যন্ত বৃষ্টির জন্যই তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন না বোধ হয়। সেই দারুণ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎকাল পরে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন; আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এ দিকে চৌধুরী মহাশয় আবার রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'প্রমোদ, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার বিশেষ মায়া আছে কি?'

"জগদীশ! তোমার এ কি রকম প্রশ্ন?"

"আমি যে রকম লোক। আমি আবারও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"কিন্তু ও কি? তুমি অমন করিয়া রাক্ষসের মত আমার মুখের পানে তাকাইয়া আছ কেন?"

"তবে তুমি আমার কথার উত্তর দিবে না? ভাল, মনে কর, এই পূজার পূর্ব্বেই তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে।"

"জগদীশ! ও কথা ছাড়িয়া দেও।"

"মনে কর, তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে—"

"আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, ও কথায় এখন আর কাজ নাই।"

"তাহা হইলে তুমি দুই লক্ষ টাকা পাইবে, তোমার ক্ষতি হইবে—"

"বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

"বড় দূর আশা, প্রমোদ—নিতান্ত দূর আশা। তোমার এখনই টাকার দরকার। এ ক্ষেত্রে তোমার লাভ নিশ্চিত, ক্ষতি অনিশ্চিত।"

"আমার সুবিধার কথা যেমন দেখিতেছি, তেমনই আপনার সুবিধার কথাও ভাবিয়া দেখ। টাকার জন্য আমার যে দরকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অনেকাংশে তোমারই জন্য ধার করা হইয়াছিল, সে কথা মনে আছে তো? আর আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তোমার স্ত্রী যে এক লক্ষ টাকার অধিকারিণী হইবেন, এ কথা তোমার মত ধূর্ত্ত লোক যে এককালে ভুলিয়া গিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। ও কি! আবার এমন করিয়া চাহিতেছ কেন? আমার ও সব ভাল লাগে না। তোমার এরূপ দৃষ্টি দেখিয়া, আর ঐ সকল ভয়ানক প্রশ্ন শুনিয়া আমার শরীর কণ্টকিত হইতেছে।"

"তোমার শরীর কণ্টকিত হইতেছে! সত্য না কি? তোমার স্ত্রীর মৃত্যু একটা সম্ভাবিত ঘটনামাত্র, আমিও তাহাই বলিতেছি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? যে সকল অতি গণ্যমান্য উকীল নিয়ত উইল ও অন্যান্য দলীল প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তো সততই জীবন্ত মানুষের মরার কথা আলোচনা করেন। তাহাতে কি তোমার শরীর কণ্টকিত হয়? তোমার অবস্থা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রণিধান করা আমার অদ্য রাত্রের প্রয়োজন। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। যদি তোমার স্ত্রী বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে দলীলে তাঁহার নাম সহি করাইয়া লইয়া উপস্থিত দায় উদ্ধার করিতে হইবে। আর যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্য অর্থ হইতে সে দায় মিটাইতে হইবে।"

এই সময় রজমতি দেবীর ঘরের আলোক

নির্ব্বাপিত হইল। তিনি এতক্ষণে শয়ন করিলেন বোধ হয়।

রাজা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—"বল! মুখের কথা বই তো নয়, যত পার বল! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যেন, দলীলে আমার স্ত্রীর নাম সহি হইয়াই গিয়াছে।"

চৌধুরী বলিলেন,—"সে সকল ভার তুমি আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ, তবে আর কথা কহ কেন? আমার সম্মুখে দুই মাসের অধিক সময় আছে। যখন সেই সময় উপস্থিত হইবে, আমি কিছু করিয়া উঠিতে পারি কি না, তখন দেখাইব; সে কথা আপাততঃ যাইতে দেও। টাকার কথা এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া, আমি এখন তোমার অপর গোলযোগের কথায় মনঃসংযোগ করিতে প্রস্তুত আছি। যে জন্য আজিকালি তোমার অত্যন্ত ভাবান্তর দেখা যাইতেছে, অতঃপর সে সম্বন্ধে যদি আমাকে তোমার কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

রাজা সহজ ও ভদ্র স্বরে বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা তো করিব, কিন্তু কোথা হইতে যে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিব, তাহাই ভাবিয়া স্থির করা ভার।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমি তোমার সহায়তা করিব কি? তোমার এই গুপ্ত উদ্বেগের একটা নাম দেওয়া যাউক। এ ব্যাপারের নাম মুক্তকেশী হউক না কেন?"

"দেখ জগদীশ, আমাদের পরিচয় বহুদিনের। তুমি আমাকে দুই একটা বিপদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছ সত্য, কিন্তু অর্থ দ্বারা যত দূর সম্ভব, আমি তোমার প্রত্যুপকারের কোনই ত্রুটি করি নাই। আমরা উভয়েই উভয়ের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু অবশ্যই আমাদের উভয়ের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিবার অনেক বিষয় আছে—নাই কি?"

"তোমার একটি বিষয় আমার অজ্ঞাত ছিল বটে; কিন্তু সংপ্রতি একটি কঙ্কালমূর্ত্তি তোমার এই রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া, তুমি ছাড়া অন্য লোককেও দেখা দিয়াছে জানিবে।"

"ভাল, যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যখন সে বিষয়ের সহিত তোমার কোন সন্ধান নাই, তখন সে জন্য তোমার কৌতূহলী হইবার প্রয়োজন কি?"

"সে জন্য আমি কি কৌতূহলী হইয়াছি?"

"হাঁ, তা হইয়াছ বই কি।"

"বটে? তবে আমার মুখ এবার ধরা দিয়াছে দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য কথা। এত বুড়া বয়সের মনের ভাব মুখের চেহারায় বাহির হইয়া পড়ে। ও কথা যাইতে দেও। শুন রাজা, আমাদের এখন অকপটচিত্তে কথা কওয়া আবশ্যক। আমি তোমার গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান করি নাই, তোমার সেই গুপ্ত বিষয়ই আমার সন্ধান করিয়াছে। ভাল, ধর, আমি সে জন্য কৌতূহলী হইয়াছি; কিন্তু আমি তোমার প্রাচীন বন্ধু, এ কথা স্মরণ করিয়াও তুমি কি আমাকে তোমার রহস্য ও তজ্জনিত বিভ্রাট সম্পূর্ণরূপে তোমারই হস্তে রাখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে অনুরোধ কর?"

"হাঁ, ঠিক তাই আমার মনের ভাব।"

"তাহা হইলে এই মুহূর্ত্ত হইতে আমার কৌতূহলের অবসান ও মৃত্যু হইল জানিবে।"

"বাস্তবিকই কি তোমার মনের তাই সঙ্কল্প?"

"কেন তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ?"

"কারণ জগদীশ, তোমার রকম-সকম ও ভাব-ভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তুমি যে কোন না কোন সময়ে আমার নিকট হইতে এ কথা বাহির না করিয়া লইয়া ছাড়িবে, এরূপ আমার বোধ হয় না।"

চেয়ার আবার শব্দিত হইল এবং বারান্দার থামটা কাঁপিয়া উঠিল। চৌধুরী বেগে গাত্রোত্থান করিয়া মহা রাগের সহিত থামের গায়ে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি কম্পিত ও ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রমোদ! তুমি কি সত্যই আমাকে কেবল ঐরূপ লোক বলিয়াই জান? আমার সম্বন্ধে তোমার এত অভিজ্ঞতাতেও আমার স্বভাবের কিছুই কি তুমি দেখিতে পাও নাই? সুযোগ সমুপস্থিত হইলে আমি অতি মহিমান্বিত পুণ্যকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ, তাহা কি তুমি জান না? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার জীবনে তাদৃশ সুযোগ অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছে, আমার বন্ধুত্ব-বোধ অতি উচ্চ ও গাঢ়। তোমার সেই রহস্য-সংযুক্ত কঙ্কালমূর্ত্তি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে; সে জন্য আমার অপরাধ কি? আমার কৌতূহলের কথা আমি স্বীকার করিলাম কেন? আমি ইচ্ছা করিলে লোকে যেরূপ সহজে গাড়ু হইতে জল ঢালিয়া বাহির করে, সেইরূপ ভাবে তোমার নিকট হইতে তোমার রহস্য বাহির করিয়া লইতে পারিতাম। বল তুমি, তাহা আমি

পারিতাম কি না? কিন্তু তুমি আমার বন্ধু এবং বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য সমূহ আমি পবিত্র ও পুণ্যময় বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই জন্যই দেখ, আমি ঘৃণার্হ কৌতূহলকে পদতলে বিদলিত করিলাম। প্রমোদ, আমার ন্যায় ব্যক্তিকে অবিশ্বাস করিয়া তুমি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ; কিন্তু আমি বন্ধুকৃত দুর্ব্ব্যবহার কিরূপে ক্ষমা করিতে হয়, তাহা জানি। আইস প্রমোদ, তোমার সমস্ত দুর্ব্ব্যবহারের কথা ভুলিয়া তোমাকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সুখী হই।"

চৌধুরী মহাশয়ের কথার শেষ ভাগের স্বর শুনিয়া বোধ হইল, বাস্তবিকই তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। রাজা থতমত খাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন,—কিন্তু চৌধুরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, —"ছি! বন্ধুর নিকট বন্ধুর ক্ষমা-প্রার্থনা উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত ইতরতার চিহ্ন। ও সকল কথা যাইতে দেও, আমাকে সরল হৃদয়ে বল দেখ, আমার কোন সাহায্যে তোমার প্রয়োজন আছে কি না?"

"অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।"

"তাহা হইলে কোন্ স্থলে তাহার প্রয়োজন, অকুণ্ঠিতচিত্তে তুমি তাহা ব্যক্ত করিতে পার।"

"আমি তোমাকে আজি বলিয়াছি যে, মুক্তকেশীর সন্ধানের জন্য যত দূর সম্ভব চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই।"

"এ কথা তুমি আমাকে বলিয়াছ বটে।"

"জগদীশ! যদি তাহার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

"বটে! এটা তা হ'লে কি এতই ভয়ানক কথা?"

একটু আলো বারান্দার নীচে ঘাসের উপর নড়িতে লাগিল। আমার বোধ হইল, চৌধুরী মহাশয় রাজার মুখের ভাব সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পুস্তকালয়ের মধ্যস্থলস্থিত আলোক বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পরব লিলেন,—"হাঁ, তোমার মুখের ভাব দেখিয়া বিষয়টা যে নিতান্ত গুরুতর, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অর্থঘটিত ব্যাপারও যেমন ভয়ানক, ইহাও দেখিতেছি তেমনই।"

"অধিকতর ভয়ানক! তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, কোন ব্যাপারই এ ব্যাপারের তুল্য নহে।"

চৌধুরী আলোক যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন বোধ হইল। রাজা বলিলেন,—"মুক্তকেশী বালির মধ্যে আমার স্ত্রীর উদ্দেশে যে চিঠি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা আমি তোমাকে দেখাইয়াছি। জগদীশ! সে পত্রে কোন বৃথা জাঁকের কথ নাই; সুতরাং সহজেই অনুমান হইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই আমার গুপ্ত রহস্য জানে।"

"আমাকে সে রহস্যের কথা জানাইয়া কাজ নাই। আমি কেবল জানিতে চাহি, সে কথা সে কোথা হইতে জানিল?"

"সে তাহার মাতার নিকট হইতে জানিয়াছে।"

"এঃ! বড় মন্দ সংবাদ! দুই জন স্ত্রীলোক একটা গুপ্ত কথা জানা ভাল নহে। দাঁড়াও, আর একটা কথা অগ্রে জিজ্ঞাসা করি। মুক্তকেশীকে পাগ্‌লাগারদে আট্‌কাইয়া রাখার অভিপ্রায় আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু সে কেমন করিয়া সেখান হইতে পলাইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহাদের উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তাহারা অপর কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাবধান হইয়া মুক্তকেশীর পলায়নের সুযোগ করিয়া দিয়াছে, এরূপ সন্দেহ তোমার মনে হয় কি?"

"না; তাহার কোন দৌরাত্ম্য ছিল না এবং রক্ষকেরা তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। সে যে পুরাপুরি পাগল, এমন কথা বলা যায় না। পাগল বলিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যদি স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে সুবোধ মনুষ্যের মত সহজ কথায় সহজেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে।"

"বুঝিয়াছি। এ অবস্থায় তোমার বিপদের সম্ভাবনা কি আছে, তাহা আমাকে অগ্রে বুঝাইয়া দেও, তাহার পর আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

"মুক্তকেশী নিকটেই আছে এবং রাণীর সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ ও পত্র লেখালেখি চলিতেছে— আর বিপদের বাকী কি? আমার স্ত্রী যতই কেন অস্বীকার করুক না, বালিতে লুকান সেই পত্র পাঠ করিয়া কে বলিবে যে, সে গুপ্ত কথা এখনও আমার স্ত্রী জানিতে পারে নাই?"

"দাঁড়াও, প্রমোদ! যদিই রাণী সে রহস্য জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, সে কথা তোমার পক্ষে নিতান্ত হানিজনক। তিনি তোমার স্ত্রী, সে কথা তিনি কখনই ব্যক্ত করিবেন না।"

"বটে! সে কথাও তোমাকে বলিতেছি, শুন।

যদি আমার প্রতি তাহার কিছুমাত্র আস্থা থাকিত, তাহা হইলে আমার হানিজনক রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখাই সে স্বার্থের অনুকূল বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অপর এক জনের পথের কণ্টক-মাত্র। দেবেন্দ্র নামে একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মাষ্টারকে আমার সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্ব হইতে সে ভালবাসিত—এখনও তাহাকে ভালবাসে।"

"তাহা হইলই বা ভাই? ইহাতে ক্ষতিই বা কি? বিস্ময়ের কারণই বা কি? কে কোথায় স্ত্রী-হৃদয়ের প্রথম অধিকারী হইয়াছে? আমার এত বয়স হইল, সংসারের এত দেখিলাম শুনিলাম, কিন্তু কৈ, প্রথম-সংখ্যক প্রেমিক আমি তো দেখি নাই? দুইয়ের নম্বর দুই একটা দেখিয়াছি বটে। তিনের, চারের, পাঁচের নম্বর অনেক দেখিয়াছি। একের নম্বর এক জন করিয়া আছে বটে, কিন্তু আমি ত কখন তাহার দেখা পাই নাই।"

"থাম, আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। মুক্ত-কেশী যখন পলাইয়া যায়, তখন কে তাহার সহায়তা করিয়া তাহাদের অনুসরণকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, জান? আনন্দধামে মুক্তকেশীর সহিত কে আবার দেখা করিয়াছিল, জান? ঐ দেবেন্দ্র। দুইবারই সে একাকী তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া-ছিল। এই নরাধম আমার স্ত্রীকে যেমন ভালবাসে, আমার স্ত্রীও তাহাকে তেমনই ভালবাসে। সেও এই গুপ্ত কথা জানে। এই দুই জন একবার একত্র হইলেই আপনাদের ইষ্টের জন্য সেই গুপ্ত সংবাদের সহায়তায় আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার আর সন্দেহ কি?"

"এও কি হইতে পারে, প্রমোদ? রাণীর এত ধর্ম্মজ্ঞান থাকিতে এমন কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্ভব কি?"

"রেখে দাও তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! রাণীর টাকা ছাড়া আর কি আছে না আছে, আমি জানি না। ব্যাপারটা কি, তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না? হইতে পারে, রাণী নিজে খুব নিরীহ লোক, কিন্তু যদি রাণী এবং সেই হতভাগা দেবেন্দ্র—"

"হাঁ, হাঁ, আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু দেবেন্দ্র এখন আছে কোথায়?"

"ওঃ, সে এখন বলিতে গেলে এ দেশেই নাই। যদি তাহার বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে যেন শীঘ্র এ দেশে না ফিরিয়া আইসে।"

"তুমি নিশ্চিত জান, সে অনেক দূরে আছে?"

"নিশ্চয়ই। তাহার আনন্দধাম হইতে চলিয়া আসার পর হইতে, এ দেশ হইতে প্রস্থানকাল পর্য্যন্ত নিয়ত তাহার পশ্চাতে আমি লোক লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমি সাবধানতার কোনই ত্রুটি করি নাই। মুক্তকেশী শক্তিপুরের নিকটেই একটা খামার-বাড়ীতে ছিল। আমি তাহার সন্ধানে সেখানে নিজে গিয়াছিলাম। যাহাতে মুক্তকেশীকে আবদ্ধ রাখায়, দুরভিসন্ধির পরিবর্ত্তে আমার মহত্ত্বই ব্যক্ত হয়, এইরূপভাবে মনোরমা দেবীকে লিখিবার জন্য একখানি পত্রের রচনা করিয়া মুক্তকেশীর মাতার নিকট রাখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার সন্ধানের জন্য কতই যে অর্থব্যয় করিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে এখন আবার কোথা হইতে আসিয়া আমারই জমীদারীর মধ্যে বেড়াইতেছে! কেমন করিয়া জানিব, কত লোকের সঙ্গে হয় তো তাহার দেখা হইতেছে এবং কত লোকই হয় তো তাহার সহিত কথা কহিতেছে। সেই সর্ব্বনেশে দেবেন্দ্রটা হয় তো আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িতে পারে এবং কালিই মুক্তকেশীর সহিত মিলিয়া—"

"তাহার ক্ষমতায় তাহা আর হইতেছে না। যখন আমি এ ক্ষেত্রে উপস্থিত আছি এবং মুক্তকেশী এ অঞ্চলেই আছে, তখন যদিই দেবেন্দ্র ফিরিয়া আইসে, তবুও তাহার আর কিছু করিতে হইবে না। এখন মুক্তকেশীকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার স্ত্রী তোমার মুঠার মধ্যেই আছেন; মনো-রমা দেবী কোনক্রমেই তোমার স্ত্রীর কাছ-ছাড়া হইবেন না, সুতরাং তিনিও তোমার মুঠার মধ্যেই আছেন। আর দেবেন্দ্র বাবু তো বিদেশে। এখন কেবল এই অদৃশ্য মুক্তকেশীই আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয়। তুমি এ বিষয়ে যত দূর সন্ধান করিবার, সব করিয়াছ তো?"

"হাঁ! আমি তার মা'র কাছে গিয়াছি; গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি—কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।"

"তার মা কি বিশ্বাস করিবার মত লোক?"

"হাঁ।"

"সে তো একবার গুপ্তকথা বলিয়া ফেলিয়াছে।"

"আর বলিবে না।"

"কেন? এ কথা ব্যক্ত করায় তোর কোন স্বার্থ আছে কি?"

"বিশেষ স্বার্থ আছে।"

"ভাল কথা। প্রমোদ, তুমি হতাশ হইও না।

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টাকার ভাবনা ভাবিবার এখনও দেরী আছে। আমি কালি হইতে মুক্তকেশীর সন্ধান করিব এবং তোমাদের অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইব। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে ?"

"কি ?"

"আপাততঃ দলীলে নাম সহি করিতে হইবে না, এই সংবাদ রাণীকে দিবার জন্য যখন আমি কাঠের ঘরে যাই, তখন ঘটনাক্রমে দেখিতে পাই যে, একটা স্ত্রীলোক কেমন সন্দেহজনকভাবে রাণীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতেছে। আমি তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। মুক্তকেশীকে চিনিতে পারিব কিরূপে ?"

"হাঃ! হাঃ! আমি এক কথায় তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। সে আমার স্ত্রীর পীড়িত ও রুগ্ন রূপান্তরমাত্র।"

আবার চেয়ারের শব্দ হইল এবং আবার থাম কাঁপিয়া উঠিল। চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় এবার সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নিতান্ত আগ্রহের সহিত তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"বল কি ?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"একটা কঠিন পীড়ার পরে আমার স্ত্রীর আকৃতি কিরূপ দাঁড়াইবে, একবার কল্পনা কর, সেই আকৃতিতে একটু মাথাপাগলা রকম ভাব যোগ কর, তাহা হইলে মুক্তকেশী কি, ঠিক বুঝিতে পারিবে।"

"উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি ?"

"কিছুমাত্র না।"

"তথাপি এরূপ সাদৃশ্য ?"

"হাঁ, অদ্ভুত সাদৃশ্য। কিন্তু তুমি হাসিতেছ কেন ?"

কোন উত্তরও নাই, কোন শব্দও নাই। সময়ে সময়ে চৌধুরী মহাশয় যেরূপ নিঃশব্দে হাসিয়া থাকেন, বোধ হয়, এখন সেইরূপেই হাসিতেছিলেন।

রাজা আবার সজোরে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাল, তুমি এত হাসিতেছ কেন ?"

"সে কথায় কাজ কি বাবা ? আমি বাঙ্গাল—কখন হাসি, কখন কাঁদি, তাহার তুমি কি বুঝিবে ? যাউক, মুক্তকেশী আমার চক্ষে পড়িলে আর তাহাকে আমার চিনিতে ভুল হইবে না। এখন যাও, নিশ্চিন্তমনে ঘুমাও গিয়া। দেখিও, প্রাতে আমি কি করিয়া উঠি। আমার এই অতি প্রকাণ্ড মাথার মধ্যে অনেক মৎলব আছে। তোমার টাকার গোলও মিটিয়া যাইবে, মুক্তকেশীকেও পাওয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমি তোমাকে শপথ করিয়া আশ্বাস দিতেছি। এখন বল, আমার ন্যায় বন্ধু হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে সংস্থাপিত থাকিবার উপযুক্ত কি না ? এখনই তুমি কৌশলে আমার টাকা ধারের কথা উল্লেখ করিয়াছ; এখন ভাবিয়া দেখি, আমি এখ তাহার যোগ্য কি না ? আর যাহা কর প্রমোদ, আমাকে অকারণ আর কখন মনঃপীড়া দিও না। আইস, আমি তোমার সহিত কোলাকুলি করিয়া তোমাকে আবার ক্ষমা করিতেছি। যাও, এখন শয্যায় গিয়া শয়ন কর।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহারা পুস্তকালয়ের দরজা বন্ধ করিলেন, শুনিতে পাইলাম। এতক্ষণ কি বৃষ্টিই হইল, এখনও বৃষ্টি থামে নাই। ওঃ, আমার হাতে, গায়ে—সর্ব্বাঙ্গে কি ভয়ানক ঝিঁঝিঁ ধরিয়াছে! এ কি, দাঁড়াইতে পারি না যে! অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম। কষ্টে-সৃষ্টে ও সন্তর্পণে যখন নিজের ঘরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা। আমার বারান্দা হইতে চলিয়া আসার সময়ে কেহ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে বা কিছু বুঝিতে পারিয়াছে, এমন কোনই সন্দেহের কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না।

নবম পরিচ্ছেদ।

* * * * * *

২৩শে জ্যৈষ্ঠ।—প্রাতঃকালে আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে। আমি সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটি-বারও বিছানার নিকটে যাই নাই, একটিবার চক্ষু বুজি নাই—মেজেতেই পড়িয়া আছি। কতক্ষণ সেখানে আছি, তাহা ঠিক জানি না। বোধ হয়, বারান্দা হইতে আসার পর এখানেই পড়িয়া আছি। সময়ের কোন বোধ আমার নাই। রাত্রি দেড়টার সময় আমি ঘরের মধ্যে আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন, কত সপ্তাহই আমি এই অবস্থায় পড়িয়া আছি। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কি বেদনা! এ দারুণ গ্রীষ্মের দিনে এ কি শীত! আমার শরীরে যে আর তৃণেরও শক্তি নাই। এ কি, আমি কি সেই আমি ?

রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত এইরূপে পড়িয়া থাকার পর আমার শরীরের বিশেষ ভাবান্তর হইতে আরম্ভ হইল। তখন শীতের পরিবর্ত্তে অতিশয় উত্তাপ বোধ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর ও

মস্তিষ্কের শক্তিও পুনরায় ধীরে ধীরে দেখা দিল। তখন এ ভয়ানক স্থান হইতে যত শীঘ্র সম্ভব লীলাকে লইয়া পলায়ন করিবার সংকল্প করিলাম। এই দুই নরপ্রেতের নৈশ আলাপের সমস্ত কথা এই সময়ে মনে জাগরূক থাকিতে থাকিতে, লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ আগ্রহ হইল। তাহার পর আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া বাতী জ্বালিলাম এবং কাপড় ছাড়িয়া লিখিতে বসিলাম। এ পর্য্যন্ত আমার কথা বেশ মনে আছে। তাহার পর অবিশ্রান্ত, দ্রুত, সতেজভাবে কলম চালাইতে থাকি। তখন ভোর হয় নাই, তখন বাটীর লোক জাগে নাই।

কিন্তু তখন এত বেলা পর্য্যন্ত আমি এখানে বসিয়া কেন, এখনও আরও লিখিয়া কাতর মস্তিষ্ককে আরও ক্লান্ত করিতেছি কেন? কেন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করি না? কেন নিদ্রার দ্বারা এ দাহনকারী জ্বরের উগ্রতা নষ্ট করি না?

সে চেষ্টা করিতে আমার সাহস হয় না। একটা অতি দুরন্ত ভয় আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এই যে দারুণ উত্তাপে আমার শরীর পুড়াইয়া ফেলিতেছে, তাহার জন্য আমি ভীত নহি, আমার মাথার মধ্যে যে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে, তাহার জন্য আমি ভীত নহি। কিন্তু এখন যদি আমি শয়ন করি, তাহা হইলে হয় তো আর আমার উঠিবার মত শক্তি হইবে না, এই ভয়ই সকল ভয়ের অপেক্ষা প্রধান।

* * * *

বাজিল কটা—আটটা না নটা? নটা হবে হয় তো। এ কি, আবার আমার এমন কম্প আরম্ভ হইল কেন? ওঃ, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল যে! এ কি, এখানে এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছি না কি? কি জানি, বসিয়া বসিয়া কি করিতেছি। হে ভগবন্! আমাকে কঠিন পীড়াগ্রস্ত করিতেছ কি? এইরূপ দুঃসময়ে পীড়া?

এঃ, মাথার মধ্যে কি হইল? মাথার জন্য যে বড় ভয় হইতেছে। এখনও লিখিতে পারি, কিন্তু ছত্রগুলা মিশিয়া যাইতেছে। লীলা—লীলার নামটা আমি লিখিয়াছি। লীলা! বাজিল কটা—আটটা, না নটা?

কি বৃষ্টি! ওঃ, আমার মাথার ভিতরে ঘড়ী খট্ খট্ করিতেছে—

* * * *

মন্তব্য।

[এই স্থান হইতে দিনলিপি আর পড়া যায় না। ইহার পরেও যে দুই তিন পঙ্‌ক্তি লিখিত আছে মাত্র, তাহাতে সম্পূর্ণ কথা একটিও নাই। কথার অংশবিশেষ লিখিত আছে মাত্র, তাহাও নিতান্ত অস্পষ্ট এবং কালী ও কলমের অনেক দাগ-সংযুক্ত। শেষ কথাটি যেন লীলা বলিয়া বোধ হয়।

পরপৃষ্ঠায় এক অপরিচিতপূর্ব্ব লেখা দেখা যাইতেছে। লেখাটি বড় বড়, সমস্থূল ও সমশীর্ষ—যেন পুরুষের হস্তলিখিত এবং '২১শে জ্যৈষ্ঠ' এই তারিখযুক্ত। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।]

এক জন অকৃত্রিম বন্ধু-লিখিত উপসংহার।

আমাদের গুণবতী মনোরমা দেবীর পীড়া হওয়ায় আমার এক অপূর্ব্ব মানসিক সুখসম্ভোগের সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি এই সম্প্রতি অধীত মনোজ্ঞ দিনলিপির উল্লেখ করিতেছি। ইহা বহু শত পৃষ্ঠাত্মক। হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া অকপটচিত্তে ঘোষণা করিতে পারি যে, তন্মধ্যস্থ প্রতি পৃষ্ঠাই আমাকে মুগ্ধ, আনন্দিত ও পুলকিত করিয়াছে, প্রশংসনীয় রমণী! মনোরমা দেবীর কথা বলিতেছি। বিরাট্ কীর্ত্তি! দিনলিপির কথা বলিতেছি।

বস্তুতই এই সকল পৃষ্ঠা বিস্ময়জনক। ইহাতে যে কৌশল, বিচারশক্তি, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, মানব-চরিত্রপর্য্যবেক্ষণের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতা, রচনার সরল সুন্দর ভঙ্গী, হৃদয়ভাবের স্ত্রীজনোচিত মুগ্ধকর উচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎসমস্তই আমাকে এই মহান্ মহাপ্রাণীর—এই অপার্থিব মনোরমা সুন্দরীর স্তাবক করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে আমার যে চরিত্র বিবৃত হইয়াছে, তাহা অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরিচায়ক। আমার সেই চরিত্র যে সম্পূর্ণরূপ হইয়াছে, তৎপক্ষে আমার অন্তরে কোনই সন্দেহ নাই। আমি যখন এতাদৃশ সমুজ্জ্বল, মূল্যবান্ ও প্রকৃষ্ট বর্ণে বিচিত্রিত হইয়াছি, তখন অবশ্যই আমি লেখিকার হৃদয়ে মৎসম্বন্ধে বিশদ স্থায়িভাব সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি; আমি নিতান্ত বিষণ্ণ-হৃদয়ে ব্যক্ত করিতেছি যে, নিদারুণ প্রয়োজনানুরোধে আমাদিগকে বিরুদ্ধ পথে স্বার্থান্বেষণ করিয়া পরস্পরের প্রতিকূলতাচরণ করিতে হইতেছে। অপেক্ষাকৃত সুসময় সমুপস্থিত হইলে আমি মনোরমা দেবীর না জানি, কতই হৃদয়ানন্দসংবর্দ্ধনে সমর্থ হইতাম—মনোরমা দেবীও না জানি, আমার কতই হৃদয়ানন্দবর্দ্ধনে সমর্থ হইতেন।

যে অপূর্ব্ব ভাবে অধুনা আমার হৃদয় অনুপ্রাণিত, তাহাতে অসত্যের স্থান থাকিতে পারে না। অতএব পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তৎসমস্তই গভীর সত্যময়।

সেই অপূর্ব্বভাবের প্রাবল্যে আমার হৃদয়ে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার অবকাশ নাই। আমি সম্প্রতি স্বার্থচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া অকপট-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, প্রমোদ এবং আমার গুপ্ত কথোপকথন শুনিবার নিমিত্ত এই অতুলনীয় কামিনী যে কৌশলাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নিরতিশয় প্রশংসার্হ এবং তাঁহার মৎসম্বন্ধীয় লিখিত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণে বর্ণে সত্য।

সেই অপূর্ব্বভাবের প্রাবল্যে আমি মনোরমা দেবীর রোগশান্তির নিমিত্ত আমার রসায়নশাস্ত্রসংক্রান্ত প্রগাঢ় জ্ঞান এবং চিকিৎসা ও তাড়িত চৌম্বকীয় শাস্ত্র মানবজাতির কল্যাণার্থে যে সমস্ত কৌশল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, আমার তৎসমূহের অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ব্বোধ চিকিৎসককে সহায়তা করিতে প্রস্তুত। দুর্ভাগা ডাক্তার এখন পর্য্যন্ত আমার উপদেশ-গ্রহণে অনিচ্ছুক।

সেই অপূর্ব্বভাবের প্রাবল্যে আমি এই স্থলে এই কয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ, সহানুভূতিপূর্ণ এবং স্নেহপূর্ণ পঙ্ক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। দিনলিপি বন্ধ করিলাম। ন্যায় ও কর্ত্তব্যবোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তক আমি আমার পত্নী দ্বারা লেখিকার টেবিলের উপর পুনঃ স্থাপিত করিয়া রাখিলাম। ঘটনাচক্র আমাকে সবেগে প্রধাবিত করাইতেছে। কৃত কর্ম্মাবলী ভয়ানক পরিণাম-সমূহ উৎপন্ন করিতেছে। সফলতার প্রভূত দৃশ্যাবলী আমার নেত্রসম্মুখে নিরন্তর উন্মুক্ত হইতেছে। আমি নিমিত্ত-কারণরূপে ধীরভাবে বিধিলিপি সম্পন্ন করিতেছি মাত্র। কেবল প্রশংসাবর্ষণ ব্যতীত আর কিছুতেই আমার অধিকার নাই, আমি সম্মান ও স্নেহের সহিত তাহা মনোরমা দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি। প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্র রোগমুক্ত হউন।

মনোরমা দেবী ভগ্নীর হিতকামনায় যে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎসমস্তের বিফলতা হেতু আমি নিতান্ত দুঃখিত। তাঁহার দিনলিপি দেখিতে পাওয়ায় তাঁহাকে বিফল-প্রযত্ন করিবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ হইয়াছে, এ কথা যেন তিনি কদাপি মনে না করেন, ইহাই আমার সানুনয় অনুরোধ। দিনলিপি-পাঠের পূর্ব্বে আমি যে সংকল্প করিয়াছি, অধুনা তাহাই অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে মাত্র।

জগদীশ।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কথা।*

(নিবাস—আনন্দধাম। ব্যবসায় জমীদারী।)

কি জ্বালাতে পড়িয়াছি গা। আমাকে কি কেহই একটু সুস্থির হইয়া থাকিতে দিবে না? কেন, আমি কি কাহারও পাকা ধানে মই দিয়াছি? জ্ঞাতিকুটুম্ব, আত্মীয়বন্ধু, চেনা অচেনা যে যেখানে আছে, আমাকে জ্বালাতন করাই সকলের কাজ। কেন দুনিয়ার লোক আমার উপর এমন করিয়া লাগিয়াছে, কেহ বলিতে পার কি গা?

এ পর্য্যন্ত লোকে আমাকে যত প্রকারে জ্বালাতন করিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত এইবার উপস্থিত। আমাকে বলে কি না, গল্প লিখিয়া দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! আমার মত দুর্ভাগা, চিররোগী লোক কি কখন গল্প লিখিতে পারে? সে কথা শুনে কে? তাহারা বলে, আমার ভাইঝি-সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুতর ঘটনা আমার জ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আমাকেই লিখিতে হইবে। যদি না লিখি, তাহা হইলে তাহারা আমাকে যে ভয় দেখাইতেছে, তাহা মনে করিতে হইলেও আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। এমন দায়ে কি কখন কেহ পড়ে? দেখি যত দূর পারি। আমার ছাইও মনে নাই। তবু ছাড়িবে না। কি বালাই গা?

সময় মনে করিব কেমন করিয়া? আমার জীবনে কখন সে কর্ম্ম আমার দ্বারা ঘটে নাই। আরম্ভ করিব কোথা হইতে? আমার চাকর রামদীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটাকে যত গাধা মনে করিয়াছিলাম, সে তত গাধা নয় দেখিতেছি। ভাল ভাল, তাহার দ্বারা কতক সাহায্য পাইব বোধ হইতেছে। দেখি, দুই জনে মিলিয়া কত দূর কি করিয়া উঠিতে পারি।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসেই বোধ হয়, আমি এক দিন তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আমার প্রিয় কার্য্যের ভাবনা ভাবিতেছি, অর্থাৎ জগতের হিতের জন্য একখানি প্রাচীন পুথির টীকা করাইবার উপায় চিন্তা করিতেছি। সেই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত হইলে মনুষ্যের জ্ঞান ও উন্নতির যে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব

* রায় মহাশয়ের কথা এবং ইহার পশ্চাদ্বর্ত্তী আরও কয়েকটি কথা যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

সোপান উন্মুক্ত হইবে, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। হায় হায়! এইরূপে মানব-জাতির প্রভূত হিত-সাধন করা যাহার নিরন্তর চিন্তার বিষয়, তাহার শান্তি ও সুখের জন্য প্রতিনিয়ত ব্যাকুল না থাকিয়া লোকে দিবারাত্রি তাহাকে জ্বালাইয়া পুড়িয়া মারে। অহো! মনুষ্য-জাতি কি উন্নতির বিরোধী! তাহারা কি নির্ব্বোধ!

হাঁ—সেইরূপে একাকী বসিয়া আমি চিন্তামগ্ন রহিয়াছি, এমন সময়ে রামদীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে ডাকি নাই, তখন তাহাকে আমার কোন দরকার নাই, তবু দেখ দেখি, হতভাগা আসিয়া আমার সমস্ত চিন্তাগ্রন্থি ছিঁড়িয়া দিয়া তবে ছাড়িল! কি বালাই! আমি রাগত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, 'তুই হতভাগা! এখন মরিতে আইলি কেন?' সে বুঝাইয়া দিল, এক জন স্ত্রীলোক আমার সহিত দেখা করিবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। কি গ্রহ! সে স্ত্রীলোকের নাম গিরিবালা। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"গিরিবালা লোকটা কে?"

রামদীন উত্তর দিল,—"রাণী ঠাকুরাণীর দাসী।"

"রাণী ঠাকুরাণীর দাসী, তা আমার কাছে কেন?"

"একখানি চিঠি।"

"নিয়ে এস।"

"হুজুরের হাতছাড়া আর কাহাকেও সে তাহা দিতে চাহে না।"

"কে সে চিঠি পাঠাইয়াছে?"

"আজ্ঞে, মনোরমা ঠাকুরাণী।"

তবেই সর্ব্বনাশ! মনোরমাকে চটাইলে যে বেজায় গোলের বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমার বেশ জানা আছে, কাজেই মনোরমার কাজের উপর কথা চলে না। আমাকে বলিতে হইল—"রাণী ঠাকুরাণীর দাসীকে আসিতে দেও। হাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও। সে দাসীর গায়ে কোন অলঙ্কার আছে কি? তাহাদের হাতে প্রায়ই রূপার বা বেলোয়ারি চুড়ি থাকে; তাতে বড় শব্দ হয়।"

এ সকল কথা আগে জানিয়া সাবধান হওয়া ভাল; কারণ, ঐ শব্দে আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়া উঠে এবং সে মাথা ধরা সারে না। রামদীন আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, দাসীর হাতে দুইগাছি সোনার বালা ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই। তাহার পর রামদীন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বাঁচিলাম, ছুঁড়ীর হাতে চুড়ি ঠং ঠং করে না। আচ্ছা, তোমরা কেহ বলিতে পার কি, এই দাসীগুলা সুশ্রী হয় না কেন? আমি স্বয়ং এ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করি নাই, এ জন্য কোন মীমাংসা করিতে অক্ষম। তোমরা কেহ কিছু জান কি? আমি দাসীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি মনোরমার কাছ থেকে চিঠি আনিয়াছ? ঐ টেবিলের উপর চিঠিখানা রাখিয়া দাও। দেখিও, সাবধান, কোন শব্দ না হয়, কোন সামগ্রী যেন না নড়ে চড়ে, মনোরমা কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন।"

"আর লীলাবতী রাণী?"

আর উত্তর নাই। দেখিলাম, তাহার মুখখানা কেমন বিকট হইয়া উঠিল এবং আমার বোধ হয়, সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহার চক্ষুর নিকটে তরল পদার্থ-বিশেষ দেখিয়াছি সন্দেহ-নাই। ঘাম না চক্ষের জল? একবার রামদীনকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলে, চক্ষের জল। তবে তাই। কিন্তু অশ্রু পদার্থটা কি? বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে, অশ্রু এক প্রকার দৈহিক রস। এই রস স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় হইতে পারে, এ কথা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু মনের ভাব-বিশেষের জন্য অঙ্গবিশেষ হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, সে যে কি ব্যাপার, তাহা আমি কিছুতে বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, রসের কথায় আর কাজ নাই। আমি তাহার রস উথলাইয়া উঠিল দেখিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম এবং রামদীনকে বলিলাম,—"কাণ্ডটা কি, বুঝিয়া লও।"

রামদীন কাণ্ড বুঝিতে গিয়া প্রকাণ্ড গোলের সৃষ্টি করিল, এও বুঝিতে পারে না, সেও বুঝাইতে পারে না, বলিব কি, তাহাদের এই গোলমালে আমার অসুখ না বাড়িয়া, বড় আমোদ বোধ হইল। আমি অতঃপর যখন মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইব, তখন এই তামাসা দেখিবার জন্য তাহাদের উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইব স্থির করিয়াছি। যাহা হউক, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর দাসী অশ্রুর যে কারণ রামদীনকে বুঝাইয়া দিল এবং রামদীন তাহা আমার নিকট যেরূপে ব্যাখ্যাত করিল, সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি নিজে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই এ স্থানে লিখিতে পারি। তোমরা তাহাতেই রাজি আছ তো? কৃপা করিয়া বল, হাঁ, নচেৎ আমি মারা যাইব।

সে রামদীনের মারফতে আমাকে যাহা বলিল, তাহাতে আমি বুঝিলাম, তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিয়াছেন। দেখ অন্যায় অত্যাচার!

তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিয়াছেন, সে দোষ কি আমার? তবে আমাকে সে কথা বলিয়া ত্যক্ত করে কেন বাপু? এ তোমাদের কোন্ দেশী বিবেচনা? কর্ম্মে জবাব হওয়ার পর সে এক বৃদ্ধার বাটীতে রাত্রিযাপন করিয়াছে। সে কথা আমাকে বলিবার দরকার? আমি কি সেই বৃদ্ধা, না জবাবের পর সে কোথায় ছিল, সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় নাই? পরদিন বেলা তিনটা কি চারিটার সময় মনোরমা তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়া তাহার কাছে দুইখানি পত্র দিয়া যান। একখানি আমার জন্য, আর একখানি কলিকাতার এক জন ভদ্রলোকের জন্য। আমার কি তা? আমি কি কলিকাতার এক জন ভদ্রলোক? তবে সে কথা আমার শুনিবার দরকার কি? সে সযত্নে সেই পত্র দুইখানি আপনার কোল-আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। দেখ দেখি বেয়াদপি? তাহার কোল-আঁচলের খুঁটের খোঁজে আমার কোন আবশ্যক আছে কি? তবে সে কথা আমাকে বলিস্ কেন? মনোরমা চলিয়া গেলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং কোন প্রকার আহারাদি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সেটাও কি ছাই আমার দোষ? তোমার যদি ক্ষুধা না হয়, খাইতে ভাল না লাগে, তার জন্যও কি ছাই আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে? তাহার পর রাত্রিযাপন করিবার অভিপ্রায়ে সে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে 'চৌধুরাণী ঠাকুরাণী' তথায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহাকে সগর্ব্বে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এই সম্মানিত পদবী দ্বারা বিভূষিত করিল, তিনি আমার সেই দুরন্ত ভগ্নী—যিনি স্বেচ্ছায় এক বাঙ্গালের সহিত বিবাহ করিয়া আমাদের সকলের মুখে চুণকালী দিয়াছেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া গিরিবালা অবাক্ হইল। তবে তো আমার বড়ই ক্ষতি!

কিন্তু তোমরা যাই বল, আমি খানিকটা বিশ্রাম না করিয়া আর কোনমতেই লিখিতে পারি না। আমি চক্ষু বুজিয়া খানিকটা পড়িয়া থাকিব এবং রামদীন আমার শ্রমকাতর অবসন্ন মস্তকে একটু অডিকলোঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিবে, তাহার পর আর লিখিতে পারি কি না, তাহা বিচার করিব।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়াই—

উহুঃ—লিখিতে যদিও পারি, উঠিয়া বসিতে কোনমতেই পারিব না। কাজেই আমি পড়িয়া পড়িয়া বলিব মাত্র। রামদীন একটু একটু লিখিতে জানে। সেই কেন লিখুক না? বেশ ব্যবস্থা। আঃ, বাঁচিলাম!

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়াই বলিলেন যে, মনোরমা কয়েকটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই কথা কয়টি বলিয়া দিতে তিনি আসিয়াছেন। গিরিবালা কথা কয়টি শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু আমার একগুঁয়ে ভগ্নীর স্বভাব যাইবে কোথায়? তিনি বলিলেন, সে যতক্ষণ কিছু না খাইবে, ততক্ষণ তিনি তাহাকে কোন কথা বলিবেন না। আমার ভগ্নী গিরিবালার উপর নিতান্ত বিস্ময়জনক দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ আবার তাঁহার কিরূপ স্বভাব? তিনি বলিলেন,—'ছিঃ গিরিবালা! চাকরী তালপাতের ছায়া। চিরদিনই কে কোথায় এক স্থানে চাকরী করিয়াছে? চাকরী গেল বলিয়া শরীরকে কষ্ট দেওয়া বড়ই অন্যায় কর্ম্ম। খাও কিছু। তুমি কিছু না খাইলে আমি তোমাকে কোন কথাই বলিব না।' গিরিবালা খাইবে বলিয়া সেই বাড়ীওয়ালী বুড়ী একটু দুধ ও চারিটি চিঁড়া দিয়াছিল। আমার ভগ্নী আবার বলিলেন,—"আমি নিজহাতে তোমার খাবার ঠিক করিয়া দিতেছি, দেখি, তুমি কেমন করিয়া না খাও।" এই কথা বলিয়া আমার ভগ্নী স্বহস্তে তাহার দুধ চিঁড়া মিশাইয়া ফলার প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বোধ হয়, ভগ্নী ইদানীং একটু পাগল হইয়া থাকিবেন; নচেৎ এমনই ব্যবহার আর কেহ কি করিতে পারে গা? গিরিবালা অনুরোধে বাধ্য হইয়া আহার সমাপ্ত করিল; কিন্তু আহার সমাপ্ত হইবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রামদীন বলে, এই কথা বলিবার সময় তাহার চক্ষু দিয়া অতিশয় জল পড়িয়াছিল। হইবে! আমি তখন দায়গ্রস্ত হইয়া চক্ষু বুজিয়া শুনিতেছিলাম মাত্র, চক্ষে দেখিতে তখন আমার সাধ্য ছিল না। কাজেই সে কথা কত দূর সত্য, আমি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম।

কি বলিতেছিলাম? হাঁ। ফলার করিয়াই গিরিবালার মূর্চ্ছা হইল। আমি তাহার কি করিতে পারি? যদি বিজ্ঞানবিৎ লোক হইতাম, তাহা হইলে ফলারান্তে মূর্চ্ছা হওয়ায় ফলারের সহিত মূর্চ্ছার কি নিকট-সম্বন্ধ আছে, তাহার বিচার করিতে পারিতাম; আর যদি ডাক্তার হইতাম, তাহা হইলে ফলারের পর মূর্চ্ছা হইলে কি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহার একটা প্রেস্ক্রপ্সন্ লিখিয়া দিতে পারিতাম। আমি সে সকল কিছুই নই,

তবে মাগী, ফলারান্তে মূর্চ্ছার কথা আমার কাছে বলে কেন? সে তো ফলার করিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল, সুতরাং তাহার মনকে প্রবোধ দিবার উপায় আছে, কিন্তু আমি যে বিনা আহারেও দিনরাত্রি মূর্চ্ছিত থাকি বলিলেই হয়। আমার দশা দেখে কে, তাহার ঠিকানা নাই। যাহা হউক, আধ ঘণ্টাখানেক পরে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সে দেখিল, কেবল বাড়ীওয়ালী বুড়ী তাহার নিকটে বসিয়া আছে; আর চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তাহার মূর্চ্ছা সারিবার লক্ষণ দেখিয়া, অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সুবিধা না থাকায় চলিয়া গিয়াছেন।

যেই গিরিবালার নিকট হইতে বুড়ী চলিয়া গেল, সেই সে আপনার কোল-আঁচলে হাত দিল এবং দেখিল, চিঠি দুইখানি সেইখানেই আছে; কিন্তু যেরূপ তাহা বাঁধা ছিল, তাহা কেমন এলোমেলোমত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রিই তাহার মাথা-ঘুরুনী ছিল, কিন্তু শেষরাত্রে একটু নিদ্রা হওয়ায় তাহার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া গেল এবং ভোরবেলা উঠিয়া সে আদেশমত একখানি চিঠি ষ্টেশনে আসিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল। অপর চিঠিখানি সে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে এবং এখনই আমার হাতে দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছে। এই তো তাহার কথার মর্ম্ম। এখন কি করিতে হইবে, কি করিলে ভাল হইবে, কে দুইটা ভাল কথা বলিবে, এই ভাবনায় সে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অবহেলা হইয়াছে ভাবিয়া সে বড় মর্ম্মাহত হইয়াছে। এই স্থলে তাহার রদন আবার দেখা দিল। কিন্তু তাহার যাহাই হউক, আমার এই স্থলে বিলক্ষণ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলাম,—"এত কথার তাৎপর্য্য কি?"

আমার ভাইঝির দাসী নির্ব্বাক্‌ভাবে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম,—"রামদীন, দেখ দেখি, উহার মনের কি ভাব? পার যদি উহার অভিপ্রায় আমাকে বুঝাইয়া দেও।"

আবার যে গণ্ডগোল, সেই গণ্ডগোলই উপস্থিত হইল, তখন অগত্যা আমাকে সেই গোলে মাথা দিতে হইল। কিয়ৎকাল বিহিতবিধানে চেষ্টা করিয়া আমি তাহার অভিপ্রায় কতকটা বুঝিতে পারিলাম। মনোরমা দেবী চৌধুরাণী ঠাকুরাণী দ্বারা তাহার নিকট যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, দৈবদুর্ব্বিপাক হেতু তাহা জানিতে না পারায় সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। সে আশঙ্কা করিতেছে, হয় তো সে সকল সংবাদ না জানিতে পারায় রাণীর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। রাজার ভয়ে তাহার আর সে রাত্রে রাজবাটীতে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ জানিয়া আসিতে সাহস হয় নাই এবং মনোরমা তাহাকে বিশেষ করিয়া সকালের গাড়ীতে চলিয়া আসিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া সে পরদিন আর বুড়ীর বাড়ীতে সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেও ভরসা করে নাই। পাছে তাহার এই অনায়ত্ত অপরাধ হেতু রাণী তাহাকে অবাধ্য অমনোযোগী বলিয়া মনে করেন, ইহাই তাহার প্রধান ভাবনা। সে অতি কাতরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন আমি কি করিব? আপনি দয়া করিয়া বলিয়া দিউন, আমার এখন কি করিলে ভাল হয়?"

আমার চিরন্তন স্বভাবানুসারে, আমি তখনই উত্তর দিলাম,—"কেন? ও সকল কথা লইয়া আর কোন আন্দোলনের দরকার নাই। যাহা যেমন হইয়াছে, তাহা তেমনই থাকুক। বুঝিয়াছ? আমি অনর্থক কোন বিষয়ে গোল বাধাইতে ভালবাসি না। এই তো তোমার কথার শেষ?"

সে বলিল,—"আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি সমস্ত কথা পত্র দ্বারা রাণী ও মনোরমা ঠাকুরাণীকে লিখিয়া জানাই এবং প্রার্থনা করি যে, যদি নিতান্ত বিলম্ব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদের আদেশ এখনও লিখিয়া পাঠাইলে আমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া আজ্ঞামত কার্য্য শেষ করিয়া কৃতার্থ হই। আপনি এ বিষয়ে কি পরামর্শ দেন?"

এ তো বড় জ্বালা! আমার যাহা বলিবার, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবু সে ছাড়ে না কেন? অনর্থক কথা কহিয়া ত্যক্ত করা নিম্নশ্রেণীর লোকের নিতান্ত কদভ্যাস। তাহার যাহা বলিবার, তাহা তো শেষ হইয়াছে, আমার যাহা বলিবার, তাহাও বলিয়াছি। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমাকে বলিতে হইল,—"আমার এখন কাজ আছে। তুমি এখন যাও।"

এ কথার পরে আর মানুষকে জ্বালাতন করা কখনই চলে না। কাজেই সে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল; আমিও বাঁচাইলাম। তখন আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এ জন্য আমি একটু নিদ্রা দিলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনোরমার পত্রখানি আমার চক্ষে পড়িল। তাহাতে কি লেখা আছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝি

আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাহা দেখিবার চেষ্টাও করিতাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে মনে কোন সন্দেহ না থাকায় আমি চিঠিখানি পাঠ করিলাম এবং সে জন্য সমস্ত দিন আমাকে অভিভূত হইয়া থাকিতে হইল। আমি নিতান্ত সরলপ্রাণ লোক এবং আমার প্রকৃতি বড়ই কোমল; যে আমার উপর যতই অত্যাচার করুক না কেন, আমি সকলই অকাতরে সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু হাজার হউক, আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু নই তো? মানুষের শরীরে আর কতই সহিবে বল দেখি? আজ মনোরমার পত্র পড়িয়া আমি বস্তুতই বড় বিরক্ত হইলাম। আমার অপরাধের মধ্যে আমি স্ত্রী-পুত্রবিহীন লোক। সংসারের চারিদিকে হাহাকার; দারুণ অন্নকষ্টে লোক ছট্‌ফট্ করিতেছে! যাহারা আছে, তাহারাই অতি কষ্টে পেটের ভাত জুটাইতে পারে না। তোমরা বংশবৃদ্ধি করিয়া সংসারের সেই ক্লেশভার আরও বাড়াইয়া দিতেছ এবং মানুষের যত্নার্জ্জিত মুষ্টিমেয় অন্নের আরও বখরাদার তৈয়ার করিতেছ। আমার অপরাধ, আমি আত্মসুখের জন্য সেরূপ কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। সন্তান হওয়ার কষ্টের কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাইবে; তথাপি হতভাগ্যেরা সন্তান হইল না বলিয়া শোকে অধোমুখ ও নিতান্ত কাতর। ইহার অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার কথা আর কি আছে, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যাহা হউক, আমার দাদা বিবাহ করিলেন এবং কিছু কাল পরে তাঁহার এক কন্যা-সন্তান হইল। বেশ কথা। কিছু দিন পরে দাদার মৃত্যুকাল উপস্থিত। তখন তিনি সেই মেয়ের ভার আমার ঘাড়ে চাপাইলেন। স্বীকার করি, তাঁহার সে মেয়ে বড় শিষ্ট, শান্ত, সুন্দরী। কিন্তু তাহার ভার গ্রহণ করা সোজা কথা কি? আমার যদি সন্তানাদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই আমার স্কন্ধে এ গুরুভার প্রদান করিতেন না; অবশ্যই তিনি স্বীয় সন্তানের জন্য ব্যবস্থান্তর করিয়া যাইতেন। আমার অপরাধ যে, আমি তাঁহার মত বেকুবি করি নাই; এই জন্যই তাঁহার দায় আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। যাহা হউক, আমি যথাসাধ্য যত্নে তাহাকে মানুষ করিলাম; অনেক অনর্থক আড়ম্বর ও কষ্টস্বীকার করিয়া দাদার মনোনীত পাত্রে তাহার বিবাহও দিলাম। তাহার পর স্বামি-স্ত্রীতে বনিবনাও হইল না। এখন সে মনান্তরের জন্য আমি মারা যাই। আমার ভাইঝির এই দায়ের মধ্যে আমাকে এখন মাথা দিতে হইবে। আমার নিজের ছেলেপিলে থাকিলে ভাইঝি হয় তো এ সময়ে অন্য উপায় দেখিতেন। কিন্তু আমার অপধাধ, নিজের কোন বোঝা নাই; কাজেই আমাকে অপরের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হইবে।

মনোরমা পত্রে আমাকে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছেন। সুযোগ পাইলে আমাকে ভয় দেখাইতে কে ছাড়ে? যদি এই আনন্দধামে আমি আমার ভাইঝি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল বিপদ, সকল দুঃখ, সকল মনস্তাপের বাসা বাঁধিয়া না দিই, তাহা হইলে যত প্রকার শাস্তি কল্পনা করা যাইতে পারে, সকলই আমাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে; মনোরমার পত্রের এই ভাব। তা হউক, একটু না বুঝিয়া আমি হঠাৎ কিছু করিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি মনোরমার নাম শুনিলেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসি এবং তাহার কথার বা কাজের কোন প্রতিবাদ করি না; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মনোরমার প্রস্তাব এতই অন্যায় যে, আমাকে এবার ভাবিবার সময় লইতে হইল। যদিই আমি আনন্দধামে রাণীকে আসিতে দিই, তাহা হইলে রাজাও যে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া, তাঁহার স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে আমার উপর মহারাগের সহিত চক্ষু রাঙ্গাইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, হঠাৎ এ কার্য্য করিয়া ফেলিলে অপরিসীম গোলের উদ্ভব হইবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া মনোরমাকে একবার এখানে আসিয়া সমস্ত বিষয় স্থির করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। যদি মনোরমা আমার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে পারেন, তাহা হইলে আদরের ধন লীলাকে অবশ্যই আনা হইবে, নচেৎ নহে। এ কথাও আমার মনে হইল যে, আমার এই পত্রপ্রাপ্তির পর মনোরমা ঘোর তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে আমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিবে যদি লীলাকে আসিতে বলা যায়, তাহা হইলে এ দিকে আবার রাজা ঘোর তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে আমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিবেন। এই উভয়বিধ তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্যে আমার পক্ষে মনোরমার তর্জ্জন-গর্জ্জনই ভাল; কারণ, আমার তাহা সহ্য করার অভ্যাস আছে। সুতরাং ফেরৎ ডাকে মনোরমাকে আসিতে পত্র লিখিয়া দিলাম। আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ দুদিন সময় তো পাওয়া যাইবে।

এরূপ কষ্টের পর ঠাণ্ডা হইতে অন্ততঃ তিন চারি দিন সময় পাওয়া আবশ্যক। আমি তিন দিন চুপ

করিয়া বিশ্রাম করিব এবং শরীর ও মনকে স্থির করিব সংকল্প করিলাম। বিধাতা দেখিলেন, এমন অভাগাকে এ সামান্য সময়ও বিশ্রাম করিতে দিলে চলিবে কেন? তিনি আমাকে তাহাও দিলেন না। তৃতীয় দিনে এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা আমাদের চিরবন্ধু বক্তৃতাবাগীশ উকীল উমেশবাবুর বখরাদার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ডাকযোগে মনোরমা দেবীর হস্তাক্ষরে শিরোনাম-লিখিত এক পত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু পত্রের খাম খুলিয়া তিনি তাহার মধ্যে একখানি সাদা চিঠির কাগজ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার কূটতর্কপূর্ণ মস্তিষ্ক কল্পনা করিয়াছে যে, নিশ্চয়ই অপর কেহ খুলিয়া এইরূপ প্রতারণা করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মনোরমা দেবীকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন উত্তর পান নাই। এ অবস্থায় তাঁহার ও কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজের কথায় মনঃসংযোগ করাই সৎপরামর্শ। তাহা না করিয়া আমি এ বিষয়ের কিছু জানি কি না, আমাকে তিনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বালাতনের একশেষ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি তাহার কি জানিতে পারি? তবে আমাকে এমন বেয়াদবি করিয়া কষ্ট দেও কেন? আমি রাগতভাবে তাঁহাকে তাহাই লিখিয়া দিলাম। সেই চিঠির পর হইতে উকীলবাবু বুঝিয়াছেন, হয় তো তাঁহার কাজটা ভাল হয় নাই। তিনি আর আমাকে পত্র লিখিয়া জ্বালাতন করেন নাই।

মনোরমার আর কোন পত্রও পাওয়া গেল না এবং তাঁহার শীঘ্র এখানে আসিবার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না; এটা বড়ই বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। আমার সে পত্র পাইয়া একবারে এরূপ ভাবে চুপ করিয়া থাকিবার লোক মনোরমা নহেন। তবেই বোধ হইতেছে, হয় তো রাজা-রাণীর অকৌশলভাব মিটিয়া গিয়াছে। আঃ, বাঁচিলাম। চারিদিকের গণ্ডগোল ঠাণ্ডা হইয়া গেল, এখন আমি আবার প্রাচীন গ্রন্থালোচনায় মনঃসংযোগ করিয়া জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই। আমি প্রিয় গ্রন্থ-বিশেষ লইয়া তাহার আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছি, এমন সময় রামদীন একখানি কার্ড হাতে করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম,—"আবার এক জন ঝি আসিয়াছে বুঝি? তা আসুক, আমি কখনই তার সঙ্গে দেখা করিব না। বল্ গে, আমার সাহত দেখা হইবে না।"

"না হুজুর, এবার এক জন ভারী বাবু।"

এক জন বাবু শুনিয়া অবশ্যই অন্য মত করিতে হইল। রামদীনের হাত হইতে কার্ড লইয়া পাঠ করিলাম। কি সর্ব্বনাশ! আমার সেই দুষ্ট ভগ্নীর বাঙ্গাল স্বামী—জগদীশনাথ চৌধুরী। বলা বাহুল্য যে, কার্ড দেখিবামাত্র যাহা সঙ্গত মীমাংসা, তাহাই আমার মনে হইল। আমি বুঝিলাম, আমার বাঙ্গাল ভগ্নীপতি মহাশয় নিশ্চয়ই আমার নিকট টাকা ধার করিতে আসিয়াছেন। আমি বলিলাম,—"রামদীন, তোমার বোধ হয় কি, দুই চারি টাকা পাইলে এ লোকটা অমনই অমনই চলিয়া যাইতে পারে কি?"

রামদীন অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিল। তাহার কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। সে আমাকে বুঝাইয়া দিল, আমার বাঙ্গাল ভগ্নীপতি মহাশয়ের পরিচ্ছদ খুব জাঁকাল এবং তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্ববিধ সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী বলিয়া মনে হয়। এই সকল বর্ণনা শুনিয়া আমার পূর্ব্ব-সংস্কারের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। তখন আমি স্থির-সিদ্ধান্ত করিলাম যে, চৌধুরীর নিশ্চয়ই কোন পারিবারিক অকৌশল উপস্থিত হইয়াছে এবং অন্যান্য সকলের ন্যায় তিনিও সকল জ্বালা আমার ঘাড়ে চাপাইতে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসিলাম,—"কি জন্য তিনি আসিয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন কি?"

"মনোরমা দেবী এখন রাজবাটী হইতে আসিতে পারিবেন না; এ জন্য চৌধুরী মহাশয় আসিয়াছেন।"

আবার নূতন বিভ্রাট উপস্থিত। যদিও চৌধুরীর কোন হেঙ্গাম না হউক, মনোরমার তো বটেই! যে দিক্ দিয়া হউক, গোল ভোগ করিতেই হইবে। হায়! হায়! কি কপাল গা! তখন নিরুপায় হইয়া বলিলাম,—"তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

চৌধুরী মহাশয়কে দর্শনমাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। ওরে বাপ রে! কি বৃহৎ দেহ। আমি বুঝিলাম, তাঁহার পদভরে ঘর কাঁপিয়া উঠিবে এবং জিনিসপত্র ওলট-পালট হইয়া পড়িবে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে চৌধুরী মহাশয়ের দেহ সমাচ্ছন্ন। তিনি বড়ই হাস্যবদন এবং ধীরস্বভাব। ফলতঃ তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। পরিণামে যে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে, প্রথম সাক্ষাতে চৌধুরীর প্রকৃতি বুঝিতে না পারায় আমার মানব-চরিত্র-প্রণিধান-ক্ষমতায়

বিশেষ দোষ দিতে হয়। কিন্তু আমি সরলপ্রাণ লোক। আপনার দোষের কথা লুকাইব কেন ?

তিনি বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণ-সরোবরের রাজ-বাটী হইতে আসিতেছি এবং আমি মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী রঙ্গমতি দেবীর স্বামী; অতএব আমার সানুনয় অনুরোধ যে, মহাশয় আমাকে নিঃসম্পর্কিত ও অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। আপনার নড়িয়া চড়িয়া কাজ নাই,—আমার জন্য একটুও ব্যস্ত হইবার দরকার নাই!"

আমি উত্তর দিলাম,—"আপনি বড়ই ভদ্রলোক। আমি বড়ই দুর্ব্বল, এ জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। আপনার আনন্দধামে আগমন-ঘটনায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বসুন—ঐ চেয়ারে বসুন।"

চৌধুরী বলিলেন,—"আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনার হয় তো বেশী অসুখ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"বারোমাসই আমার সমান। আপনাকে আর বলিব কি, আমি কেবল মরা মানুষ জানিবেন। আমার শরীরে কিছুই নাই।"

চৌধুরী বলিলেন,—"আমার এই জীবনে আমি বহুশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য সর্ব্ববিষয়াপেক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনায় আমি অধিক সময় ব্যয় করিয়াছি। আপনার অবস্থা দৃষ্টে দুই একটি অতি সামান্য, অথচ বিশেষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিতে আমার বাসনা হইতেছে। আপনি অনুমতি করিলে গৃহমধ্যে যে স্থানে আপনি উপবেশন করেন, তাহা আমি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি।"

"করুন—যাহা ভাল বুঝেন, করুন। আমাকে রক্ষা করিবার যদি কোন উপায় থাকে, দেখুন।"

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জানালার নিকটে গমন করিলেন। আহা! কি সদ্বিবেচক! যাওয়া, চলা-ফেরা সকল বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ সাবধানতা! তিনি জানালার নিকট হইতে অতি মৃদু, কোমল ও আশ্বাসপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,-"বিশুদ্ধ বায়ু, বুঝিলেন রায় মহাশয়, বিশুদ্ধ বায়ু আপনার জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রী। সকল জীবনের পক্ষেই বায়ু বলকারক, পুষ্টিকারক, রক্ষাকারী সামগ্রী। বিশেষতঃ আপনার পক্ষে তাহার উপকারিতার সীমা নাই। দেখুন, একটা বৃক্ষও নিরবচ্ছিন্ন বায়ু-বিহীন স্থানে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় না। মহাশয় গৃহের যে স্থানে উপবেশন করেন, তথায় বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমনের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়, এই বাতায়নপথে গৃহমধ্যে যে দক্ষিণবায়ু প্রবেশ করে, তাহা সম্মুখস্থ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। সেই বায়ুপ্রবাহের সম্মুখে যদি মহাশয় সতত উপবেশনের আসন রক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনার নিয়তই বিশুদ্ধ বায়ু-সম্ভোগ ঘটিবে এবং তজ্জন্য অবশ্যই আপনার অপরিসীম শারীরিক উন্নতি সংঘটিত হইবে। অতএব আমার সানুনয় অনুরোধ যে, মহাশয়কে অতঃপর এই স্থানে উপবেশন করিতে হইবে। আপনি এই চির-অপরিচিত অথচ অতি নিকট-কুটুম্বের এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া অবশ্যই বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

কথাটি আমার মনে বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল। লোকটার কথা ঠেলিবার যো নাই। বায়ুর কথা পর্য্যন্ত তো দেখিলাম, লোকটার কথা অবশ্য গ্রাহ্য। তাহার পর চৌধুরী পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে আসিতে আবার বলিতে লাগিলেন,—"রায় মহাশয়! আপনার সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না, তাহা আমি এক্ষণে সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।"

"সে কি! কেন বলুন দেখি?"

"কেন? ভারতবর্ষে আপনার ন্যায় সাহিত্যামোদী সুপণ্ডিত ব্যক্তি কে আছে, বলুন দেখি? নিরন্তর আপনি স্বদেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে নিযুক্ত। কিন্তু হায়! বিধাতার কি বিড়ম্বনা। আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তি চিররুগ্ন, অপ্রফুল্ল ও অবসন্ন। আপনার এই গৃহে আগমনাবধি আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয় দারুণ দুঃখে অভিভূত হইতেছে। সুতরাং মহাশয়ের নিকট অপরিচিত থাকাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য সন্দেহ কি? আমার হৃদয় সাধারণ জনগণের ন্যায় কঠিন ও অকৃতজ্ঞ নহে। আমি একসঙ্গে আপনার অসাধারণ ব্যাধিযাতনা এবং অসাধারণ গুণাবলী দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি।"

লোকটা যথার্থই আমার প্রকৃত অবস্থা সুন্দররূপ বুঝিয়াছে। কি বলিব, আমার দেহে তৃণের ন্যায় শক্তিও নাই। যদি আমার শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও বল থাকিত, তাহা হইলে আমি তখনই উঠিয়া চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কোলাকুলি করিতাম। তাহা না পারিয়া আমি কেবল কৃতজ্ঞতাসূচক ঈষদ্ধাস্য করিলাম মাত্র। বোধ হয়, চৌধুরী তাহাতেই আমার হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিলেন। চৌধুরী আবার বলিতে লাগিলেন,—"আপনার এই অবস্থা দৃষ্টে আপনাকে বিনোদিত করিবার উপায় অন্বেষণ না করিয়া আমাকে আপনার নিকট নিদারুণ

পারিবারিক অশান্তির সংবাদ সকল ব্যক্ত করিয়া, আপনাকে অধিকতর কাতর করিতে হইবে ভাবিয়া আমি নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইতেছি।"

তখনই আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল এবং আমি বুঝিলাম, এই রে! এতক্ষণ বাদে এ হতভাগাও জ্বালাতনের সূত্রপাত আরম্ভ করিল দেখিতেছি।

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! সে সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কি নিতান্তই আবশ্যক? ভাল, সে সকল কথা থাক্ না কেন?"

চৌধুরী নিতান্ত গম্ভীরভাবে মস্তকান্দোলন করিলেন। আমি বুঝিলাম, নিতান্তই আমার কপাল পুড়িয়াছে,—এ লোকটাও জ্বালাতন না করিয়া কোনমতেই ছাড়িবে না। বলিলাম,—"তবে কি আমাকে সে সকল কথা শুনিতেই হইবে?"

চৌধুরী তখন তাঁহার প্রকাণ্ড মস্তক হেলাইয়া এতৎপ্রসঙ্গের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন এবং আমার মুখের দিকে অপ্রীতিকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন আমার প্রাণ বলিল, দেখিতেছ কি, চক্ষু বুজিয়া ফেল—আজি আর নিস্তার নাই। আমি তখন প্রাণের কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিয়া বলিলাম,—"মহাশয়! তবে কৃপা করিয়া একটু কোমলতার সহিত আপনার কুসংবাদ ব্যক্ত করুন। কেহ মরিয়াছে কি?"

একটু বাঙ্গালে রাগ ও জোরের সহিত চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন,—"মরিয়াছে! সে কি রায় মহাশয়, আমি এমন কি বলিয়াছি বা এমন কি করিয়াছি যে, আপনি আমাকে মৃত্যুর বার্ত্তাবহ বলিয়া মনে করিতেছেন?"

আমি উত্তর দিলাম,—"এ জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এরূপ স্থলে অতি মন্দ সন্দেহই মনে করিয়া থাকি; তাহাতে সংবাদের কঠোরতা একটু লাঘব হয়। যাহা হউক, কাহারও মৃত্যু হয় নাই শুনিয়া বড়ই নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। কাহারও পীড়া হইয়াছে কি?"

এতক্ষণে আমি আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম। তখন দেখিলাম, লোকটাকে অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার এমনই রং ছিল কি, না আমি চক্ষু মুদিত করার পর হইতে তাঁহার রং বদলাইয়া গিয়াছে? রামদীন যে ছাই এ সময়ে ঘরের মধ্যে ছিল না। তাহা হইলে তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। যাহা হউক, তিনি কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"কাহারও পীড়া হইয়াছে কি?"

"আমার অপ্রীতিকর সংবাদের মধ্যে তাহাও আছে বটে। হাঁ রায় মহাশয়, কাহারও পীড়া হইয়াছে সত্য।"

"বটে? কাহার?"

"গভীর দুঃখের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে, মনোরমা দেবী পীড়িত হইয়াছেন। বোধ হয়, আপনিও এ আশঙ্কা করিয়া থাকিবেন। আপনার প্রস্তাবানুসারে যখন মনোরমা দেবী এখানে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, সম্ভবতঃ আপনার স্নেহজনিত উদ্বেগ হেতু আপনি তখনই তাঁহার পীড়ার আশঙ্কা করিয়াছেন।"

আমার স্নেহজনিত উদ্বেগ হেতু সেরূপ আশঙ্কা আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কথা এখন আমার মোটেই মনে পড়িল না। তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমি তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিলাম। সংবাদটা শুনিয়া আমি বিচলিত হইলাম। মনোরমার ন্যায় সরল ও সুস্থকায় লোকের পীড়ার কথা জানিয়া আমি অনুমান করিলাম, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া থাকিবে। হয় তো সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছেন, নয় তো অন্য কোন প্রকারে কোন আঘাত লাগিয়াছে, নয় তে হাতপা কাটিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"পীড়া কি বড় কঠিন?"

চৌধুরী উত্তর দিলেন,—"কঠিন, তাহার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু ভয়ানক নহে, তৎপক্ষে আমার আশা ও বিশ্বাস আছে। দুঃখের বিষয়, মনোরমা দেবী এক দিন অতিশয় বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন। সেই কারণে সেই রাত্রি হইতেই তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে।"

আমি চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম,—"জ্বর! সংক্রামক নয় তো?"

চৌধুরী বলিলেন,—"না, না, এখন পর্য্যন্ত জ্বরের সেরূপ কোন সন্দেহজনক ভাব দেখা যায় নাই। অতএব সেরূপ আশঙ্কা করিবেন না।"

তিনি হাজার বলুন, আমার মনে বড় ভয় হইল। এই শরীরের উপর এত জ্বালাতন একে নিতান্তই অসহ্য ব্যাপার, তাহার উপর এই সংবাদের পরেও আবার কথা কহা বা শুনা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব। তখন আমি কাতরভাবে বলিলাম,—"আমার অবস্থা দেখিতেছেন তো? আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও চিররোগী। অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা

কহা আমার সাধ্যাতীত। এক্ষণে কি জন্য মহাশয়ের শুভাগমন, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ছুটী দিউন।”

আমি মনে করিয়াছিলাম, এ কথার পর তিনি আর বেশী কথা কহিবেন না—দুই একটা শিষ্টাচারের কথা কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবেন। ও মা! যাওয়া তো দূরের কথা, তিনি তাঁহার সেই রাক্ষসে হাতের বিকট দুটা অঙ্গুলী উঁচু করিয়া তুলিলেন এবং আমার মুখের দিকে আর একবার সেইরূপ বিরক্তিজনক দৃষ্টিপাত করিয়া নিতান্ত গম্ভীর ও স্থিরস্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন করিব কি? আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ লোক—সে পাহাড়-পর্ব্বতের সহিত ঝগড়া করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার তদানীন্তন অবস্থা যদি ভাবিয়া বুঝিতে পার, তবে বুঝিয়া লও। ভাষার সাহায্যে তাহার বর্ণনা করা সম্ভব কি? কখনই নহে।

কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের দিকেই লক্ষ্য না করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমার আগমনের অভিপ্রায় কয়টি, তাহা আমার আঙ্গুল দেখিলেই জানিতে পারিবেন। দুই কারণে আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে। প্রথম, আপনি মনোরমা দেবীর পত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রাজা প্রমোদরঞ্জন ও রাজ্ঞী লীলাবতী দেবীর মধ্যে ঘোর বিষাদজনক মনান্তর উদ্ভূত হইয়াছে, আমি নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাহার সমর্থন করিতেছি। আমি রাজার অতি প্রাচীন বন্ধু, আমি রাণীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, রাজবাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই ত্রিবিধ কারণে সকলই জানিবার ও বলিবার অধিকার আছে। আপনি এ পরিবারের মস্তক। মনোরমা দেবী এ সম্বন্ধে আপনাকে পত্র দ্বারা যাহা জানাইয়াছেন, তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। এতদ্বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিলে অধিকতর অপ্রীতিকর কলঙ্ক ও লোকাপবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এ সময়ে কিয়ৎকালের জন্য স্বামি-স্ত্রীর পরস্পর অন্তরিত থাকা নিতান্তই আবশ্যক। আমি ক্রমশঃ রাজাকে প্রকৃতিস্থ করিবার ভার গ্রহণ করিতেছি। রাণীর অপরাধ কিছুই নাই, অথচ তাঁহার এ অবস্থায় স্বামি-ভবন হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বাস করা নিতান্ত সৎপরামর্শ। কিন্তু মহাশয়ের বাটী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বাস করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত, সম্ভব ও বিধেয় নহে। অতএব আপনি তাঁহাকে অবিলম্বে এখানে আনাইবার ব্যবস্থা করুন।”

দেখ একবার কাণ্ডকারখানা! তাহাদের মধ্যে বিবাহবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে, আমাকে বিনা অপরাধে তাহার মধ্যে মাথা দিয়া তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি এই কথা রাগের সহিত বলিব ভাবিতেছি, কিন্তু শুনে কে? চৌধুরী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সুবিশাল আঙ্গুলদ্বয়ের একটা নামাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বাক্যের শকট আমার ঘাড়ের উপর দিয়া আবার চালাইতে লাগিলেন। কোচম্যান গাড়ী ঘাড়ের উপর দিয়া চালাইতে হইলেও একবার ‘হৈ হৈ’ করিয়া চীৎকার করিয়া সাবধান করে; তিনি তাহাও করিলেন না।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—“আমার প্রথম অভিপ্রায় মহাশয়কে জানাইলাম। পীড়া হেতু মনোরমা দেবীর আগমনের ব্যাঘাত ঘটায়, তিনি স্বয়ং আসিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাই সমাপিত করিতে আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে; ইহাই আমার আগমনের দ্বিতীয় কারণ। আমি প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বলিয়া রাজবাটীস্থ সকলেই সকল বিষয়ে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি মনোরমা দেবীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কেন যে আপনার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি অগ্রে মনোরমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া রাণীর আগমন-বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন নাই, তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম। রাজা রাণীকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কোন গোলমাল করিবেন কি না, তাহার স্থির-সংবাদ অগ্রে না জানিয়া, রাণীকে এক স্থানে আশ্রয় দিতে ইতস্ততঃ করা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণই ন্যায়সঙ্গত কথা, স্বীকার করি। আমি ইহাও স্বীকার করি যে, এরূপ প্রসঙ্গের বাদানুবাদ পত্রে নির্ব্বাহিত হইবার নহে। এই সকল কারণে মনোরমা দেবীর অক্ষমতা হেতু আমাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও মহাশয়ের নিকট আগমন করিতে হইয়াছে। আমি রাজার প্রকৃতি অন্য লোকের অপেক্ষা সমীচীনরূপে জ্ঞাত আছি। আমি আপনাকে নিঃসংশয়িতরূপে জানাইতেছি যে, যত দিন রাণী এখানে থাকিবেন, সে সময়ের মধ্যে রাজা একবারও এ বাটীর নিকটেও আসিবেন না এবং এখানকার কোন লোকের সঙ্গে

কোন প্রকার বাক্যালাপও রাখিবেন না। রাজার বৈষয়িক অবস্থা এক্ষণে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। রাণী স্থানান্তরিত হইলে তিনি স্বাধীন হইবেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া দূরপ্রদেশে চলিয়া যাইবেন, ইহার কোনই সন্দেহ নাই। বোধ করি, এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারট সম্পূর্ণরূপে আপনার হৃদ্গত হইয়াছে। এখন আপনার আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা কিছু আছে কি? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করুন যত কথা মনে থাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বসিয়া আছি।"

যে লোক আমার অবস্থার দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া এত কথা কহিয়া ফেলিল, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আরও অনেক কথা বলিবে, তাহার ঠিক কি? তাহাকে কি আমি ঘাঁটাইতে পারি? আমি কাতরভাবে বলিলাম,—"আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমার এ অবস্থায় সকল কথাই স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। আপনি কৃপা করিয়া এ ব্যাপারের মধ্যস্থতা গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। যদি কখন শরীর ভাল হয় এবং আপনার সহিত পুনরায় ভাল করিয়া আলাপের সুযোগ উপস্থিত হয়—"

আমার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই চৌধুরী গাত্রোত্থান করিলেন। আমি ভাবিলাম, লোকটা বুঝি এবার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে। ও আমার কপাল! চলিয়া যাইতে তাহার দায় পড়িয়াছে! তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পূর্ব্বে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। রাণী-মাতাকে এখানে আনিতে মনোরমা দেবীর আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার কথা আপনি একবারও ভাবিবেন না। মনোরমা দেবীর শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, রাজবাটীর গিন্নী-ঝি আছে, আর কলিকাতা হইতে এক জন পাশকরা উপযুক্ত পরিচারিকা লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার যত্নের কোনই ত্রুটি হইতেছে না, ইহা আপনি স্থির জানিবেন। তাঁহার পীড়ায় রাণীর হৃদয় এত শোকাকুল ও কাতর হইয়াছে যে, তাঁহার দ্বারা পীড়িতার পরিচর্য্যা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ দিকে রাজার সহিত তাঁহার অসদ্ভাব প্রতিদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। যদি তাঁহাকে আপনি রাজবাটীতে আরও কিছু দিন রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার ভগ্নীর কোনই উপকার তো হইবে না; অধিকন্তু আপনার, আমার এবং আমাদের সকলকেই ঘোর বিরক্তিকর ও নিতান্ত অপমানজনক লোকনিন্দার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইবে। এই দারুণ দুর্দ্দৈবের দায়িত্ব হইতে আপনি সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত থাকিবেন বলিয়া আমি আপনাকে কায়-মনোবাক্যে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এখনই রাণী-মাকে অবিলম্বে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত পত্র লিখুন। আপনি আপনার স্নেহপ্রণোদিত, মানজনক, অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করুন, তাহার পর ভবিষ্যতে যাই কেন ঘটুক না, সে জন্য কেহই আপনাকে কোন প্রকারে অপরাধী করিতে পারিবে না। আমি আমার প্রগাঢ় দূরদর্শিতার প্রভাবে আপনাকে এই সুহৃদ্জনোচিত উপদেশ প্রদান করিতেছি। ইহা আপনি গ্রহণ করিলেন কি বলুন?"

আমি অবাক্ হইয়া লোকটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর মনে করিলাম, রামদীনকে ডাকিয়া লোকটাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিই। আশ্চর্য্য কাণ্ড! লোকটা আমার মুখ দেখিয়া আমার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। চৌধুরী আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"আপনি এখনও অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করিতেছেন। আপনি মনে করিতেছেন, রাণীর এখন শরীর ও মনের এরূপ অবস্থা নহে যে, তিনি এই পথশ্রম সহ্য করিয়া এত দূর একাকিনী আসিতে পারেন। দেখুন, আমার হৃদয়ের সহিত আপনার হৃদয়ের কেমন একতা! দেখুন, কেমন আশ্চর্য্যরূপে আমি আপনার হৃদয়ভাব প্রণিধান করিতেছি! আপনি আরও মনে করিয়াছেন, কলিকাতা দিয়া আসিতে হইলে রাণী কলিকাতার কোন্ স্থানে থাকিবেন, তাহারও স্থির নাই। রাণীর পরিচারিকার জবাব হইয়াছে, রাজবাটীর গিন্নী-ঝি প্রভৃতি মনোরমা দেবীর পীড়ার জন্য ব্যস্ত, সুতরাং রাণীর সঙ্গে আসিবে কে? এ সকল আপত্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইলেও অখণ্ডনীয় নহে। যখন পশ্চিম হইতে আমি রাজার সহিত এ দেশে আসি, তখনই আমার স্থির ছিল যে, আমি কলিকাতার কোন স্থানে বাস করিব। সংপ্রতি সেই অভিপ্রায়ে আমি কলিকাতার বড়বাজার পল্লীতে ছয় মাসের জন্য একটি সুন্দর বাড়ী ভাড়া করিয়াছি। মনে করুন, যদি আমি স্বয়ং যাইয়া রাণীকে ষ্টেশন হইতে আমার বাসায় লইয়া আসি এবং সেখানে তাঁহার পিসীর সহিত আবশ্যকমত কাল থাকার পর তাঁহাকে আবার সঙ্গে করিয়া ষ্টেশনে আনিয়া রেলে উঠাইয়া দিই এবং তিনি শক্তিপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে যদি গিরিবালা

তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে, তাহা হইলে কোন অসুবিধা হইবে, এমন আর বোধ হয় না। অতএব আপনি আর অন্যমত করিবেন না। এখনই আপনি রাণী-মাতাকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া আমাদের সকল উদ্বেগের অবসান করুন, ঘোর লোকাপবাদের হস্ত হইতে এ নিরপরাধ পরিবারকে রক্ষা করুন এবং সে দুঃখিনী বালিকার হৃদয়কে বিশ্রাম লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইতে দিউন। এ কার্য্য আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। অবহেলা করিয়া পরিণামে পরিতাপ ভোগ করিবেন না।"

লোকটা যেন কোন সভামধ্যে বক্তৃতা করিতেছে। হাত নাড়া, পা নাড়া, ঘাড় ঘুরান, বুক ফুলানর ঘটা কি! তখন আমি দেখিলাম, ইহাকে শীঘ্র সরাইয়া দিতে না পারিলে আমার আর কোনক্রমে ভদ্রস্থতা নাই। সেই সময়ে ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে এক অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রদান করিলেন; আমি তখনই চৌধুরীর প্রার্থনামত পত্র লিখিয়া সকল যন্ত্রণার সমাপ্তি করিবার সংকল্প করিলাম। আমার পত্র পাইলেই লীলা আসিবে বলিয়া কোন ভয় নাই; কারণ, মনোরমার পীড়া থামিতে লীলা তাহাকে ছাড়িয়া আসিবে, এ কথা কখনই সম্ভব নহে। এ সোজা কথা চৌধুরীর মত চালাক লোক যে কেন বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, তিনি এ কথা বুঝিতে পারার আগে পত্রখানা লিখিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলে সকল দিকে রক্ষা হয়। তাঁহাকে এক বিন্দুও ভাবিবার সময় দিব না মনে করিয়া আমি কষ্টে-সৃষ্টে একটু সোজা হইয়া বসিলাম এবং যথার্থ কলম হাতে লইয়া লিখিতে বসিলাম। তাড়াতাড়ি করিয়া লিখিলাম, "জীবিতাধিক লীলা,—যখন তোমার ইচ্ছা হইবে, তখনই এখানে আসিবে। কলিকাতা তোমার পিসীর বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিও। মনোরমার পীড়ার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।" পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহা চৌধুরী মহাশয়ের দিকে ফেলিয়া দিলাম এবং বলিলাম,—"আর না। আমাকে ক্ষমা করুন, আর কোন কথা বলিলে আমি তাহা শুনিতে পারিব না। আপনি বৈঠকখানা-বাটীতে গিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি করুন। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আজ এই পর্য্যন্ত।" এই কথা বলিয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে আমি শয্যায় পড়িলাম।

কিন্তু চৌধুরী তবুও আবার বকিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহার কথা আর শুনিব না প্রতিজ্ঞা করিলেও অনেক কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল! আমার ভগ্নীর এই বিরাট্ স্বামী আমাদের সাক্ষাতের জন্য অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন; আমার শরীরের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; আমার গুণের অনেক সুখ্যাতি করিলেন; আমার জন্য একটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতে চাহিলেন; বিশুদ্ধ বায়ুর কথা আবার আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যে আমি রাণীকে দেখিতে পাইব বলিয়া আশ্বাস দিলেন; তাহার পর নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যখন আমি আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, তখন দেখিলাম, চৌধুরী চলিয়া গিয়াছেন। আঃ, বাঁচিয়াছি! লোকটার প্রধান গুণ—বড় সাবধান। তিনি যে কখন্ ঘরের দরজা খুলিয়াছেন এবং বন্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। কিছু কাল পরে রামদীন আসিলে আমি তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই অতি বড় লোক যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন? আঃ, বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার জয় হউক।"

আমার আর কোন কথা বলিবার দরকার দেখিতেছি না; দরকার থাকিলেও আমি তাহাতে অক্ষম। পরে যে সকল ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে তাহার কিছুই আমার সমক্ষে হয় নাই। প্রার্থনা করি, সে জন্য কেহই যেন নিন্দার ভাগ আমার ঘাড়ে না চাপান। আমি সকলই ভাল করিয়াছি। যে বিষাদময় দুর্ঘটনা পরে ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা জানিবার ও বুঝিবার কোনই উপায় ছিল না। সুতরাং সে জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। সেই দুর্ঘটনায় আমার শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই অধিকতর মনস্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছে। রামদীন আমার বড় অনুগত ভৃত্য! সে বলে, এ কষ্টের ধাক্কা আমি সামলাইয়া উঠিতে পারিব না। সে দেখিতেছে, আমি এখনও—চক্ষে রুমাল দিয়া তাহাকে লিখিতে বলিতেছি। আর কি বলিব?

রাজবাটীর গিন্নী-ঝি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীমতী মা‍ণী-মাতা ঠাকুরাণীর পীড়ার ক্রমশঃ কিরূপ ব্যবস্থা হইতে লাগিল এবং কি জন্য শ্রীমতী রাণীমাতাকে রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতে হইল, তাহার বিবরণ আমাকে লিখিতে হইবে। আমি ব্রাহ্মণকন্যা এবং এক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রী। অদৃষ্টবশে বৈধব্য হওয়ায় আমাকে পরের দ্বারস্থ হইয়া জীবনপাত করিতে হইতেছে। তা আমি রাজবাটীতে ছিলাম, ভালই বলিতে হইবে। সমস্ত চাকর, চাকরাণী, রাঁধুনী প্রভৃতির কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করাই আমার প্রধান কার্য্য। পূর্ব্ব হইতেই একটু লিখিতে পড়িতে জানিতাম, এ জন্য আমার হাত দিয়া সংসারের যে খরচ হইত, তাহার হিসাবও আমি রাখিতাম। নিজে রাঁধাবাড়া করিয়া যথাসময়ে একবার আহার করিতাম; কোন কথার মধ্যে থাকিতাম না।' সকলেরই যাহাতে উপকার হয়, তাহাই করিতাম। কেহই আমার উপর নারাজ ছিল না। সামান্য দাসীটি হইতে রাণী-মাতা পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন। মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা কখনও জানি না; সুতরাং যাহা লিখিব, তাহার মধ্যে এক বর্ণও অসত্য স্থান পাইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সকল কথা আমাকে ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে, এ কথা যদি কখন জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তারিখ প্রভৃতি সব টুকিয়া রাখিতাম। তাহা রাখি নাই, সুতরাং সময়ের কথা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে দশ কি পনর দিন থাকিতে—মনোরমা দেবীর কঠিন পীড়া আরম্ভ হয়। প্রায়ই দিবা ৯॥ টা বা ১০ টার সময়ে রাজাদের সকলের খাওয়া-দাওয়া হইয়া থাকে। যে দিন তাঁহার পীড়ার আরম্ভ হইয়াছিল, সে দিন অন্যান্য দিনের মত তাঁহার, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও রাণীমাতার আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া দাসী তাঁহাদের ডাকিতে গেল। প্রতিদিন তাঁহাদের খাইবার স্থান করা হইতে আহারের শেষ পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সে দিনও সেইরূপ দাঁড়াইয়া ছিলাম। এমন সময়ে দাসী অত্যন্ত ভীতভাবে দৌড়াইয়া আসিল এবং বলিল,—"মাসীমা ঠাকুরাণীর কি হইয়াছে।" আমি বেগে মাসীমাঠাকুরাণীর ঘরে ছুটিলাম, দেখিলাম, তাঁহার অতি ভয়ানক জ্বর হইয়াছে; তিনি একটা কলম হাতে করিয়া পাগলের মত ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহার কোনই কথা কহিবার শক্তি নাই। আমি সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাণীমাতা সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি ভগ্নীর অবস্থা দেখিয়া এমনই ভীত ও কাতর হইলেন যে, তাঁহার দ্বারা তখন কোন কাজ হওয়াই সম্ভব নহে। তখনই চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও আমি রোগীকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়াইয়া দিলাম; আর চৌধুরী মহাশয় পাশের ঘরে বসিয়া, যতক্ষণ ডাক্তার আসিয়া না পৌছেন, ততক্ষণ রোগীকে যে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং রাজবাটীর খয়রাতি ঔষধ আনাইয়া স্বহস্তে মাথায় দিবার একটা জল এবং খাইবার একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঠাকুরাণী ও আমি মনোরমা দেবীর মাথায় সেই জলের পটী দিতে লাগিলাম। রাজা আসিয়াই অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা আবশ্যক বোধে নিকটস্থ রাজপুর হইতে বিনোদ ডাক্তারকে ডাকিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে এক জন দ্বারবান্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই বিনোদবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ দেশে বিনোদবাবুর সম্ভ্রম যথেষ্ট। তিনি বয়সে প্রবীণ এবং সুবিজ্ঞ। বিনোদবাবু রোগীর অবস্থা দেখিয়া, পীড়া বড় কঠিন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আমরা নিতান্ত ভয়াকুল হইলাম। চৌধুরী মহাশয় আসিয়া সরলভাবে বিনোদবাবুর সহিত কাথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং বর্ত্তমান পীড়া সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত অকপটে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় ডাক্তার কি না, বিনোদবাবু তাহা জানিতে চাহিলে, চৌধুরী মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি চিকিৎসক নহেন। অমনি বিনোদবাবু বলিলেন যে, তিনি সখের ডাক্তারের মতামত শুনিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন। চৌধুরী মহাশয় একটুও রাগত না হইয়া অতি ভদ্রতার সহিত ঈষৎ হাস্য

করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়া গেলেন, তিনি সারাদিন কাঠের ঘরে থাকিবেন; যদি কোন দরকার পড়ে, তাঁহাকে সেখানে সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। সেখানে তিনি কেন গেলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়, এরূপ অবস্থায় বাটীতে খুব কম লোক থাকা ভাল ভাবিয়া তিনি অগ্রেই তাহার পথ দেখাইলেন। তাঁহার যেরূপ মহৎ মন, তাহাতে তিনি সকলই করিতে পারেন। তিনি অতি সদাশয় ও বড়লোক। রাত্রিতে মাসী-মাতা ঠাকুরাণীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িল এবং যত ভোর হইতে লাগিল, ততই জ্বর আরও বাড়িতে লাগিল। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও আমি পালা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। রাণীমাতা অকারণ জোর করিয়া আমাদের সহিত বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের শরীর অত্যন্ত কোমল, তাহাতে ভগ্নীর কঠিন পীড়ার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত কাতর। এরূপ অবস্থায় শারীরিক অত্যাচারে তাঁহারও পীড়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ সময়ে সময়ে তিনি কাঁদিয়া যেরূপ ব্যকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে রোগীর ঘরে তাঁহার থাকাই ভাল নহে। রাণীমার মত শান্ত, ভালমানুষ, স্নেহ-পরায়ণা স্ত্রীলোক আমি আর কখন দেখি নাই। রাজা ও চৌধুরী মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। বোধ করি, রাণীর ব্যাকুলতা হেতু এবং মনোরমা দেবীর পীড়ার ভাবনায় রাজা যেন কিছু বিচলিত ও অস্থির হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের কিন্তু সম্পূর্ণ স্থিরভাব। আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি একখানি কেতাব হাতে করিয়া রাজাকে বলিতেছেন,—"চল প্রমোদ, আমাদের এ পীড়ার সময় বাটীতে বসিয়া থাকিয়া গোল বাড়াইবার দরকার নাই। আমরা বাড়ীতে থাকিলে নানারূপ হেঙ্গাম আপনিই জুটিয়া উঠিবে। আমি কাঠের ঘরে বসিয়া পড়িব মনে করিয়াছি। আমি যখন পড়িতে বসি, তখন আমার কাছে কেহ থাকা আমি ভালবাসি না। তোমার যদি আর কোন দিকে যাইবার ইচ্ছা হয়, যাইতে পার। নিস্তারিণি! বাছা, খুব সাবধান থাকিবে; আমি আসি এখন।"

রাজা হয় তো উৎকণ্ঠা হেতু এমন ভদ্র ও উদারভাবে আমার নিকট বিদায় লইলেন না। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আমাকে পর-প্রত্যাশী হইতে হইয়াছে; এ বাড়ীর মধ্যে কেবল চৌধুরী মহাশয়ই এ কথা বুঝিয়া আমার সহিত সত বড় শিষ্ট ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিকই তাঁহা শরীরে বড়লোকের সমস্ত লক্ষণই আছে। সকলে প্রতিই তিনি সুব্যবহার করিতেন। গিরিবা নামে রাণী-মার যে পরিচারিকা ছিল, চৌধুরী মহাশ তাহার পর্য্যন্ত ভাবনা ভাবিতেন। যখন রাজ তাহাকে জবাব দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তখন চৌধুরী মহাশয় আমাকে তাঁহার পাখী দেখাইতে দেখাইতে গিরিবালা রাজবাটী হইতে গিয়া এখন কোথা আছে, সে অতঃপর কি করিবে ইত্যাদি কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যবহারই তো বড় লোকের লক্ষণ। আমি যে এ সকল কথা এখনই কেন তুলিলাম, তাহা বলা আবশ্যক। শুনিয়াছি, কেন কোন লোক চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকে। কিন্তু যে মহাত্মা দুরবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ-কন্যার সম্মান করিতে জানেন, একটা সামান্য দাসীর জন্যও পিতৃ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া উদ্বিগ্ন হন, তাঁহার স্বভাব যদি মন্দ হয়, তবে দিনরাত্রি সমস্তই মিথ্যা।

মাসী-মা ঠাকুরাণীর পীড়ার কিছুই ভাল দেখিতেছি না; বরং দ্বিতীয় রাত্রিতে প্রথম রাত্রির অপেক্ষা বৃদ্ধি। বিনোদবাবুর যত্নের কোন ত্রুটি নাই; চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এবং আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রোগীর সেবা করিতেছি; আর রাণীমাকে হাজার অনুরোধ করিয়া একবারও রোগীর নিকট হইতে সরাইতে পারিতেছি না। তাঁর কথা, "আমার শরীর থাকুক আর যাউক, কিছুতেই আমি দিদির কাছ-ছাড়া হইব না।"

দুপুরবেলা অন্যান্য সাংসারিক কাজের জন্য আমি একবার নীচে আসিয়াছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আবার রোগীর ঘরে যাইবার জন্য ফিরিবার সময় দেখিলাম, চৌধুরী মহাশয় কিছু প্রফুল্লভাবে কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাটীতে উঠিতেছেন। রাজা ঠিক সেই সময়ে কেতাবঘরের দরজার ভিতর হইতে উঁকি দিয়া চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন,—"ছুঁড়ীটাকে দেখিতে পাইয়াছ না কি?"

চৌধুরী মহাশয় কথায় কোনও উত্তর দিলেন না, তাঁহার প্রকাণ্ড মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, রাজা সেই সময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, আমি যাইতেছি, অমনই আমার প্রতি নিতান্ত অসভ্যভাবে বিরক্তির সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরীকে বলিলেন,—"এ দিকে আসিয়া সকল কথা আমাকে বল। বাড়ীতে যদি মেয়েমানুষ থাকিল, তাহা হইলে নিশ্চয়

দেখিবে, কখন তাহারা স্থির হইয়া থাকিবে না—উপর—নীচে, এ ঘর সে ঘর যাওয়া-আসা করিবেই করিবে।"

চৌধুরী মহাশয় কোমলস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রমোদ! নিস্তারিণীর কি এক কাজ? দেখিতেছ না, উহাকে কত দিক্‌ ঠেকাইতে হইতেছে? নিস্তারিণি! এখন রোগীর অবস্থা কিরূপ?"

"কৈ, ভাল তো কিছুই দেখিতেছি না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"বড়ই ভাবনার বিষয়! কিন্তু নিস্তারিণি, তোমাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর দেখাইতেছে। এরূপ পরিশ্রম তোমাদের আর সহিবে কেন? আমার বোধ হয়, তোমার ও আমার স্ত্রীর সাহায্যের জন্য কলিকাতা হইতে রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত পাশকরা যে স্ত্রীলোক ধাই পাওয়া যায়, তাহারই এক জনকে আনা আবশ্যক হইয়াছে। কোন বিশেষ কারণে আমার স্ত্রীকে কালি কি পরশু একবার কলিকাতা যাইতে হইবে। তিনি প্রাতঃকালে যাইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিবেন। আমি এক জন অতি সৎস্বভাবা পাশ-করা শুশ্রূষাকারিণীকে জানি। যদি সে এখন কোথাও নিযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের সাহায্যের জন্য তাহাকেই আমার স্ত্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। কিন্তু যতক্ষণ সে আসিয়া না পৌঁছে, ততক্ষণ তাহার কথা ডাক্তারকে জানাইয়া কাজ নাই; কারণ, আমার লোক শুনিলেই তিনি তাহার উপর নারাজ হইবেন। সে আসুক আগে, তাহার পর কার্য্য দেখিয়া তিনি তাহাকে রাখিবার কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না, রাণীমাতাও কোন অমত করিবেন না। রাণী-মা ভাল আছেন তো নিস্তারিণি? আহা, ভগ্নীর পীড়ায় তাঁহার কি ভয়ানক মনস্তাপই যাইতেছে! তাঁহাকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইও।"

আমি কৃতজ্ঞভাবে তাঁহার সদাশয়তার উল্লেখ করিতেছি, এমন সময়ে চৌধুরী মহাশয়ের বিলম্ব হইতেছে বলিয়া রাজা একটা কটু কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর আসিতে বলিলেন। ছিঃ ছিঃ! আমি উপরে উঠিলাম। হাজার হউক, আমি মেয়েমানুষ, অপরের মনের ভাব বলিতে আমার কোন আবশ্যকতা ও অধিকার নাই সত্য, তথাপি রাজা চৌধুরী মহাশয়কে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া আমার বড় কৌতুক জন্মিল। তাঁহারা একটা স্ত্রীলোকের সন্ধানে আছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কে সে স্ত্রীলোক? তাহা কে জানে? কেন তাহাকে সন্ধান করা হইতেছে, তাহাই বা কে বলিবে? চৌধুরী মহাশয় যেরূপ অপূর্ব্ব ধার্ম্মিক লোক, তাহাতে তাঁহার দ্বারা কোন কলঙ্কজনক কর্ম্ম হওয়া অসম্ভব, এ কথা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার অত ভাবিয়া কাজ কি?

রাত্রি সেইরূপ ভাবেই কাটিল—রোগীর অবস্থা কিছুই ভাল বোধ হইল না। পরদিন তাঁহাকে একটু ভাল বোধ হইল। পরদিন প্রাতে আমি যত দূর জানি, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কাহাকেও তাঁহার যাত্রার কারণ না জানাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। অতঃপর মনোরমা দেবীর সমস্ত ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল, আর ভগ্নীর নিকট হইতে একবারও সরিয়া না যাইতে রাণী-মাতার যে প্রকার জেদ, তাহাতে হয় ত শীঘ্রই তাঁহারও শুশ্রূষার ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই দিন ডাক্তারবাবুর সহিত চৌধুরী মহাশয়ের দেখা হওয়ায় আবার অধিকতর অকৌশল জন্মিল। চৌধুরী মহাশয় দ্বিপ্রহরকালে পাশের ঘরে আমাকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ডাক্তারবাবু ও রাণী সে সময়ে রোগীর নিকটে ছিলেন। আমি চৌধুরী মহাশয়ের কথার উত্তর দিতেছি, এমন সময়ে ডাক্তারবাবু বাহিরে যাইবার অভিপ্রায়ে পাশের ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চৌধুরী মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও মহত্ত্বের সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"নমস্কার ডাক্তারবাবু! আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনি রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছেন না?"

"আমি আজি সমূহ উন্নতি দেখিতেছি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আপনি এই জ্বর-রোগে এখনও আগেকার মত মৃদু ঔষধ চালাইতেছেন কি?"

বিনোদবাবু কহিলেন,—"আমার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞান যাহা আমাকে সঙ্গত বলিয়া প্রতীত করাইয়াছে, আমি সেই প্রণালীরই অনুসরণ করিতেছি ও করিব।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্বন্ধে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমি কোন উপদেশ দিতেছি না, কেবল একটা অনুসন্ধান করিতেছি মাত্র। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে আপনি অনেকটা দূরে বাস করেন, ইহা বোধ করি, আপনি অস্বীকার করিবেন না। ঐ সকল স্থানে যে সকল সুশিক্ষিত,

জ্ঞানবান্, অভিজ্ঞ, মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক বাস করেন, তাঁহারা এরূপ স্থলে কি প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাহা আপনি শুনিয়াছেন কি?” তাহার পর কতকগুলি ইংরাজী ঔষধের নাম করিয়া বলিলেন,—“এরূপ রোগে এ সকল ঔষধের কিরূপ কার্য্যকারিতা, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন কি?”

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—“যদি আমাকে কোন ব্যবসায়ী লোক এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহার কথায় উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবসায়ী নহেন, আপনার কথার উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি।” এই কথা বলিয়া বিনোদবাবু প্রস্থানের জন্য অগ্রসর হইলেন। চৌধুরী মহাশয় একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন,—“নমস্কার বিনোদবাবু, নমস্কার।”

রাত্রিতে চৌধুরাণী এক জন শুশ্রূষাকারিণী সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন। শুনিলাম, তাহার নাম রমণী। তাহার চেহারা দেখিয়া এবং তাহার সহিত দুই একটা কথা কহিয়া জানিতে পারিলাম, সে বাঙ্গাল। রমণীর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। দেখিতে বেঁটে, রোগা, কালো, কটা চক্ষুযুক্ত। তাহার পরিচ্ছদের খুব পারিপাট্য। হাতে সোনার বালা, গলায় হেলে হার, গায়ে বাহারে জামা, পরিধান সিমলার চওড়া কালা-পেড়ে উৎকৃষ্ট সাটী। তাহার কথা-বার্ত্তা খুব কম এবং ব্যবহার যেন খুব চাপা রকম।

চৌধুরী মহাশয়ের অপূর্ব্ব উদারতা; এমন মনান্তরের পরও তিনি ব্যবস্থা করিলেন, যতক্ষণ বিনোদবাবু দেখিয়া মত না দিবেন, ততক্ষণ এই নূতন লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পাইবে না। আমি সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইলাম। নূতন লোক রোগীর শুশ্রূষার ভার লয়, ইহা রাণী-মাতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। বাঙ্গাল বলিয়াই কি তাঁহার এত বিদ্বেষ? রাণী মাতার ন্যায় সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ অনুদারতা নিতান্ত বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই।

পরদিন প্রাতে ডাক্তারের অনুমোদনের জন্য রমণীকে মাসী-মা ঠাকুরাণীর শয়ন-গৃহের পাশের ঘরে বসাইয়া রাখা হইল। সে নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া আমিও তাহার নিকট থাকিলাম। বুঝিতে পারিলাম, বিনোদবাবু তাহাকে নিযুক্ত করায় অমত করিবেন না, এরূপ কোন সন্দেহ তাহার মনে নাই। সে স্বচ্ছন্দভাবে ও নিশ্চিন্তমনে জানালায় মুখ বাড়াইয়া হাওয়া খাইতে লাগিল। এ ব্যবহারে অন্য লোকে হয় ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু আমি ইহা তাহার অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেছি। ডাক্তার উপরে না আসিয়া আমাকে নীচে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি আসিলে, তিনি আমাকে বলিলেন,—“এই নূতন লোকের কথা বলিবার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি।”

“আপনি কি বলিতে চান?”

“ঐ যে মোটা বাঙ্গালটা সর্ব্বদা আমার কাজের ব্যাঘাত করিতে আইসে, উহারই স্ত্রী কলিকাতা হইতে এ লোকটাকে আনিয়াছে। নিস্তারিণী ঠাকুরাণী ও মোটা বুড়াটা একটা হাতুড়ে।”

এরূপ করিয়া কথা বলা নিতান্তই অসভ্যতা। আমি বলিলাম,—“আপনার মনে করা উচিত যে, উনি এক জন খুব বড়লোক।”

“আরে রেখে দেও তোমার বড়লোক, আমি অমন ঢের দেখিয়াছি। সে যাহাই হউক, ঐ মেয়েমানুষটার কথা স্থির করা যাউক। আমি তো তাহার কথায় আপত্তি করিতেছিলাম।”

“তাঁহাকে না দেখিয়াই?”

“হাঁ। সে যখন আমার আনীত লোক নয়, তখন আর দেখিব কি? এ কাজের জন্য আজিকালি অনেক লোক পাওয়া যায় এবং আমিও অনেককে জানি। যখন জীবন-মরণের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে এবং যখন এই স্ত্রীলোকের হাতেই ঔষধ খওয়ান, রোগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা, আমার অনুপস্থিতিকালের সময় ঘটনা বর্ণনা করা প্রভৃতি সমস্ত কাজের জন্য আমাকে নির্ভর করিতে হইবে, তখন এ লোক আমার দ্বারা আনীত ও অনুমোদিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ আপত্তি আমি রাজাকে জানাইয়াছি। রাজা বলেন, তাঁহার স্ত্রীর পিসী কষ্ট করিয়া কলিকাতা হইতে লোককে আনিয়াছেন, তাহাকে একবার কাজে না লাগাইয়াই বিদায় করিয়া দিলে, তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইতে পারে। এ কথাটা কতকটা সঙ্গত বটে এবং ইহার উপর কোন প্রতিবাদ চলে না। কিন্তু আমি স্বীকার করাইয়া লইয়াছি, যদি তাহার কোন অসন্তোষজনক কার্য্য দেখি, তাহা হইলে তাহাকে তখনই তাড়াইয়া দিতে হইবে। রাজা তাহাতে রাজী হইয়াছেন। আমি আপনার উপর খুব নির্ভর করি। এই নূতন লোকের কাজকর্ম্মের উপর আপনার প্রথম দুই এক দিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে, সে রোগীকে আমার ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ না খাওয়ায়। আপনার এই বাঙ্গাল বড়লোক রোগীকে তাহার হাতুড়ে

ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ছট্-ফট্ করিতেছে; তাহার স্ত্রীর আনীত লোক কতকটা উহাদেরই পক্ষে হওয়া সম্ভব; বুঝিয়াছেন? চলুন, এখন উপরে যাওয়া যাউক। রমণী সেখানে আছে কি? তাহাকে দুই একটা কথা বলিতে চাহি।"

আমরা উপরে আসিয়া দেখিলাম, রমণী তখনও জানালায় দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতেছে। আমি ডাক্তারের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলে, ডাক্তারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এবং তাঁহার কঠোর প্রশ্ন তাহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিল না। সে ধীরভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল এবং ডাক্তারের নানা বিরুদ্ধচেষ্টা সত্ত্বেও সে আপন কার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিতে লাগিল। ইহা নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়বল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমরা তিন জনেই রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলাম।

রমণী খুব যত্নের সহিত রোগীকে দেখিল; রাণী-মাতাকে প্রণাম করিল; দুই একটা সামগ্রী গুছাইয়া রাখিল। তাহার পর যতক্ষণ কোন দরকার না পড়ে, ততক্ষণের জন্য ঘরের এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। এই নূতন লোকের আগমনে রাণী ঠাকুরাণী কিছু ত্যক্ত ও বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। পাছে মনোরমা দেবীর ঘুম ভাঙ্গে, এই ভয়ে কেহ কোন কথা কহিলেন না। কেবল ডাক্তার ফুস্-ফুস্ করিয়া রাত্রির খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে বলিলাম,—"সমানই।" তাহার পর ডাক্তার বাহিরে আসিলেন, রাণী-মাও বোধ করি, রমণীর কথা বলিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। বাঙ্গাল হউক আর যাহাই হউক, আমি স্থির করিলাম, রমণী বেশ কাজের লোক এবং সে যে কর্ম্মে আসিয়াছে, সে কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ডাক্তারবাবুর উপদেশ অনুসারে আমি প্রথম তিন চারি দিন অতিশয় সতর্কতার সহিত রমণীর কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন সময়েই তাহার কোন সন্দেহজনক কার্য্য দেখিতে পাইলাম না। রাণী-মাও বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার কাজকর্ম্ম দেখিতেন; তিনিও কোন বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিতে পাইলেন না। সে চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একটি কথাও কহিত না; ডাক্তারবাবুর দেওয়া ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ সে কখনই খাওয়াইত না এবং রোগীর শুশ্রূষার জন্য যথাবিহিত যত্ন করিত। যে ভাল, তাহাকে ভাল না বলিলে ধর্ম্মে ভার সহিবে কেন?

রমণী আসার বোধ হয় চারিদিন পরে কোন বিশেষ কাজের জন্য চৌধুরী মহাশয়কে কলিকাতা যাইতে হইল। গমনকালে তিনি রাণী-মাতাকে আমার সমক্ষে বিশেষ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আরও দুই চারি দিন বিনোদবাবুকে বিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ উপকার না দেখা যায়, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে হইবে। এ গাধা ডাক্তারকে তখন চটাইলে ক্ষতি নাই, মনোরমা দেবীর জীবন বড়, না ডাক্তারের রাগ বড়? আমি আপনাকে নিতান্ত উদ্বেগের সহিত হৃদয়ের হৃদয় হইতে এই সকল কথা বলিয়া রাখিতেছি।"

রাণী-মাতা সভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের এত আত্মীয়তাপূর্ণ আন্তরিক উদ্বেগোক্তির একটা উত্তরও দিলেন না। বোধ করি, ভগ্নীর পীড়ার চিন্তায় তাঁহার মনের ভাবান্তর হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলে রাণী-মা আমাকে বলিলেন,—"বল দেখি নিস্তারিণি, এখন করি কি? আমার এমন কেহ আত্মীয় নাই যে, এ বিপদে একটা উপদেশ দেয়। তোমার কি বোধ হয়, বিনোদবাবুর চিকিৎসা ভাল হইতেছে না? তিনি নিজে আমাকে আজি প্রাতে বলিয়াছেন, ভয়ের কোন কারণ নাই এবং অন্য ডাক্তার আনিবার কোন দরকার নাই।"

আমি বলিলাম,—"মা! আমাদের ডাক্তারবাবু যতই কেন ভাল হউন না, আমি কিন্তু এ অবস্থায় চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশই ভাল মনে করি।"

রাণী-মাতা সহসা আমার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইলেন এবং কেন বলিতে পারি না, নিতান্ত হতাশভাবে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"তাঁহার উপদেশ! ভগবান্, রক্ষা কর—তাঁহার উপদেশ!"

আমার যেন মনে হইতেছে, চৌধুরী মহাশয় এক সপ্তাহকাল ফিরিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু রাজার নানাপ্রকার ভাবান্তর দেখা যাইতে লাগিল। বাটীতে রোগ-শোকের জ্বালায় তিনি কিছু অভিভূত হইয়াছেন বলিয়াও আমার বোধ হইল। সময়ে সময়ে তাঁহার ভাব নিতান্ত চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তিনি একবার বাটীতে আসিতেছেন, একবার বাহিরে যাইতেছেন, কখন বা আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রাণী-মাতার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছিল; রাজা সে জন্য আন্তরিক দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন বোধ হয়। তিনি

সততই বিশেষ আগ্রহের সহিত মাসী-মা ও রাণী-মার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। আমার বোধ হয়, তাঁহার কর্কশ ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং এখন তাঁহার মন অনেক কোমল হইয়াছে। কিন্তু চাকর-বাকরের মুখে শুনা যায় যে, তিনি ইদানীং কিছু বেশী মাত্রায় মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইলেও চাকর-বাকরের কখন এরূপ বলা উচিত নহে এবং আমাদের সে সকল কথা ধর্ত্তব্যই নহে।

কয়েক দিনের মধ্যে মাসী-মার অবস্থা বেশ ভাল হইতে লাগিল বোধ হইল। বিনোদবাবুর উপর আমাদের শ্রদ্ধা খুব বাড়িয়া উঠিল। তিনিও মনে খুব ভরসা পাইলেন, রাণী-মাকেও তিনি বলিলেন যে, এ রোগের সম্বন্ধে তাঁহার কোন ভয় ছিল না, এখন তো নাই-ই। যদি এখনও কোন প্রকার আশঙ্কা মনে উদয় হয়, তাহা হইলে তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যদিও এখন রমণীর জন্য কাহাকেও রোগীর আর কোন ভারই লইতে হয় না, তথাপি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী প্রায় সারাদিনই মাসী-মার কাছে থাকিতেন। তিনিই কেবল ডাক্তারের আশ্বাস-বাক্যে এবং রোগীর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি আমাকে এক দিন গোপনে বলিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়া মত প্রকাশ না করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার মনে কোন ভরসা হইতেছে না। আর তিন দিনের মধ্যে চৌধুরী মহাশয় ফিরিয়া আসিবেন লিখিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদিন নিয়মিতরূপে চিঠি লেখালেখি চলে। চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী বিবাহিত জীবনের আদর্শস্থানীয়।

তৃতীয় দিনের রাত্রিতে আমি মাসী-মার অবস্থার মন্দ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই ভয় পাইলাম, রমণীও সে পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। রাণী-মা তখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া বসিবার ঘরে একখানি সোফায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে কোন কথা জানাইলাম না। বিনোদবাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগী দেখিতে আসিলেন। রোগীকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখের ভাবান্তর হইল। তিনি সে ভাব লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত বলিয়া বোধ হইল। তখনই তিনি লোক পাঠাইয়া বাটী হইতে ঔষধ আনাইলেন এবং তাঁহার আদেশক্রমে রাজবাটীতে তাঁহার শয়নের স্থান হইল। আমি তাঁহাকে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসিলাম,—"পীড়া কি নিতান্ত শক্ত হইয়াছে?" তিনি বলিলেন,—"আমার তো সেই ভয়ই হইতেছে। বোধ হয় যেন, রোগটা ছোঁয়াচে; কালি প্রাতে ঠিক বুঝিতে পারিব।"

বিনোদবাবুর উপদেশক্রমে সে রাত্রে রাণী-মাতাকে এ সকল সংবাদ কিছুই জানান হইল না। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার তাঁহাকে সে রাত্রে পীড়িতার ঘরে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে রাণী-মা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ডাক্তারের কথা অবহেলা করিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাকে ডাক্তারের কথাই শুনিতে হইল।

পরদিন প্রাতে বিনোদবাবুর পত্র লইয়া এক জন সরকার কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে গেল। যত শীঘ্র সম্ভব, সে ডাক্তার লইয়া ফিরিবার ভার লইল। সে লোক চলিয়া যাওয়ার আধঘণ্টা পরে চৌধুরী মহাশয় এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন চৌধুরাণী তাঁহাকে মাসী-মার নিকটে লইয়া আসিলেন। মাসী-মা তখন আর মানুষ চিনিতে পারেন না। বোধ হইল, যেন পরমাত্মীয়কেও তিনি পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। কারণ, চৌধুরী মহাশয় তাঁহার শয্যার নিকটে আসিলে মাসী-মার অস্থির ঘূর্ণায়মান নেত্র ক্রমে চৌধুরী মহাশয়ের মুখ স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল; তখন সেই চক্ষুর এরূপ ভাব হইল যে, আমি জন্মে কখন তাহা ভুলিতে পারি না। চৌধুরী মহাশয় মাসী-মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, এবং অতি মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন। তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া, যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও ক্রোধ-সূচক দৃষ্টির সহিত ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বিনোদবাবুও ভয়ে ও রাগে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চৌধুরী মহাশয় তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন্ হইতে এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে?"

আমি যাহা জানিতাম, বলিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ হওয়ার পর হইতে রাণী-মা এ ঘরে আসিয়াছিলেন?" আমি বলিলাম যে, "তিনি আসেন নাই; ডাক্তার তাঁহাকে জোর করিয়া আসিতে বারণ করিয়াছেন।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"সর্ব্বনাশ

কতদূরে গড়াইয়াছে, তাহা তুমি আর রমণী জানিতে পারিয়াছ কি?" আমি বলিলাম যে, আমরা কেবল বুঝিয়াছি, রোগটা যেন ছোঁয়াচে।

তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"ইহাকে ডাক্তারীমতে টাইফয়েড জ্বর বলে; বাঙ্গালা মতে ইহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক বিকার বলিলেও বলা যায়। এ জ্বর এ দেশে খুব কম হয়, তাই লোকে ইহার কথা বড় জানে না; কিন্তু রমণী বোধ হয়, ইহার কথা জানে। ইহা অতি ভয়ানক রোগ এবং বড় সংক্রামক।"

এতক্ষণে বিনোদবাবু প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন.—"না, ইহা টাইফয়েড জ্বর নহে। এখানে আর কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই; আমিও কাহারও কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমার সাধ্যমত কর্ত্তব্যপালনে আমি ত্রুটি করি নাই।"

চৌধুরী মহাশয় অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রোগীর শয্যা দেখাইয়া তাঁহার কথায় বাধা দিলেন। ডাক্তার-বাবু ইহাতে অধিকতর রাগত হইয়া বলিলেন,—"আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। ডাক্তার ব্যতীত আর কাহারও সহিত রোগের বিচার করিতে সম্মত নহি, আপনি রোগীর ঘর হইতে চলিয়া যাউন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমি যাদশাপন্ন জীবের সাহায্যার্থ এখানে আসিয়াছি এবং যদি কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে সেই কারণে আবার এখানে আসিব। আমি আপনাকে আবার বলিতেছি, জ্বর টাইফয়েডের আকার ধারণ করিয়াছে এবং আপনার কদর্য্য চিকিৎসাপ্রণালীই এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। যদি এই মহিলার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে বিচারালয়ে আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিব যে, আপনার মূর্খতা ও একগুঁয়েমী ইহার মৃত্যুর কারণ।"

চৌধুরী মহাশয়ের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র পার্শ্বের বসিবার ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল এবং রাণী-মাতা সে স্থান হইতে অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আমি কাহারও কথা শুনিব না,—আমি ঘরের ভিতর যাইবই যাইব।"

চৌধুরী মহাশয় সকল সময়েই অতিশয় সাবধান এবং কোন বিষয়েই কখন তাঁহার কোন ভুল হয় না। কিন্তু আজি কেমন তাড়াতাড়ি তিনি এমন সংক্রামক রোগের নিকটে রাণী-মাতাকে আসিতে বারণ করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং পাশের ঘরে গিয়া, তাঁহার আগমন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। এ ক্ষেত্রে বিনোদবাবুর অধিকতর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। রাণী-মাতা ঘরের মধ্যে পা বাড়াইতেই তিনি গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"আপনাকে বড়ই কষ্টের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, যতক্ষণ এই জ্বর সংক্রামক হওয়ার আশঙ্কা দূর না হইতেছে, ততক্ষণ আমি আপনাকে বিনয়সহকারে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এ ঘরে আসিবেন না।"

রাণী-মাতার বাহুদ্বয় ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ডাক্তারের হাতের উপর পড়িয়া গেলেন। আমি ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিলাম এবং ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজঘরে লইয়া গেলাম। চৌধুরী মহাশয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাণী-মার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন; তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে, এই সংবাদ দিলে চলিয়া আসিলেন।

আমি ডাক্তারের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে, রাণী-মা এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় ও রাজা সময়ে সময়ে রোগীর খবর লইতে লাগিলেন। মহোদ্বেগে ধীরে ধীরে সময় কাটিতে লাগিল। অবশেষে বেলা ৫টা কি ৬টার সময় কলিকাতার ডাক্তার আসিয়া পৌছিলেন। আমাদের বিনোদবাবুর চেয়ে এ ডাক্তারের বয়স কম। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে খুব গম্ভীর ও স্থিরবুদ্ধির লোক বলিয়া বোধ হইল। পূর্ব্ব-চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার কি মত দাঁড়াইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, তিনি বিনোদবাবুর চেয়ে আমাকেই আর রমণীকেই বেশী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং বিনোদবাবুর কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন, এমনও বোধ হইল না। এই সকল দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে, পীড়া সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। তাহার পর যখন বিনোদবাবু আসল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমরা তাঁহার ভুল বেশ জানিতে পারিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জ্বরটা কি রকম দেখিতেছেন?"

কলিকাতার ডাক্তার বলিলেন,—"টাইফয়েড জ্বর, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

কলিকাতার ডাক্তারবাবু এই কথা বলার পর রমণী যেরূপ আনন্দসূচক ঈষৎ হাস্যের সহিত আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, আমার বোধ হয়, স্বয়ং চৌধুরী মহাশয় এখানে উপস্থিত থাকিলে সেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। চৌধুরী মহাশয়ের জয়ে তাহার এত আনন্দ কেন?

ডাক্তার আমাদিগকে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া এবং আর পাঁচ দিন পরে আবার আসিবেন স্থির করিয়া, বিনোদবাবুকে ডাকিয়া লইয়া গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি মাসী-মার আরোগ্য হওয়া আর না হওয়া সম্বন্ধে কোন অভি-প্রায় প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন যে,—"এরূপ রোগের এ অবস্থায় কিছুই বলা সম্ভব নহে।"

নিতান্ত উদ্বেগের সহিত পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। মাসী-মার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। রাণী-মাতার শরীরের অবস্থা কিন্তু ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ দুই তিনবার করিয়া রোগীর গৃহে শয্যা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া মাসী-মাকে দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত ডাক্তারবাবুর নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমার বোধ হয়, ডাক্তার দেখিলেন, তাঁহাকে বুঝাইয়া কোন ফল হইবে না; তখন তিনি অনিচ্ছা সহকারে তাঁহাকে সে অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। সুখের বিষয়, এ কয় দিনের মধ্যে ডাক্তারের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের আর কোন বচসা হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই রাজার সঙ্গে নীচে থাকিতেন; রোগীর যখন যে সংবাদ লইতেন, তাহা লোক দ্বারা লইতেন।

পঞ্চম দিনে কলিকাতার ডাক্তার আবার আসিলেন এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভরসা দিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, এ ব্যাধির প্রথম দশ দিন কাটিয়া গেলে ঠিক বুঝা যায় যে, রোগীর কিরূপ গতি দাঁড়াইবে। অতএব সেই দশ দিবসে তিনি তৃতীয়বার রোগীকে আবার দেখিয়া যাহা বলিবার হয়, বলিবেন। এই পাঁচ দিনের মধ্যে চৌধুরী মহাশয় এক দিন কলিকাতায় গিয়া সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসিলেন।

দশম দিবসে আমরা সকল ভাবনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কলিকাতার ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, মাসী-মা সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হইয়াছেন। আর তাঁহার আসিবার দরকার নাই; যেমন যুঃ অবিরত চলিতেছে, এখন এইরূপ চলিলেই আর কিছুই করিতে হইবে না। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া রাণী-মাতা নিতান্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, এ আনন্দ সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং তাঁহার দেহ ও মন এতই অবসন্ন হইল যে, তিনি দুই এক দিব-সের মধ্যে আপনার শয্যা হইতে উঠিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জন্য বিনোদবাবু আপা-ততঃ বিশ্রাম ও পরে স্থানপরিবর্ত্তন ব্যবস্থা করি-লেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার অবস্থা আরও যে মন্দ হইল না, তাই রক্ষা, নতুবা আমাদিগকে হয় ত বড় বিব্রত হইতে হইত। কারণ, সেই দিন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ডাক্তারবাবুর ভয়ানক বচসা হইল এবং ডাক্তারবাবু রাজবাটীতে যাতায়াত ছাড়িয়া দিলেন।

আমি ঝগড়ার সময়টায় উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু জানিতে পারিলাম, এই জ্বরের পর মাসী-মাকে কি পরিমাণ আহার দেওয়া আবশ্যক, তাহাই উপলক্ষ করিয়া ঝগড়ার উৎপত্তি হয়। বিনোদবাবু পূর্ব্ব হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের কথা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এখন তো তাঁহার কথা আরও বিরক্তিকর মনে করিবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? চৌধুরী মহাশয় সে দিন তাঁহার চিরাভ্যস্ত আত্মসংযম-ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া, ডাক্তার-বাবুর রোগের অবস্থা বুঝিতে যে ভুল হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবু এ সকল ব্যবহার রাজার গোচর করিয়া বলিলেন যে, এরূপ অত্যা-চার হইলে তাঁহাকে অগত্যা রাজবাটীতে আসা বন্ধ করিতে হইবে। রাজা যে উত্তর দিলেন, তাহা নিতান্ত মন্দ না হইলেও এ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর বিরক্তি উৎপাদন করিল। তিনি সেই দিনই রাগ করিয়া রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন এবং পরদিনই আপনার প্রাপ্য টাকার জন্য বিল পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর আমাদিগকে কাজেই ডাক্তারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তা হউক, ডাক্তারের কিছু এখন আর দরকার নাই; কেবল সুপথ্য খাওয়া আর নিয়মে থাকাই দরকার। তবে আরও দিনকতক এ ডাক্তার না হউক, অন্য কোন ডাক্তার যাওয়া আসা করিলে ভাল দেখাইত। রাজা ভাবিলেন, অনর্থক অন্য ডাক্তার আসিয়া

কি লাভ? যদিই মাসী-মার পীড়া দৈবাৎ আবার বাড়িয়া উঠে, তখন এক জন ডাক্তার ডাকিলেই চলিবে। আপাততঃ সামান্য দরকারে চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শই যথেষ্ট। কথা সকলই সত্য বটে; কিন্তু তথাপি আমি মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন থাকিলাম। রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শে রাণী-মার নিকট হইতে আমরা ডাক্তারের চলিয়া যাওয়ার কথা লুকাইয়া রাখিলাম। যদিও তাঁহার শরীরের অবস্থা বিবেচনায় ভাল ভাবিয়াই আমরা এ প্রতারণা করিতে লাগিলাম সত্য, তথাপি এ কার্য্যটা নিতান্ত অবৈধ ও অসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হইল।

সেই দিনের আর একটি ঘটনা আমার চিত্তের অশান্তি অত্যন্ত বাড়াইয়া দিল। রাজা আমাকে কেতাবঘর হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সেখানে চৌধুরী মহাশয়ও ছিলেন। কিন্তু আমি তথায় যাইবামাত্র তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা আমাকে বলিলেন,—"নিস্তারিণি! একটু বিশেষ কাজের কথা বলিবার জন্য তোমাকে ডাকাইয়াছি। কথাটি অনেক দিন হইতে বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বাটীতে সম্প্রতি নানা প্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তাহা বলিতে পারি নাই। নানা কারণে, তোমাকে ছাড়া অন্যান্য সকল চাকর-বাকরকে জবাব দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিয়া দেখ, মনোরমা দেবী যেই একটু ভাল হইয়া উঠিবেন, সেই তিনি ও তাঁহার ভগ্নী পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন; তাহা না করিলে তাঁহাদের শরীর থাকিবে না। চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী কলিকাতায় বাসা ঠিক করিয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্রই সেই বাসায় চলিয়া যাইতেছেন। কেবল আমার জন্য এত লোক থাকার কোনই দরকার দেখিতেছি না। বিশেষতঃ, আমিও যে এখানেই বসিয়া থাকিব, তাহারই বা স্থিরতা কি? অতএব এ সকল লোককে আর অনর্থক একটি দিনও রাখিবার আবশ্যক নাই। আমি কোন কাজ হবে, হচ্চে শুনিতে ভালবাসি না। তুমি ইহাদের হিসাব-নিকাশ করিয়া সকলকে যত শীঘ্র পার, বিদায় করিয়া দেও।"

আমি অবাক্ হইয়া রাজার কথা শুনিলাম। তাঁহার কথা শেষ হইলে বলিলাম,—"সকলকেই কি জবাব দিতে হইবে? আপনি যদিই একা থাকেন, তাহা হইলেও আর কিছু হউক না হউক, একটা রাঁধুনী তো আপনার জন্য রাখিতে হইবে।"

তিনি বলিলেন,—"কিছু না, আমার কাজ আমি এক রকমে চালাইয়া লইব, সে জন্য কোন ভাবনা নাই। ভাল, যদি নিতান্তই তোমার কাহাকে রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রামীকে রাখিয়া দেও। তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারিবে।"

আমি বলিলাম,—"বলেন কি? আপনি যাহার কথা বলিতেছেন, সমস্ত চাকর-চাকরাণীর মধ্যে সে নির্ব্বোধের একশেষ। তাহার দ্বারা কি কাজ পাওয়া যাইবে?"

"তাহাকেই রাখিয়া দেও, আর না হয়, গ্রামের ভিতর হইতে একটা ঠিকা-ঝি আনিয়াই লও। সে আবশ্যকমত কাজ-কর্ম্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে; এখানে তাহার দিনরাত্রি থাকিবার দরকার নাই। তোমাকে যেমন বলিতেছি, তুমি তাহাই কর। তোমাকে কোন কথা বলিলে তুমি বড় তর্ক করিয়া থাক। আমার ইচ্ছায় কাজ হইবে, না তোমার ইচ্ছায় কাজ হইবে? কতকগুলা নিষ্কর্ম্মা লোক লইয়া, ভাঁড়ার-ঘরের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিবার সুযোগ যাইতেছে দেখিয়া তোমার এ ব্যবস্থা ভাল লাগিতেছে না বুঝি? যাও, যাহা বলিলাম, তাহা এখনই শেষ করিয়া ফেল।"

আমি "যে আজ্ঞা" বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। এ কথার পর আর কোন কথা বলা চলে কি? মাসী-মা ঠাকুরাণীর কঠিন পীড়া, রাণী-মা ঠাকুরাণীরও শরীর ভাল নয়; এ সময়ে আমি যদি যাই, তাহা হইলে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইবে। কাজেই আমাকে চুপ করিয়া রাজার এই তিরস্কার সহিয়া থাকিতে হইল; নচেৎ আমিও তখনই কাজে জবাব দিয়া চলিয়া যাইতাম। সেই দিনেই আমি ঝি-চাকর প্রভৃতি সকলকে জবাব দিয়া বাড়ী ফাঁক করিয়া ফেলিলাম। রাজা নিজে কোচম্যান ও সহিসের দলকে জবাব দিলেন এবং একটি বাদে আর সকল ঘোড়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কেবল আমি, রাণী আর এক জন মাত্র মালী থাকিলাম। মালী বাগানের মধ্যে তাহার ঘরে থাকিত। যে একটা ঘোড়া থাকিল, সেই মালীই তাহার তদারক করিবে, ব্যবস্থা হইল। এই বৃহৎ পুরী একেবারে লোকহীন হইয়া গেল; রাণী মাতা পীড়িত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিলেন, মাসী-মাতার এই কাতর-অবস্থা; ডাক্তার রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মন নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল। আমি

তখন কামনা করিতে লাগিলাম, তাঁহারা শীঘ্র সারিয়া উঠুন, তাহার পর আমার যেন এখানে থাকিতে না হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

রাজবাটীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এখানে থাকিতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা জন্মিয়াছিল; শীঘ্র এখান হইতে দুই চারি দিনের নিমিত্ত স্থানান্তর যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। দাসদাসীদিগকে জবাব দেওয়ার দুই এক দিন পরে রাজা আবার আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখিলাম, এবারও আগেকার মত রাজা ও চৌধুরী মহাশয় দুই জনে এক জায়গায় বসিয়া আছেন। কিন্তু সেবার আমি যাওয়ার পর চৌধুরী মহাশয় ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এবার সেরূপ না করিয়া তিনি সেখানেই বসিয়া থাকিলেন এবং রাজা আমাকে যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তিনিও তাহাকে যোগ দিয়া রাজার কথাবার্ত্তার সাহায্য করিতে লাগিলেন।

যে বিষয়ের জন্য রাজা আমাকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। মাসী-মা ও রাণী-মা আপাততঃ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে যাইবেন, স্থির হইয়াছে। আমি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব এবং আবশ্যকমত অন্যান্য ঝি ও লোকজন সঙ্গে থাকিবে। অন্যান্য লোকজন যখন ইচ্ছা তখনই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিদেশে অন্ততঃ একজনও খুব পাকা ও জানা-শুনা ঝি সঙ্গে না থাকিলে রাণী-মার ও মাসী-মার কষ্ট হওয়াই সম্ভব। সেরূপ এক জন সহজে পাওয়া ভার, অথচ এক জন চাই-ই চাই। গিরিবালা রাণী-মার ও মাসী-মার বেশ জানা লোক এবং তাহার কাজকর্ম্মে তাঁহারা খুব তুষ্ট। অতএব তাহাকে যাহাতে সঙ্গে লইতে পারা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। রাগের মাথায় রাজা তাহাকে জবাব দিয়া ভাল করেন নাই। শীঘ্রই এরূপ দরকার উপস্থিত হইবে জানিলে তিনি কখনই এমন কাজ করিতেন না। রাজা বলেন, এখন সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতার যেখানে সে আছে, রাজা আমাকে তাহা লিখিয়া দিলেন। সে যেখানেই কেন থাকুক না, রাণী-মা ও মাসী-মার সে যেরূপ অনুগত, তাহাতে তাঁহাদের নাম শুনিলে, সে তখনই ছুটিয়া আসিবে। তাহাকে আনিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে এই সকল কথা রাজা ও চৌধুরী মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। চৌধুরী মহাশয়ই বেশীর ভাগ কথা কহিলেন। এ প্রস্তাবে দোষ কিছুই দেখিলাম না; বরং সকলই ভাল বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে ডাকিয়া আনিতে রাজা তো আর যাইতে বা তাহাকে পত্র লিখিতে পারেন নাই; ইহা আমার পক্ষেই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি হইতে কোন ওজর করিলাম না। কিন্তু তাহাকে কলিকাতাতেই পাওয়া যাইবে কি না, সে সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ থাকিল। গিরিবালাকে কলিকাতায় না পাইলে আমাকে বাটী ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা হইল। আমার যেন বোধ হয়, সে শক্তিপুরে আছে; কিন্তু তাঁহারা জানেন, সে কলিকাতায় আসিয়াছে।

পরদিন প্রাতে আমি কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। যাইবার পূর্ব্বে আমি মাসী-মা ও রাণী মার সংবাদ লইলাম। রমনী বলিল যে, মাসী-মা ঠাকুরাণী ক্রমেই ভাল হইতেছেন; আমরাও তাঁহাকে দেখিয়া ভালই বোধ হইল। রাণী-মার সহিত আমার দেখা হইল না। তিনি তখন নিদ্রিত ছিলেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, রাণী-মা এখনও অত্যন্ত কাতর ও দুর্ব্বল।

এই সকল পরিবর্ত্তন, এই জনহীনতা, এই সকল অদ্ভুত ব্যবস্থা, সকলে নিশ্চয়ই সন্দেহজনক বলিয়া মনে করিবেন। আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু কি করিব? আমি অধীন, আজ্ঞাপালন ভিন্ন আমার পক্ষে আর কি সম্ভব?

আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই হইল—কলিকাতার সে ঠিকানায় গিরিবালা নাই। আমি দিন দুই পরে রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট সকল কথা নিবেদন করিলাম। রাজা তখন অন্য চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তিনি আমার কথায় কোন মনোযোগই দিলেন না। অনেক পরে বলিলেন, "আমার সামান্য অনুপস্থিতিকালের মধ্যে এখানে আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে; চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের কলিকাতার নূতন বাসায় গিয়াছেন।" কেন তাঁহারা হঠাৎ চলিয়া গেলেন, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসিলাম যে, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী চলিয়া গিয়াছেন, তবে এখন রাণী-মার কাছে আছে কে? রাজা বলিলেন যে, এখন তাঁহার নিকট রামী আছে।

গ্রামের মধ্য হইতে সংসারের কাজ করিবার জন্য একটা ঝি আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। রামীর মত নির্ব্বোধ ইতর মেয়েমানুষ কি না এখন রাণী-মার কথার দোসর! ছিঃ! আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, সিঁড়ির কাছেই রামী দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে মাসী-মা ঠাকুরাণীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাকে মুখ ভেঙ্গচাইতে ভেঙ্গচাইতে কদর্য্য ভাষায় যে উত্তর দিল, তাহার এক বর্ণও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, বিরক্তির সহিত চলিয়া গেলাম এবং রাণী-মার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, রাণী-মা যদিও এখনও অতিশয় দুর্ব্বল ও কাতর আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর এ কয়দিনে পুর্ব্বের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে বোধ হইল। সে দিন প্রাতঃকাল হইতে কাহারও নিকট মাসী-মার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এ কাজটা রমণীর পক্ষে বড়ই অন্যায় হইয়াছে। আমি আসিলে রাণী-মা আমাকে সঙ্গে লইয়া মাসী-মার ঘরে চলিলেন। যে বারান্দা দিয়া মাসী-মার ঘরে যাইতে হইবে, আমরা তাহার খানিকটা দূরে যাওয়ার পর, রাজাকে দেখিয়া আমাদের দাঁড়াইতে হইল। রাজা যেন সেখানে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি রাণী-মাতাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাইতেছ?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"দিদির ঘরে।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার আশা-ভঙ্গ হেতু কষ্টনিবারণের জন্য তোমাকে এখনই বলিয়া দেওয়া ভাল যে, তুমি তাঁহার ঘরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।"

"দেখিতে পাইব না?"

"না। গত কল্য প্রাতে জগদীশ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"

রাণী-মাতা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। এই বিস্ময়জনক কঠোর সংবাদ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মুখের বর্ণ যেন শাদা হইয়া গেল এবং তিনি নীরবে স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া দেয়াল হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আমিও এমনই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম যে, কি বলিব, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সত্যই কি মাসী-মা রাজবাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন? এ কথা আমি রাজাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রাজা বলিলেন,—"সত্যই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি আবার বলিলাম,—"তাঁহার এই অবস্থায়, রাণী-মাকে কোন কথাই না বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন?"

রাণী-মা একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন বোধ হয়। রাজা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি দেয়ালের নিকট হইতে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সজোরে এবং ভীতভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"অসম্ভব কথা! ডাক্তার কোথায় ছিলেন? যখন দিদি চলিয়া যান, তখন বিনোদবাবু কোথায় ছিলেন?"

রাজা বলিলেন,—"ডাক্তারের আর এখানে কোন দরকার ছিল না। তিনি আপন ইচ্ছায় যাওয়া আসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, মনোরমা দেবীর শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ কেন? যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে স্বচক্ষে দেখ না কেন? তাঁহার ঘরের দরজা খুলিয়া দেখ, ইচ্ছা হয়, বাটীর সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখ না কেন?"

রাণী-মাতা তাহাই দেখিতে চলিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মাসী-মার ঘরে রামী ছাড়া আর সত্যই কেহ নাই। রামী সে ঘরের সামগ্রীপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, পরে এ পাশের ও পাশের আরও দুই একটা ঘর দেখা গেল, কোথাও কেহ নাই। রাজা তখনও আমাদের প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রাণী-মাতা আমার কর্ণে কর্ণে বলিলেন,—"আমার কাছছাড়া হইও না নিস্তারিণি, তোমার সাত দোহাই, তুমি আমার কাছছাড়া হইও না।"

আমি তাঁহাকে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি বাহিরে আসিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—"বল রাজা, বল, ইহার অর্থ কি? আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমার পায়ে পড়িতেছি, বল, কি হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন,—"কি আর হইবে? মনোরমা দেবী দেখিলেন, তাঁহার শরীরে অনেকটা বল হইয়াছে; জগদীশ ও তাঁহার স্ত্রী কলিকাতায় যাইতেছে শুনিয়া তিনিও কলিকাতায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।"

"কলিকাতায়!"

"হাঁ, আনন্দধামে যাইতে হইলে কলিকাতা দিয়া যাওয়া সুবিধা নয় কি?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রাণী-মা আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বল নিস্তারিণি, দিদির এতটা পথ-শ্রম সহিবার মত শরীরের অবস্থা দেখিয়াছ কি না, বল।"

"না মা, আমি তো তাঁর তেমন অবস্থা হইয়াছে, মনে করি না।"

রাজাও সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞা-সিলেন,—"তুমি কলিকাতায় যাইবার আগে রমণীর কাছে বলিয়াছিলে কি না যে, মনোরমা দেবীর শরীরে বেশ বল হইয়াছে এবং তিনি ভাল আছেন বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি এ কথা বলিয়াছিলাম বটে।"

আমার উত্তর শেষ হইবামাত্র তিনি রাণী-মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এখন নিস্তারিণীর দুই রকম মত মিলাইয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিচার কর। আমরা কি এতই পাগল যে, যদি তাঁহার অবস্থা ভাল না বুঝিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে যাইতে দিতাম? তাঁহার সঙ্গে জগদীশ আছেন, তোমার পিসী-মা আছেন, আর রমণী আছে। তিন জন উপযুক্ত লোক সঙ্গে থাকিতে ভাবনার কারণ কি হইতে পারে? কালি তাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, আজি তিনি জগদীশ ও রমণীকে সঙ্গে লইয়া আনন্দধামে—"

রাণী-মা রাজার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমাকে এখানে একা ফেলিয়া দিদি কেন আনন্দ-ধামে চলিয়া গেলেন?"

"কারণ, তোমার খুড়া-মহাশয় অগ্রে মনোরমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার সে পত্র তোমাকে দেখান হইয়াছিল। সে কথা তোমার মনে থাকা উচিত ছিল।"

"আমার তাহা মনে আছে।"

"তবে মনোরমা দেবী চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া এত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ কেন? আনন্দধামে যাইতে তোমার অত্যন্ত সাধ হইয়াছে; সেই জন্যই তোমার দিদিকে অগ্রে তোমার খুড়ার সহিত সে সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিতে যাইতে হইয়াছে।"

আহা! রাণী-মার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "দিদি আমাকে না বলিয়া কখন কোথায়ও যান না।"

রাজা বলিলেন, "এবারও তিনি তোমাকে না বলিয়া যাইতেন না; কিন্তু তোমারই ভয়ে তাহা পারেন নাই। তিনি বেশ জানেন, তুমি তাঁহাকে যাইতে দিবে না, তুমি তাঁহাকে কাঁদিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। কিন্তু আর আমি বকাবকি করিতে পারি না। আমার শরীর ও মন এরূপ জ্বালাতনে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমি নীচে চলিলাম। যদি তোমার এখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, তাহা হইলে নীচে আসিয়া বল।"

তিনি তখনই চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব আজি বড় কেমন কেমন। তাঁহার মন এত কোমল, এত সহজে তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইয়া পড়েন, এরূপ ভাব আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। আমি রাণী-মাতাকে ঘরের ভিতর গিয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিলাম। তিনি সে কথা না শুনিয়া নিতান্ত ভীতভাবে আমাকে বলিলেন, "নিশ্চয়ই দিদির কিছু হইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"মনে করিয়া দেখুন রাণী-মা, মাসী-মার সাহস কত অধিক। এরূপ অবস্থাতেও পথশ্রম সহিতে উদ্যত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। আমার মনে এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হই-তেছে না।"

সেইরূপ ভীতভাবে রাণী-মা আবার বলিলেন,—"যেখানে দিদি গিয়াছেন, আমিও সেখানে যাইব। আমি স্বচক্ষে দেখিতে চাহি যে, তিনি সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছেন। নিস্তারিণি, আমার সঙ্গে নীচে রাজার কাছে চল।"

তাঁহার সঙ্গে আমার যাওয়াটা হয় ত রাজার বিরক্তিকর হইতে পারে। আমি সে কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তিনি সে কথা মোটেই না শুনিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। রাজা মদ খান জানি, আমরা নীচে রাজার নিকটে আসিয়া গন্ধে বুঝিলাম, রাজা এখনই খুব মদ খাইয়াছেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই রাগতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তোমরা কি মনে করিতেছ, ইহার মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে? সেটা বড় ভুল। ইহার মধ্যে কোন লুকান কাজ নাই!" পার্শ্বে আলবোলায় তামাক সাজা ছিল। তিনি কথা সমাপ্তিমাত্র তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

রাণী-মা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"দিদি যদি পথশ্রম সহিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমিও তাহা পারিব। দিদির জন্য আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, এ জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আমাকে দিদির নিকট যাইবার অনুমতি দেও।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতেই হইবে। যদি তাহার মধ্যে কোন

নিষেধের সংবাদ না আইসে, তাহা হইলে তুমি যাইতে পার। আমি জগদীশকে আজি রাত্রির ডাকে তোমার যাওয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইব।"

তিনি একটি কথাও রাণী-মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন না। কথা শেষ হইলে কেবল তামাক টানিতে লাগিলেন। রাণী-মা নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়কে এ কথা লিখিবে কেন?"

রাজা বলিলেন,—"দুপুরের গাড়ীতে তোমার যাওয়া হইবে, এই সংবাদ দিবার জন্য। তুমি কলিকাতায় পৌছিলে তিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেসন হইতে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইবেন, সেখানে তুমি তোমার পিসীমার নিকটে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন আনন্দধামে যাইবে।"

রাণী-মা এখনও আমার হাত ধরিয়া ছিলেন। কেন জানি না, তাঁহার হাত এখন অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"না না, চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেসনে আসিবার কোনই দরকার নাই। কলিকাতায় রাত্রিতে থাকিবার কোনই আবশ্যকতা নাই তো।"

"কলিকাতায় তোমাকে থাকিতেই হইবে। একদিনে আনন্দধাম পর্য্যন্ত যাওয়া কখনই হইতে পারে না। কাজেই তোমাকে কলিকাতায় একরাত্রি থাকিতে হইবে। তোমার পিসীর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা তোমার কাকাও করিয়াছেন। এই দেখ, তাঁহার পত্র।"

রাণী-মা পত্র হাতে করিয়া লইলেন এবং একবার তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা আমার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি পড়, কি জানি, আমার কি হইয়াছে, আমি উহা পড়িতে পারিতেছি না।"

চারি ছত্রের একখানি চিঠি—নিতান্ত ছোট, নিতান্ত অসাবধানভাবে লেখা। আমার যেন বোধ হয়, তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল.—"জীবিতাধিক লীলা,—যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই আসিও। পথে তোমার পিসীর বাড়ীতে রাত্রিতে থাকিয়া বিশ্রাম করিও। মনোরমার পীড়ার সংবাদে বড় দুঃখিত হইলাম।—আশীর্ব্বাদক শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়।"

আমার চিঠি পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাণী-মা ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"সেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা নাই—কলিকাতায় এক রাত্রি থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি মিনতি করিতেছি, চৌধুরী মহাশয়কে এ জন্য কোন পত্র লিখিও না।"

ভয়ানক রাগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কেন পত্র লিখিব না, তাহা আমি জানিতে চাই। কলিকাতায় তোমার পিসীমার বাড়ীতে থাকাই তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং তোমার কাকারও তাহাই ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা কর দেখি নিস্তারিণীকে!"

বাস্তবিকই রাজার এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সঙ্গত। আমি রাণী-মার দিকে টানিয়া কথা কহি বটে, কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ-সংস্কারের আমি কোনই সমর্থন করিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গাল বলিয়া রাণী-মা যদি তাঁহার উপর এত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহারের নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। রাজা উত্তরোত্তর অধিকতর ক্রোধ ও আগ্রহের সহিত যতবার কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় থাকিবার কথা বলিতে লাগিলেন, ততবারই রাণী-মা তাহাতে অস্বীকার করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে পত্র লিখিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন অসভ্যভাবে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আর কথায় কাজ নাই। কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, তাহা যদি তুমি না বুঝিতে পার, তাহা হইলে অন্যে যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই তোমাকে শুনিতে হইবে। যাহা মনোরমা দেবী তোমার পূর্ব্বে করিয়াছেন, এখন তোমাকে তাহাই করিতে বলা যাইতেছে মাত্র।"

রাণী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"দিদি! দিদি! চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে!"

"হাঁ, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে। তিনি সেখানে কালি রাত্রিতে ছিলেন। তোমার দিদি যাহা করিয়াছেন, তোমার কাকা যাহা বলিতেছেন, তোমাকেও তাহাই করিতে বলা যাইতেছে। আমাকে এমন করিয়া আর জ্বালাতন করিও না।"

এই বলিয়া রাজা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি তখন রাণী-মাকে বলিলাম,—"চলুন মা, আমরা উপরে যাই।" তিনি অন্যমনস্কভাবে আমার সহিত চলিলেন। তিনি স্থিরভাবে বসিলেন, আমি তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত নানা কথা বলিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার মন হইতে মনোরমা দেবীর জন্য ভয় এবং তাঁহার কি জানি কেন, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিতে থাকিতে অকারণ আশঙ্কা কোন ক্রমেই দূর করিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে রাণী-মার এরূপ অমূলক কদর্য্য মত দূর করিতে যত্ন করা আমার কর্ত্তব্য বোধে আমি বিহিত সম্মানের সহিত নিবেদন করিলাম,—

"মা, ফল দেখিয়া কার্য্যের বিচার করা আবশ্যক। মাসী-মার পীড়ার প্রথম দিন হইতে চৌধুরী মহাশয়ের নিরন্তর যত্ন ও উদ্বেগ দেখিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না করা অসম্ভব। বিনোদবাবুর সহিত যে তাঁহার গুরুতর মনোবাদ ঘটিয়াছিল, মাসী-মার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠাই তাহার কারণ।"

বিশেষ আগ্রহের সহিত রাণী-মা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি মনোবাদ?"

এ কথা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপ ন্যায়-বিগর্হিত বোধে আমি সমস্ত কথা সবিশেষ জানাইলাম। আমার কথা শুনিয়া রাণী-মা অধিকতর বিচলিত ও ভীতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—"আরও খারাপ—আরও ভয়ানক কথা! চৌধুরী মহাশয় জানিতেন যে, ডাক্তারবাবু কখনই দিদিকে এ অবস্থায় অন্যত্র যাইতে দিবেন না; সেই জন্যই তিনি কৌশলে তাঁহাকে অপমান করিয়া আগেই সরাইয়া দিয়াছেন।"

আমি একটু প্রতিবাদের ভাবে বলিলাম,—"বলেন কি? এও কি সম্ভব?"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"নিস্তারিণি! যে যাহাই কেন বলুক না, আমার দিদি স্বেচ্ছায় ঐ লোকটার হাতে পড়িয়াছেন বা তাহার বাটীতে আছেন, এ কথা আমি কখনই বিশ্বাস করিব না। আমার কাকা শত সহস্র পত্রই লিখুন এবং রাজা শত সহস্র অনুরোধই করুন, আমি কিছুতেই ঐ ব্যক্তির বাটীতে জলগ্রহণ বা এক মুহূর্ত্ত বাস করিতে সম্মত নহি। তবে দিদির জন্য আমার যে ভয়ানক ভাবনা হইতেছে, তাহাতে আমি সকলই করিতে পারি—চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতেও যাইতে পারি।"

আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম, রাজার কথা-প্রমাণে মাসী-মা তো এখন শক্তিপুর গিয়াছেন। রাণী-মা বলিলেন,—"আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, আমার আশঙ্কা হইতেছে, এখনও দিদি ঐ লোকটার বাড়ীতে আছেন। যদিই আমার আশঙ্কা অমূলক হয়, যদিই দেখি, দিদি সত্যই আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমি চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে তিলার্দ্ধকালও দাঁড়াইব না। তুমি আমার মুখে, দিদির মুখে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নাম অনেকবার শুনিয়া থাকিবে। আমি কাল রাত্রে তাঁহার বাটীতে থাকিব, এ কথা এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া রাখিতেছি। জানি না, কেমন করিয়া সেখানে যাইব, জানি না, কেমন করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের হাত হইতে আমি এড়াইব; কিন্তু যদি দেখি, দিদি আনন্দধামে গিয়াছেন, তাহা হইলে যেমন করিয়া হউক, আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে যাইবই যাইব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে যে পত্র লিখিব, তাহা তোমাকে স্বহস্তে ডাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। রাজবাটীর চিঠির থলিয়ায় বিশ্বাস নাই। এটুকু উপকার করিবে কি না, বল। বোধ হয়, তোমার নিকট এই আমার শেষ অনুগ্রহ-ভিক্ষা।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এ সকল কথার অর্থ কি? হয় ত রোগে ও চিন্তায় রাণী-মার একটু মাথা খারাপ হইয়া গিয়া থাকিবে। যাহাই হউক, এক জন পরিচিত স্ত্রীলোকের নিকট চিঠি পাঠাইতে দোষ কি বিবেচনায় আমি পত্র ডাকে পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত হইলাম। পরাগত ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, রাণী-মাতার কালিকাপুরের রাজবাটীতে অবস্থানের শেষ দিনের শেষ বাসনা পূরণ করিতে আমি বিরোধিতা করি নাই, ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

তিনি পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিলেন, আমি স্বয়ং ডাকঘরে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। সে দিন রাজার সহিত আমাদের আর দেখা হইল না। আমি রাণী-মাতার আদেশ অনুসারে তাঁহার শুইবার ঘরের পাশের ঘরে শয়ন করিলাম। উভয় ঘরের মধ্যে দরজা খোলা থাকিল। রাণী-মা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া অনেক পুরাতন পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়ার পর পত্র সকল পুড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং বাক্স, দেরাজ প্রভৃতি খালি করিয়া, যে সকল সামগ্রী তিনি বড় ভালবাসিতেন, সে সকল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাকে আর কখন রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। শয়ন করার পর তাঁহার একটুও সুনিদ্রা হইল না। অনেকবার তিনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদিয়া উঠিলেন; একবার এতই জোরে কাঁদিয়া উঠিলেন যে, সে শব্দে তাঁহার নিজেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার স্বপ্নের কথা তিনি আমাকে বলিলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন, বেলা বারোটার সময় গাড়ী প্রস্তুত হইয়া দরজার নিকট আসিবে। সাড়ে বারোটার সময় আমাদের ষ্টেশন হইতে রেল-গাড়ী ছাড়িয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে রাণীকে ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। রাজার আপাততঃ কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে হইতেছে; কিন্তু রাণী যাত্রা করার পূর্ব্বে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। যদিই কোন প্রতিবন্ধকে তাঁহার সে সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসা না হয়, তাহা হইলে রাণী-মার সঙ্গে আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে হইবে। রাণী-মার সঙ্গে সঙ্গে রামী-ঝি ও দারবান্ এক জন কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইবে। আমাকে ষ্টেশন হইতে আবার রাজবাটী ফিরিয়া আসিতে হইবে। ঝি ও দ্বারবান্ তাঁহাকে কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় পৌঁছিয়া দিয়াই চলিয়া আসিবে। এখানে চাকর-বাকরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়াছে; এ জন্য অধিক লোক সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা নাই। আর কতকগুলা লোক সঙ্গে থাকারও দরকার আছে বলিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন না। রাজা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে এই সকল ব্যবস্থা সমাপন করিলেন। রাণী-মাতা বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। কিন্তু রাজা একবারও তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন না।

রাজা কথা সমাপ্ত করিয়া প্রস্থানাভিপ্রায়ে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলে রাণী-মা হস্ত-বিস্তার করিয়া তাঁহার পথাবরোধ করিলেন এবং বলিলেন, —"আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমাদের এই বিদায় সম্ভবতঃ চিরবিদায়। রাজা, আমি তোমার কৃত কার্য্য-সমূহ যেমন অকপট-চিত্তে ক্ষমা করিতেছি, বল, তুমিও আমার কৃত কার্য্য-সমূহ সেইরূপে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করিবে?"

তখন রাজার বদন অত্যন্ত পাণ্ডু হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ললাটদেশে ঘর্ম্মবিন্দু-সমূহ প্রকাশিত হইল। "আমি আবার আসিব", এই কথা বলিয়া তিনি বেগে প্রস্থান করিলেন; যেন রাণী-মার কথায় ভীত হইয়াই তিনি পলায়ন করিলেন।

রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া আমি মনে বড় ব্যথা পাইলাম এবং এতদিন এমন লোকের নুণ খাইয়াছি বলিয়া আমার মনে বড় ঘৃণা হইল। রাণী-মাকে দুই একটা প্রবোধের কথা বলিব মনে করিলাম, কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস হইল না।

যথাসময়ে গাড়ী আসিল। রাণী-মার অনুমান যথার্থ। রাজা আর ফিরিলেন না। আমি শেষ-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অগত্যা রাণী-মার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া আমি তাঁহাকে সময়ে সময়ে পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাকে নিতান্ত চিন্তিত দেখিয়া আমি দুই একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি তখন এতই অন্যমনস্ক যে, আমার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। আমি তাহার পর বলিলাম,—"রাণী-মার কালি রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই।" তিনি বলিলেন,—"হাঁ! কালি রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।" আমি ভাবিলাম, তিনি হয় ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে বলিবেন; কিন্তু তিনি সে সকল কোন কথা না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি নিজ হাতে অন্নপূর্ণা দেবীর সে চিঠিখানি ডাকে দিয়াছিলে তো?" আমি উত্তর দিলাম,—"হাঁ মা।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা কালি বলিয়াছিলেন বুঝি যে, চৌধুরী মহাশয় কলিকাতার রেলষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন?" আমি বলিলাম,—"হাঁ মা।" তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিলেন, কিন্তু আর কোন কথা কহিলেন না।

আমরা যখন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন গাড়ী ছাড়িতে আর দেরী নাই। যে মালী গাড়ী হাঁকা-ইয়া গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র ঠিক করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল; দ্বারবান্ টিকিট কিনিয়া ফেলিল; গাড়ীর বাঁশী বাজিতে লাগিল। আমি এবং রামী রাণী-মার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল, তিনি যেন হঠাৎ বড় ভয় পাইয়াছেন। গাড়ীতে বসিবার সময় তিনি সহসা আমার বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন,—"নিস্তারিণি, তুমিও যদি আমার সঙ্গে যাইতে, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।" এখন যদি সময় থাকিত, কিংবা একদিন আগে যদি এ কথা মনে উদয় হইত, তাহা হইলে যদি আবশ্যক বুঝি-তাম, রাজার কর্ম্মে জবাব দিয়াও আমি রাণী-মার সঙ্গে যাইতাম। কিন্তু এখন অন্য চিন্তা দূরে থাকুক, টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিবারও সময় নাই।

তিনি বোধ হয়, এ সকল অসুবিধা বুঝিতে পারিলেন, তাই এ কথা আর না বলিয়া নিজে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং উভয় হস্তে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"যখন আমরা নিঃসহায়, তখন তুমি আমার আর আমার দিদির অনেক উপকার করিয়াছ। আমি জীবন থাকিতে তোমার কথা কখনই ভুলিব না। তুমি ভাল থাক; সুখে থাক। আমাকে এখন বিদায় দেও।"

যে স্বরে রাণী-মা এই সকল কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি বলিলাম, —"আসুন মা,—শীঘ্রই আপনার মনের চিন্তা দূর হউক; শীঘ্রই আবার যেন আপনার চাঁদ-মুখ দেখিতে পাই।"

গার্ড আসিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন রাণী মা অতি মৃদুস্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি স্বপ্নে বিশ্বাস কর কি? আমি কালি রাত্রিতে যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, এখন আমার তাহা মনে করিয়া ভয় করিতেছে।" আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইল। তাঁহার বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন মুখ আর দেখিতে পাইলাম না।

রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত দিন রাণী মার কাতরভাব মনে করিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া থাকিল। সন্ধ্যার একটু আগে মনে করিলাম, একবার বাগানে বেড়াই। রাজা যে সেই প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন, এখনও বাটী ফিরেন নাই। বাটীতে কথাটি কহিবার একটি লোক পর্য্যন্ত নাই। কলিকাতায় রাণী-মাকে পৌঁছিয়া দিয়া দ্বারবানের সঙ্গে রামী ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা চৌধুরী মহাশয়ের বাটী পর্য্যন্ত রাণী-মার সঙ্গে ছিল। তিনি সেখানে পৌঁছিলেই তাহারা আবার ষ্টেশনে আসিয়া, পরের গাড়ীতে এইমাত্র রাজবাড়ীতে ফিরিয়াছে। এখন কথার দোসরই বল, আর মন্ত্রীই বল, আর যাই বল, সকলই রামী। কিন্তু সেরূপ নির্ব্বোধ, সেরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সময় কাটান অসম্ভব। বাগানে বেড়াইতে বাহির হইলাম। মোড় ফিরিলে যেই সমস্ত বাগানের দৃশ্য আমার চক্ষের সম্মুখে পড়িল, সেই আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, এক জন অপরিচিত স্ত্রীলোক আমার দিকে পিছন করিয়া বাগানে ফুল তুলিতেছে। আমি নিকটস্থ হইলে আমার পদশব্দ শুনিয়া সে আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, সে রমণী। তাহাকে দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম এবং কোন কথা কহিতেও পারিলাম না, একপদ অগ্রসর হইতেও পারিলাম না সে কিন্তু আমার দিকে ফুলের গোছা হাতে লইয়া অতি নিশ্চিন্তভাবে চলিয়া আসিল এবং অতি প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসিল,—"কি হইয়াছে?"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম,—"তুমি এখানে! কলিকাতায় যাও নাই? শান্তিপুরে যাও নাই?"

অতি পৌরুষব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের সহিত ফুলের আঘ্রাণ লইতে লইতে সে উত্তর দিল,—"না; আমি একবারও রাজবাটী ছাড়িয়া যাই না তো।"

তখন আমি শ্বাস গ্রহণ করিয়া সাহসের সহিত জিজ্ঞাসিলাম,—"মাসী মা কোথায়?"

রমণী একবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—"তিনি একবারও রাজবাটী ছাড়িয়া যান নাই তো।"

এই দারুণ বিস্ময়াবহ সংবাদ শুনিয়া আমার রাণী-মার বিদায়ের কথা মনে পড়িল। হায়! হায়! যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সংবাদ জানিবার উপায় হইত, আমি তাহাও করিতাম। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। রাণী-মার কাতর দুর্ব্বল দেহের কথা স্মরণ করিয়া আমি শিহরিতে লাগিলাম। এই ভয়ানক সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, না জানি, তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে? মিনিট দুই পরে রমণী ঘাড় তুলিয়া চাহিল এবং বলিল, - "এই যে রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

রাজা হস্তস্থিত ছড়ির দ্বারা উভয়দিকের ফুলগাছে আঘাত করিতে করিতে আমাদের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে দেখিতে পাইবামাত্র সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর সহসা এমন বিকট উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন যে,সে শব্দে ভীত হইয়া নিকটস্থ বৃক্ষের পক্ষীরা পলায়ন করিল। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে নিস্তারিণি, এতক্ষণে সব কথা বুঝিতে পারিয়াছ, কেমন?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। তিনি রমণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কখন্ বাগানে বাহির হইয়াছ?"

"আধ ঘণ্টা হইল, আমি বাগানে বাহির হইয়াছি। আপনি বলিয়াছিলেন যে, রাণী-মা কলিকাতায় চলিয়া গেলেই আমি বাগানে বাহির হইতে পারিব।"

"ঠিক কথা। আমি তোমার কোন দোষ দিতেছি না. কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র।" তাহার পর কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া তিনি আবার আমার

দিকে ফিরিয়া চাহিয়া পরিহাসের স্বরে বলিলেন, "এ ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াই উঠিতে পারিতেছ না, কেমন? আইস, স্বচক্ষে দেখ আসিয়া।"

রাজা অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। রমণী আমার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। কিয়দ্দূর আসার পর বাটীর অব্যবহৃত ভাগের দিকে ছড়ি দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—"যাও ঐ দিকে। উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে, মনোরমা দেবী ঐ পাশের ঘরে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। রমণি! তোমার নিকট চাবী আছে, তুমি নিস্তারিণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া দেও।"

এতক্ষণে ক্রমে ক্রমে আমার পূর্ব্ব-সজীবতা আবার আবির্ভূত হইল। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি, তাহা বিচার করিতে তখন আমার শক্তি হইল। আমি স্থির করিলাম, যে ব্যক্তি রাণী-মাতার সহিত এবং আমার সহিত এতাদৃশ লজ্জাজনক প্রতারণা ও ভয়ানক মিথ্যা কথা ব্যবহার করিয়াছে, তাহার অধীনে আর কর্ম্ম করা শ্রেয়ঃ নহে। আমি বলিলাম,—"রাজা, আমি অগ্রে আপনার সহিত গোপনে দুই একটা কথা কহিয়া পরে এই লোকের সঙ্গে মাসী-মার ঘরে যাইব।"

রমণী একটু রাগতভাবে চলিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"আবার কি?"

আমি বলিলাম,—"আমি আমার কর্ম্ম হইতে অবিলম্বে অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা অতীব বিরক্তির সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কেন?"

আমি বলিলাম,—"এ বাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। রাণীমাতার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার জন্য এবং আমার নিজের অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কর্ম্মে জবাব দিতে চাই।"

রাজা অতিশয় রাগত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বুঝিয়াছি, তোমার আর বলিতে হইবে না। রাণীর মঙ্গলের জন্যই তাঁহার সহিত একটা নির্দ্দোষ প্রতারণা করিতে হইয়াছে বটে। বুঝিয়াছি, তুমি তাহা হইতে নিজের যেমন বুদ্ধি, সেইরূপ জঘন্য ও ইতর অর্থ গ্রহণ করিয়াছ। রাণীর স্বাস্থ্যের জন্য অবিলম্বে বায়ুপরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তুমিও জান, আমিও জানি, মনোরমা দেবীকে এখানে ফেলিয়া তিনি কখনই কোথাও যাইবেন না। সুতরাং যে যাই বলুক, রাণীর হিতার্থে এরূপ প্রতারণা না করিলে উপায় কি? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি চলিয়া যাইতে পার। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি? যখন ইচ্ছা তুমি চলিয়া যাইতে পার, কিন্তু সাবধান, এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর যদি তোমার দ্বারা কখন আমার দুর্নাম-রটনা হয়, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া কখনই ছাড়িব না। স্বচক্ষে মনোরমা দেবীকে তুমি দেখিয়া যাও। তাঁহার কোন সেবা-যত্নের ত্রুটি হইতেছে কি না, দেখ। মনে থাকে যেন, ডাক্তার বলিয়াছিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব রাণীর বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সকল কথা মনে রাখিয়া আমার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলিতে সাহস হয় তো বলিও।"

অতি দ্রুতভাবে ও ব্যস্ততার সহিত পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি বাক্য সমাপ্ত করিলেন। যতই কেন বলুন না, তিনি গত কল্য আমাদের নিকট অনবরত নানারূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এবং ভগ্নীর জন্য উদ্বেগে উন্মাদপ্রায় রাণী-মাকে অকারণে নিতান্ত জঘন্য প্রতারণা দ্বারা তাঁহার দিদির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ সংস্কার কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে। আমি মনের কথা মনেই রাখিলাম, কিন্তু যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিলাম না। তাঁহাকে কোন কথা বলিলেই তিনি কেবল রাগ করিবেন বৈ তো নয়।

তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন্ তুমি যাইতে চাও? মনে করিও না যে, তুমি থাকিবে না বলিয়া আমি ভাবিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার আগাগোড়া কোনখানে কপটতা নাই। তুমি কখন্ যাইবে, বল।"

"আপনার যত শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া সুবিধা হইবে, আমি তত শীঘ্রই যাইব।"

"আমার সুবিধা অসুবিধা তোমার দেখিবার দরকার নাই। আমি কালই এখান হইতে চলিয়া যাইব। আজি রাত্রিতেই আমি তোমার হিসাব চুকাইয়া দিব। যদি কাহারও সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া তোমার যাওয়া না যাওয়া স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে মনোরমা দেবীর নিকটে যাও। রমণীকে যত দিনের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং সে আজি রাত্রিতে কলিকাতা যাইবে শুনিতেছি। এখন তুমিও চলিয়া গেলে মনোরমা দেবীকে দেখিবার লোক কেহই থাকিতেছে না।"

এরূপ দুঃসময়ে মনোরমা দেবীকে ফেলিয়া

যাওয়া আমার অসাধ্য। তখন আমি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া স্থির করিয়া লইলাম যে, যেই আমি রমণীর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিব, সেই সে চলিয়া যাইবে এবং ডাক্তার বিনোদবাবু আবার যাতায়াত করিয়া রোগীকে দেখিতে থাকিবেন। এ সকল ব্যবস্থা স্থির হইলে আমি মনোরমা দেবীর যত দিন দরকার,তত দিন পর্য্যন্ত রাজবাটীতে থাকিতে স্বীকার করিলাম। কথা সমাপ্ত হইবামাত্র রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রমণী এতক্ষণ আমাকে মাসী-মার ঘর দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আমি তাহার নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে দুই এক পদ যাইতে না যাইতে রাজা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন এখানকার চাকরীতে জবাব দিতেছ ?"

এত কথার পর তিনি আবারও এ আশ্চর্য্য প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে আবার বলিলেন,—"দেখ, কেন তুমি যাইতেছ, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। লোকে এ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তোমার অবশ্যই একটা কারণ দেখাইতে হইবে, তখন তুমি কি কারণ দেখাইবে ? রাজবাটীর সকলে নানা স্থানে চলিয়া যাওয়ায় তোমার আর থাকা হইল না। কেমন, এই কথা বলিবে কি ?"

"কেহ যদি আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে ও কথা বলায় কোন আপত্তি দেখিতেছি না।"

"বেশ কথা। আর আমার কিছুই জানিবার আবশ্যক নাই।"

আমি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বেগে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব আজি বড়ই অদ্ভুত। বাস্তবিকই তাঁহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল। আমি রমণীর নিকটস্থ হইলে সে আমাকে বলিল—"বাপ রে! কথা আর ফুরায় না।" তাহার পর আমাকে সঙ্গে লইয়া সে উপরে উঠিল এবং এক এক করিয়া সে অনেক ঘর ছাড়াইয়া গেল। শেষে একটা ঘরের সম্মুখে গিয়া সে আঁচল হইতে চাবী বাহির করিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। সেই ঘরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলে, রমণী আমার হাতে একটা চাবী দিয়া বলিল যে, এই চাবী দিয়া সম্মুখের দ্বার খুলিলে মাসী-মাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ দিকে যে এত ঘর আছে, তাহা আমি কখনও জানিতাম না এবং কখনও এ সকল ঘর দেখি নাই। মাসী-মার ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি রমণীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, অতঃপর মাসী-মার সমস্ত ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছি ; রমণীকে আর কিছুই করিতে হইবে না।

রমণী আমার কথার উত্তরে বলিল—"আঃ! তুমি আমাকে বাঁচাইলে। কলিকাতায় যাইবার জন্য আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কি আজই যাইবে ?"

সে বলিল,—"আজই কি ? এখনই। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। তোমাদের কাছে এত দিন কত দৌরাত্ম্য করিলাম, সে জন্য কিছু মনে করিও না।"

সে চলিয়া গেল। বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, তাহার সহিত আমার ইহজীবনে আর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। মাসী-মার ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি নিদ্রিত। তাঁহার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ বোধ হইল না। ইহা আমার স্বীকার করা সর্ব্বদা আবশ্যক যে, আমি মাসী-মার কোন বিষয়েই অযত্ন দেখিতে পাইলাম না। ঘরটি বহু দিন অব্যবহৃত থাকায় নিতান্ত মলিন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বায়ু ও আলোক-গমনাগমনের কোন অসুবিধা ছিল না। আমি যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, রাজা ও রাণীকে এ ক্ষেত্রে মাসী-মাকে লুকাইয়া রাখা ভিন্ন আর কোন অপরাধে অপরাধী করা যায় না। মাসী-মার ঘুমের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া আমি তখন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া বাহিরে মালীকে আমার নাম করিয়া ডাক্তার মহাশয়কে আসিবার কথা বলিতে বলিলাম। এখন চৌধুরী মহাশয় এখানে নাই, এ কথা শুনিলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া অবশ্যই ডাক্তারবাবু আসিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতেছি। মালী ঘণ্টা ২।৩ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, ডাক্তারবাবুর আজি একটু শরীর খারাপ আছে, বোধ হয়, তিনি কালি প্রাতে আসিবেন। আমাকে এই সংবাদ দিয়া মালী চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম যে, আজি রাত্রিতে তাহাকে আমাদের এই ঘরের নিকটে কোন একটা খালি ঘরে শুইয়া থাকিতে হইবে। মালী সহজেই বুঝিল যে, এত বড় বাড়ীতে একা থাকিতে আমার ভয় করিতেছে ; সে আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং রাত্রি ৯।১০ টার সময়

আসিয়া দুই তিনটি ঘরের পরে একটা খালি ঘরে শুইয়া থাকিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে রাজা বিকট স্বরে এত ভয়ানক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম সমস্ত বৈকাল রাজা নিতান্ত অস্থির ও উত্তেজিতভাবে বাটীর চারিদিকে বাগানে ও ময়দানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, হয় তো তিনি অতিরিক্ত মদ খাইয়াছেন। রাত্রি গভীর হইলে তাঁহার উগ্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং তিনি সহসা ঘোর কর্কশশব্দে সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য মালী ছুটিয়া গেল। পাছে সেই বিকট রব মাসী-মার কানে আসিয়া পৌঁছে, এই আশঙ্কায় আমি মাঝের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। মালী আসিয়া বলিল, রাজা পাগল হইয়া গিয়াছেন। মদ খাইয়া যে তিনি এমন করিতেছেন, তাহা নহে; কেমন এক রকম ভয়ে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ হইয়া গিয়াছে। সে গিয়া দেখিল, রাজা ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন আর চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, তাঁহার বাড়ী নরককুণ্ড, তিনি এ জঘন্য স্থানে এক মুহূর্ত্তও থাকিবেন না, এই মাঝ-রাত্রিতেই তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। মালী তাঁহার সম্মুখস্থ হইলে তিনি তাহাকে অকারণ কটুবাক্য বলিয়া তখনই গাড়ী তৈয়ার করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই সে গাড়ী আনিলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঘোড়াকে চাবুক মারিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। মালী চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল, রাজার মুখের আকৃতি অতি ভয়ানক রাজা কোথায় গেলেন, কেনই বা গেলেন, তাহা সে জানে না। এই ঘটনার এক দিন কি দুই দিন পরে, নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের এক জন লোক গাড়ী ফিরাইয়া আনিল। রাজা সে গ্রামে গিয়াছিলেন, পরে রেলে উঠিয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহা সে লোক জানে না। তাহার পর এ পর্য্যন্ত আমি রাজার আর কোন সংবাদ পাই নাই এবং তিনি এ দেশেই আছেন কি দেশান্তরী হইয়াছেন, তাহাও আমি বলিতে পারি না। সেই অবধি আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই, প্রার্থনা করি, এ জীবনে যেন তাঁহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ না হয়।

এই দুঃখজনক গল্পে আমার বক্তব্য অংশ ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। যাঁহাদের অনুরোধে আমি এ কাহিনী লিখিতেছি, তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন যে, ঘুম ভাঙ্গার পর মাসী-মা আমাকে যাহা বলিলেন ও তাঁহার যেরূপ ভাব হইল, তাহার বিবরণ এ প্রস্তাবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, বাটীর ব্যবহৃত ভাগ হইতে এই অব্যবহৃত ভাগে তাঁহাকে কিরূপে আনা হইল, তাহা মাসী-মা জ্ঞাত নহেন। কোন ঔষধের শক্তিতে হউক, বা স্বাভাবিক ভাবেই হউক, তিনি তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বাটীতে তৎকালে নির্ব্বোধের শিরোমণি রামী ভিন্ন দাসদাসী ছিল না,—আমি কলিকাতায়। সেই সুযোগে মাসী-মাকে স্থানান্তরিত করা সহজেই ঘটিয়াছে মাসী-মা নিদ্রাভঙ্গের পর রমণীকে যত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে কিছুরই উত্তর দেয় নাই; কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত সসম্মান ব্যবহার করিয়াছে ও তাঁহার শুশ্রূষার কোন ত্রুটি করে নাই। এই অতি ঘৃণিত প্রতারণা-ব্যাপারে লিপ্ত থাকা ব্যতীত অপর কোন কারণে, ধর্ম্মতঃ রমণীকে দোষী করিতে পারি না।

রাণী মাতার প্রস্থান-সংবাদে, অথবা অচিরাগত ঘোরতর বিষাদজনক সংবাদ-শ্রবণে মাসী-মাতার কিরূপ অবস্থা ঘটিল, তাহা আমাকে বলিতে হইবে না। বহু যাতনার পর মাসী-মার হৃদয় এই সকল শোক অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। যে পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি না হইল, সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার কাছ ছাড়া হই নাই। তাহার পর উভয়ে একত্রে কলিকাতায় আসিয়া আন্তরিক কষ্টের সহিত আমাদের পরস্পরের নিকট বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। আমি ভবানীপুরের এক জন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিলাম। আর মাসী-মা কাঁদিতে কাঁদিতে শক্তিপুরে রাধিকাবাবুর বাটীতে গমন করিলেন।

কর্ত্তব্যানুরোধে আর কয়েকটি কথা লিখিয়া আমি এই শোকপূর্ণ কাহিনী সমাপ্ত করিব। আমার বিশ্বাস যে, যে সকল বৃত্তান্ত আমি লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহার মধ্যে কোন স্থানেই চৌধুরী মহাশয়ের বিন্দুমাত্র দোষের বা কলঙ্কের সংস্রব নাই। আমি জ্ঞাত হইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে অতি উৎকট সন্দেহ এবং তাঁহার কৃত কোন কোন কার্য্যের অতি ভয়ানক অর্থ কল্পিত হইয়াছে। যে যতই কেন বলুক না, তাঁহার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আমার অবিচলিত বিশ্বাস আছে। আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবার সময়ে তিনি রাজার সহায়তা করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তিনি না জানিয়া এবং না বুঝিতে পারিয়াই করিয়াছিলেন; সুতরাং সে জন্য কখনই নিন্দনীয় হইতে পারেন না।

তিনি যদি রমণীকে জুটাইয়া দিয়া থাকেন এবং সেই রমণী যদি গৃহস্বামী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও সম্পাদিত প্রতারণায় লিপ্ত হইয়া ইতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে, সে জন্য চৌধুরী মহাশয় দোষী হইবেন কেন ? চৌধুরী মহাশয়কে অকারণ কলঙ্কভাজন করা আমার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ। আর এক কথা,—রাণী-মাতা যে দিন রাজবাটী হইতে কলিকাতায় চলিয়া যান, সে তারিখটা আমার কোনমতেই মনে আসিতেছে না, এ জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি শুনিয়াছি, সেই তারিখটা জানা অতি আবশ্যক ; কিন্তু সে জন্য আমি অনেক ভাবিয়াও কিছুই মনে করিতে পারি নাই ; এত দিন পরে তাহা আর মনে করা কখনই সম্ভব নহে। যে দুই জন লোক রাণী-মার সঙ্গে গিয়াছেন, তাহার মধ্যে রামীর কথা বাদ দিয়া, দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত তারিখের মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কপালক্রমে সে বেচারা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার প্রায় পোনের কুড়ি দিনের পর, হঠাৎ ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া অতি সামান্য সময়ের মধ্যে এই আত্মীয়হীন বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছে। জানিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও আমি রামীকে রকম রকম করিয়া এ কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সে কোনবার বা হাঁ করিয়া জিব বাহির করিয়াছে, কোনবার শুধুই হাঁ করিয়াছে, এই দুই কার্য্য ছাড়া অন্য কোন উত্তর তাহার নিকট কখন পাই নাই। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বলিতে পারি যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি রাণী-মা কলিকাতায় গিয়াছিলেন। এত যদি জানিতাম, তাহা হইলে তারিখটা এক জায়গায় টুকিয়া রাখিতাম। সেই রেলের গাড়ীতে শেষ বিদায়সময়ে রাণী-মা কাতরভাবে আমার পানে যে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার তখনকার সে মুখ আমার যেমন মনে পড়িতেছে, তাঁহার যাত্রার দিনটাও যদি সেইরূপ মনে পড়িত, তাহা হইলে বেশ ত।

চৌধুরী মহাশয়ের পাচিকা রামমতি ঠাকুরাণীর কথা।

আমি লিখিতে পড়িতে কিছুই জানি না। মিথ্যা কথা বলা ভারী পাপ, তাহা আমি জানি। আমার এই সকল কথায় একটিও মিথ্যা থাকিবে না। যাহা আমি জানি, তাহাই আমি বলিব। যে বাবু আমার কথা লিখিয়া লইতেছেন, আমি লেখাপড়া না জানায় আমার কথায় যত দোষ হইবে, তাহা যেন তিনি দয়া করিয়া শুধরাইয়া লন।

গেল গ্রীষ্মকালে আমার চাকরী ছিল না। আমি জানিতে পারিলাম, সিমুলিয়ায় এক বাড়ীতে এক জন রাঁধুনীর দরকার আছে। সে বাড়ীর নম্বর ৫। আমি সেই কর্ম্ম জুটাইয়া লইলাম। বাড়ীর কর্ত্তা বাবুর নাম জগদীশ। তাঁহারা বুঝি চৌধুরী। কর্ত্তা আর গিন্নী ছাড়া বাড়ীতে আর তাঁহাদের কোন আপনার লোক ছিল না ; আমি ছাড়া তাঁহাদের এক জন ঝি ছিল। অন্য চাকর-বাকর ছিল না। আমার কাজে ভর্ত্তি হওয়ার পর কর্ত্তা-বাবু আর গিন্নী-মা বাসায় আসিলেন। তাঁহারা আসার পরেই আমরা শুনিতে পাইলাম যে, দেশ হইতে এ বাসায় শীঘ্রই গিন্নী-মার ভাই-ঝি আসিবেন। তাঁহার জন্য ঘর ঝাড়িয়া ও বিছানা পাতিয়া রাখা হইল। গিন্নীমার মুখে শুনিতে পাইলাম, তাঁহার ভাইঝির নাম রাণী লীলাবতী দেবী। তাঁহার শরীর বড় খারাপ, তাঁহার জন্য আমাকে একটু যত্ন করিয়া রাঁধিতে হইবে। তিনি সেই দিনই আসিবেন শুনিলাম। সে দিন কোন্ তারিখ, তাহা করিয়া আমার মনে নাই। সে সকল কথা আমরা মনে রাখিতে জানি না। আমরা দুঃখী মানুষ—অত কথা আমাদের দরকার হয় না। রাণী ঠাকুরাণী আসিলেন। তিনি আসিয়াই আমাদের খুব হেঙ্গামে ফেলিলেন। কর্ত্তা মহাশয় রাণীকে কেমন করিয়া বাসায় আনিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না—আমি তখন কাজে ছিলাম। আমার যেন মনে হইতেছে, বৈকালবেলায় তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপরে যাওয়ার একটু পরেই আমরা একটা গোল শুনিতে পাইলাম, আর গিন্নী-মা আমাদের ডাকিতেছেন শুনিলাম। ঝি আর আমি দৌড়িয়া উপরে আসিয়া দেখিলাম, রাণী খাটের উপর শুইয়া আছেন, তাঁহার মুখ শাদা পাঙ্গাস, তাঁহার হাত খুব মুঠাবান্ধা, আর তাঁহার মাথা এক দিকে বাঁকিয়া রহিয়াছে। গিন্নী-মা বলিলেন, রাণী এখানে আসিয়াই হঠাৎ বড় ভয় পাইয়াছেন। কর্ত্তা বলিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর তিন চারিটা বাড়ীর পরেই ভোলানাথবাবুর ডাক্তারখানা, আমি তাহা বেশ চিনিতাম। ভোলানাথবাবুর খুব যশ। তিনি যে রোগ ভাল করিতে না পারেন, তাহা কলিকাতার আর কোন ডাক্তারই আরাম করিতে পারেন না। যাহারা

তাঁহা কে জানে, তাহারা কখন অন্য কোন ডাক্তার কথা শুনে না। তিনি যেমন শান্ত, তেমনই পরোপকারী ও অমায়িক লোক। আমার একবার ব্যারাম হইলে আমি মরার মত হইয়াছিলাম, ভোলানাথবাবু আমার কাছ হইতে একটিও পয়সা লইলেন না, বাড়ার ভাগ ঘর হইতে ঔষধ দিয়া, আর দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমাকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁর মত মানুষ আর হয় না। তিনি মানুষও যেমন চমৎকার, তাঁর বিদ্যাও তেমনই আশ্চর্য্য। শুনিয়াছি, বড় বড় সাহেব ডাক্তারও তাঁর চিকিৎসা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। আমি রাণীর অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি কর্ত্তাবাবুকে ভোলানাথবাবুর কথা বলিলাম। তিনি আমাকে তখনই ভোলানাথবাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। আমি দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, ভোলানাথবাবু ডাক্তারখানাতেই আছেন। তিনি তখনই আমার সঙ্গে আসিলেন।

ভোলানাথবাবু আসিয়া দেখিলেন, রাণীর কেবলই মূর্চ্ছা হইতেছে। একবার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া একটু জ্ঞান হইতে না হইতে তাঁহার আবার মূর্চ্ছা হইতেছে। ডাক্তারবাবু রোগীর অবস্থা বেশ করিয়া দেখিয়া, ঔষধ লইয়া যাইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিলেন। দরকারী ঔষধ ছাড়া তিনি একটা বাঁশীর মত চোঙ্গ সঙ্গে করিয়া আনিলেন। চোঙ্গটার একদিক্ তিনি রাণীর বুকে লাগাইয়া আর একদিক্ আপনার কানে লাগাইয়া থাকিলেন। খানিকক্ষণ সেইরূপে থাকিয়া তিনি গিন্নী-মাকে বলিলেন,—"পীড়া বড়ই কঠিন দেখিতেছি। রাণী লীলাবতী দেবীর আত্মীয়জনকে সংবাদ দেওয়া আপনাদের এখনই আবশ্যক।" গিন্নী-মা জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখিলেন কি, বুকের ব্যারাম?" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখিলাম, অতি ভয়ানক বুকের পীড়া।" তিনি যেমন যেমন বুঝিলেন, সমস্তই গিন্নী-মার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। আমি সে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তবে মোটামুটি এই বুঝিলাম যে, তাঁহারই চিকিৎসা হউক, কি আর কোন ডাক্তারের চিকিৎসাই হউক, কিছুতেই রাণী আরাম হইবেন না। ভোলানাথবাবু যখন এ কথা বলিলেন, তখন শিব-সাক্ষাৎ হইলেও রাণী আর বাঁচিবেন না, তাহা আমি ঠিক বুঝিলাম।

কর্ত্তাবাবু এই সকল কথা শুনিয়া যেরূপ কাতর হইলেন, গিন্নী-মা সেরূপ হইলেন না। কর্ত্তাবাবু কেমন এক রকম লোক। তাঁহার কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর আর পাখী আছে। তিনি তাহাদের ছেলের মত সোহাগ করেন, আর তাহাদের সঙ্গে কতই গল্প করেন। ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া কর্ত্তাবাবু যাত্রার সঙের মত হাত নাড়িতে নাড়িতে কত দুঃখ করিতে লাগিলেন। মা যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন, বাবু দশটা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে আমাদের জ্বালাতন করিয়া শেষে একটু ঠাণ্ডা হইলেন। পরে বাটীতে যে একটু ফুলবাগান ছিল, সেখানে আসিয়া অনেক ফুল তুলিয়া আমাকে সেই ফুল দিয়া রোগীর ঘর সাজাইয়া দিতে বলিলেন—যেন তাহাতেই ব্যারাম সারিয়া যাইবে। আমার বোধ হয় বাবু আগে একটু পাগল ছিলেন। তাহা হউক, তিনি কিন্তু লোক ভাল। তাঁর কথা-বার্ত্তা বড় মিষ্ট, হাসি তাঁর মুখে লাগিয়াই আছে, আর তাঁর মনে একটু অহঙ্কার নাই। আমি গিন্নী-মার চেয়ে কর্ত্তা-বাবুকে বেশী ভালবাসি। গিন্নী-মা বড় খিট্‌খিটে মানুষ।

রাত্রে রাণীর একটু জ্ঞান হইল। তিনি আগে হাত-পা না নড়াইয়া মরার মত পড়িয়াছিলেন, এখন একটু হাত-পা নাড়িতে লাগিলেন, আর ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে যে তাঁহার চেহারা খুব ভাল ছিল, তাহার ভুল নাই। গিন্নী-মা সারারাত্রি একা তাঁহার কাছে থাকিলেন। আমি শুইবার আগে একবার তাঁহাকে দেখিতে গেলাম; দেখিলাম, তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। খানিকক্ষণ তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনি কি কথা বলিবেন বলিয়া কাহাকে খুঁজিতেছেন। যাহাকে তিনি সন্ধান করিতেছেন, তাহার নামটা আমি প্রথমবারে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। দ্বিতীয়বারে কর্ত্তাবাবু আসিয়া আমাকে রাণীর বিষয়ে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, আমি সেবারেও নামটা ঠিক শুনিতে পাইলাম না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম, রাণীর চেহারা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে; আর তিনি যেন কাকনিদ্রায় আছেন। ভোলানাথবাবু পরামর্শ করিবার জন্য আর এক জন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা রাণীর ঘুম ভাঙ্গাইতে বিশেষ করিয়া বারণ করিলেন। তাঁহার আগে কেমন শরীর ছিল, আগে তাঁহার কে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কখন অনেক দিন ধরিয়া তাঁহার পাগলের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল কি না ইত্যাদি নানা কথা ডাক্তারেরা গিন্নী-মাকে ঘরের একদিকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শেষ কথার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"হাঁ।" তাহাতে ডাক্তারেরা দু'জনে দু'জনের মুখ চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, সেই আগেকার পাগলামীর সহিত এখনকার বুকের রোগের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। আহা! রাণীর শরীরে এখন কোনই শক্তি নাই; তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে আর একটুও বাঁচিবেন, এমন মনে হয় না।"

সেই দিন আর একটু বেলা হইলে রাণীর অবস্থা হঠাৎ বেশ ভাল হইতে লাগিল। অচেনা লোক তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা নিষেধ; এ জন্য আমি কি ঝি তাঁহার নিকট যাইতে পাইলাম না। তিনি যে একটু ভাল আছেন, সে কথা আমি কর্ত্তাবাবুর মুখে শুনিলাম। রাণী একটু ভাল আছেন জানিয়া কর্ত্তাবাবুকে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হইল। তিনি রান্নাঘরের জানালা হইতে হাসিতে হাসিতে আমাকে ডাকিয়া এই সকল খবর জানাইলেন। তাঁহার বয়স ষাইট বৎসর ছাড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভাব ছেলেমানুষের মত। তিনি আহ্লাদে আট-খানা হইয়া ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া বেড়াইতে গেলেন।

দুপুরবেলা আবার ভোলানাথবাবু আসিলেন। তিনিও বুঝিলেন যে, ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে রাণীর অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে রাণীর নিকটে কোন কথা এবং রাণীকে আমাদের সঙ্গে কোন কথা কহিতে বারণ করিলেন, আর যাহাতে রাণীর খুব ঘুম হয়, তাহারই তদ্বির করিতে বলিলেন। রাণী ভাল আছেন বলিয়া কর্ত্তাবাবুর যত আহ্লাদ দেখিলাম, ডাক্তারবাবুর তত দেখিলাম না। তিনি নীচে আসিয়া আর কোন কথাই বলিলেন না; কেবল বলিলেন যে, তিনি আবার বেলা ৫টার সময় আসিবেন। প্রায় বেলা ৫টার সময় গিন্নী মা অত্যন্ত ভয়ের সহিত উপর হইতে চীৎকার করিয়া আমাকে ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। রাণীর আবার মূর্চ্ছা হইয়াছে। তখনও কর্ত্তাবাবু ফিরিয়া আইসেন নাই। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছি, এমন সময় ভাগ্যক্রমে ডাক্তারবাবুকে আমাদের দরজার কাছেই দেখিতে পাইলাম। তিনি আপনিই রোগীকে দেখিতে আসিতেছিলেন।

আমিও ভোলানাথবাবুর সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিলাম। ডাক্তারবাবু দ্বারের কাছে যাইতেই গিন্নী মা বলিলেন,—"রাণী লীলাবতী সেই রকমেই ছিলেন, ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে তিনি এক রকম ভাব করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল।" ডাক্তারবাবু কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রোগীর নিকটে গিয়া মুখ নত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের খুব চিন্তিত ভাব হইল; তিনি রাণীর বুকের উপর হাত দিলেন।

গিন্নী-মা ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল এবং তিনি অস্ফুট-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আছেন তো?"

ডাক্তার স্থির ও গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"না; মৃত্যু হইয়াছে। কালি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর আমার মনে ভয় ছিল যে, রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইবে; তাহা হইয়াছে।" গিন্নী-মা ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং কয়েক পদ পিছাইয়া আসিয়া, আপন মনে অস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিলেন.—"এত শীঘ্র হঠাৎ মৃত্যু হইল! চৌধুরী মহাশয় বলিবেন,—কি?" ডাক্তারবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি সারা রাত্রি জাগিয়া আছেন. আপনার শরীর খারাপ হইয়াছে, আপনার আর এখন এখানে থাকিয়া কাজ নাই, আপনি নীচে গিয়া মনকে স্থির করুন। আপাততঃ যাহা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা আমি করাইয়া দিতেছি। যতক্ষণ ব্যবস্থামত কার্য্য না হয়, ততক্ষণ (আমার দিকে হাত ফিরাইয়া দেখাইলেন) ইনি থাকুন।" গিন্নী মা নীচে চলিয়া গেলেন,—"চৌধুরী মহাশয়কে কেমন করিয়া এ কথা জানাইব? ও মা, কি হইবে!" তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

গিন্নী-মা চলিয়া গেলে ডাক্তারবাবু আমাকে বলিলেন,—"তোমাদের বাবু তো বিদেশী লোক। তিনি বোধ হয়, কলিকাতার সকল ব্যবস্থা জানেন না।" আমি বলিলাম,—"না জানাই সম্ভব।" তিনি আবার বলিলেন,—"দেখিতেছি, ইঁহাদের লোকজন বেশী নাই, হয় তো এ অবস্থায় তাঁহাদের কিছু বিব্রত হইতে হইবে? যদি সুবিধা মনে কর, তাহা হইলে যেরূপ লোকের দ্বারা এ সময়ের সাহায্য হওয়া সম্ভব, আমি সেরূপ লোক দুই চারি জন পাঠাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম,—"আপনি কৃপা করিয়া সে সকল ব্যবস্থা না করিয়া দিলে ইহাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা কাহাকেও চিনি না, কিছুই জানি না।" তিনি অনুগ্রহ

করিয়া লোক পাঠাইতে সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন; আমি মরার নিকটে বসিয়া থাকিলাম।

কর্ত্তাবাবু বাটী আসিলেন. কিন্তু উপরে আসিলেন না। আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত অভিভূত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত ও অবসন্ন বলিয়া মনে হইল, কিন্তু বিশেষ দুঃখিত বলিয়া আমার মনে হইল না। দয়ার সাগর ভোলানাথবাবু চারি জন লোক পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা বৈষ্ণব। গিন্নী-মা সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ওঃ! সৎকারের জন্য যে তাঁহারা কতই টাকা খরচ করিলেন, তাহার আর কি বলিব? অতি উত্তম খাটে বেশ করিয়া বিছানা পাতা হইল। তাহার উপর রাণীকে শুয়াইয়া শাল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। চন্দনকাষ্ঠ, ধুনা, ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা সৎকারের ব্যবস্থা হইল, লোকেরা খাট কাঁধে লইয়া চলিল। কর্ত্তাবাবু খালি পায়ে গামছা কাঁধে লইয়া, নিতান্ত দুঃখিতভাবে থপ্‌থপ্ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। গিন্নী-মা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে শান্ত করিতে থাকিলাম। রাণী লীলাবতী দেবীর স্বামী তখন বিদেশে বেড়াইতে গিয়াছেন, কোন্ স্থানে আছেন, তাহার স্থিরতা নাই। তাঁহাকে সংবাদ দিবার কোন সুযোগ হইল না। শক্তিপুরে বুঝি রাণীর বাপের বাড়ী; সেখানে সংবাদ গেল।

আমাকে যে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, শেষে তাহার উত্তর লিখিতেছি।

(১) আমি ঝি, কর্ত্তাবাবুকে কখন নিজ হাতে রাণীকে কোন ঔষধ খাওয়াইতে দেখি নাই।

(২) কর্ত্তাবাবুকে আমি কখন রাণীর ঘরে একা থাকিতে দেখি নাই।

(৩) রাণী এখানে আসিয়া প্রথমেই খুব ভয় পাইয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমাকে বা ঝিকে সে ভয়ের কারণ কখনই কেহ বলেন নাই।

উপরের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহার সমস্তই সত্য।

শ্রীমতী রামমতি দেব্যা। × ঢেরাসহি।

ডাক্তারের কথা।

ই সেক্সনের জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রার মহাশয় সমীপেষু—

আমি শ্রীমতী রাণী লীলাবতী দেবীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স একুশ বৎসর। গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৫নং আশুতোষ দেবের লেনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হৃদ্‌রোগ তাঁহার মৃত্যুর কারণ। পীড়া কত দিনব্যাপী, আমি তাহা জানি না। ইতি তারিখ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৫।

(স্বাক্ষর) শ্রীভোলানাথ ঘোষ।
লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তার।

বৈষ্ণবগণের কথা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভোলানাথবাবুর লোক, এক জন স্ত্রীলোকের সৎকারের জন্য আমাদের ডাকিয়া আনিয়া দেয়। আমরা চারি জনে আসিয়া শুনিলাম যে, তিনি এক জন রাণী। আমরা তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নিমতলায় লইয়া আসি এবং চন্দনকাষ্ঠের চিতায় উঠাইয়া ঘৃত, ধুনা ও রত্নাদি দিয়া সৎকার শেষ করি। আমরা প্রত্যেকে দুই টাকা হিসাবে পুরস্কার পাই। আমাদের সঙ্গে রাণীর পিসামহাশয়ও ঘাটে গিয়াছিলেন। সৎকারে অনেক খরচ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের আর কিছু করিয়া দিলে ভাল হইত।

(   ) শ্রীনিত্যানন্দ দাস।
শ্রীগোপীনাথ রায়।
শ্রীরামহরি দে।
শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ দাস

নিমতলার ঘাটের কথা।

নাম লীলাবতী দেবী। স্বামীর নাম রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়। পিতার নাম—৺প্রিয়প্রসাদ রায়। বয়স—একুশ বৎসর। মৃত্যুর দিন ২৫শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৫ (ঘাটের রেজেষ্টরী বহি।)

শক্তিপুরের উদ্যানে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি-
পার্শ্বস্থ প্রস্তর-ফলকের কথা।

সুন্দরী-শিরোমণি, পাপ-সংস্পর্শ-বিহীনা,
পরলোকগতা
শ্রীশ্রীমতী রাণী লীলাবতী দেবীর
স্বর্গীয়-জীবনের স্মরণার্থ
এই প্রস্তর-ফলক
সংস্থাপিত
হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

১২৮৫ সালের গ্রীষ্মারম্ভে আমি এবং আমার জীবিত সঙ্গিগণ কাবুল হইতে স্বদেশে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। এই সুদীর্ঘ প্রবাসে আমি বারংবার মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু সে সকলের বিবরণ অধুনা নিষ্প্রয়োজন। অতি কষ্টের পর ১৩ই ভাদ্র রাত্রে আমরা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম।

যে অভিপ্রায়ে আমি স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে প্রস্থান করিয়াছিলাম, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। এই স্বারোপিত বনবাস হইতে আমি পরিবর্ত্তিত মানব হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলাম। নিদারুণ বিপদ্ ও কষ্ট ভোগ করিয়া আমার বাসনা কাঠিন্য লাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় দৃঢ় হইয়াছে। অভিনব দুর্দ্দৈব-পরম্পরার আঘাতে আমার জীবন নবীভূত ও বলীয়ান্ হইয়াছে। একদা আমি আত্মজীবনের ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছায়া সন্দর্শনে ভীতভাবে পলায়ন করিয়াছিলাম, অদ্য আমি সেই দুর্দ্দমনীয় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত পুনরাগত হইলাম। নবজীবন লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আশাভঙ্গজনিত অপ্রতিবিধেয় মনস্তাপের এক বর্ণও কদাপি ভুলিতে সমর্থ হইয়াছি কি?—না, আমি কেবল সে দারুণ যন্ত্রণা কেমন করিয়া সহিতে হয়, তাহা অভ্যাস করিয়াছি। যখন এই চিরপ্রিয় মাতৃভূমি হইতে প্রস্থান করি, তখনও লীলাবতী দেবী আমার চিন্তার একমাত্র বিষয়; আবার যখন সেই চিরপ্রীতি-পূর্ণ রমণীয় প্রদেশে পুনরায় প্রবেশ করিলাম, তখনও লীলাবতী দেবী আমার চিন্তার একমাত্র বিষয়। প্রেমের কি আশ্চর্য্য অন্ধতা! লীলাবতী এখন রাণী, লীলাবতী এখন পরের সামগ্রী! আমার অন্ধ প্রেম এ সকল কঠোর চিন্তা একবারও মনে উদিত হইতে দিতেছে না।

রাত্রি দশটার সময় কলিকাতায় পৌছিলাম। তখনই কে আমাকে লীলার সংবাদ দিবে? মনোরমা দেবী কেমন আছেন, কেই বা জানাইবে? অগত্যা আমাকে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু কোথায় যাইলে, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের সংবাদ পাইব? সমস্ত রাত্রি একবারও নিদ্রার সাক্ষাৎ পাইলাম না। স্থির করিলাম, পরদিন প্রত্যুষে শক্তিপুরে যাইব এবং আনন্দধাম-সন্নিহিত লোকজনের নিকট হইতে তাঁহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিব।

গ্যাসালোক নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই আমি গাত্রোত্থান করিলাম এবং ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলাম। বহুক্ষণ ষ্টেশনে বসিয়া যম-যন্ত্রণা ভোগ করার পর বেলা ৭ টার ট্রেণ আমাকে বহন করিয়া শক্তিপুর যাত্রা করিল। আমি বেলা প্রায় ১০টার সময় পূর্ব্বপরিচিত তারার খামারে পৌছিলাম। আমাকে দেখিয়া তারা চিনিতে পারিল এবং একটা কাঠের বাক্স পাতিয়া বসিতে দিল। আমি বসিলে তারা একে একে অনেক কথা আমাকে শুনাইল। তাহার সকল কথাই আমি ধীরভাবে শুনিলাম। যাহা বলিবার নহে, তাহাও সে বলিল। তখন সংসার অন্ধকার! জীবন মরুভূমি হইল। আর কেন?

আর কেন? জানি না, আর থাকি কেন? যে চিতায় লীলার কোমল কলেবর ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহার কণামাত্র ভস্ম পাওয়া যাইতে পারে কি? না, তাহা আর পাওয়া যাইবে না। তাহা পাইলে একবার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই পবিত্র বিভূতি-বিলেপিত-কায় হইয়া জীবন সার্থক করিতাম। তাহা হইবার নহে। তাহার মুখে শুনিলাম, লীলার স্মরণার্থ আনন্দোদ্যানে এক প্রস্তর-ফলক সংস্থাপিত হইয়াছে। লীলাবতী দেবীর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পাষাণখণ্ড কি সহায়তা করিবে? আমার হৃদয় হইতে সে স্মৃতি বিলোপ করে, এমন সাধ্য কাহার আছে? তথাপি একবার সেই পরলোকগতা নবীনার নামযুক্ত পাষাণখণ্ড স্পর্শ করিতে বড়ই বাসনা হইল। আমি ইহজগতে আমার এই শেষ বাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দধাম-সংলগ্ন উদ্যানোদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

ধীরে ধীরে আমি ক্রমশঃ সেই সুপরিচিত, চির

নবীনতা ও সজীবতা-পূর্ণ, বহুমাসব্যাপী আশা ও হতাশার লীলাক্ষেত্র, বিপদ্ ও আশঙ্কার নিকেতন, আমার জীবনের সেই প্রিয় রঙ্গভূমিতে উপনীত হইলাম; কিন্তু কি ভাবে? তাহা আর বুঝাইবার প্রযত্ন করিব না। সেই ক্ষেত্র হইতে আমি কত কাল হইল অন্তরিত হইয়াছি, কিন্তু প্রবল পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে সকলই অচিরপূর্ব্বদৃষ্ট, সম্প্রতি পরিত্যক্ত-রূপে প্রতীত করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, এখনই তিনি আমার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে রচনা-পুস্তক হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন। আহা! মৃত্যু, তোমার আক্রমণ কি কঠোর! হে শমন! তুমি কি নির্ম্মম! হায়! আজি এ কি পরিবর্ত্তন!

আমি সে দিক্ হইতে ফিরিলাম। বরদেশ্বরী দেবীর সেই অমল-ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরবিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আমার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। দেখিলাম, সেই প্রতিমূর্ত্তির পদতলস্থ বেদিকা-পার্শ্বে আর এক অভিনব বেদিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ নবীন বেদিকা কি চিরস্মরণীয়া নবীনার স্মরণার্থ সংগঠিত হইয়াছে? আমি ধীরে ধীরে সেই বেদিকা আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, বেদিকার একপার্শ্বে স্বর্ণাক্ষর-সংযুক্ত এক সমুজ্জ্বল পাষাণফলক সন্নিবিষ্ট। আমি সেই নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন লিপি পাঠ করিতে প্রযত্ন করিলাম। সেই দেবীর নাম আমি পাঠ করিলাম। আমার শেষ বিদায়কালে তাঁহার সেই অশ্রুভারাবনত আয়ত ইন্দীবরলোচন, সেই ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ-সমাচ্ছন্ন অবসন্ন ও আনত শির এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত কাতর ও নির্দ্দোষ অনুরোধ ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই আমি আজি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। বড় আশা করিয়াছিলাম, পুনঃ সাক্ষাতে তাঁহার সুখময় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুখী হইব, তাঁহাকে আনন্দ-ময়ী দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। হা বিধাতা! সে আশার কি এই পরিণাম?

আমি আর একবার সেই ক্লেশপ্রদ লিপি পাঠ করিবার প্রযত্ন করিলাম। কিন্তু না; আর তাহা দেখিব না। সেই দেবীর নামের সহিত এরূপ এক শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে যে, তৎপাঠে আমার চিন্তাগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং আমাকে তাঁহার চিন্তা হইতে বিচ্যুত করিতেছে। অতএব বেদিকার এ পার্শ্বে না থাকিয়া অপর দিকে গমন করিলাম। আমি সেই স্থানে গিয়া উভয় বাহু দ্বারা সেই বেদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলাম এবং বেদিকার উপরে মস্তক স্থাপন করিয়া উপবেশন করিলাম। এখন বাহ্য-জগৎ আমার নয়ন ও অন্তর হইতে অন্তরিত হইল। তখন আমি "প্রাণেশ্বরি! সর্ব্বস্বধন! কোথায় তুমি?" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। "গতকল্য বলিলেই হয়, আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছি,—গতকল্য বলিলেই হয়, তোমার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হই-য়াছে—আর আজি তুমি কোথায়? প্রাণেশ্বরি! আমার হৃদয়রত্ন! আজি তুমি কোথায়?"

কতক্ষণ আমি সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলাম। দূরাগত এক অস্ফুটশব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। শব্দ ক্রমশঃ আমার নিকটে আসিতে লাগিল। তখন আমার বোধ হইল, তাহা মানবের পদধ্বনি। শব্দ থামিয়া গেল। আমি বেদিকার উপর হইতে মস্তকোত্তোলন করিলাম। তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। তাহার বক্র স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাতে কানন উদ্ভাসিত। আকাশ মেঘবিহীন। সুমন্দ মারুত-হিল্লোলে চারিদিক্ আমোদিত। আমি দেখিলাম, বেদিকার বিপরীত দিকে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী সেই বেদিকা দেখিতেছেন এবং আমাকেও দেখিতেছেন। দুই জনেই একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন রমণীদ্বয়ের এক জন অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। আমি সেই সন্ধ্যা-আলোকে সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনি মনোরমা দেবী। সে মুখের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যেন কত বর্ষমেয় কালের তরঙ্গাভিঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। দেখিলাম, সেই প্রীতি-বিস্ফারিত উজ্জ্বল লোচন অধুনা নিতান্ত ভয়চকিত ও ব্যাকুল-ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া আছে, বদনমণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট, শুষ্ক, মলিন ও অবসন্ন হইয়াছে। যাতনা, মনস্তাপ ও বিষাদ তাঁহার উপর অনপনেয় অঙ্কপাত করিয়াছে।

আমি বেদিকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অভি-মুখে এক পদমাত্র অগ্রসর হইলাম। কিন্তু তিনি নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল। তখন তাঁহার সঙ্গিনীর বদন হইতে একটা অপরিস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। সহসা আমার জীবন অব-সন্ন হইয়া পড়িল এবং এক অবক্তব্য আতঙ্কে আমার আপাদ-মস্তক অভিভূত হইয়া গেল। অবগুণ্ঠনবতী সঙ্গিনীর নিকট হইতে সরিয়া ধীরে ধীরে আমার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন মনোরমা দেবী কথা কহিলেন। সেই ভাবান্তরিত ভয়চকিত

নয়নের ন্যায়, সেই রূপান্তরিত কাতর বদনের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বরের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; আমি তাহা ঠিক চিনিতে পারিলাম।

তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আমার স্বপ্ন! আমার সেই স্বপ্ন!" পরে করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বিধাতা! তুমি উঁহার সহায় হও; এই দুঃসময়ে, দয়াময়, তুমি উঁহাকে বল দেও।"

অবগুণ্ঠনবতী ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে আমার নিকটস্থ হইলেন। আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে অতঃপর আমার অন্য কোন দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া গেল। যে কণ্ঠ এতক্ষণ আমার নিমিত্ত ভগবানের সাহায্য কামনা করিতেছিল, তাহা নির্জীব ও রুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই সহসা সতেজে ও সজোরে আমাকে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত নিতান্ত ভীত হতাশভাবে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু তখন সেই অবগুণ্ঠনবতী আমার দেহ ও আত্মার উপর সর্ব্বতোমুখী আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন। অবগুণ্ঠনবতী বেদিকার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে কণ্ঠ এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সেই কণ্ঠ এক্ষণে অধিকতর নিকটস্থ হইয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, "তোমার মুখ ঢাকিয়া রাখ, এই স্ত্রীলোকের মুখ দেখিও না। ভগবান্, উঁহাকে রক্ষা কর।"

তথাপি অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন, দেখিলাম, সেই লীলাবতী দেবী—সেই সজীব, চিরমাধুর্য্যময়ী লীলাবতী দেবী—তাঁহার মৃত্যুর এই অবিসংবাদিত নিদর্শনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি চাহিয়া আছেন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

শুক্লবসনা সুন্দরী

তৃতীয় ভাগ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই সন্ধ্যাসময়ে সেই সরসী-সন্নিহিত সুশ্যামল কাননমধ্যে সহসা স্বর্গীয় লীলাবতী দেবীর সজীব প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করার পর হইতে আমার জীবন-প্রবাহ এক অভিনব পন্থা পরিগ্রহ করিল এবং আমার আশা ও আশঙ্কা, উদ্যম ও অনুরাগ সমস্তই নবীভূত হইয়া আমাকে নবোৎসাহে বলীয়ান্ করিল। সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব শুভসংঘটনের পরবর্ত্তী সপ্তাহকালের বিবরণ বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া, কল্পিত নাম ধারণ করিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম। যে পথপার্শ্বে আমরা বাসস্থান মনোনীত করিলাম, তাহা সতত জনাকীর্ণ। আমাদের বাসভবনের নিম্নতলে একখানি মনোহারী বিপণি। দ্বিতলে ও ত্রিতলে আমাদের বাসা। দ্বিতলে আমি থাকি আর ত্রিতলে শ্রীমতী মনোরমা দেবী ও শ্রীমতী লীলাবতী দেবী আমার ভগ্নী-পরিচয়ে বাস করেন। আমি কলিকাতার একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ রচনা করি; আর তাঁহারা অবকাশকালে মোজা, কম্ফর্টর আদি বুনিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন, তদ্দ্বারা আমার সাহায্য করেন। আমাদের দাসদাসী নাই। রন্ধনাদি সমস্ত গৃহকর্ম্মই মনোরমা দেবী স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তাঁহাকে সেই ক্ষীণ শরীরে, সেই দুর্ব্বল ও শীর্ণ দেহে, সেই চিরসুখসেবিত কলেবরে কঠোর গৃহকর্ম্ম সমাধা করা সম্পূর্ণ অসম্ভাবিত হইলেও আমাদের আয়ের অবস্থা দেখিয়া ও সম্ভাবিত ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনায় অগত্যা তিনি জোর করিয়া এই গুরুভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। কষ্টেসৃষ্টে এক জন ঝি রাখিলেও রাখা যাইতে পারিত, কিন্তু কোন অপরিচিত নূতন লোককে আমাদের এই প্রচ্ছন্ন জীবনের সহিত মিশিতে দেওয়া নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনায় তাহা করা হইল না। সংবাদপত্রের জন্য পরিশ্রম করিয়া আমার যাহা আয় হয়, তাহা হইতে কায়ক্লেশে আমাদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বাঁচিয়া থাকে, তাহা ভবিষ্যতের জন্য আমরা সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখি। লীলাবতী দেবীর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মনোরমা দেবীকে নানা কারণে বহু ব্যয়-ভূষণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীধনস্বরূপ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা তৎসমস্ত নির্ব্বাহিত হইয়া এক্ষণে তাহার প্রায় দুই শত টাকামাত্র অবশিষ্ট ছিল। অধুনা আমরা উভয়ের সঞ্চিত এই ক্ষুদ্র সম্পত্তি একত্র করিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলাম। তাহা আমাদের পবিত্র ধনস্বরূপে রক্ষিত হইল। লীলার নিমিত্ত যে ভয়ানক যুদ্ধে আমি প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার জন্য ভবিষ্যতে আমার কখন কিরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপে বিশ্বরাজ্য হইতে পরিত্যক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে আমরা এই ঘোর জনাকীর্ণ কলিকাতা মহানগরীমধ্যে অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করিলাম। যুক্তির চক্ষে, আইন অনুসারে, আত্মীয়কুটুম্বের বিচারে এবং সর্ব্বসাধারণের বিবেচনায় রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। আমার চক্ষে এবং তাঁহার ভগ্নীর চক্ষে প্রিয়প্রসাদ রায়ের কন্যা, রাজা প্রমোদরঞ্জনের স্ত্রী এখনও জীবিতা; কিন্তু সাধারণের চক্ষে তিনি মৃতের তালিকাভুক্ত—জীবনেও মৃতা ও ভস্মাবশেষে পরিগণতা। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন,

সুতরাং তাঁহার চক্ষে তিনি মৃতা ; ভবনস্থ দাসদাসীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, সুতরাং তাহাদের চক্ষে তিনি মৃতা। রাজপুরুষগণ তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার স্বামী ও পিতৃষ্বসাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে তিনি মৃতা। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ বিচারে তিনি মৃতা। তথাপি জীবিতা ! দুঃখ ও দারিদ্রমধ্যে, দীনহীন এক পরিচিত শিক্ষকের সহায়তায় এবং এক যাতনাক্লিষ্ট বিধবা ভগ্নীর যত্নে পুনরায় সজীব মনুষ্য-মণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হইবার চেষ্টায় নিযুক্ত। যে এই ঘটনা শুনিয়াছে, সেই ইহা নিরতিশয় অসম্ভব ব্যাপার বোধে ঈষৎ বক্র হাস্তের সহিত সকল কথা উপেক্ষা করিয়াছে এবং আমাদের দুই জনকে মুক্ত-কেশী-নাম্নী উন্মাদিনীর সহিত লিপ্ত, ঘোর দুরভি-সন্ধির বশবর্ত্তী, দারুণ চক্রান্তকারী বলিয়া মনে করি-য়াছে। কিন্তু যে লীলাবতীকে কেহই চিনিল না, অতি স্বসম্পর্কিত ব্যক্তিগণও যাঁহাকে তাঁহার স্বরূপত্ব প্রদান করিল না এবং কেহই যাঁহাকে উন্মাদিনী মুক্ত-কেশী ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিল না, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইয়াছিল কি ? যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুর অকাট্য সাক্ষিস্বরূপ সেই স্মরণলিপির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি বদনের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়াছেন, তৎকাল হইতে অণুমাত্র ভ্রম হওয়া দূরে থাকুক, কোন প্রকার সন্দেহের ছায়াও আমার অন্তরে উদিত হয় নাই। সেই দিন দিবাকর অস্তগত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার যে জন্ম-ভবনের দ্বার তাঁহার পক্ষে চির-নিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহার দৃশ্য আমা-দের নেত্র-পথ-ভ্রষ্ট না হইতেই আমি আনন্দধাম হইতে প্রস্থানকালে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহাকে যে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা আমাদের উভয়েরই মনে পড়িল। আমি তখনই তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম ; তিনিও তাহা স্পষ্টই মনে করিলেন। "কিন্তু দেবি, যদি কখন এমন সময় উপস্থিত হয়, কখন আমার প্রাণপণ চেষ্টাতে আপনার এক মুহূর্ত্তেরও সন্তোষ জন্মিতে পারে বা এক মুহূর্ত্তেরও কষ্ট বিদূরিত হইতে পারে, তখন কি দেবি, আপনি দয়া করিয়া এ দীনহীন শিক্ষককে স্মরণ করিবেন ?" যে অবলা পরাগত গুরুতর বিপদ্ ও মনস্তাপের প্রায় কিছুই মনে করিতে অক্ষম, তিনি কিন্তু আমার সেই বহুদিন পূর্ব্বে কথিত এই কথাগুলি সুন্দররূপে স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং তখনই নিতান্ত আত্মীয়-জ্ঞানে আমার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, তাহারা আমাকে সকল কথাই ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে ; তথাপি আমি দিদিকে আর তোমাকে ভুলি নাই।" বহুকাল পূর্ব্বেই আমি সেই দেবীর চরণে আমার সম্পূর্ণ প্রেম উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহার এই বাক্যের পর আমি আমার জীবনও সেই সন্তপ্তা নারীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিলাম এবং সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্ববিধাতার অনুকম্পায় আমার জীবন রক্ষিত হওয়ায় আমি তাহা তদভিপ্রায়ে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইলাম বলিয়া সেই মঙ্গলময় দেবতার উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিলাম।

সময় উপস্থিত হইয়াছে। শত শত ক্রোশ দূর হইতে, ঘোরারণ্য ও দুর্গম গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, আমি সমুচিত সময়ের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত প্রত্যাগত হইয়াছি। অধুনা তিনি আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বহু যাতনায় ক্লিষ্ট, রূপান্তরিত, শ্রীভ্রষ্ট এবং তাঁহার চিত্ত তমসাচ্ছন্ন। এখন তাঁহার সে পদ-গৌরব নাই, তাঁহার সে ধন-সম্পত্তি নাই, তদীয় চরণে আমার হৃদয় ও মনের ঐকান্তিক আনু-গত্য কলঙ্কসংস্পর্শ-শূন্য হইয়া উৎসর্গ করিবার এই যথোপযুক্ত অবসর। বিপদ্-ভারে নিপীড়িত হইয়া, সংসারে বন্ধু-বিহীন হইয়া, তাঁহার এখন আমার হইবার অধিকার হইয়াছে। এখন আমিই তাঁহার একমাত্র সহায়, অনন্য অবলম্বন এবং অদ্বিতীয় বন্ধু। তাঁহার বিলুপ্ত অস্তিত্ব, অপগত রূপরাশি, বিলুণ্ঠিত সুখসম্পদ্, সকলই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত আমি তখনই বদ্ধপরিকর হইলাম। প্রবল-পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং সুকৌশলসম্পন্ন প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। সকল দুর্দ্দশার ও বিপদের সম্মুখীন হইতে আমি প্রস্তুত। আমার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিধ্বংসিত হউক, আমার সুহৃদ্-গণ আমাকে উন্মাদ বোধে পরিত্যাগ করুন, শত সহস্র বিপদ্ ও যাতনা আমাকে নিষ্পেষিত করুক এবং আমার জীবনই গতপ্রায় হউক, আমি আমার সঙ্কল্প কদাপি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অখণ্ডনীয় পণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার অভিপ্রায় ও অবস্থা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করি-লাম, অতঃপর মনোরমা ও লীলার বক্তব্য বিবৃত হওয়া আবশ্যক। আমি তাঁহাদের উভয়ের বর্ণিত

বিশৃঙ্খল বৃত্তান্তমধ্য হইতে আমার ও আমার উকীলের ব্যবহারের জন্য যত্নসহকারে এক সার-সঙ্কলন করিয়াছি। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এ স্থলে তাহাও প্রকাশিত করিলাম। কালিকাপুরের রাজবাটীর গিন্নী-ঝির বক্তব্য যে স্থলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতে মনোরমার কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে।

স্বামিভবন হইতে রাণী চলিয়া আসার পর তদ্‌-ঘটনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বৃত্তান্ত গিন্নী-ঝি মনোরমা দেবীকে জানাইয়াছিল। ইহার কয়েক দিন পরে (কয় দিন, তাহা নিস্তারিণী ঠাকুরাণী ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না) চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর এক পত্র আসিয়া পৌঁছে; তাহাতে লিখিত ছিল যে, কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় রাণী লীলাবতী দেবীর হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কোন দিন এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, চিঠিতে তাহা লেখা ছিল না। আর লেখা ছিল যে, গিন্নী-ঝি যদি ভাল বুঝে, তাহা হইলে এ দুঃসংবাদ এখন মনোরমা দেবীর গোচর করিতে পারে, অথবা যত দিন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষাও করিতে পারে।

ডাক্তার বিনোদ বাবু এই সময়ে স্বয়ং পীড়িত হওয়ায় কয় দিন রাজবাটীতে আইসেন নাই। তিনি আসিলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারই সমক্ষে চিঠি-প্রাপ্তির দিনেই কি তাহার পরদিনে গিন্নী-ঝি সমস্ত সংবাদ মনোরমা দেবীকে জানাইল। এ দারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মনোরমা দেবীর যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা এ স্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সংপ্রতি এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, সংবাদ-প্রাপ্তির পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাঁহার স্থানান্তরে যাইবার শক্তি ছিল না। তৎপরে তিনি গিন্নী-ঝিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। যদি ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোন্ ঠিকানায় পত্র লিখিলে নিস্তারিণী ঠাকুরাণী পাইতে পারেন, তাহা পূর্ব্বেই মনোরমা দেবীকে তিনিই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মনোরমা দেবী তাহার পরে করালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে জানান যে, রাণীর মৃত্যু-বিষয়ে তাঁহার সমূহ সন্দেহ আছে। তিনি এ সন্দেহের কথা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে বাসনা করেন না; এমন কি, নিস্তারিণীকেও তিনি মনের কথা জানান নাই। করালী বাবু পূর্ব্ব হইতেই মনোরমা দেবীর কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বন্ধুভাবে তাঁহার সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি অতি সাবধনতা সহকারে এই বিপজ্জনক ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার ভার গ্রহণ করিলেন।

করালী বাবু প্রথমেই চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে যে যে ঘটনা এখনও শ্রীমতী মনোরমা দেবী জানিতে পারেন নাই, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রেরিত হইয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংবাদ সবিস্তারে তাঁহার গোচর করেন এবং যাহাতে তাঁহার আরও সংবাদ সংগ্রহ করার সুবিধা হইতে পারে, তাহারও সুযোগ করিয়া দেন। ডাক্তার ভোলানাথ বাবু, পাচিকা, ঝি ও বৈষ্ণবগণের সন্ধান চৌধুরী মহাশয় করালী বাবুকে বলিয়া দেন। চৌধুরী মহাশয়, তাঁহার পত্নী, ডাক্তারবাবু এবং পাচিকা ও ঝির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া করালী বাবু স্থিরসিদ্ধান্ত করেন যে, মনোরমা দেবীর এতাদৃশ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক এবং ভগ্নী-বিয়োগজনিত নিদারুণ মনস্তাপে তাঁহার বিচার-শক্তির এরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি মনোরমা দেবীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যে কুৎসিত সন্দেহকে মনে স্থান দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা ভিত্তিহীন ও বিশ্বাসের অযোগ্য। উকীল বাবুর অনুসন্ধানের এইরূপে আরম্ভ ও সমাপ্তি হইল।

এ দিকে মনোরমা দেবী আনন্দধামে ফিরিয়া আসিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রঙ্গমতি দেবীর লিখিত এক পত্র দ্বারা শ্রীযুত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে জ্ঞাত হয়েন। সে চিঠিতেও মৃত্যুর তারিখ লেখা ছিল না। রঙ্গমতি সেই পত্রেই উদ্যানমধ্যে যে স্থানে তাঁহাদের বড় বধূ ঠাকুরাণীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারই পার্শ্বে পরলোক-গতা ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্মরণার্থ এক স্মৃতি-চিহ্ন-সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। রায় মহাশয় এ প্রস্তাবে অসম্মত হয়েন নাই। কয়েক দিবসের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক বেদিকা নির্ম্মিত হইল এবং তাহার এক পার্শ্বে এক সুন্দর প্রস্তরফলক সংযোজিত হইল। এই স্মরণলিপি-সংস্থাপনদিনে যথেষ্ট সমারোহ হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং এতদুপলক্ষে আনন্দধামে আসিয়াছিলেন এবং গ্রামের প্রজাবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছিল। সেই দিন এবং তৎপরে আরও এক দিন চৌধুরী মহাশয় আনন্দধামেই ছিলেন; কিন্তু রায় মহাশয়ের

ইচ্ছানুসারে তাঁহার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে লেখালিখিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল বটে। রাণীর শেষ পীড়া ও মৃত্যুর অন্যান্য বৃত্তান্ত চৌধুরী মহাশয় পত্র দ্বারা রায় মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন। যে যে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছে, তদপেক্ষা কোন নূতন কথা সে পত্রে ছিল না; তবে পত্রসমাপ্তির পর পুনশ্চের মধ্যে মুক্তকেশী-সংক্রান্ত একটা বড় কৌতূহলজনক সংবাদ লিখিত ছিল। তাহাতে রায় মহাশয়কে জানান হইয়াছে যে, মনোরমা দেবী আনন্দধামে আসিলে রায় মহাশয় তাঁহার নিকট মুক্তকেশী-নাম্নী এক স্ত্রীলোকের কথা জানিতে পারিবেন। সেই মুক্তকেশী উন্মাদিনী। কালিকাপুরের রাজবাটীর সন্নিহিত এক গ্রামে মুক্তকেশী আবার ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাকে দ্বিতীয়বার পাগ্‌লা-গারদে রাখা হইয়াছিল। বহু দিন অচিকিৎসায়, স্বাধীনভাবে বিচরণ করায় মুক্তকেশীর মানসিক পীড়া সংপ্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজা প্রমোদরঞ্জনের প্রতি বদ্ধমূল বিদ্বেষ তাহার মত্ততার প্রধান লক্ষণ। সংপ্রতি সেই বিদ্বেষ আর এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। এই অভাগিনী নারী অবরোধের কর্ম্মচারিগণের নিকটে আপনার পদগৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং রাজাকে অধিকতর উত্ত্যক্ত ও ব্যথিত করিবার মানসে আপনাকে রাজার পত্নী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এক দিন সঙ্গোপনে সে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই দিন রাজমহিষীর সহিত স্বীয় আকৃতিগত অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য সন্দর্শনে তাহার মনে এই দুরভিসন্ধি সঞ্চারিত হইয়াছে। পুনরায় অবরোধ হইতে তাহার পলায়নের কোনই সম্ভাবনা নাই। তথাপি সে স্বর্গীয়া রাণীর আত্মীয়গণকে পত্র লিখিয়া উত্ত্যক্ত করিলেও করিতে পারে। তাদৃশ কোন পত্র হস্তগত হইলে যেরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য রায় মহাশয়কে এরূপে সাবধান করা হইল। মনোরমা দেবী শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে আনন্দধামে উপনীত হইলে তাঁহাকে এ পত্র দেখান হইয়াছিল। রাণী কলিকাতায় পিসীমার বাটীতে আসিবার সময়ে যে যে বস্ত্র ও সামগ্রী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তৎসমস্তও এই সময়ে মনোরমাকে দেওয়া হইয়াছিল। রঙ্গমতি ঠাকুরাণী সেই সমস্ত সামগ্রী সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আনন্দধামে পাঠাইয়াছিলেন।

দুর্ব্বল শরীরে, বিজাতীয় মনস্তাপ ও অত্যুৎকট চিন্তা সহ্য না হওয়ায় আনন্দধামে আগমন করার অনতিকালমধ্যে মনোরমার আর একবার পীড়া হইল। মাসাধিক কালের মধ্যে তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল বটে, কিন্তু ভগ্নীর মৃত্যু-সম্বন্ধীয় সন্দেহের বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। এতাবৎকালের মধ্যে তিনি রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের কোনই সংবাদ পায়েন নাই। রঙ্গমতি দেবী তাঁহাকে অনেক পত্র লিখিয়াছেন এবং আপনার স্বামীর নাম করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ সকল পত্রের কোন উত্তর না দিয়া মনোরমা দেবী চৌধুরী মহাশয়ের সিমুলিয়াস্থ ভবন এবং তদ্বাসী ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার সঙ্গোপনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহাতে সন্দেহজনক কোন ব্যবহার দৃষ্ট হয় নাই।

রমণী-নাম্নী সেই ধাত্রীর সম্বন্ধেও মনোরমা দেবী গোপনে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ কোন সন্দেহজনক সংবাদ জানিতে পারেন নাই। প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, সে আপনার স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিয়াছে। পল্লীবাসীরা তাহাদিগকে শান্ত ও ভদ্রপরিবার বলিয়া বিশ্বাস করে। রাজা প্রমোদরঞ্জনের সম্বন্ধে মনোরমা দেবী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, তিনি এক্ষণে কাশীধামে বন্ধুবান্ধবের সহিত ধীরভাবে কাল কাটাইতেছেন।

সর্ব্বত্র বিফল-প্রযত্ন হইয়াও মনোরমা দেবী স্থির হইতে পারিলেন না। তিনি শেষে যে কারাগারে মুক্তকেশী অবরুদ্ধ আছে, স্বয়ং তথায় যাইবার সংকল্প করিলেন। পূর্ব্ব হইতে একবার মুক্তকেশীকে দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। অধুনা মুক্তকেশী যে আপনাকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এ কথা কত দূর সত্য, তাহা জানিতে তাঁহার আরও আগ্রহ হইল। যদি তাহার এরূপ প্রলাপোক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে কোন্ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া সে এরূপ কথা প্রচার করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে তাঁহার অত্যন্ত বাসনা জন্মিল। এই সকল তথ্য নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ১১ই ভাদ্র তারিখে মনোরমা দেবী বাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি ১১ই ভাদ্র কলিকাতাতে রাত্রিযাপন করিলেন। রাণীর পূর্ব্ব-অভিভাবিকা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে তিনি রাত্রিযাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দর্শনমাত্র লীলাবতী দেবীকে স্মরণ করিয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এরূপ

কাতর ও অভিভূত হইয়া উঠিলেন যে, মনোরমা দেবী সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকা উভয় পক্ষেরই অসম্ভব বোধে এক জন পূর্ব্ব-পরিচিত ভদ্র-পরিবারের ভবনে আসিয়া রাত্রিপাত করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি বাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমে বাতুলাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় যে পত্রে রায় মহাশয়কে মুক্তকেশীর প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলেন, তাহা মনোরমা দেবীব সঙ্গেই ছিল। তিনি পত্রের সেই অংশ দেখাইয়া, তিনিই যে তল্লিখিত মনোরমা দেবী এবং স্বর্গীয় রাণীর তিনি যে অতি নিকট-আত্মীয়, এ সকল কথা অধ্যক্ষ মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন; সুতরাং মুক্তকেশীর এরূপ পাগ্‌লামীর কারণ কি, তাহা অবধারণ করিতে অবশ্যই তাঁহার অধিকার আছে। তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় আর কোন আপত্তি করিলেন না।

মনোরমা দেবীর মনে ধারণা হইল যে, রাজা এবং চৌধুরী মহাশয় বাতুলালয়ের অধ্যক্ষকে আভ্যন্তরিক কোন রহস্য জানান নাই এবং সে সরলভাবে মুক্তকেশীর সম্বন্ধে যে যে কথা বলিল, চক্রান্তকারিগণের সহিত সংলিপ্ত হইলে কখনই তাহা বলিত না। উন্মাদিনীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে কারাধ্যক্ষের সহিত মনোরমা দেবীর খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সহজেই অধ্যক্ষ বলিল যে, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় মুক্তকেশীকে ধরিয়া আনিয়া, এই গারদে পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়েরও এক পত্র ছিল। রোগী পুনরায় গারদে আসিলে অধ্যক্ষ প্রথমেই রোগীর কতকগুলি বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন, কিন্তু বায়ুরোগগ্রস্তগণের সেরূপ পরিবর্ত্তন তিনি আরও অনেক দেখিয়াছেন; উন্মাদের আন্তরিক পরিবর্ত্তনের সহিত বাহ্য-পরিবর্ত্তনও অনেক সময় লক্ষিত হইয়া থাকে। রোগ সমভাবে থাকিলে প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কিন্তু যখন ভাল হইতে মন্দে আইসে, অথবা মন্দ হইতে ভালতে যায়, তখনই প্রায় রোগীর আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটে। মুক্তকেশীর রোগের অবস্থা যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই, সুতরাং তজ্জন্য বাহ্যাকারের কিছু পরিবর্ত্তন তিনি সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। তথাপি কারাগার হইতে পলায়নের পূর্ব্বে মুক্তকেশীর যেরূপ ভাব ছিল, এবার পুনরায় আগমনের পর হইতে তাহার অনেক বিভিন্নতা দেখিয়া তিনি কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সকল বিভিন্নতা এত সূক্ষ্ম যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি এমন কথা বলেন না যে, মুক্তকেশীর শরীরের দৈর্ঘ্য, আকার, বর্ণ কিংবা কেশ, চক্ষু ও মুখের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন যে কি, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। কারাধ্যক্ষের এই সকল কথা শুনিয়া পরাগত ঘটনার নিমিত্ত মনোরমা দেবী যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহার মনের বিশেষ ভাবান্তর জন্মিল, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি কিয়ৎকাল নীরবে সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিলেন এবং ধীরে ধীরে কারাধ্যক্ষের সঙ্গে অবরোধমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, মুক্তকেশী তখন কারামধ্যস্থ উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কারাধ্যক্ষ মনোরমা দেবীকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার জন্য এক জন পরিচারিকার উপর ভার দিয়া স্বয়ং কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন, পরিচারিকা মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল, এবং কিয়দ্দূর গমনের পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, দুইটি স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। পরিচারিকা বলিল,—"ঐ যে মুক্তকেশী। আপনি উহার সঙ্গে যে ধাই আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কথা জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মনোরমাও তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহারাও মনোরমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইলে দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জন সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মনোরমাকে দেখিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই পরিচারিকার হস্ত ছাড়াইয়া সবেগে আসিয়া মনোরমার বাহুমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখনই মনোরমা আপন ভগ্নীকে চিনিতে পারিলেন এবং জীবন্মৃতার কাহিনী বুঝিতে পারিলেন—মনের সকল অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে তথায় সেই পরিচারিকা ধাত্রী ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তাহার বয়স বেশী নয়। সে সম্মুখের এই কাণ্ড দেখিয়া এমন বিচলিত হইয়া পড়িল যে, তখন কি করা

কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইল, তখন আর কোন বিষয় না ভাবিয়া তাহাকে মনোরমা দেবীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে হইল; কারণ, তিনি তখন মূর্চ্ছিতা। অনতিকালমধ্যে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং পাছে তাঁহার ভগ্নী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়েন এই আশঙ্কায় বিহিত যত্নে আপনার চঞ্চলতা প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

তাঁহারা উভয়ে সেই পরিচারিকার চক্ষের উপরে থাকিবেন এই কথা স্বীকার করিলে সে তাঁহাকে রোগীর সহিত স্বতন্ত্রভাবে কথা কহিতে অনুমতি প্রদান করিল। তখন আর অন্য কথার সময় নাই। মনোরমা দেবী তখন রাণীকে কেবল স্থির হইয়া থাকিলে শীঘ্রই নিষ্কৃতির উপায় হইবে, অন্যথা সকল দিকেই নষ্ট হইয়া যাইবে, এ কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই নরকপুরী হইতে, এই জীবন্মৃত অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির আশা পাইয়া রাণী তাঁহার ভগ্নীর বাসনানুসারে স্থিরভাবে থাকিতেই স্বীকার করিলেন। মনোরমা তদনন্তর পরিচারিকার সমীপাগত হইয়া তাহার হস্তে পাঁচটি টাকা প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন্ এবং কোথায় তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে?" তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে শঙ্কাকুল বোধ করিয়া মনোরমা দেবী বুঝাইয়া দিলেন যে, অধুনা মনের চাঞ্চল্য হেতু তিনি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম; সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তিনি পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার তাঁহার কোন বাসনা নাই। পরদিন বেলা ৩টার সময় গারদের উত্তরদিকে প্রাচীরের বাহিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সে স্বীকৃত হইল। এমন সময়ে দূরে কারাধ্যক্ষকে আসিতে দেখিয়া মনোরমা শীঘ্র তাহার সহিত কথা শেষ করিয়া আপনার ভগ্নীর কানে কানে বলিলেন,—"ভয় নাই, স্থির হও—কালই দেখা হইবে।" কারাধ্যক্ষ সমীপস্থ হইয়া মনোরমা দেবীর কিছু ব্যাকুলিতভাব লক্ষ্য করিলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, মুক্তকেশীকে দেখিয়া তিনি সত্যই কিছু কাতর হইয়াছেন। তাহার পর আর অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করা অবৈধ বোধে ত্বরায় কারাধ্যক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমস্ত কাণ্ডটা ভাল করিয়া আলোচনা করিবার শক্তি পুনরাগত হইলে মনোরমা স্থির করিলেন যে, রাণীকে আইনসঙ্গত উপায়ে তাঁহার যথার্থ অবস্থা প্রমাণ করাইয়া মুক্ত করিতে হইলে বহুবিলম্ব ঘটিবে এবং তাহাতে সম্ভবতঃ রাণীর বর্ত্তমান দুরবস্থা হেতু অবসন্ন মানসিক শক্তি আরও দুর্ব্বল ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িবে। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্থির করিলেন যে, ঐ পরিচারিকার দ্বারা গোপনভাবে রাণীর নিষ্কৃতির উপায় করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, কলিকাতার এক ব্যাঙ্কে তাঁহার যে সামান্য টাকা ছিল, তাহা সংগ্রহ করিলেন এবং অলঙ্কারাদি যাহা সঙ্গেই ছিল, তাহা বিক্রয় করিলেন। এই উপায়ে তাঁহার হস্তে প্রায় দেড় হাজার টাকা হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সংগৃহীত অর্থের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দিয়াও ভগ্নীর নিষ্কৃতিসাধন করিতে হইবে। সমস্ত টাকা লইয়া পরদিন নিরূপিত সময়ে তিনি বাতুলাগারের প্রাচীর-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

পরিচারিকা সেখানে উপস্থিত ছিল। মনোরমা সাবধানতার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে যে মুক্তকেশীর পরিচারিকা ছিল, মুক্তকেশীর পলাইয়া যাওয়ায় তাহার কর্ম্ম গিয়াছিল। আবারও যদি মুক্তকেশী কোনরূপে পলাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারও কর্ম্ম যাইবে। এ কর্ম্ম যে খুব ভাল, তাহা সে মনে করে না। কারণ, এ কর্ম্মে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবারও বাড়ী যাইবার ছুটী নাই। তাহার স্বামী আছে; কিন্তু এক দেশে থাকিয়াও সে স্বামীর সহিত দেখা করিতে পারে না। এ জন্য সে বড়ই অসুখী। এই জন্যই তাহারা স্বামি-স্ত্রীতে কলিকাতায় কোন দোকান করিয়া একত্রে থাকিবে স্থির করিয়াছে। কিন্তু দোকান করিতে খুব কম হইলেও হাজার টাকা পুঁজি চাই। তাহাই জুটাইবার জন্য এরূপ কষ্টস্বীকার করিয়া সে এই কর্ম্মে রহিয়াছে। তাহার স্বামীও আর এক জায়গায় কর্ম্ম করিতেছে। হাজার টাকা হাতে হইলেই সে এ কর্ম্মের মুখে ছাই দিয়া চলিয়া যাইবে। এই সকল কথা শুনিয়া মনোরমা দেবী যে সুরে কথা কহিলে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন যে, যাহাকে তাহারা মুক্তকেশী বলিয়া মনে করিতেছে, সে তাঁহার অতি নিকট-আত্মীয় এবং সে মুক্তকেশী নহে। ভুলক্রমে তাহাকে মুক্তকেশী বলিয়া গারদে আনিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার উপায় করিলে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হইবে। পরিচারিকা কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই মনোরমা হাজার টাকার

নোট বাহির করিয়া তাহাকে এই উপকারের জন্য পুরস্কারস্বরূপে দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল এবং এরূপ সৌভাগ্য সম্ভব বলিয়াই সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনোরমা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "ইহাতে তোমার ভয়ের কারণ কিছুই নাই। এক জন যথার্থ বিপদাপন্ন লোকের উপকার করিয়া যদি পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি আছে? এই তোমার দোকানের পুঁজির টাকা হইল, এখন তোমার কর্ম্ম থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আর ভাবনা কি? তুমি তাহাকে নিরাপদে আমার নিকট লইয়া আইস। আমি তোমাকে এই হাজার টাকা দিয়া তাহাকে লইয়া যাইব।"

পরিচারিকা বলিল,—"আপনি এই কথা লিখিয়া আমাকে একখানি পত্র দিলে বড় ভাল হয়। আমার স্বামী যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এত টাকা একসঙ্গে আমি কোথায় পাইলাম, তখন আমি তাঁহাকে আপনার ঐ পত্র দেখাইব।"

মনোরমা বলিলেন, "আমি তোমার প্রার্থনামত পত্র লিখিয়া আনিব, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে, বল?"

"হাঁ তা করিব।"

"কখন?"

"কালি।"

স্থির হইয়া গেল কল্য অতি প্রত্যুষে মনোরমা দেবী এই স্থানে আসিয়া পার্শ্বস্থ দুইটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। পরিচারিকা যে ঠিক কোন্ সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে সেখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে, বলা যায় না। কিন্তু যতই হউক, সে সুযোগ পাইবামাত্র মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে, স্থির থাকিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে নোট ও পত্র লইয়া মনোরমা যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনতিকালমধ্যেই পরিচারিকা রাণী লীলাবতী দেবীর হস্ত ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মনোরমা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে পত্র ও নোটের তাড়া দিয়া সাশ্রুনয়নে আপনার ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। এই অচিন্তনীয় ভয়ানক ঘটনার পর ভগ্নীদ্বয়ের পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

পরিচারিকা অতি সদ্বিবেচনা সহকারে রাণীর গায়ে একখানি মোট বিছানার চাদর দিয়া আনিয়াছিল। মনোরমা প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে মুক্তকেশীর পলায়ন-বৃত্তান্ত অবরোধমধ্যে কিরূপে প্রচারিত করিতে হইবে এবং প্রচারিত হইবার পরই বা সে কি বলিবে, তাহা তাহাকে শিখাইয়া দিলেন। সে গারদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অন্য লোক শুনিতে পায়, এমনই ভাবে বলিবে যে, মুক্তকেশী কয় দিন হইতে কেবলই কলিকাতা হইতে কালিকাপুর কত দূর, তাহারই সন্ধান করিতেছে। তাহার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পলায়ন-সংবাদ চাপিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা না বলিয়া, যখন নিতান্তই না বলিলে নহে বুঝিবে, তখন বলিবে যে, মুক্তকেশীকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মুক্তকেশী এখন রাজা প্রমোদরঞ্জনের রাণী হইয়াছে, ইহাই তাহার পাগলামীর প্রধান অঙ্গ; বিশেষতঃ সে আবার কালিকাপুর কত দূর, তাহার সন্ধান করিয়াছে, সুতরাং সে নিশ্চয়ই কালিকাপুরের দিকে গিয়াছে, সকলের মনেই এই ধারণা হইবে এবং তাহারা সেই দিকেই তাহার সন্ধান করিতে ছুটিবে; প্রকৃত দিকে কেহই যাইবে না।

পরিচারিকার সহিত এই সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া, মনোরমা ভগ্নীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং সেই দিন বৈকালের গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রিতে আনন্দধামে পৌছিলেন

আনন্দধামে গমনকালে পথে মনোরমা ধীরে ধীরে সুকৌশলে রাণীকে বিগত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাণীর তখন শরীর ও মনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। তিনি সকল কথা মনে করিয়া ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সম্বন্ধে তিনি যাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নিতান্ত অসংবদ্ধ বৃত্তান্ত হইলেও তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক।

রাণী লীলাবতী কালিকাপুর হইতে চলিয়া আসার পর ক্রমে কলিকাতার ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন দিদির জন্য চিন্তায় তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠিত অবস্থা ছিল, তাহাতে সে দিন কোন্ তারিখ, কি বার, কিছুই তাঁহার মনে থাকা সম্ভব নহে। সে সকল কোন কথাই তাঁহার মনে নাই।

ষ্টেশনে আসিয়াই তিনি চৌধুরী মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল তাহারাই রাণীর সমস্ত সামগ্রীপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন এবং চৌধুরী

মহাশয়ের সহিত এক ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। সে গাড়ীখানা কি রকম, তাহা তিনি তৎকালে লক্ষ্য করেন নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া তিনি চৌধুরী মহাশয়কে মনোরমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। চৌধুরী মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে, মনোরমা এখন আনন্দধামে যান নাই; আরও কয়েক দিন বিশ্রাম না করিয়া তিনি তত দূর পর্য্যটন করিতে অশক্ত।

এখনও তবে মনোরমা চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে উত্তর দেন, তাহা রাণী ঠিক মনে করিয়া বলিতে পারেন না। তবে ইহা তাঁহার মনে আছে যে, চৌধুরী মহাশয় রাণীকে তখনই মনোরমাকে দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাণীর কলিকাতা ভাল করিয়া দেখা ছিল না, এ জন্য কোন্ কোন্ পথ দিয়া তাঁহাদের গাড়ী চলিতে লাগিল, তাহা তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। যেখানে গাড়ী থামিল, সে স্থানটা বহুজনাকীর্ণ ও কলবরপূর্ণ। এই কথা শুনিয়া নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয় কখনই তাঁহাকে আশুতোষ দের গলীর মধ্যস্থ স্বীয় আবাসে লইয়া যান নাই। তাঁহারা উপরে উঠিয়া একতম প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জিনিসপত্র সযত্নে তুলিয়া লওয়া হইল; এক জন ঝি আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিল এবং দীর্ঘ-শ্মশ্রুযুক্ত এক বাঙ্গাল পুরুষ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেল। রাণী তাঁহার দিদি কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করায় চৌধুরী মহাশয় উত্তর দেন যে, তিনি এখানেই আছেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তিনি এবং সেই শ্মশ্রুধারী বাঙ্গাল তাহার পর সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন; রাণী তথায় একাকিনী বসিয়া রহিলেন সে ঘরের সাজগোজ বড় মন্দ এবং ঘরটা দেখিতেও ভাল নহে। নিম্নতলে অনেক মানুষ কথা কহিতেছে বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন। অনতিকালমধ্যে চৌধুরী মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন যে, মনোরমা দেবী এখন ঘুমাইতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহাকে বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এবার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে এক জন ভদ্রবেশধারী পুরুষ ছিলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে নিজের এক জন বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন।

সেই ভদ্রলোকটির নাম কি অথবা তিনি কে, তাহার কিছুই না বলিয়া চৌধুরী মহাশয় আবার প্রস্থান করিলেন। ভদ্রলোকটি রাণীর ঘরেই থাকিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা বিশেষ সৌজন্যব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি আশ্চর্য্য প্রশ্ন শুনিয়া, তাঁহার দৃষ্টির বিকট ভাব দেখিয়া রাণী নিতান্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞাত পুরুষ কিয়ৎকালমাত্র সে ঘরে থাকিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার অত্যল্পকাল পরে আর এক ভদ্রলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনাকে চৌধুরীর এক জন বন্ধু বলিয়া পরিচিত করিলেন। তিনিও অতি বিকটভাবে রাণীর প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন এবং কতকগুলি নিতান্ত অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর তিনিও পূর্ব্বব্যক্তির ন্যায় প্রস্থান করিলেন। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রাণীর মনে অত্যন্ত ভয় হইল এবং তিনি নীচে নামিয়া আসিয়া ঝিকে ডাকিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তদভিপ্রায়ে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র চৌধুরী মহাশয় তথায় পুনরাগত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র রাণী তাঁহাকে নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসিলেন যে, তাঁহার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহাকে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে? প্রথমে চৌধুরী একটা উড়ো জবাব দিলেন, কিন্তু নিতান্ত পীড়াপীড়ি হওয়ায় অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত স্বীকার করিলেন যে, মনোরমা দেবী যেরূপ ভাল আছেন বলিয়া এতক্ষণ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ তিনি সেরূপ নাই। তাঁহার কথার ভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়া রাণীর অত্যন্ত ভয় হইল এবং অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আগমনাবধি তাঁহার মনে যে উদ্বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বর্দ্ধিত হইল। এই সকল প্রবল মানসিক কষ্টে রাণীর মস্তিষ্ক নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় হওয়ায় এক গ্লাস পানীয় জলের প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চৌধুরী মহাশয় দ্বার-সমীপে আসিয়া কাহাকে এক গ্লাস জল এবং স্মেলিং সল্টের শিশি আনিতে বলিলেন। সেই শ্মশ্রুধারী বাঙ্গাল উভয় সামগ্রীই আনয়ন করিল। জলপান করিতে আরম্ভ করিয়া রাণী তাহাতে এরূপ কটু আস্বাদ অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মাথা ঘোরা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি চৌধুরী মহাশয়ের হস্ত হইতে স্মেলিং সল্টের শিশিটা লইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলেন। মাথা আরও ঘুরিয়া উঠিল এবং স্মেলিং সল্টের শিশি হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। চৌধুরী মহাশয় পতনোন্মুখ শিশি ধারণ করিলেন। রাণীর শেষ এইমাত্র মনে আছে যে, চৌধুরী মহাশয়

তাঁহার নাসিকাগ্রে স্মেলিং সল্টের শিশি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

অতঃপর রাণীর কথিত বৃত্তান্ত নিতান্ত অসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যবিরহিত। তিনি বলেন যে, অনেক রাত্রিতে তাঁহার চৈতন্য হয়. তখন তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে আহারাদি করিয়া রাত্রি-যাপন করেন। কেমন করিয়া, কাহার সঙ্গে তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে গমন করিলেন, তাহা কিছুই মনে করিতে পারেন না। তিনি যে অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন। আরও অসম্ভব কথা তিনি বলেন যে, সেখানে রমণী-নাম্নী পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল। অন্নপূর্ণার সহিত তাঁহার কি কথা হইয়াছিল অথবা সেখানে আর কেই বা ছিল এবং রমণীই বা সেখানে কেন আসিয়াছিল, এ সকল কোন কথাই তিনি মনে করিয়া বলিতে পারেন না।

পরদিন প্রাতের যে বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করেন, তাহা আরও অসংবদ্ধ ও অবিশ্বাস্য। তিনি বলেন, প্রাতে চৌধুরী মহাশয় ও রমণীর সহিত তিনি গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। কিন্তু কখন্ এবং কেন তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটী হইতে চলিয়া আইসেন, তাহার কোন কথাই তিনি বলিতে পারেন না। গাড়ী কোন্ দিকে চলিল, কোথায় গিয়া থামিল এবং চৌধুরী মহাশয় ও রমণী নিয়ত তাঁহার সঙ্গে ছিল কি না, এ সকল কথারও তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন না। সহসা তিনি এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এবং নানাবিধ অপরিজ্ঞাত স্ত্রী-লোকের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধ্যে যে কি হইল, এক দিন কি দুই দিন—কত সময় অতীত হইল, তাহার এক কথাও তিনি মনে করিয়া বলিতে অক্ষম। এই স্থানেই বাতুলালয়। এই স্থানে তিনি সবিস্ময়ে শ্রবণ করিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মুক্তকেশী বলিয়া ডাকিতেছে এবং এই স্থানে তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, তিনি মুক্তকেশীর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে বলিল,—"তুমি আপনার কাপড়-চোপড় দেখিতেছ না? কেন তুমি আপনাকে রাণী রাণী বলিয়া আমাদের জ্বালাতন করিতেছ? তুমি মুক্তকেশী, এ কথা সকলেই জানে।"

আনন্দধামে যাত্রাকালে পথে সাবধানতা সহকারে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মনোরমা রাণীর নিকট হইতে কেবল এই অসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যহীন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। বাতুলালয়ে অবস্থানকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মনোরমা দেবী তাহা জানিতে চেষ্টা করিলেন না; কারণ, অধুনা রাণীর যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে সে সকল বৃত্তান্ত পুনরায় আলোচনা করিতে হইলে নিতান্ত কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বাতুলালয়ের অধ্যক্ষের কথামতে রাণী ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তথায় স্থাপিত হন। সেই দিন হইতে ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত তিনি অবরুদ্ধা ছিলেন। এতাবৎকাল লোকে নিরন্তর তাঁহাকে মুক্তকেশী বলিয়া ডাকিয়াছে, তিনি যে সত্যই মুক্তকেশী, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তিনি যে উন্মাদিনী, তাহা তাঁহাকে সকলেই বলিয়াছে ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়াছে। এরূপ ভয়ানক অবস্থায় অবস্থাপিত হইলে তাঁহার অপেক্ষা কঠিন-প্রকৃতিক, অভিজ্ঞ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু ব্যক্তির চিত্তও নিশ্চয়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কেহই এইরূপ ভয়ানক ঘটনার পর অপরিবর্ত্তিতরূপে প্রত্যাগত হইতে পারে না।

১৫ই রাত্রিতে আনন্দধামে পৌছিয়া সে দিন আর মনোরমা দেবী কোন গোল উত্থাপন করিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিশেষরূপ সতর্কতার সহিত অগ্রে প্রাসঙ্গিক নানা কথা বলিয়া, তিনি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। আশঙ্কা ও বিস্ময় অন্তরিত হইলে, রায় মহাশয় রাগের সহিত বলিলেন যে, মুক্তকেশী নিশ্চয়ই মনোরমাকে ভুলাইয়াছে। তিনি চৌধুরী মহাশয়ের পত্রের শেষাংশ এবং উভয়ের আকৃতিগত যে সাদৃশ্যের কথা মনোরমা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, তৎসমস্ত তাঁহাকে মনে করিতে বলিলেন। তিনি সে পাগলিনীকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সম্মুখে আসিতে দিতে অস্বীকার করিলেন; আর বলিলেন যে, সে উন্মাদিনীকে বাটীতে আসিতে দেওয়াই নিতান্ত অত্যাচার হইয়াছে। মনোরমা অতিশয় ক্রোধের সহিত সে গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। ক্রোধের প্রথম উগ্রতা মন্দীভূত হইলে তিনি স্থির করিলেন, রাণী সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত লোকের ন্যায় এ বাটী হইতে বিদূরিত হইবার পূর্ব্বে যেমন করিয়া হউক, রায় মহাশয়ের সমক্ষে তাঁহাকে একবার উপস্থিত করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অনতিকালমধ্যে রাণী লীলাবতীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রায় মহাশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ভৃত্য প্রবেশ করিতে একবার নিষেধ করিল

বটে, কিন্তু মনোরমা তাহাকে একটা ধমক দিতেই সে দ্বার হইতে চলিয়া গেল। তখন মনোরমা ভগ্নীর হাত ধরিয়া রায় মহাশয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সেখানে যাহা যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা করিতে হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হয়; এইজন্য মনোরমা সে কথা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এ স্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রায় মহাশয় সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখাগত স্ত্রীলোককে তিনি কখনই চিনেন না; তাহার মুখের ভাব ও ব্যবহারাদি দেখিয়া তাঁহার স্থির প্রতীতি হইয়াছে যে, সে কখনই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী হইতে পারে না; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর যে মৃত্যু হইয়াছে, তৎপক্ষে তাঁহার কোনই সংশয় নাই এবং যদি এই পাগলিনীকে অদ্যই তাঁহার বাটী হইতে স্থানান্তরিত করা না হয়, তাহা হইলে তিনি দ্বারবানের দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। রায় মহাশয় যেরূপ স্বার্থপর, অলস ও হৃদয়হীন ব্যক্তি, তাহাতে এ ব্যবহার তাঁহার অনুরূপ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজার হইলেও মনে মনে চিনিতে পারিয়া, মুখে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। সেরূপ ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যবহার নিতান্ত পশু-প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষেও কদাপি সম্ভব নহে। এ পক্ষে চেষ্টার এই স্থানে শেষ হইল দেখিয়া, মনোরমা অতঃপর বাটীর দাস-দাসীগণের নিকটে এ কথা উত্থাপন করিলেন। তাহারা পূর্ব্ব হইতে তাহাদের প্রভু-তনয়ার সহিত মুক্তকেশী-নাম্নী উন্মাদিনীর যে সাদৃশ্যের কথা শুনিয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহা বিচার করিয়া, তাহারাও উপস্থিত স্ত্রীলোককে রাণী লীলাবতী বলিয়া স্বীকার করিল না। এতক্ষণে মনোরমা বুঝিলেন যে, দীর্ঘকাল অবরোধ ও নানাবিধ মনস্তাপ হেতু তাঁহার বাহ্যাকারের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাঁহার চক্ষে না হইলেও অন্যের চক্ষে তাহা বড়ই ভয়ানক। যে কল্পনাতীত চক্রান্ত তাঁহার মৃত্যু-ঘোষণা করিয়াছে, তাহা এতই প্রবল যে, তাহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া রাণীর জন্মভবনে ও তাঁহার আজন্ম-পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকটেও তাঁহার বিদ্যমানতা সমর্থন করা মনোরমার পক্ষে অসম্ভব হইল।

ঘটনা নিরতিশয় বিপজ্জনক না হইলে, এত শীঘ্র হতাশভাবে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইত না। গিরিবালা নামে সেই ঝি রাণীকে যেরূপ জানিত, তাহাতে সে যে তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিলে চিনিতে পারিত না, এমন বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে এখন সেখানে ছিল না, দিন দুই পরে আসিতে পারে, কথা আছে। তাহার চেনার দরুণ হয় তো অন্যের মনের সংস্কারও ক্রমশঃ দূর করিলে করা যাইতে পারিত। তা ছাড়া রাণীকে দিনকতক এখানে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেও ক্রমে ক্রমে অবশ্যই তাঁহার শরীর ভাল হইয়া উঠিত এবং তাঁহার পূর্ব্ব-লাবণ্য ও সজীবতা আবার দেখা দিত। তাহা হইলে লোকজন অবশ্যই তাঁহাকে চিনিতে পারিত। কিন্তু যে উপায়ে তাঁহাকে স্বাধীন করা হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ কোন অনুষ্ঠান নিতান্তই অসম্ভব। গারদ হইতে লোকেরা আপাততঃ তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য কলিকাপুরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু যেই তাহারা সেখানে তাঁহার সন্ধান না পাইবে, সেই নিশ্চয়ই আনন্দধামের দিকে ধাবিত হইবে। এই সকল কথা আলোচনা করিয়া মনোরমা আপাততঃ এ সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব, এ স্থান হইতে কোন নিরাপদ্ স্থানে পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কলিকাতায় গিয়া থাকাই তাঁহার সুবিধা বলিয়া মনে হইল। সেরূপ লোকারণ্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকা অনেকটা সহজ কাজ। চিরস্মরণীয় ১৬ই ভাদ্রের বৈকালে মনোরমা ভগ্নীকে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বনের নিমিত্ত উত্তেজিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা উভয়ে চিরপরিচিত ক্রীড়াভূমি ও বাল্যলীলার নিকেতন হইতে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত লোকের ন্যায়, ভীত ও অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় সঙ্কোচসহকারে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা উদ্যানপার্শ্ব দিয়া চলিয়া আসার পর রাণী লীলাবতী দেবী ইহজীবনের মত একবার আপনার জননীর প্রতিমূর্ত্তি শেষ দেখা দেখিয়া লইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মনোরমা তাঁহাকে এ বাসনা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাণী এ বিষয়ে দিদির ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার সেই নিষ্প্রভ নয়নে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বাহুতে আবার শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি জোর করিয়া দিদিকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। আমার অন্তরে নিয়তই এই বিশ্বাস যে, বিশ্ববিধাতা, কৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধু, এই ঘটনায় সেই বাদশাপন্না

মর্ম্মপীড়িতা সুন্দরীর শরীরে ও হৃদয়ে বলবিধান করিয়া তাঁহার চিরমঙ্গলময় নামের অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কারণ, এরূপ না হইলে তাঁহার বিয়োগ-বিধুর দীন সন্তান ইহসংসারে সে নিদারুণ অন্তর্জ্বালা-নিবৃত্তির উপায় কোথায় খুঁজিয়া পাইত ?

তাঁহারা উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানে এই তিনটি জীবনের ভবিষ্যৎ সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা তৎকালে অতীত কাহিনী যত দূর পরিজ্ঞাত ছিলাম, তাহা লিখিত হইল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার মনে স্বতই দুই মীমাংসা সমুপস্থিত হইল। প্রথমতঃ এই লোমহর্ষণ কুমন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত চক্রান্তকারিগণকে কতই সুযোগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, কতই সাবধানতা সহকারে ঘটনাবলী পরিচালিত করিতে হইয়াছে, তাহা আমি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। অন্যান্য আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া ও বৃত্তান্ত এখনও আমার অপরিজ্ঞাত থাকিলেও সেই শুক্লবসনা সুন্দরী এবং রাণীর আকৃতিগত সাদৃশ্য-সূত্রাবলম্বনে যে এই অচিন্তনীয় দুষ্কর্ম্ম সংসাধিত হইয়াছে, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তকেশী চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় রাণীরূপে পরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছিল। ইহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রাণী বাতুলালয়ে সেই পরলোকগতা রাণীর স্থান অধিকার করিতে বাধ্য হইলেন। সকল পরিবর্ত্তন এরূপ সুকৌশলে সংসাধিত হইয়াছিল যে, ডাক্তার, চৌধুরী মহাশয়ের ভবনস্থ পাচিকা ও দাসী এবং সম্ভবতঃ বাতুলালয়ের অধ্যক্ষ প্রভৃতি নির্লিপ্ত ও নিরীহ ব্যক্তিগণ বিশেষ সংস্রবে থাকিয়াও এ দারুণ চক্রান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ সহসা তাঁহাদের সকলকেই চক্রান্তে বিশেষরূপ লিপ্ত ও সহায়কারী বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তের পরিণামমাত্র। চৌধুরী মহাশয় ও রাজার হস্তে আমাদের তিন জনের কোন প্রকারে নিষ্কৃতি নাই, ইহা স্থির। এই চক্রান্তে কৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহাদের দুই জনের তিন লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে; এক জন দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছেন, আর এক জন স্ত্রীর যোগে এক লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়াছেন। এই ভয়ানক কাণ্ড প্রচ্ছন্ন রাখিতে না পারিলে তাঁহাদের লাভের হানি তো হইবেই, অধিকন্তু তাঁহাদের উভয়কেই যার-পর-নাই বিপন্ন হইতে হইবে এবং রাজদ্বারে বিশেষ-রূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে; এই সকল কারণে তাঁহাদের জঘন্য চক্রান্তের প্রধান লক্ষ্য কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাকে অকৃত্রিম সুহৃদ মনোরমা ও আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কোন প্রকার যত্নের ও চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

এই ভয়ানক বিপদ্ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকেই গ্রাস করিতে পারে, বিবেচনা করিয়া আমি কলিকাতায় বহুজনতাপূর্ণ কার্য্যময় এক পল্লীমধ্যে আমাদের বাসস্থান অবধারিত করিলাম। সে পল্লীর সকল লোকই কর্ম্মময় ও স্ব স্ব ভাবনায় ব্যস্ত, সুতরাং তাহাদের এমন সময় ও অবকাশ নাই যে, তাহারা পরের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। আমি কলিকাতায় এই জনাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এই ঘোর অত্যাচারের প্রতিবিধান এবং এই বিজাতীয় কাণ্ডের প্রতীকারকল্পে জীবনকে ব্রতী করিলাম।

এই নূতন আবাসে নূতন অবস্থায় অবস্থাপিত হওয়ার পর যখন কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের জীবন-প্রবাহ ধীরে ধীরে সুনিয়মে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন ভবিষ্যতে আমি কিরূপ প্রণালীতে আমার বর্ত্তমান ব্রতপালনে অগ্রসর হইব, তাহা অবধারণ করিয়া লইলাম।

আমি যে লীলাবতীকে চিনিতে পারিয়াছি অথবা মনোরমা যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এ দুই প্রমাণে কোন ফল হইবে না, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমরা দুই জনেই তাঁহার নিকট অপরিসীম, অতি বলবান্ প্রেমডোরে বাঁধা। এই প্রেম আমাদের হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত সংস্কার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য? আমাদের কি বিচার করিয়া, আলোচনা করিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে চিনিতে হইবে?

অতীত ঘটনাবলীর ভয় ও নানাবিধ অত্যুৎকট মনস্তাপ, মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার আকৃতিগত যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভিন্নতা ছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে অবিকল তত্তুল্য করিয়া তুলিয়াছে। আমি যৎকালে আনন্দধামে অবস্থান করিতাম, তৎকালে উভয়কে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল,

যদিও স্থূলতঃ উভয় কামিনীর অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, তথাপি সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই অতীতকালে এতদুভয়কে একত্রে দাঁড় করাইয়া দেখিলে, কাহারও মনে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে কোনই ভ্রান্তি হইত না। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা যায় না। লীলাবতীর অনাগত জীবনে যদি কখন বিষাদ ও যাতনা সমুপস্থিত হয় তাহা হইলে মুক্তকেশীর সহিত সাদৃশ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে বলিয়া তৎকালে আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সুখ-সৌভাগ্য-সংবেষ্টিতা লীলাবতী দেবীর জীবনের সহিত তাদৃশ অপ্রিয়কল্পনা একবারও মনে মনে বিমিশ্রিত করিয়াছিলাম বলিয়া আমার তখন নিরতিশয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! ঘটনাচক্র এখন সত্য সত্যই সুকুমারীর সুকোমল হৃদয় ও শরীরকে নিদারুণ দুঃখ-ভারে নিপীড়িত করিয়াছে। তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও যৌবনশ্রী অধুনা যাতনাজনিত কালিমা-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে এবং একদা যে সাদৃশ্যের কথা মনে মনে আলোচনা করিয়াও ব্যথিত হইতাম, এখন তাহা সর্ব্বাংশে সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা দুই জন তাঁহাকে যে চক্ষে দর্শন করি সে চক্ষু ব্যতীত অন্য কোন চক্ষু তাঁহাকে তাঁহার বাতুলালয় হইতে মুক্তির দিবস দর্শন করিলে কখনই সেই লীলাবতী বলিয়া চিনিতে পারিত না এবং সে জন্য তাহাদিগকে অপরাধী করিবার কোনই করেণ নাই।

এই সকল কারণে লীলার বাহ্যাকারের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ের অবস্থাও তেমনই মন্দ হইয়াছিল। দৈহিক দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার চিরন্তন সজীবতা, লাবণ্য ও শোভা যেমন বিধ্বংসিত হইয়াছিল, মনের শক্তিও সেইরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি বড়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বকালের কোন প্রসঙ্গই তিনি ভাল করিয়া মনে করিতে পারিতেন না, অতীত ঘটনা সকল তিনি সহসা স্মরণ করিতে পারিতেন না এবং অল্পদিন পূর্ব্বে চৌধুরী মহাশয় ও রাজার প্রযত্নে যে যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও তিনি মনে করিয়া বলিতে পারিতেন না। লীলার মানসিক শক্তির এবংবিধ অভাব ও তাঁহার নিরন্তর অপ্রফুল্লতা আমাদের চিন্তার প্রধান ও প্রথম বিষয় হইল। আমি ও মনোরমা অবিরত লীলার হৃদয়ে প্রফুল্লতা সঞ্চারিত করিতে ও তাঁহাকে তাঁহার বিগত সজীবতা পুনঃ প্রদান করিতে বিহিত-বিধানে চেষ্টা করিতে নিযুক্ত হইলাম।

আহার ও পথ্যের সুব্যবস্থায় বাহ্য দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া ক্রমশঃ মনের অবস্থাও ভাল হইবে মনে করিয়া, আমরা আপনারা অতি সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত থাকিয়া, লীলার নিমিত্ত নানাবিধ পুষ্টিকর ও বলবিধায়ক সুখাদ্য ব্যবস্থা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক-শক্তি সমুত্তেজিত করিবার বাসনায় নানাপ্রকার আয়োজন করিলাম। আমাদের সেই ক্ষুদ্র আবাসে লীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ আমরা নানাপ্রকার মনোহর পুষ্পাদি দ্বারা সাজাইতে লাগিলাম এবং লীলার চিত্ত বিনোদিত হইতে পারে, এরূপ নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। তাহাতে লীলার চিত্ত অনুরক্ত হইতেছে দেখিয়া, ক্রমশঃ আমি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ কাব্যাদি পড়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। লীলা সানন্দে পাঠ করিতে সম্মত হইলেন। আবার—বহুকাল পরে—আবার আমি লীলার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার নিকট কাব্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে নিযুক্ত হইলাম। ইহাতে লীলার চিত্ত ক্রমেই অধিকতর সজীব ও প্রফুল্ল হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ববৎ ভাব আবার দেখা দিতে লাগিল। এক দিন আমি লীলাকে পাঠ বলিয়া দিয়া নীচে নিজ প্রকোষ্ঠে আগমন করিয়া প্রবন্ধ-রচনায় নিযুক্ত হইলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আমি আবার লীলার ঘরে গমন করিলে লীলা লজ্জাবনত-বদনে ঈষৎ হাস্যের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আমি আনন্দধামে কখন কখন এক একটা কবিতা লিখিতাম, আপনি তাহার বড়ই প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাহার পর এত দিনের মধ্যে আর একটিও কবিতা লিখি নাই। আজি আবার আমি একটি ছোট কবিতা লিখিয়াছি। যদি তাহা দেখিয়া আপনি রাগ না করেন, তাহা হইলে সেটি আপনাকে দেখিতে দিব। বলুন, রাগ করিবেন না?" ধন্য বিধাতঃ! তোমার অপার করুণাবলে আমার প্রাণের প্রাণ লীলাবতী যাহা ছিলেন, আবার তাহাই হইতেছেন।

যেরূপে হউক, যত ক্ষতি স্বীকার করিয়াই হউক এবং যত কষ্টেই হউক, লীলার পূর্ব্ব-অবস্থা পুনরায় সংস্থাপন করিতেই হইবে। মনোরমা ও আমি পরামর্শ করিলাম, আমাদের সংকল্পসিদ্ধির নিমিত্ত যে কোন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সকলই লীলার নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কারণ, সেই সকল ব্যাপারের আলোচনা করিতে হইলে লীলার অতিশয় কষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে তাঁহার ক্ষীণ মস্তিষ্ক আবার অবসন্ন হইয়া পড়িতে পারে। এইরূপ সংকল্পবদ্ধ হইয়া আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

মনোরমার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে যেখান হইতে যত বৃত্তান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, সমস্ত সংগৃহীত হইলে পর করালী বাবুকে সকল কথা জানাইতে হইবে এবং আইনের সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। মনোরমা রাজবাটীতে অবস্থানকালে যে দিনলিপি লিখিয়াছিলেন, প্রথমতঃ আমি তাহারই আলোচনায় নিযুক্ত হইলাম। এই দিনলিপির মধ্যে স্থানে স্থানে আমার প্রসঙ্গ ছিল। তৎসমস্ত আমার নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিবেন মনে করিয়া মনোরমা তাহা আমাকে পড়িতে না দিয়া স্বয়ং পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতে লাগিলেন। আমি তন্মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ লিখিয়া লইতে লাগিলাম। গভীর রাত্রিতে সাংসারিক অন্য কার্য্য শেষ হওয়ার পর আমরা দিনলিপির আলোচনা করিতাম। তিন রাত্রিতে এ কার্য্য শেষ হইল।

তদনন্তর কোন দিকে কোন সন্দেহ উৎপাদন না করিয়া অন্যত্র যে সংবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। লীলা যে বলিতেছেন, তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আবাসে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এ কথা কত দূর সত্য, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমি ঠাকুরাণীর বাটীতে গমন করিলাম। এ স্থলে এবং ভবিষ্যতে অন্য স্থলেও প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া, যখন লীলার কথা উঠিল তখন 'স্বর্গীয়া রাণী' বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

মৎকৃত প্রশ্নের উত্তরে অন্নপূর্ণা যে উত্তর দিলেন, তাহা শুনিয়া আমার পূর্ব্বের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। লীলা সেখানে রাত্রিতে থাকিবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একবারও সেখানে আইসেন নাই। এই বিষয়ে এবং অন্যান্য কোন বিষয়ে লীলার নিতান্ত বিস্ময়াবহ ভ্রম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এরূপ ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা সহজ নহে। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, এরূপ বিপরীত প্রমাণ আমাদের উদ্দেশ্যের নিতান্ত প্রতিকূল সন্দেহ নাই।

ঠাকুরাণীকে লীলা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে চাহিলে, তিনি আমাকে তাহা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার খামখানি তিনি রাখেন নাই; নিষ্প্রয়োজন বোধে তিনি তাহা ফেলিয়া দিয়াছেন। চিঠিতে কোন তারিখ দেওয়া নাই। ডাকের মোহর দেখিয়া একটা তারিখ বুঝিতে পারা যাইতে পারিত, কিন্তু খামখানিও হারাইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, চিঠিতে রাণী স্বয়ং লিখিয়াছেন বটে যে, তিনি কল্য আসিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীতে রাত্রি অতিবাহিত করিবেন। সে কয় ছত্রের দ্বারা বর্ত্তমান অনুসন্ধানবিষয়ে কোনই সহায়তা হইবার সম্ভাবনা নাই।

অন্নপূর্ণা দেবীর বাটী হইতে হতাশভাবে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, রাজবাটীর গিন্নী-ঝি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীকে একখানি পত্র লিখিবার জন্য মনোরমাকে বলিলাম। তাঁহাকে লেখা যাউক যে, চৌধুরী মহাশয়ের কোন কোন ব্যবহার একটু সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গিন্নী-ঝি সত্যের অনুরোধে সমস্ত ঘটনা আমাদিগকে জানাইলে আমরা উপকৃত হইব। এ ক্ষেত্রেও 'স্বর্গীয়া রাণী' নামেই লীলাবতীর কথা উল্লেখ করা হইল। এ দিকে পত্রের উত্তর আসিতে যে কয় দিন বিলম্ব হইবে, সে সময়টা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া আমি সিমুলিয়ায় ডাক্তার বাবুর নিকট গমন করিলাম। সেখানে আপনাকে শ্রীমতী মনোরমা দেবীর প্রেরিত লোকরূপে পরিচিত করিয়া স্বর্গীয়া রাণীর' মৃত্যু সম্বন্ধে তৎকালে উকীল করালী বাবু যে যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত আরও কোন নূতন সংবাদ এখন জানিতে পারা সম্ভব কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। ভোলানাথ বাবুর সহায়তায় আমি মৃত্যুর সার্টিফিকেটের নকল পাইলাম এবং যে বৈষ্ণবেরা সৎকারার্থ শব লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলাম, আর রামমতিনাম্নী সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীরও সন্ধান পাইলাম। রামমতি সংপ্রতি প্রভুপত্নীর সহিত মনান্তর হেতু কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমি গিন্নী-ঝি, ডাক্তার বাবু, বৈষ্ণবগণ, রামমতি প্রভৃতি সকলের লিখিত বৃত্তান্ত সংগৃহীত করিলাম। তৎসমস্ত এ গ্রন্থের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল কাগজপত্র সংগৃহীত হইলে আমি মনে করিলাম, এখন করালী বাবুর সহিত পরামর্শ করার সময় হইয়াছে। মনোরমা আমার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, কোন বিশেষ গোপনীয় কথা-বার্ত্তার জন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, অতএব কোন্ দিন কোন্ সময়ে উকীল বাবুর সুবিধা হইবে, তাহা জানাইলে তিনি বাধিত হইবেন।

প্রাতে আমি লীলাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের ভবনস্থ বারান্দায় বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরিক্রমণের পর তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সজীব বোধ করিয়া আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এবং লীলাকে 'অভিজ্ঞানং শকুন্তলা' পড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পাঠালোচনা হইলে আমি উঠিবার উদ্যোগ করিলাম। তখন লীলা নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে আমার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গুলী সকল পূর্ব্বকালের ন্যায় তত্রত্য একটা পেন্‌সিল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। তিনি অবশ্যই কি বলিবেন মনে করিয়া আমি একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নিতান্ত কাতরভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বকালে তুমি আমাকে যেমন ভালবাসিতে, এখনও কি তেমনই ভালবাস? এখন আমার সে লাবণ্য নাই, সে সজীবতা নাই, আমার মনের সে প্রখরতা নাই। এখন দেবেন্দ্র, এখনও কি তুমি আমাকে তেমনই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাক? এখন আমি তোমার স্নেহের, তোমার ভালবাসার নিতান্ত অযোগ্য। আমাকে তুমি বলিয়া দাও, আমি কি করিলে আবার তেমনই হইতে পারিব?"

শিশুর ন্যায় সরলভাবে লীলাবতী সুন্দরী এইরূপ আমাকে হৃদয়ের ভাব জানাইলেন। আমি বলিলাম, —"ললীবতি, তুমি পূর্ব্বকার অপেক্ষা এক্ষণে আমার অধিকতর স্নেহের, অধিকতর ভালবাসার সামগ্রী হইয়াছ। তোমার সুখ-সৌভাগ্য অপগত হওয়ায় সম্ভবতঃ তোমার নিতান্ত কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমার ভালবাসা তোমার সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া জন্মে নাই, সুতরাং তাহার হ্রাস হইবে কেন? তোমার কষ্টে, তোমার দুঃখে আমার অনুরাগ এখন আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেন লীলা, তুমি এ অলীক চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছ? দেবি! হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে সচেষ্ট হও, এ অবস্থান্তরের কষ্ট বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর এবং সতত আনন্দিত থাকিয়া আমাকে ও মনোরমাকে সুখী কর। তোমার আনন্দ, তোমার প্রফুল্লতা, তোমার সুখ ভিন্ন আমাদের জীবনের আর কোনই লক্ষ্য নাই।"

লীলা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন, —"আর আমার আনন্দের কি অভাব আছে? যদি কিছু অভাব থাকে, তাহাও আর থাকিবে না। কিন্তু দেবেন্দ্র, তুমি যেন এখন কোথায় যাইবে বোধ হইতেছে। যেখানেই যাও, ফিরিয়া আসিতে দেরী করিও না। তুমি বাটী না থাকিলে আমার চিত্ত সুস্থির থাকে না।"

আমি বলিলাম,—"না লীলা, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তুমি চিত্তকে সুস্থির ও সজীব করিতে চেষ্টা কর।"

বাহিরে আসিয়া আমি মনোরমাকে আমার সঙ্গে আসিতে সঙ্কেত করিলাম। প্রকাশ্যরূপে পথে বাহির হইলে আমার বিপদ্ ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে মনোরমাকে সতর্ক করিয়া রাখা আবশ্যক বোধে আমি বলিলাম,—"সম্ভবতঃ আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিব। আমার অনুপস্থিতিকালে দেখিও, কেহই যেন বাটীর মধ্যে আসিতে না পায়। আর যদিই কিছু ঘটে—"

মনোরমা তৎক্ষণাৎ আমার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল দেবেন্দ্র, আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, কি বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; তাহা হইলে সে জন্য আমি সাবধান থাকিব।"

আমি বলিলাম,—"লীলার পলায়ন-সংবাদ শুনিয়া রাজা প্রমোদরঞ্জন বোধ হয়, কলিকাতা আসিয়াছেন। তুমি শুনিয়াছ, আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি আমার পশ্চাতে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যদিও আমি তাঁহাকে কখন দেখি নাই, তথাপি সম্ভবতঃ তিনি আমাকে চিনেন।"

মনোরমা আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া উদ্বেগের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। ইহাতে আমার কতই গুরুতর বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হইল।

আমি বলিলাম,—"এত শীঘ্রই যে রাজা অথবা তাঁহার নিয়োজিত লোক আমাকে কলিকাতার পথে দেখিতে পাইবে, এরূপ আমি মনে করি না; তবে সেরূপ ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে। যদিই সেরূপ কারণে আমি আজি রাত্রে বাটী ফিরিতে না পারি, তাহা হইলে তোমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইও না এবং কোনরূপ কৌশল করিয়া লীলাকে কোন কথা জানিতে দিও না। যদি আমি বুঝিতে পারি, কোন গোয়েন্দা আমার অনুসরণ করিতেছে, তাহা হইলে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এ বাটী পর্য্যন্ত না আসিতে পারে, আমি তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিব। যতই বিলম্ব হউক, আমি যে ফিরিয়া আসিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না।"

দৃঢ়তার সহিত মনোরমা বলিলেন,—"না। মনে করিও না যে, ক্ষুদ্র স্ত্রীলোক ভিন্ন তোমার আর সহায় নাই। আমি কখনই সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া তোমার বাধা জন্মাইব না।" আবার কিয়ৎকাল তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহার পর উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, —"কিন্তু দেবেন্দ্র, সাবধানের বিনাশ নাই। বল, খুব সাবধানে চলাফেরা করিবে?"

আমি মস্তকান্দোলন করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলাম এবং এই সন্দেহ-সমাকুলিত অন্ধকারময় অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাথমিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

করালী বাবুর কার্য্যালয়ে আসিতে পথে কোনই সন্দেহজনক কাণ্ড দেখিলাম না। কিন্তু কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া আমার হঠাৎ মনে হইল যে, আমি এরূপে এখানে আসিয়া কাজ ভাল করি নাই। মনোরমার দিনলিপি শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি করালী বাবুকে রাজবাটী হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয় খুলিয়াছিলেন এবং গিরিবালার যোগে প্রেরিত তাঁহার দ্বিতীয় পত্রও চৌধুরীর স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং চৌধুরী মহাশয় করালী বাবুর আফিসের ঠিকানা বেশ জানেন। এখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, লীলাকে আবার হস্তে পাইয়া মনোরমা অবশ্যই করালী বাবুর সহিত পরামর্শ করিবেন। এরূপ স্থলে করালী বাবুর আফিসের নিকট চৌধুরী মহাশয় ও রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আমাকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত যে লোক লাগাইয়াছিলেন, যদি এবারও তাহাদের লাগাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ এখনই ব্যক্ত হইয়া যাইবে। রাস্তায় পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই ভাবনাই ভাবিতেছি, কিন্তু এখানে যে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমার একবারও মনে হয় নাই। এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া সময় থাকিতে থাকিতে আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এখন আর সে বিবেচনায় ফল কি? যাহা হইয়াছে, তাহার আর হাত নাই; এখন ফিরিবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকিব সঙ্কল্প করিলাম।

কিয়ৎকাল বাহিরে অপেক্ষা করার পর করালী বাবুর আরদালী আমাকে বাবুর খাসকামরায় লইয়া গেল। দেখিলাম, করালী বাবু লোকটি খুব কৃশ, খুব কর্ম্মী, বড় ধীর এবং বেশ বিচক্ষণ। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম এবং বলিলাম,—"মহাশয়, আমার বক্তব্য আমি যত সংক্ষেপেই কেন শেষ করি না, তথাপি অনেকক্ষণ সময় লাগিবে।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"মনোরমা দেবীর কর্ম্মে সময়ের বিচার করিতে আমার অধিকার নাই। আমার অংশীদার শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু কার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণকালে আমাকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে, মনোরমা দেবীর কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহাতে কদাচ অবহেলা করা না হয়।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসিলাম,—"উমেশ বাবু এখন কোথায় আছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"তিনি আপাততঃ দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেছেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু কত দিনে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, তাহার কোনও স্থিরতা নাই।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে করালী বাবু সম্মুখস্থ কাগজপত্র খুঁজিয়া মোহরমুক্ত একখানি পত্র বাহির করিলেন। আমি মনে করিলাম, তিনি বুঝি পত্রখানি আমার হস্তে প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি পত্রখানি না দিয়া, সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন এবং আমার বক্তব্য শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া বর্ত্তমান ব্যাপারের যাহা জানিতাম, সকলই তাঁহাকে জানাইলাম। আইন-ব্যবসায়িগণ সহজেই চাপা। বিশেষতঃ করালী বাবু তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তথাপি আমার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় ও অবিশ্বাস হেতু বারংবার তাঁহার মুখের নিরতিশয় ভাবান্তর দেখা গেল; তিনি চেষ্টা করিয়াও সে ভাব কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আমি ক্ষান্ত না হইয়া আমূল বক্তব্য শেষ করিলাম এবং সমস্ত কথা সমাপ্ত করিয়া সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন বলুন, এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

তিনি বেশ করিয়া বিচার না করিয়া হঠাৎ মত দিবার লোক নহেন। বলিলেন,—"আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি প্রশ্ন করিবার আবশ্যকতা আছে।"

তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সকল তীক্ষ্ণ, সন্দেহ-পূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া আমি সহজেই অনুমান করিলাম যে, করালী বাবু স্থির করিয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই কাহারও চাতুরীতে পড়িয়াছি। যদি আমি মনোরমার পত্র লইয়া না আসিতাম, তাহা হইলে হয় তো তিনি আমাকে কোন দুষ্টাভিসন্ধি-প্রণোদিত, প্রবঞ্চনাকারী, অসৎ লোক বলিয়াই মনে করিতেন।

তাঁহার জিজ্ঞাস্য শেষ হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"আমার কথা সত্য বলিয়া কি আপনার বিশ্বাস হইতেছে না?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আপনাদের বিশ্বাসমতে আপনি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি এবং তজ্জন্য এরূপ ব্যাপারে তিনি যে ভদ্রলোককে মধ্যস্থরূপে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাকে আমিও বিশ্বাস করিতে বাধ্য। শিষ্টাচারের অনুরোধে এবং যুক্তির অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, রাণীর অস্তিত্ব আপনার নিকটে ও মনোরমা দেবীর নিকটে সুন্দররূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমার নিকটে আইনের মত জানিতে আসিয়াছেন। আমি আইন-ব্যবসায়ী। আইনানুসারে আমাকে বলিতে হইতেছে, দেবেন্দ্র বাবু, আপনার মোকদ্দমা টিকিবে না।"

আমি বলিলাম,—"করালী বাবু, আপনি বড় শক্ত কথা বলিতেছেন।"

তিনি বলিলেন,—"আমার শক্ত কথা আমি সহজ করিয়া দিতেছি। রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যুর প্রমাণ সহজ চক্ষে দেখিলেও বেশ পরিষ্কার ও সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পিসীই বলিতেছেন যে, তিনি পিসার বাসায় আসিয়াছিলেন, সেখানে পীড়িয়া হইয়াছিলেন এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যু সম্বন্ধে এবং সে মৃত্যু যে স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে ডাক্তারের প্রমাণ রহিয়াছে। যে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিয়াছে, তাহারাও সাক্ষী রহিয়াছে। এই মামলা আপনি উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। আপনি বলিতেছেন, যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে ও যাহার সৎকার হইয়া গিয়াছে, সে রাণী লীলাবতী নহে। ইহার আপনি কি প্রমাণ দিতেছেন? আপনার কথিত বৃত্তান্তের প্রধান প্রধান অংশ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাহার মূল্য কি দাঁড়ায়। মনোরমা দেবী পাগ্‌লা-গারদে গিয়া একটি পাগলিনীকে দেখিতে পান। ইহা সকলেরই জানা আছে যে, মুক্তকেশী-নাম্নী এক পাগলিনীর সহিত রাণীর আকৃতির অত্যদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল; সে ঐ গারদ হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। ইহাও জানা আছে যে, গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ যে স্ত্রীলোককে পাগ্‌লা-গারদে রাখা হয়, সেই মুক্তকেশী বলিয়াই পুনরায় গৃহীত হয়। ইহাও জানা আছে যে, যদিও কেহই তাহার কথা প্রত্যয় করেন নাই, তথাপি গারদে মুক্তকেশী বার বার আপনাকে রাণী লীলাবতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এ সকলই সত্য ঘটনা। ইহার বিরুদ্ধে আপনার বলিবার কি কথা আছে? মনোরমা দেবী তাঁহাকে দেখিয়াই রাণী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পরাগত ঘটনা সকল সে পরিচয়ের নিতান্ত প্রতিকূল। মনোরমা দেবী তখনই কি আপনার ভগ্নীর স্বরূপত্ব কারাধ্যক্ষের গোচর করিয়া আইনসঙ্গত উপায়ে তাহার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? না তিনি গোপনে এক জনকে ঘুষ দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপে সন্দেহজনকভাবে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া যখন তিনি তাঁহাকে রাধিকা বাবুর নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন? মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখ মনে পড়ায় তিনি একবারও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন কি? না। চাকরবাকরের কেহই কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল? না। তাহার পর তাঁহার স্বরূপত্ব সমর্থন ও অন্য নানারূপ চেষ্টার জন্য তাঁহাকে নিকটেই কোন স্থানে রাখা হইয়াছিল কি? না—তাঁহাকে গোপনে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে আপনিও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি কোনরূপ জ্ঞাতি-কুটুম্ব নহেন। চাকরবাকরের সাক্ষ্য দ্বারা আপনার সাক্ষ্য কাটিয়া গেল। আর আপনারা যাঁহাকে রাণী বলিতেছেন, তিনি নিজেই নিজের সাক্ষ্য কাটিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, তিনি রাত্রিতে কলিকাতায় এক জায়গায় ছিলেন। আপনি প্রমাণ পাইয়াছেন, তিনি সে জায়গার দিক্ দিয়াও যান নাই। আর আপনি বলিতেছেন, তাঁহার এখন মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহাকে নিজের কোন কথা বলিবার জন্য কোন স্থানে উপস্থিত হইতে দেওয়া অসম্ভব। সময় বাঁচাইবার অনুরোধে উভয় পক্ষেরই সামান্য সামান্য কথা আমি আর এখন আলোচনা করিব না। এখন আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আদালতে জুরীর সমক্ষে এই মোকদ্দমা উঠিলে আপনি কি প্রমাণ দিবেন?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার আমূল সমস্ত অবস্থাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া লইলাম। মনোরমা ও লীলার কাহিনী এক জন নিঃসম্পর্কিত লোক শুনিলে কি বিবেচনা করে, তাহা আমি এই প্রথম বুঝিলাম। আমাদের সম্মুখে যে সকল বিকট প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, এতক্ষণে আমার তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিল। আমি বলিলাম,—"মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে সমস্ত ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের অত্যন্ত বিরোধী বটে।"

তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আপনি মনে করিতেছেন, এ সকল সত্য ঘটনা; সুতরাং ইহার বিরুদ্ধ ব্যাপার সমূহ সহজেই কার্য্য-কারণ দেখাইয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে। সে সম্বন্ধেও আমি যাহা বুঝি, তাহা বলি, শুনুন। বিচারক আপনার অত ব্যাখ্যা, অত মীমাংসা শুনিয়া কখনই কার্য্য করিবেন না। তিনি ঘটনাটি শুনিয়া সহজেই যাহা বুঝা যায়, তাহাই বুঝিবেন ও তদনুযায়ী বিচার করিবেন। মনে করুন, আপনারা যাঁহাকে লীলাবতী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, এক স্থানে তিনি রাত্রিপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রমাণ হইতেছে, তিনি তাহা করেন নাই। আপনি এ বিষয়ের মীমাংস করিবার জন্য তাঁহার সে সময়ের মনের অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের তর্ক বাধাইয়া দিবেন। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, আপনার সে মীমাংসা ভুল; কিন্তু মনে করুন দেখি, বিচারক বাদীর নিজের কথায় অবিশ্বাস করিবেন, না আপনার কূট-তর্কে বিশ্বাস করিবেন?"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু নিয়ত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আরও প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে না কি? আমার ও মনোরমা দেবীর কয়েক শত টাকা আছে—"

তিনি আমার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনিই একবার বেশ করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন না। আপনি রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের প্রকৃতির যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যদিও সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করিতেছি না, তথাপি যদি তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আপনার নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করার প্রতিকূলে তাঁহারা প্রাণপণ যত্নে প্রভূত প্রতিবন্ধক না জন্মাইয়া কখনই স্থির থাকিবেন না। মোকদ্দমার যত দূর ব্যাঘাত জন্মাইতে পারা যায়, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই জন্মাইবেন, প্রত্যেক কথার উপর আইনের কূট-তর্ক উঠিবে এবং কয়েকটি শতের কথা কি বলিতেছেন,—সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াও আমাদিগকে হারিয়া বাটী আসিতে হইবে। যে সকল স্থলে আকৃতিগত সাদৃশ্যের গোল থাকে, বর্ত্তমান মোকদ্দমার ন্যায় আনুষঙ্গিক এত গোলমাল না থাকিলেও তাহার মীমাংসা নিতান্ত কঠিন। আমি এই অতি অসাধারণ কাণ্ডের কোনই মীমাংসা দেখিতেছি না। বস্তুতই দেবেন্দ্র বাবু, এ মোকদ্দমার কোন জুত নাই—ইহা টিকিবে না।"

কিন্তু আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, মোকদ্দমার বেশ জুত আছে এবং ইহা টিকিবে। আমি এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"ভাল, অন্য কিরূপ প্রমাণ পাইলে কাজ হইতে পারে, বলুন।"

তিনি বলিলেন,—"আর যে প্রমাণে ফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সংগ্রহ করা আপনার সাধ্যাতীত। তারিখগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে সহজেই নিশ্চিত ফল পাওয়া যাইত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাহা সংগৃহীত হওয়াও অসম্ভব। যদি মৃত্যুর তারিখ ও রাণীর কলিকাতা আগমনের তারিখ এতদুভয়ের অনৈক্য দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কাহাকেও আর কথাটি কহিতে হইত না এবং আমি তখনই বলিতাম. মোকদ্দমা চালাইতে হইবে।"

"এখনও চেষ্টা করিলে তারিখ পাওয়া যাইতে পারে।"

"যে দিন পাইবেন, সেই দিন আপনার মোকদ্দমার আর এক চেহারা দাঁড়াইবে। যদি এখন তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমাকে বলুন, আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র তৈয়ার করিতে আরম্ভ করি।"

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। গিন্নী-ঝি কিছু বলিতে পারেন না, লীলার কিছু মনে নাই, মনোরমা কিছু জানেন না। ইহ-জগতে কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ভিন্ন বোধ হয়, আর কেহই জানেন না। বলিলাম,—"এখনই তারিখ সংগ্রহ করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। এখন অনেক চিন্তা করিয়াও রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ছাড়া আর কেহ তাহা জানেন, এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না।"

এ পর্য্যন্ত করালী বাবুর স্থির-গম্ভীর বদনে একবারও হাসি দেখি নাই। এখন তাঁহার মুখে ঈষৎ হাস্য দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—"এই দুই জনের সম্বন্ধে আপনার যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে সে স্থান হইতে কৃতকার্য্য হওয়া কত দূর সম্ভব, তাহা বুঝিয়া দেখুন। যদি তাঁহারা এই চক্রান্ত দ্বারা রাণী-কৃত টাকা হস্তগত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন কথা স্বীকার করিবেন, এমন বোধ হয় না।"

"কিন্তু করালী বাবু, তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।"

"কে বলপ্রয়োগ করিবে ?"

"কেন, আমি।"

আমরা উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তিনি আগ্রহ সহকারে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়া আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বুঝিলাম যে, আমি তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি। তিনি বলিলেন,—"আপনি অতি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দেখিতেছি, এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কোন বিশেষ স্বার্থ মিশ্রিত আছে। আমার তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই; আমি আপনাকে এইমাত্র বলিতেছি যে, যদি কখন আপনি মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সাহায্য করিব। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমি এ কথাও বলিয়া রাখি যে, যদিই আপনি রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার টাকা উদ্ধারের কোন উপায় হইবে, এমন বোধ হয় না। বাঙ্গাল মহাশয়ের বাড়ী নাই, ঘর নাই, তাঁহার ঠিকানা করাই ভার হইবে। আর রাজার দেনা এত বেশী যে, এক কপর্দ্দকও আদায় করিতে পারা যাইবে না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—"রাণীর আর্থিক প্রসঙ্গের কোনই আবশ্যক নাই। আমি পূর্ব্বেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা জানিতাম না এবং এখনও তাঁহার অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ভিন্ন আর কিছুই জানি না। আপনি অনুমান করিয়াছেন যে, এ ব্যাপারের মধ্যে আমার কোন বিশেষ স্বার্থ মিশ্রিত আছে, সে কথা সত্য। সে স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে আমার মনোবৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন অন্য কোন কামনামূলক নহে,—" তিনি আমার বাক্যস্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি আমার অভিপ্রায়ে সন্দেহ করিয়াছেন মনে করিয়া, আমি তখন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এ জন্য তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া বলিতে লাগিলাম,—"আমার স্বার্থের মূলে কোন অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। রাণী তাঁহার জন্মভবন হইতে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছেন; তাহার মৃত্যুর ক্ষোদিত নিদর্শন তাঁহার মাতৃ-প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল দুই ব্যক্তি এই বিজাতীয় অত্যাচারের নিমিত্ত দায়ী। সেই জন্মভবনের দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় উন্মুক্ত হইবে এবং সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সেই ক্ষোদিত নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। যদিও বিচারাসন-সমাসীন বিচারপতি মহাশয়ের ক্ষমতাবলে তাহা সংশোধিত না হয়, তথাপি আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আমার নিকট ঐ দুই ব্যক্তিকে তাহাদের দুষ্কৃতির নিমিত্ত দায়ী ও পদাবনত করিবই করিব। আমি এই ব্রতে আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদিও আমি নিঃসহায়, তথাপি ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলে নিশ্চয়ই আমার মনোরথ সফল করিব।"

করালী বাবু কোন কথা না কহিয়া টেবিলের দিকে একটু সরিয়া বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, তিনি স্থির করিয়াছেন, ভ্রান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা হেতু আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে আর কোনরূপ উপদেশ দেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমি আবার বলিলাম,—"আমাদের উভয়ের মনের ভাব উভয়ের জানা থাকিল; কাহার বিশ্বাস সফলিত হয়, তাহা ভবিষ্যতে সপ্রমাণ হইবে। সংপ্রতি মহাশয় আমার কথিত বৃত্তান্ত মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করায় আমি নিতান্ত কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আইনসঙ্গত কোন প্রতীকার আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; মোকদ্দমায় যেরূপ প্রমাণের প্রয়োজন, আমাদের তাহা নাই; আর মোকদ্দমা চালাইবার মত অবস্থাও আমাদের নহে। এ সকল সংবাদ জানিয়াও আমার কিছু লাভ হইয়াছে, বলিতে হইবে।"

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলে, তিনি আমাকে আবার ডাকিয়া আমার হস্তে সেই পূর্ব্বকথিত পত্রখানি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "কিছু দিন পূর্ব্বে ডাকযোগে এই পত্রখানি আমার নিকট আসিয়াছে। এখানি আপনি হাতে করিয়া লইবেন কি ? মনোরমা দেবীকে বলিবেন, আমি এ বিষয়ে যে উপদেশ দিলাম, তাহা আপনার যেমন বিরক্তিকর হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহারও তেমনই অপ্রীতিজনক হইবে; সে জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

যখন তিনি কথা কহিতেছিলেন, তখন আমি পত্রখানির শিরোনাম পাঠ করিতেছিলাম। তাহাতে লিখিত আছে, "শ্রীমতী মনোরমা দেবী সমীপেষু। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসু উকীল মহাশয়ের নিকটে, ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।" সে হাতের লেখা আমি আর কখন দেখি নাই। প্রস্থানকালে আমি করালী বাবুকে জিজ্ঞাসা

করিলাম,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন এখনও পশ্চিমে আছেন কি কোথায় আছেন, আপনি জানেন কি ?"

তিনি উত্তর দিলেন,- "আমি তাঁহার উকীলের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

আমি প্রস্থান করিলাম। অফিসের বাহিরে আসিয়া সাবধানতার অনুরোধে কোন দিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়া চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। বিপরীতদিকে গড়ের মাঠের পথে চলিতে লাগিলাম। হাইকোর্ট হইতে ইডন গার্ডেন যাইতে যে পথ আছে, তাহার সম্মুখে গিয়া আমি একটু দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, হাই-কোর্টের কোণে দুইটি লোক দাঁড়াইয়া গল্প করি-তেছে। এক মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া, আমি সে দিক্ হইতে ফিরিলাম, লোক দুইটির পার্শ্ব দিয়া আবার ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম। আমি নিকটস্থ হইলে, এক জন একটু সরিয়া গেল, আর এক জন সমানই দাঁড়াইয়া থাকিল। কাছ দিয়া যাইবার সময় আমি লোকটার মুখের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম। সন্দেহ ঘুচিয়া গেল, স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম, আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যে দুই ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহারই এক জন।

যদি আমি স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তখনই তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া, তাহাকে উত্তমমধ্যম দিয়া, কাইত করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন আমার চারি-দিক্ ভাবিয়া কাজ করা আবশ্যক, এখন সেরূপ কার্য্য করিলে আমাকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের হাতে পড়িতে হইবে। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতিই এ অবস্থায় আমার অবলম্বনীয়। সে লোকটা চলিয়া গেল ; আমি সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম এবং শীঘ্রই তাহাকে ছাড়াইয়া চলিলাম। ভবিষ্যতে সহজে চিনিতে পারিবার জন্য তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখিলাম ; তাহার পর আমি সে দিক্ হইতে ফিরিয়া ধীরে ধীরে লাট সাহেবের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলাম। লোক দুইটা ক্রমাগতই আমার পিছনে আসিতেছে দেখিলাম। একখানি খালি গাড়ী পাওয়া অথবা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত যাওয়া আমার উদ্দেশ্য। অচিরে একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী বিপ-রীতদিক্ দিয়া আসিতে দেখিলাম। কোচম্যান আমাকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু গাড়ী।" আমি কোন কথা না বলিয়া তাহার গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম এবং তাহাকে বলিয়া দিলাম,—"বৌবাজার।" সে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। সেখানে আর খালি গাড়ী ছিল না। একটা গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত না যাইতে পারিলে আমার অনুসরণকারীদের গাড়ী পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা নিরুপায় হইয়া আমার গাড়ীর পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। কিন্তু সেরূপে তাহারা কতক্ষণ দৌড়িবে ? কিছু কাল পরেই তাহারা নিরস্ত হইল। আমি যথাস্থানে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। দেখিলাম, তাহারা কেহই সঙ্গে আসিয়া উঠিতে পারে নাই। অনেকক্ষণ এ দিক্ সে দিক্ করিয়া ঘুরিয়া, একটু রাত্রি হইলে বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম, মনোরমা আমার নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন। লীলা আজি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমি ফিরিবামাত্র মনোরমা আমাকে সেই প্রবন্ধটি দেখাইবেন স্বীকার করিলে পর লীলা তাঁহার অনু-রোধে শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। এখন তাঁহার ঘুম আসিয়াছে। প্রবন্ধের কাগজ হস্তে লইয়া দেখিলাম, সেই মুক্তাফলতুল্য সুন্দর সমশীর্ষ হস্তাক্ষর পূর্ব্বে নিতান্ত দুর্ব্বলতা হেতু যেরূপ কুৎসিত, বক্র ও বিজ-ড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন ক্রমশঃ তদপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে, রচনার কৌশল ও ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া মানসিক শক্তি যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সবিশেষ সুদৃঢ় হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিলাম। লীলার ক্রমোন্নতি দেখিয়া অপার আনন্দ সহকারে আমি বার বার মনে মনে বিধাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলাম ; তাহার পর নিতান্ত অস্ফুটস্বরে মনোরমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলাম। পার্শ্বের ঘরে লীলা নিদ্রাগত আছেন ; একটু উচ্চ শব্দ হইলে তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়া যাওয়ার সম্ভা-বনা।

যতক্ষণ আমি করালী বাবুর সহিত কথোপকথনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, ততক্ষণ মনোরমার মুখের কোন ভাবান্তর দেখিলাম না। কিন্তু যখন আমি সেই লোক দুইটার কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম এবং রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ সংবাদ জানাই-লাম, তখন তাঁহার মুখের নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাব দেখিলাম।

তিনি বলিলেন,—"নিতান্ত কুসংবাদ ; দেবেন্দ্র, বড়ই মন্দ কথা। তার পর ?"

আমি বলিলাম,—"তার পর বলিবার আর কোন কথা নাই; কিন্তু তোমাকে দিবার একটা সামগ্রী আছে।" এই বলিয়া করালী বাবু-প্রদত্ত সেই পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি পত্রের শিরোনাম পাঠ করিয়াই কে পত্র লিখিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"কে পত্র লিখিয়াছে, চিনিতে পারিয়াছ কি?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"খুব চিনিয়াছি জগদীশনাথ চৌধুরী এ পত্রের লেখক।"

এই কথা বলিয়া তিনি পত্রের গালার মোহর ভাঙ্গিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন এবং পত্র বাহির করিয়া তাহা পাঠ করিলেন। পাঠকালে, সম্ভবতঃ ক্রোধাতিশয্য হেতু তাঁহার মুখ ও চক্ষু আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি আমাকে তাহা পাঠ করিতে দিলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত ছিল,—

"মহীয়সি মনোরমা সুন্দরি! আপনার অতুলনীয়, মহোচ্চ গুণ-সমূহে বিমুগ্ধ হইয়া অদ্য আমি আপনাকে দুইটি হৃদয়-তৃপ্তিকর আশ্বাসের কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি। কোন ভয় নাই! আপনার স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনা করিয়া আপনি নিভৃত-নিবাসে কালাতিপাত করিতে থাকুন; কদাপি বিপদাকীর্ণ প্রকাশ্য লোক-রাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়াস করিবেন না। ইহসংসারে আত্মত্যাগের ন্যায় মহৎকার্য্য আর কিছুই নাই; আপনি তাহাই অবলম্বন করুন। আত্মীয় সঙ্গে একান্তবাস চির-নবীনতায় ও সজীবতায় পরিপূর্ণ; আপনি স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে তাহাই সম্ভোগ করুন। সুন্দরী-কুলোত্তমে! মানব-জীবনের বিপদ্‌বাত্যা-সমূহ কখনই নির্জ্জন-বাসরূপ অধিত্যকাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না; আপনি সানন্দে সেই উপত্যকায় বাস করিতে থাকুন।

"আপনি যদি এই প্রণালীর অনুবর্ত্তিনী হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অভয় দিতেছি, আপনার কখনই কোন বিপদ্ ঘটিবে না। আর কোন অভিনব বিষাদ-ভারে আপনার অতি কোমল মনোবৃত্তি-সমূহ কদাপি নিপীড়িত হইবে না; আপনাকে আর কেহই উত্যক্ত করিবে না এবং আপনার নির্জ্জন-নিবাসের সুন্দরী সঙ্গিনীর কেহই আর অনুসন্ধান করিবে না। আপনার হৃদয়-মধ্যে তিনি নূতন আশ্রয়স্থান লাভ করিয়াছেন। অমূল্য—অমূল্য আশ্রয়স্থান। আমি তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের হিংসা করি।

"আর একটি স্নেহপূর্ণ সাবধানতার কথা জ্ঞাপন করিয়া আমি আপনার উদ্দেশ্যে এই লিপি-রচনারূপ পরম প্রীতিপ্রদ কার্য্য হইতে আপাততঃ অবসর গ্রহণ করিব। আপনি সম্প্রতি যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়া আর এক পদও অগ্রসর হইবেন না। কাহাকেও কোনরূপ ভীতি-প্রদর্শনের প্রযত্ন করিবেন না। আপনার সুবিধা লক্ষ্য করিয়া আমি আমার এই কর্ম্মময় জীবন, অপরিসীম উদ্যম-শীলতা এবং অতলস্পর্শী অভিসন্ধি-সমূহকে দমিত ও অবনত রাখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালপাত করিতেছি। আমাকে কোনমতেই পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারিত করাইবেন না। যদি আপনার কোন অপরিণত-বুদ্ধি উদ্ধত বন্ধু থাকেন, আপনি তাহার অত্যনুরাগকে মন্দীভূত করিয়া দিবেন। যদি দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন, আপনি তাঁহার সহিত কদাপি বাক্যালাপ করিবেন না। আমি আত্মপরিগৃহীত পন্থায় পরিভ্রমণ করিতেছি এবং প্রমোদরঞ্জন আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। যে দিন দেবেন্দ্র বাবু আমার সেই পথবর্ত্তী হইবেন, সেই দিন তাঁহার সকলই ফুরাইবে।"

এই পত্রের শেষভাগে বহুবিধ অঙ্কশোভিত এক 'জ' ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নাম লিখিত ছিল না। নিতান্ত ঘৃণার সহিত পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমি বলিলাম, "এ ব্যক্তি যখন তোমাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে, তখন সে নিশ্চয়ই নিজে বিশেষ ভয় পাইয়াছে।"

মনোরমার ন্যায় নারী যে এ পত্র আমারই মত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। পত্রের ভাষার ভাব ও তন্মধ্যস্থ প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা-সূচক সম্বোধন বাক্যসমূহ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধস্বরে আমাকে বলিলেন,—"দেবেন্দ্র! যদি কখন এই দুইটা নররূপী পিশাচ তোমার হাতে পড়ে, আর যদি কোন কারণে তাহাদের এক জনকে ক্ষমা করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার নিকট আমার এই মিনতি, তুমি যেন চৌধুরীটাকে কখন ছাড়িও না।"

আমি নিক্ষিপ্ত পত্র পুনরায় তুলিয়া লইয়া বলিলাম,—"সময় উপস্থিত হইলে তোমার কথা সহজেই মনে পড়িবে বলিয়া আমি পত্রখানি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেছি।"

মনোরমা বলিলেন,—"কিন্তু হায়! সে সময় কি কখন উপস্থিত হইবে? আজি করালী বাবু যে কথা বলিয়াছেন, পরে পথে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর আমাদের আর কোন শুভসংঘটনের আশা করাই অন্যায়।"

"আজিকার কথা ছাড়িয়া দেও মনোরমা! অপর এক ব্যক্তিকে আমাদের হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করা ভিন্ন আজ ত আর কিছুই করা হয় নাই। কালি হইতে আমার দিন গণনার আরম্ভ—"

"কেন? কালি হইতে কেন?"

"কারণ, কালি হইতে আমি নিজে কাজ করিতে আরম্ভ করিব।"

"কিরূপে?"

"আমি কালি ভোরের গাড়ীতে কালিকাপুর যাইব এবং বোধ করি রাত্রেই ফিরিব।"

"কালিকাপুরে?"

"হাঁ। করালী বাবুর আফিস হইতে আসিবার সময় আমি সমস্ত বিষয়টা বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়াছি, তাঁহার একটা কথার সঙ্গে আমার মনের ঠিক ঐক্য হইয়াছে। লীলা কোন্ দিন রাজবাটী হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিবার জন্য আমাকে প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। এই খুব পাকা চক্রান্তের মধ্যে এই স্থানই নিতান্ত কাঁচা আছে এবং এই তারিখটা বাহির করিতে পারিলেই লীলা যে এখনও জীবিতা আছেন, তাহা নির্ব্বিবাদে সপ্রমাণিত হইয়া যাইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"তুমি মনে করিতেছ, তারিখ জানিতে পারিলে স্থির বুঝিতে পারিবে যে, ডাক্তারের লিখিত বৃত্তান্তানুসারে লীলার মৃত্যুর পরও লীলা সজীব অবস্থায় কালিকাপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন?"

"ঠিক তাই।"

"লীলা যে পরেই আসিয়াছেন, এ কথা তুমি কেন মনে করিতেছ? লীলা তো নিজে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছেন না।"

"কিন্তু গারদের অধ্যক্ষ বলিতেছেন যে, ২৭শে তারিখে তাঁহাকে গারদে লইয়া গিয়াছিল। এক রাত্রির অপেক্ষা অধিককাল যে চৌধুরী তাঁহাকে অচেতন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, ইহা আমার কোনমতেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ২৬শে কালিকাপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ দিকে ডাক্তারের প্রমাণানুসারে ২৫শে তাঁহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। এ কথা যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে আর কোনই অপেক্ষা থাকিবে না।"

"ঠিক কথা, আমি এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু এ প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় কি?"

"নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর বর্ণনা-পাঠে আমার দুইটি উপায়ের কথা মনে হইয়াছে। যে দিন লীলা কালিকাপুর হইতে চলিয়া আইসেন, সেই দিনই নিস্তারিণী ডাক্তার বিনোদ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার বাবুর সে তারিখের কথা মনে থাকাই সম্ভব। তার পর সেই দিনই রাজা রাত্রিকালে গাড়ী হাঁকাইয়া যে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, সেখানকার যে স্থানে তিনি ছিলেন, তথায় সন্ধান করিলেও তারিখ পাওয়া যাইতে পারে। হউক আর না হউক, এ জন্য চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি, এ চেষ্টা না করিয়া কখনই শান্ত হইব না।"

"দেবেন্দ্র, আমি মন্দটাই ভাবিতেছি। কিন্তু যদি নিয়তই মন্দ ভিন্ন ভাল না দেখা যায়, তখন আর আমি মন্দের জন্য আশঙ্কা করিব না। মনে কর, যদি এ উপায়ে কিছু সন্ধান পাওয়া না যায়,—যদি কালিকাপুরের কোন লোক কিছুই বলিতে না পারে?"

"তাহা হইলেও হতাশ হইব না। এই কলিকাতায় দুইটি লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই সকল কথা জানে। এক জন রাজা প্রমোদরঞ্জন, আর এক-জন জগদীশ চৌধুরী। যাহারা নিরপরাধী ও চক্রান্তে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাহাদের সে তারিখের কথা মনে না থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা পাপী, তাহারা কখনই ভুলিবে না। যদি আমি কোন উপায়েই কৃতকার্য্য না হই, তখন আমি ঐ দুই ব্যক্তির এক জনের নিকট হইতেই হউক অথবা উভয়ের নিকট হইতেই হউক, জোর করিয়া এ কথা আদায় করিব।"

মনোরমা নিতান্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"যদি জোর করিতে হয়, তাহা হইলে আগেই চৌধুরীকে ধর।"

আমি বলিলাম,—"না মনোরমা, অগ্রে যে স্থানে বল-প্রয়োগে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানেই চেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে। আগে রাজাকে ধরিতে হইবে, তাহার পর চৌধুরীকে ধরিব। চৌধুরীর জীবনের মধ্যে লুকাইবার মত

কোন কাঁচা কথা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু আমরা জানি, রাজার জীবনে নিশ্চয়ই একটা সর্ব্বনাশজনক রহস্য আছে,—"

অমনই মনোরমা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি মুক্তকেশীসংক্রান্ত সেই অজ্ঞাতরহস্যের কথা বলিতেছ ?"

"হাঁ, সেই রহস্য। সেই উপায়ে আমি তাঁহাকে কায়দা করিব, তাঁহার পদ-প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া দিব, তাঁহাকে আমার পদাবনত করিয়া আনিব এবং তাঁহার এই অতি ঘৃণিত দুষ্ক্রিয়া জগৎসমক্ষে ধরিয়া দিব। কেবল অর্থলাভের অভিসন্ধি ব্যতীত নিশ্চয়ই আর কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া রাজা চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একমতে এই ভয়ানক কুক্রিয়া সাধিত করিয়াছেন, ইহা আমার স্থির-বিশ্বাস। তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ, রাজা চৌধুরীকে বলিতেছেন যে, তাঁহার স্ত্রী যাহা জানেন, তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মুক্তকেশীর রহস্য প্রচার হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, এ কথাও তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছে।"

"হাঁ, তা তো আমি শুনিয়াছি বটে।"

"মনোরমা, আমার অন্য সকল চেষ্টা বিফল হইলেও আমি যেমন করিয়া হউক, এই রহস্য প্রকাশ করিব। আমার সেই ভূতপূর্ব্ব সংস্কার এখনও আমার অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। আমার এখনও বিশ্বাস যে, সেই শুক্লবসনা সুন্দরী আমাদের এই তিনটি জীবনের নেত্রী। কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; আমরা নিরূপিত পরিণামের নিকটস্থ হইতেছি। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, পরলোকগতা মুক্তকেশী এখনও অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাকে সেই পরিণামের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতেই হুগলী জেলার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং বৈকালে বিনোদ বাবুর বাটীতে উপনীত হইলাম। তাঁহার সহিত দেখা ও কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। রাণী যে দিন চলিয়া আইসেন, সেই দিনই রাজবাটী হইতে ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা হেতু তিনি সে দিন রাজবাটীতে যাইতে পারেন নাই কয়দিন পরে তিনি পুনরায় মনোরমা দেবীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঠিক মনে নাই। মধ্যে কয় দিন অতীত হওয়ার পর ডাক্তার বাবু রাজবাটীতে আসিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানিতে পারিলেও রাণীর যাত্রার তারিখ স্থির করিতে পারা যাইত। নিস্তারিণীর মন সে সময়ে নানা কারণে নিতান্ত অস্থির ছিল। রাণী চলিয়া আসার কয়দিন পরে তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ নিস্তারিণীর হস্তগত হয় এবং কয় দিন পরে সে সংবাদ মনোরমা দেবীকে জানান হয়, তাহা তিনি ঠিক করিয়া রাখিতে পারেন নাই; এরূপ সময়ে, এরূপ কুসংবাদ পাইয়া চিত্ত স্থির রাখা সম্ভবও নয়। এ দিকে কোন সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি রাজপুরে অনুসন্ধান করিবার সংকল্প করিলাম। রাজপুরে উপস্থিত হইয়া, রাজা গাড়ী বিদায় করিয়া দেন। কোন্ তারিখে সেখানে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা যদি সন্ধান করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই রাণীর যাত্রার তারিখও ঠিক জানিতে পারা যাইবে; কিন্তু যখন কুপড়্তা হয়, তখন কোন দিকেই সুবিধা হয় না। রাজা সেখানে কবে আসিয়াছিলেন, এ কথা কে মনে করিয়া রাখিবে? সেখানে কোনই সন্ধান করিতে পারিলাম না। রাজার সঙ্গে যদি অনেক লোকজন থাকিত, রাজার জন্য যদি গাড়ী রিজার্ভ করিতে হইত, যদি তাঁহার অনেক জিনিসপত্র সে দিন বুক করা হইত, তাহা হইলে ষ্টেশনের আফিসে তাহার কিছু লেখাপড়া থাকিত; সুতরাং তারিখ পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু রাজা উন্মাদের ন্যায়, পলাতক ব্যক্তির ন্যায় একাকী বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ষ্টেশনে আমার উদ্দেশ্য বিষয়ক কোন সহায়তা হইল না।

কোন দিকে কিছুই হইল না; এ দিকে গাড়ীরও এখন দেরী আছে দেখিয়া মনে করিলাম, একবার কালিকাপুরের রাজবাটীতে যাই। সেখানকার মালীটা রাজার সঙ্গে রাজপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; সে হয় তো কোন সন্ধান বলিলেও বলিতে পারে সেখানেও হতাশ হইলে এ দিকের চেষ্টা বন্ধ করিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। যে গাড়ীতে করিয়া আমি কালিকাপুর আসিলাম, রাজবাটীর বহু দূর হইতেই আমি তাহা ছাড়িয়া দিলাম। বড় রাস্তা ছাড়িয়া গলী রাস্তায় প্রবেশ করিবার পর দেখিতে পাইলাম, আমার আগে আগে একটা লোক একটা ব্যাগ হাতে করিয়া দ্রুতপদে রাজবাটীর দিকে চলিয়া যাইতেছে।

দেখিয়াই আমার তাহাকে একটা ছেঁড়া মোক্তার বলিয়া মনে হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি একটু

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম,উভয়ের মধ্যস্থ ব্যবধান আরও অধিক হইয়া যাউক। সে লোকটা আমাকে দেখিতে পায় নাই; সে আপন মনে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে আমি রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াও সে লোকটাকে দেখিতে পাইলাম না; সম্ভবতঃ সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

আমি দরজার নিকটস্থ হইয়া দুইটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম; একটি প্রচীনা, অপরটিকে দেখিয়াই আমি মনোরমার বর্ণনা স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, সেই রামী। আমি সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোককে রাজা বাটীতে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা চলিয়া গিয়াছেন, ইহা ছাড়া তাহারা আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। রামী কেবল কারণে অকারণে হাসিতে লাগিল আর অনর্থক ঘাড় নাড়িতে লাগিল। আমি প্রাচীনাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, 'রাজা কখন্ গেলেন? কেন গেলেন? কেমন করিয়া গেলেন?' তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে হঠাৎ রাত্রিকালে রাজা ঘোর-রবে চীৎকার করিয়া উঠায় বৃদ্ধার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রাজার বিকট ভাব দেখিয়া সে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু সে যে কোন্ তারিখ, তাহা তাহার একটুও মনে নাই।

সে দিক্ হইতে ফিরিয়া আমি বাগানের দিকে মালীর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। আমি তাহাকে জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আমার প্রতি একটু সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করিল আমি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর নাম করায় তাহার মনে কতকটা বিশ্বাসের সঞ্চার হইল এবং সে আমার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইল। বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন; আমার চেষ্টার অন্যত্র যেমন ফল হইতেছে, এখানেও তাহাই হইল। মালী তারিখ ঠিক করিয়া বলিতে নিতান্তই অক্ষম।

যখন আমি মালীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছি, তখন সেই ব্যাগধারী লোকটা ধীরে ধীরে রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। তার অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমার মনে পূর্ব্বেই একটু সন্দেহ হইয়াছিল। মালীকে ঐ লোকটার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় মালী হয় তো মিথ্যা করিয়া, নয় ত সত্যই কোন কথা জানে না বলিল। তাহাতে আমার মনের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তখন আমি লোকটার সহিত কথা কহিয়া সকল সন্দেহ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায় করিলাম। অপরিচিত স্থলে প্রথমে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অন্যায় বোধে, আমি তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটী বাহিরের লোকে দেখিতে পায় কি না?

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল, সে আমাকে বিলক্ষণ জানে এবং আমাকে রাগাইয়া দিয়া আমার সহিত ঝগড়া বাধান তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু সে যেরূপ অতিরিক্ত বিরক্তিকর বাক্য বলিল, তাহা শুনিয়া রাগ হওয়া দূরে থাক, হাসি পায়। আমি প্রত্যুত্তরে অতিরিক্ত বিনয় ও ভদ্রতার কথা বলিলাম এবং তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। আমি মনে মনে বুঝিলাম যে, কবালী বাবুর কার্য্যালয় হইতে ফিরিবার সময়ে রাজার গুপ্তচরেরা আমাকে চিনিতে পারিয়া রাজাকে অবশ্যই সে সংবাদ জানাইয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছেন যে আমি যখন এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, তখন অবশ্যই কালিকাপুরের সন্ধান না করিয়া কখনই ছাড়িব না। সেই জন্যই এ ভগ্নদূতের আগমন। যদি কোনক্রমে লোকটা আমার সহিত ঝগড়া বাধাইতে পারিত, তাহা হইলে আর কিছু না হইলেও আপাততঃ আমার নামে অনধিকারপ্রবেশ গালি দেওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার সত্য মিথ্যা দাবীতে নালিশ রুজু করিয়া, কয়েকদিনের জন্য আমাকে মনোরমা ও লীলার কাছ-ছাড়া করিয়া রাখিতে তো পারিত।

কালিকাপুর হইতে ষ্টেশনে আসিবার সময়ে আমার পশ্চাতে চর লাগিয়া থাকিবে বলিয়া আমি মনে করিলাম; কিন্তু কোনই সন্দেহজনক কাণ্ড দেখিলাম না। সে ছেঁড়া বাবুটাকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কলিকাতায় আসিয়াও কোন দিকে কোন লোক আমার অনুসরণ করিতেছে, এরূপ বোধ হইল না। আমি ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া বাসায় আসিলাম এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া বাসায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার অনুপস্থিতি-কালের মধ্যে মনোরমার ভয় পাইবার কোনই কারণ ঘটে নাই। আজিকার অনুসন্ধানের ফলাফল মনোরমা জানিতে চাহিলে আমি তাঁহাকে অকাতরভাবে সমস্ত কথা জানাইলাম। আমার অকাতর ভাব দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বস্তুতই আমার অনুসন্ধানের নিষ্ফলতা আমাকে একটুও অভিভূত করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্যবোধে

আমি এ প্রযত্ন করিয়াছি মাত্র, কোন বাঞ্ছনীয় ফলের প্রত্যাশা করি নাই। আমার তখন মনের যেরূপ গতি, তাহাতে ক্রমে ক্রমে যতই রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিরোধিতার অধিকতর আশুক্ততা উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই আমার উৎসাহ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। আমার অন্যান্য উচ্চতর মনোবৃত্তির সহিত বৈরনির্যাতন-প্রবৃত্তি বহুদিন হইতেই মিশিয়া আছে। যে ব্যক্তি লীলার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সেই পাষণ্ডকে তাহার পাপোচিত প্রতিশোধ দিতে আমার আন্তরিক অনুরাগ। সত্যের অনুরোধে আমার স্বীকার করা আবশ্যক যে, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে বিশেষ বলবান্ থাকায় লীলার ভাবী শুভকল্পে আমার এতাদৃশ প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মিয়াছে। কিন্তু এ স্থলে ইহাও বলা অবশ্যক যে স্বীয় ভবিষ্যৎ সুখ ও স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া আমি উপস্থিত ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল হই নাই। রাজাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অথবা তাঁহার এই নিদারুণ দুষ্কৃতি জগৎসমক্ষে ধরিয়া দিতে পারিলে ভবিষ্যতে লীলার উপর তাঁহার আর কোনই অধিকার থাকিবে না এবং কেহই আর অতঃপর লীলাকে আমার চিরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না, এই দারুণ লোভজনক আশা আমার এতাদৃশ অত্যনুরাগের মূলীভূত নহে। লীলার তদানীন্তন দুরবস্থা, তাঁহার মনের সেই বিজাতীয় অবসন্নতা ও অপ্রসাদ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার যে অপরিসীম প্রেমানুরাগ ছিল, তাহা শতগুণে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পিতা বা ভ্রাতা, আপনার কন্যা বা ভগ্নীকে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিলে যেরূপ বাৎসল্য-পূর্ণ হৃদয় কাতর ও ব্যথিত হয়, আমার হৃদয়ও তাহাই হইয়াছে। লীলা আমার জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী হইবেন কি না, সে ভাবনা আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি। সে লোভ—সে আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। লীলার এ কষ্ট—লীলার এ দুরবস্থা আমার অসহ্য। আমার স্নেহপ্রবণ বাৎসল্যময় হৃদয়ের এখন এই ভাব।

হুগলী হইতে ফিরিয়া আসার পরদিন মনোরমাকে আমার নিজ প্রকোষ্ঠে ডাকিয়া আনিয়া, রাজা প্রমোদরঞ্জনকে আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত মনে মনে যে প্রণালী অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছি, তৎসমস্ত জানাইলাম। এতকাল মুক্তকেশীর সহায়তায় রাজার জীবনের সেই অপরিজ্ঞাত রহস্য জ্ঞাত হইবার আশা ছিল; কিন্তু মুক্তকেশী এখন নাই। এখন সেই দুর্জ্ঞেয় সংবাদ জ্ঞাত হইতে হইলে মুক্তকেশীর জননী-সংক্রান্ত পারিবারিক ও সংবাদ-সমূহ অগ্রে সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহা কায়দা করিয়া কথা বাহির করিতে পারা যাইবে, এমন বোধ হয় না। অতএব মুক্তকেশীর প্রধান ও অকৃত্রিম আত্মীয় রোহিণীর নিকটে সর্ব্বাগ্রে সন্ধান করা আবশ্যক। কিন্তু রোহিণী কোথায় থাকেন, তাহা আমাদের জানা নাই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনোরমা রোহিণীর ঠিকানা নির্ণয় করিবার যে এক উপায় বলিলেন, তাহা আমার মনে সদ্যুক্তি বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন, তারার খামারে তারামণির নিকটে পত্র লিখিলে এ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিরূপে রোহিণীর নিকট হইতে মুক্তকেশী বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মুক্তকেশী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার পর রোহিণী ঠাকুরাণী যে নানা স্থানে নানা প্রকারে তাহার সন্ধান করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মুক্তকেশী আনন্দধাম যেরূপ ভালবাসিতেন, তাহাতে আনন্দধামের নিকটস্থ প্রদেশে যে রোহিণী সর্ব্বাগ্রেই সন্ধান করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার নিশ্চয় কথা। যে কোন সময়ে মুক্তকেশীর সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইবার জন্য রোহিণী নিশ্চয়ই সেখানকার পরিচিত লোকদের নিজ ঠিকানা জানাইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং রোহিণীর ঠিকানা তারামণির জানিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

তৎক্ষণাৎ তারামণিকে মনোরমা এক পত্র লিখিলেন। তাহার পর মনোরমার নিকট হইতে আমি রাজার বাল্যজীবন ও পারিবারিক বৃত্তান্ত জানিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম। তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না, যাহাও জানিতেন, তাহাও শুনা কথা মাত্র। আমিও তাহাই জানিয়া লইলাম।

রাজা প্রমোদরঞ্জনের পিতা রাজা বসন্তরঞ্জন আজন্ম কুব্জ; সুতরাং নিতান্ত কুৎসিত-দর্শন ছিলেন; এ জন্য তিনি লোকসমাজে বাস করিতে বড় ভালবাসিতেন না। রাজা প্রমোদরঞ্জন তাঁহার একমাত্র পুত্র। বসন্তরঞ্জন লোকালয়ের বহির্ভূত থাকিয়া নিরন্তর সঙ্গীত আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার রাণী এবং আবশ্যকমত দাস-দাসী ব্যতীত অন্য কোন লোক তাঁহাদের সংস্রবে আসিত না। তাঁহারা কালিকাপুরের রাজ-ভবনে বনবাসী ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতেন; কেহই সাক্ষ

করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রয়াসী হইত না।

কেবল স্থানীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার তাঁহাদিগকে নিতান্ত জ্বালাতন করিয়াছিলেন। তিনি লোকপরম্পরায় শ্রুত হইয়াছিলেন যে, রাজা দেব-দেবী মানেন না, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ করেন না—নিতান্ত নাস্তিক। রাজা এরূপ পাষণ্ড হইলে বড়ই সামাজিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ঘোর তর্ক বাধাইয়া দেন। কিয়ৎকাল রাজার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তিনি রাজাকে বস্তুতই ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহার দেব বিদ্বেষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া 'রাম রাম' বলিতে বলিতে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রস্থান করেন। এই ঘটনার পর সন্নিহিত তাবৎ জনপদে রাজার অত্যন্ত দুর্নাম ও কলঙ্ক প্রচারিত হয়। রাজার কখনই কালিকাপুরে বাস করিতে অনুরাগ ছিল না; বিশেষতঃ এই ব্যাপারের পর তিনি আরও বীতরাগ হইয়া উঠেন এবং পুনরায় পাছে সেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা অন্য কেহ তাহাকে উত্যক্ত করে, এই আশঙ্কায় রাজা অতঃপর কালিকাপুরের বাস পরিত্যাগ করেন।

কিছু দিন কলিকাতায় বাস করিয়া তাঁহারা স্বামি স্ত্রীতে পশ্চিম-যাত্রা করেন এবং পশ্চিমেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়। পশ্চিম-প্রদেশেই রাজা প্রমোদ রঞ্জনের জন্ম হইয়াছিল। অগ্রে তাঁহার জননী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রমোদরঞ্জন দুই একবার এ দেশে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় লীলার পিতা ৺প্রিয়প্রসাদ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। পরিচয় হওয়ার পর উভয়ের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে প্রমোদরঞ্জনের আনন্দধামে যাতায়াত ছিল না। রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁহাকে দুই একবার ৺প্রিয়প্রসাদের সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি জানিতেন না।

যদিও মনোরমার মুখে এই কয়েকটি কথা শুনিয়া বিশেষ কোন আশাপ্রদ সংবাদ পাইলাম না, তথাপি ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া ইহাও আমার মন্তব্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

তারামণির পত্রের উত্তর আসিবার জন্য আমরা ডাকঘরের ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলাম। দিন দুই পরে সন্ধান করিয়া দেখিলাম, পত্রের উত্তর আসিয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আমাদের প্রতিকূল ছিল, এই মুহূর্ত্ত হইতে সমস্তই আমাদের অনুকূল হইতে লাগিল। তারামণির পত্রে রোহিণীর ঠিকানা ছিল।

আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। মুক্তকেশী পলাইয়া যাওয়ার পর রোহিণী অনেক দুঃখ করিয়া তারামণিকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যদি কোন ক্রমে কখন মুক্তকেশীর সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে রোহিণীর ঠিকানা লেখা ছিল। সেই ঠিকানা তারামণি এক্ষণে আমাদের নিকট নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন। সে ঠিকানা কলিকাতাতেই—আমাদের বাসা হইতে জোর আধ ঘণ্টার পথ।

'বিলম্বে কার্য্য-হানি' এই চির-প্রচলিত উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া আমি পরদিন প্রত্যুষে রোহিণীর সন্ধানে যাত্রা করিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে আমার অনুসন্ধানের অদ্যই রীতিমত আরম্ভ। বলিতে গেলে আমি যে ভয়ানক সমরে জীবনপাত করিতে সংকল্প করিয়াছি, অদ্যই তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান।

আমি তারামণির পত্রনির্দ্দিষ্ট ভবনদ্বারে ডাকাডাকি করার পর রোহিণী ঠাকুরাণী স্বয়ং আসিয়া আমাকে দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। আমার কি দরকার, তিনি জানিতে চাহিলে, শক্তিপুরের আনন্দধামে উদ্যান-মধ্যে তাঁহার সহিত রাত্রিকালে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম এবং মুক্তকেশী বাতুলালয় হইতে পলায়ন করার পর আমি কলিকাতার পথে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তার আর অধিকার কি আছে? কাজেই আমি এই সকল কথারই খুব করিয়া দোহাই দিলাম। আমি এই সকল কথা বলিলে তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন এবং ঘরের ভিতর আসিয়া বসিতে বলিলেন। আমি মুক্তকেশীর কোন সংবাদ জ্ঞাত আছি মনে করিয়া তিনি তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুক্তকেশীর বৃত্তান্ত আমি যতদূর জানি, তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে এ ব্যাপারের মধ্যে যে ভয়ানক চক্রান্ত আছে, তাহার কথাও বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ অল্পপরিচিত ব্যক্তির নিকট সে সকল রহস্য ব্যক্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহাতে মুক্তকেশীর সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্রকার অলীক আশার সঞ্চার না হয়, আমি সাবধানতা সহকারে

সেইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। এবং বুঝাইয়া দিলাম যে, যে ব্যক্তির কৌশলে মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে কে, তাই নির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে আমার স্কন্ধে কোন দোষ না স্পর্শে, এই বিবেচনায় আমি বলিলাম যে, মুক্তকেশী কোথায় আছেন, তাহা সন্ধান করিবার কোন উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না এবং তাঁহাকে যে আর সজীব অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, এমন আশাও আমার নাই। আমার বিশ্বাস, দুই ব্যক্তি কৌশল করিয়া মুক্তকেশীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই দুই ব্যক্তির দ্বারা আমি ও আমার কয়েকজন একান্ত আত্মীয় ব্যক্তিকে মর্ম্মান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অতএব সেই দুই পাষণ্ডকে তাহাদের পাপোচিত শাস্তি প্রদান করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধা রোহিণীর মন এতই চিন্তাকুল হইয়াছিল যে, তিনি প্রথমতঃ আমার বাক্যের মর্ম্ম সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে সক্ষম হইলেন না। আবার আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় ধীরভাবে ও পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলাম। কারণের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও এ ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের লক্ষ্যের যে অবিসংবাদিত একতা আছে,তাহার আর সন্দেহ কি? তিনিও তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং যে পাষণ্ডেরা মুক্তকেশীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের শাস্তির জন্য তাঁহার দ্বারা যে কোন সাহায্য সম্ভব, তিনি তাহা করিতে সম্মত আছেন বলিলেন। এরূপ স্থলে মূল হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চেষ্টা করিলে আমার পক্ষে এবং তাঁহার বলিবার পক্ষে সুবিধা হইবে মনে করিয়া আমি তাঁহাদের আনন্দধাম হইতে চলিয়া আসার পর এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি তাহার উত্তরে যাহা বলিলেন, আমি নিম্নে তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তারার খামার হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহারা কলিকাতায় আসিবেন স্থির করেন। কিন্তু রেলগাড়ীতে মুক্তকেশীর এরূপ দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখা যায় যে, কলিকাতা পর্য্যন্ত না আসিয়া তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে এক ষ্টেশনে নামিয়া এক সপ্তাহ কাটাইতে হয়। তাহার পর কলিকাতায় আসা হইল এবং রোহিণী পূর্ব্বে যে বাসায় থাকিতেন, সেই বাসায় এক মাস থাকার পর বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় তাঁহাদের বাসা বদল করিতে হয়। নূতন বাসায় যাইতে মুক্তকেশী অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং পাছে কলিকাতায় আবার কেহ সন্ধান পায়, এই ভয়ে সে নিতান্ত ভীত হয়। তাহার সঙ্গে নিয়ত একত্র থাকায় রোহিণীরও অনেকটা এইরূপ অকারণ ভীতিপ্রবণ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিল। তিনিও আর কলিকাতায় না থাকিয়া অতঃপর মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে মনস্থ করেন। গোপীনাথপুরনামক গ্রামে তাঁহার স্বামী দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন; রোহিণী সেই স্থানেই বাস করিতে মানস করিলেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব ছিল; সুতরাং সেখানে থাকাই বিশেষ সুবিধা। মুক্তকেশী কোনমতেই তাহার মাতার নিকট যাইবে না ও থাকিবে না; কারণ, একবার সেখান হইতে তাহাকে রাজা ধরিয়া লইয়া গিয়া আবার গারদে পূরিয়াছিলেন। এবারও তিনি নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ সেখানে সন্ধান করিবেন এবং মুক্তকেশী তথায় গমনমাত্র আবার ধরা পড়িবে। অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া রোহিণী গোপীনাথপুর আসিলেন।

এখানে আসিয়া মুক্তকেশীর কঠিন পীড়া দেখা-দিল। লীলাবতী দেবীর সহিত রাজা প্রমোদরঞ্জনের বিবাহ-সংবাদ একখানি দুপয়সা দামের খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়ার পর হইতে মুক্তকেশীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করান হইল। তিনি বলিলেন,—"রোগীর হৃদ্রোগ হইয়াছে।" অনেক দিন পরে মুক্তকেশী একটু ভাল হইল বটে, কিন্তু পীড়া একেবারে সারিল না; মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল। এই রূপে বৎসরাধিক কাল কাটিয়া যাওয়ার পর মুক্তকেশী জেদ ধরিল যে, সে একবার কালিকাপুর যাইবেই যাইবে এবং যেমন করিয়া হউক, রাণী লীলাবতীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবেই করিবে। এই নিতান্ত অসঙ্গত এবং সম্পূর্ণ বিপজ্জনক অভিসন্ধি পরিত্যাগ করাইবার জন্য রোহিণী যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুক্তকেশী কোন যুক্তির কথাতেই কর্ণপাত করিল না। তাহার এরূপ অভিপ্রায়ের কারণ কি, জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলে সে বুঝাইয়া দিল যে, ইহ-সংসারে তাহার কাল পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; সে এমন কোন কথা জানে, যাহা রাণী লীলাবতীকে গোপনে জানান নিতান্ত আবশ্যক। যে ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন যে. তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ করিলে তাহার পুনরায় কঠিন পীড়া হইবে এবং সম্ভবতঃ তাহাতে মৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং

স্নেহপরায়ণা রোহিণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হইল।

গোপীনাথপুর হইতে হুগলী আসিবার পথে কালিকাপুর অঞ্চলের একটি লোকের সহিত রোহিণীর আলাপ হয়; সে ব্যক্তি বাসস্থান-সন্নিহিত সমস্ত প্রদেশ বেশ জানে ও চিনে। তাহারই নিকট হইতে রোহিণী জানিতে পারিলেন যে, কালিকাপুরের ক্রোশ দুই দূরে শ্যামপুর নামে একটি সামান্য পল্লীগ্রাম আছে। সেখানে রাজা বা রাজবাটীর লোক যাতায়াত করার খুব অল্প সম্ভাবনা। সুতরাং সেইরূপ স্থানে গিয়া থাকিলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। তিনি মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে এক গৃহস্থের বাটীর মধ্যে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিলেন। এই স্থান হইতে মুক্তকেশী যতবার লীলার সহিত দেখা করিবার জন্য কালিকাপুরের কাঠের ঘরে যাওয়া-আসা করিয়াছিল, ততবারই তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। দূর নিতান্ত কম নয়, প্রায় দুই ক্রোশ। রাণীঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর যাহা বলিবার আছে, তাহা পত্রদ্বারা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য রোহিণী ঠাকুরাণী তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন; কিন্তু আনন্দধামে লীলাবতী দেবীকে মুক্তকেশী যে নামহীন পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া সে আর পত্রের উপর কোনমতেই নির্ভর করিতে সম্মত হয় নাই। একাকিনী যাইয়া রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার দৃঢ় সংকল্প।

যখন যখন মুক্তকেশী রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় কাঠের ঘরে যাইত, রোহিণী ঠাকুরাণীও তখন তখন তাহার সঙ্গে যাইতেন, কিন্তু তিনি খুব দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সুতরাং সেখানে কি ঘটিত, তাহা তিনি দেখিতে বা জানিতে পারিতেন না। এইরূপে নিত্য সুদূরপথ যাতায়াত করায় মুক্তকেশীর ভগ্ন স্বাস্থ্য অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং অবশেষে রোহিণী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। আবার মুক্তকেশীর বুকে বেদনা হইল এবং গোপীনাথপুরে তাহার যেমন অসুস্থতা ঘটিয়াছিল, সেইরূপ হওয়ায় মুক্তকেশী শয্যাগত হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায় মুক্তকেশীর উদ্বেগ-শান্তির জন্য দয়াময়ী রোহিণী ঠাকুরাণী মুক্তকেশীর পরিবর্ত্তে স্বয়ং রাণী লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি কাঠের ঘরের নিকটস্থ হইয়া রাণীকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, এক জন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ প্রবীণ ভদ্রলোক পুস্তক-হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তি জগদীশনাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় অত্যল্পকাল নিবিষ্টমনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি এ স্থানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করেন?" রোহিণী কোন উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বেই তিনি আবার বলিলেন,—আমি রাণী-মাতার একটি কথা একজনকে বলিবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু যে লোককে সে কথা বলিতে হইবে, তাহার আকৃতির যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি, তাহার সহিত আপনার আকৃতির ঐক্য হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র রোহিণী নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথা চৌধুরী মহাশয়কে জানাইলেন এবং সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার অভিপ্রায় চৌধুরী মহাশয় ব্যক্ত করিলে দুঃখিনী মুক্তকেশীর হৃদয় অনেক শান্ত হইবে। তিনি বলিলেন, তাঁহার সংবাদ অতি প্রয়োজনীয়। রাণী লীলাবতী দেবীর বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, যদি মুক্তকেশী বা তাঁহার সঙ্গিনী আর অধিক দিন এ প্রদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় রাজা প্রমোদরঞ্জন তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারিবেন; সুতরাং অবিলম্বে তাঁহাদের এ স্থান হইতে কলিকাতা চলিয়া যাওয়া আবশ্যক। রাণীমাতাও শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছেন। যদি মুক্তকেশী ও রোহিণী ঠাকুরাণী কলিকাতায় গিয়া তাঁহাদের ঠিকানা রাণীমাতাকে লিখিয়া জানান, তাহা হইলে অন্ততঃ হইতে এক পক্ষ কালের মধ্যে তাঁহাদের সহিত রাণীমাতার সাক্ষাৎ ঘটিবে। তিনি বন্ধুভাবে মুক্তকেশীকে এই হিতপরামর্শ জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মুক্তকেশী তাঁহাকে অপরিচিত জানিয়া এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিকটস্থ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবার কোনই সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া রোহিণী নিতান্ত ভীত ও কাতরভাবে বলিলেন যে, নিরাপদে মুক্তকেশীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই তাঁহার প্রধান কামনা। কিন্তু এই বিপদ্-সঙ্কুল স্থান হইতে তাঁহাকে আপাততঃ স্থানান্তরিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, সে সম্প্রতি সুকঠিন পীড়ায় শয্যাগত। এ জন্য চিকিৎসক ডাকা হইয়াছে কি না, চৌধুরী মহাশয় জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে রোহিণী বলিলেন, "পাছে তাহাতে তাঁহাদের বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি বৈদ্য ডাকিতে ইতস্ততঃ

করিতেছেন।” তখন চৌধুরী বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং এক জন ডাক্তার। যদি রোহিণীর আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া মুক্তকেশীর সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছেন। রোহিণী ঠাকুরাণী মনে মনে ভাবিলেন, এই ভদ্রলোক যখন রাণী লীলাবতী দেবীর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং তাঁহার নিয়োজিত বার্ত্তাবহ, তখন ইঁহাকে বিশ্বাস করাই সঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা সহকারে চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদনন্তর উভয়ে শ্যামপুরের কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন কুটীরাগত হইলেন, তখন মুক্তকেশী নিদ্রিত ছিল। চৌধুরী মহাশয় তাহাকে দর্শনমাত্র চমকিয়া উঠিলেন। নিশ্চয়ই রাণী লীলাবতী দেবীর সহিত পীড়িতার অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সাদৃশ্য সন্দর্শনে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রোহিণী ঠাকুরাণী এ সকল রহস্য কিছুই জানিতেন না। তিনি মনে করিলেন, মুক্তকেশীর পীড়ার আতিশয্যদর্শনে চৌধুরী মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় মুক্তকেশীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে নিষেধ করিলেন। রোগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে তিনি রোহিণীকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অতি সন্তর্পণে রোহিণীর হাত দেখিলেন। তাহার পর সে স্থানে হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি গ্রাম্য চিকিৎসকের আলয়ে গমন করিলেন এবং তথা হইতে আবশ্যকমত ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। রোহিণীকে তিনি বলিয়া দিলেন যে, এই ঔষধ সেবন করিলে মুক্তকেশীর শরীরে যথেষ্ট শক্তি জন্মিবে এবং কলিকাতা-গমনের পথশ্রম তিনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন। অদ্য এবং কল্য নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করিলে পরশ্ব কলিকাতায় যাওয়ার কোন অসুবিধা থাকিবে না। পরশ্ব দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে যাহাতে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রেল-ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহারা উক্ত সময়ে রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন যে, মুক্তকেশীর পীড়াবৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যথাবিহিত সাহায্য করিবার জন্য পুনরায় এই কুটীরে চলিয়া আসিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ-সেবনে মুক্তকেশীর বিশেষ উপকার হইল। অচিরে কলিকাতায় রাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে, এই আশ্বাসে সে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নিয়মিত দিনে নিয়মিত সময়ে তাঁহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎকালে একটি প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন; সেই স্ত্রীলোকটিও ঐ গাড়ীতে কলিকাতায় যাইবেন। চৌধুরী মহাশয় যত্ন সহকারে তাঁহাদের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের কলিকাতার ঠিকানা রাণীমাতাকে লিখিয়া জানাইবার নিমিত্ত রোহিণীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। সেই প্রবীণা স্ত্রীলোক অন্য কামরায় প্রবেশ করিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিলে তিনি কোথায় গেলেন বা তাঁহার কি হইল, তাহার কোন সন্ধান রোহিণী জানেন না। রোহিণী কলিকাতায় বাসা স্থির করিয়া অঙ্গীকারানুসারে রাণী লীলাবতী দেবীর নিকট ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলেন। এক পক্ষ কাটিয়া গেল, তথাপি কোন উত্তর আসিল না। আরও কয়েক দিন পরে যে প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদের ষ্টেশনে দেখা হইয়াছিল, তিনি রোহিণীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে, রাণীমাতা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন, মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি অগ্রে রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন; এ কার্য্যে তাঁহার আধ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রোহিণী সম্মত হইলেন। মুক্তকেশী তথায় উপস্থিত ছিল। সে-ও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। তখন রোহিণী ও সেই প্রবীণা স্ত্রীলোক একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সেই স্ত্রীলোক রঙ্গমতি দেবী। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর সেই স্ত্রীলোক একটা ভবনদ্বারে গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং রোহিণীকে বলিলেন যে, এই বাটীতে একটা সামান্য কাজ আছে, ২।১ মিনিটেই তিনি তাহা শেষ করিয়া আসিবেন; ততক্ষণ রোহিণী দেবীকে একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তিনি ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু আর বাহির হইলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রোহিণীর বড় ভয় হইল। তখন তিনি তাঁহার বাসায় গাড়ী ফিরাইয়া আনিবার জন্য গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন। গাড়ী কিঞ্চিদধিক আধ ঘণ্টার মধ্যে বাসায় ফিরিয়া আসিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, মুক্তকেশী বাসায় নাই।

বাসার নীচের তলায় একটি বৃদ্ধা বাস করিত,

উপরতলায় মুক্তকেশী ও রোহিণী থাকিতেন। রোহিণী সেই বৃদ্ধার নিকট সন্ধান পাইলেন যে তিনি প্রস্থান করিবামাত্র একটি বালক একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল এবং বৃদ্ধাকে বলিয়াছিল, উপরতলায় যে স্ত্রীলোক থাকেন, তাঁহাকে এই চিঠি দিতে হইবে। বৃদ্ধা বালককে উপরের সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে, সে পত্র দিয়া তখনই চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাওয়ার পর মুক্তকেশী একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন এবং ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মুক্তকেশীর ঘর খুঁজিয়া সে চিঠিখানি পাওয়া গেল না। অতএব নিশ্চয়ই চিঠিখানি তাঁহার সঙ্গে ছিল। চিঠিখানিতে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রলোভনজনক সংবাদ ছিল। নচেৎ মুক্তকেশী কদাপি কলিকাতার পথে একাকিনা যাইতে সাহস করিত না।

উদ্বেগের প্রথম তরঙ্গ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে রোহিণী স্থির করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে বাতুলালয়ে সন্ধান করা আবশ্যক। তদভিপ্রায়ে পরদিন প্রাতে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, সেরূপ কোন ব্যক্তিই সেখানে নাই। সম্ভবতঃ কল্পিত মুক্তকেশীর বাতুলালয়ে নিরুদ্ধ হওয়ার দুই এক দিন পূর্ব্বে রোহিণী তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি মুক্তকেশীর জননী হরিমতির নিকট তাঁহার কন্যার সন্ধানার্থে পত্র লিখিলেন। এ পত্রের যে উত্তর আসিল, তাহাতে জানা গেল, তিনি মুক্তকেশীর কোনই সন্ধান জানেন না। তাহার পর আর কি করা উচিত বা আবশ্যক, তাহা তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তৎকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিনি মুক্তকেশীর সম্বন্ধে কোন সংবাদই জ্ঞাত নহেন এবং সে সহসা কোথায় গেল বা কেন গেল, তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট এই পর্য্যন্ত মাত্র সংবাদ পাওয়া গেল। যদিও এ সকল সংবাদ আমার অপরিজ্ঞাত, তথাপি এতদ্বারা আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন সহায়তা হইবে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়া মুক্তকেশীকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে রোহিণীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। স্বামী কিংবা স্ত্রীকে, অথবা উভয়কেই রাজবিচারে দণ্ডিত করিতে পারা যায় কি না, তাহার বিচার ভবিষ্যতে করিলেও চলিতে পারিবে। কিন্তু অধুনা আমার হৃদয়ে যে প্রবল অভিসন্ধি রহিয়াছে তদ্দ্বারা আমি অন্য পথে চালিত হইলাম। রাজা প্রমোদরঞ্জন-সংক্রান্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কিঞ্চিন্মাত্রও আভাষলাভ করার আশায় আমি রোহিণীর সহিত সাক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তদ্ধেতু বিগত ঘটনা সম্বন্ধে তাহার স্মৃতির অন্যান্য অংশ স্পষ্টীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম। আমি বলিলাম, —"এই বিষাদজনক ব্যাপারে আপনার কোন প্রকার সহায়তা করা আমার আন্তরিক বাসনা। আমি আপনার বিপদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। আপনি মুক্তকেশীকে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য যে প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, লোকে আপনার পেটের সন্তানের জন্যও সেরূপ করিতে পারে না।"

রোহিণী বলিলেন,—"ইহাতে বিশেষ কিছুই প্রশংসার কথা নাই। আহা! সে আমার পেটের মেয়ের মতই ছিল। আমি তাহাকে অতি শৈশবকাল হইতে অনেক কষ্টে মানুষ করিয়াছি। আমি তাহাকে মানুষ করিবার জন্য যদি এত কষ্ট না করিতাম, তাহা হইলে তাহার জন্য আমার আজি কোন কষ্ট হইত না। আমার নিজের কখন ছেলেপিলে হয় নাই। এত দিন পরে মুক্তকেশীও আমাকে ছাড়িয়া গেল।" এই বলিয়া বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া, বৃদ্ধা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কি মুক্তকেশীর জন্মের পূর্ব্বেও হরিমতিকে জানিতেন?"

"মুক্তকেশী হইবার বেশী দিন আগে নয়—৩মাস আগে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। সর্ব্বদা দেখাশুনা হইত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কখনই হয় নাই।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিমতির বাড়ীর কাছেই কি, আপনার বাড়ী ছিল?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ মহাশয়, পুরান রামনগরে আমাদের খুব কাছাকাছি বাড়ী ছিল।"

"পুরান রামনগর? তবে কি হুগলী জেলায় ঐ নামে দুইটা গ্রাম আছে?"

"২০।২৫ বৎসর আগে তাই ছিল বটে। নদীর ধারে রামনগরের প্রায় আধ ক্রোশ দূরে এক গ্রাম বসিয়াছিল। এই নূতন রামনগরের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি

হইতে লাগিল এবং পুরান রামনগর হইতে একে একে সকল লোক উঠিয়া গিয়া নূতন রামনগরে ঘর বাঁধিতে লাগিল। এখন রামনগর বলিলে নূতন রামনগরই বুঝায়। কেবল গ্রামের ঠাকুরবাড়ী ও ভট্টাচায্য মহাশয় ছাড়া আর প্রায় সকল লোকই ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে।"

"ঐ স্থানেই কি আপনার স্বামী পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছিলেন?"

"না মহাশয়! আমার স্বামী প্রথমে বড় দরিদ্র ছিলেন। হুগলী জেলার একটি বড়লোক তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তাঁহার জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে আমার স্বামী বহুদিন কর্ম্ম করেন। হাতে কিছু টাকার সংস্থান হইলে, তিনি কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রামনগরে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। আমরা নিঃসন্তান; সুতরাং আমাদের অধিক টাকাকড়ির দরকার ছিল না। আমরা সেখানে বাস করার এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে হরিমতি ও তাঁহার স্বামী সেই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।"

"পূর্ব্ব হইতেই আপনার স্বামীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল কি?"

হরিমতির স্বামী রামধন চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার স্বামীর পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। ঐ গ্রামে বর্দ্ধমানের রাজার যে ঠাকুর-সেবা আছে, তাহারই গোমস্তার পদ খালি হওয়ায়, উক্ত রামধন চক্রবর্ত্তী জোগাড় করিয়া সেই পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন সেই অবধি তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে রামনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহারা রামনগরে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন, তখন চক্রবর্ত্তীর বয়স অনুমান ৪০ বৎসর এবং তাঁহার গৃহিণী হরিমতির বয়স পাঁচশ-ছাব্বিশ হইবে। মুক্তকেশী তখন পেটে। তাঁহারা আমাদের বাটীর নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করার পর ক্রমে জনরব হরিমতির সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। শুনিতে পাওয়া গেল, বিবাহের পর হইতে হরিমতির সহিত তাহার স্বামীর বনিবনাও ছিল না; সে স্বামীর নিকটেও থাকিত না। স্বামী অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে ঘরে আনিতে পারেন নাই; সে কেবলই বাপের বাড়ীতে থাকিত এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করিত। তাহার পর হঠাৎ হরিমতির মতিগতি ফিরিল, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত ঘরকন্না করিতে সম্মত হইল। কেন যে তাহার হঠাৎ এমন মন হইল, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, সে স্বামীর ঘরে আসার কিছু পরেই চক্রবর্ত্তীর এই চাকরী জুটিল এবং তদবধি তাঁহারা রামনগরে বাস করিতে থাকিলেন। এরূপ স্ত্রীকে কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না; কিন্তু চক্রবর্ত্তী বড় ভাললোক; এমন স্বতন্ত্রা স্ত্রীকেও তিনি বড় ভালবাসিতেন। আমাদের সহিত যতই আলাপ-পরিচয় বাড়িতে লাগিল, ততই আমরা বুঝিতে পারিলাম, হরিমতি বড় খোষপোষাকা, বেহায়া, স্বতন্ত্রা লোক। কিসে লোকে তাহার রূপের প্রশংসা করিবে, এই চেষ্টায় সে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিত। স্বামী তাহার জন্য যত্নের কোন ত্রুটি করিতেন না; কিন্তু সে একবার স্বামীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। আমার স্বামী নিয়তই বলিতেন, পরিণামে ইহাদের বড়ই অমঙ্গল হইবে। শীঘ্রই সেই কথা ফলিল। তাঁহারা রামনগরে ৪৫ মাস থাকিতে না থাকিতেই ভয়ানক কলঙ্কের কথা প্রচার হইয়া পড়িল। দুই জনেরই তাহাতে দোষ ছিল।"

'স্বামী স্ত্রী দুই জনেরই দোষ?"

"না না। চক্রবর্ত্তী বেচারার কোন দোষ ছিল না, তিনি দয়ার পাত্র, তাঁহার স্ত্রী আর যে ব্যক্তি—"

"আর যে ব্যক্তির জন্য এই কলঙ্কের উৎপত্তি?"

"হাঁ। সে ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত-বংশে জন্ম—এরূপ জঘন্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই উচিত হয় নাই। আপনি তাঁহাকে জানেন—আমার মুক্তকেশী তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত।"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়?"

"হাঁ। রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ই বটেন।"

আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজার যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য জানিবার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল এবং যাহা জানিতে পারিলে রাজাকে নিশ্চয় করতলস্থ করিতে পারা যাইবে বলিয়া আমার স্থিরবিশ্বাস, বুঝি, এতক্ষণে সেই রহস্য ব্যক্ত হইবার সূত্রপাত হইতেছে মনে করিয়া, আমার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কত রহস্যজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, কত বিপদ্‌বাত্যা অতিক্রম করিয়া সে মূল রহস্য আমার আয়ত্তগত হইবে, আমি তখন তাহার কিছুই জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন কি তৎকালে আপনাদের সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেন?"

"না মহাশয়, তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের গ্রামে আসিতেন। প্রথমে যখন তিনি আইসেন, তখন তাঁহাকে কেহ জানিত না; ক্রমে তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ হয়।"

"তিনি যখন প্রথমে আপনাদের গ্রামে আইসেন, তখন মুক্তকেশীর জন্ম হইয়াছিল কি?"

"মুক্তকেশী যখন ৭।৮ মাসের, তখন রাজা আমাদের গ্রামে প্রথম দেখা দেন।

"রাজা সকলের নিকট অপরিচিত ছিলেন; হরিমতিও তাঁহাকে চিনিত না কি?"

"আমরা প্রথমে তাহাই মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে যখন এই কলঙ্ক প্রচার হইয়া পড়িল, তখন আর তাঁহাদের আলাপ ছিল না, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। সে ঘটনা আমার এমনই মনে পড়িতেছে, যেন তাহা কল্য ঘটিয়াছে। এক রাত্রিতে হঠাৎ রামধন চক্রবর্ত্তী আমাদের জানালা দিয়া এক মুঠা ঢিল ফেলিয়া দিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইলেন; তাহার পর আমার স্বামীকে বাহিরে যাইয়া তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। তাহার পর আমার স্বামী মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন,—'সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি যাহা বরাবর মনে করিতাম, তাহাই ঘটিয়াছে। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর বাক্সে নানা প্রকার মহামূল্য অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসিলাম —"চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি মনে করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী সে সকল সামগ্রী চুরি করিয়াছেন?" তিনি উত্তর দিলেন,—"আরে না পাগলি, না। চুরি করা মহাপাপ সন্দেহ নাই; কিন্তু এ তার চেয়েও মহাপাপ। সেই যে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর খুব ভাব। তাহারা গোপনে কথাবার্ত্তা কহে, দেখাসাক্ষাৎ করে; এখন সহজেই বুঝিয়া দেখ, এ সকল অলঙ্কার তাহার বাক্সে কেমন করিয়া আসিল। আমি চক্রবর্ত্তীকে বিশেষ সাবধান থাকিয়া, আরও প্রমাণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছি।' আমি বলিলাম,—'কিন্তু তোমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়াছে, চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী যে এইরূপ এক জন চির অপরিচিত লোকের সহিত হঠাৎ ভ্রষ্টা হইবে, ইহা তো আমার কখন সম্ভব মনে হয় না।' আমার স্বামী বলিলেন,—'তুমি মনে করিয়া দেখ, চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী শত সাধ্যসাধনাতেও কখন স্বামীর ঘর করিতে রাজী হন নাই। তাহার পর বলা নাই, কহা নাই, আপনি ইচ্ছা করিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল। ইহার মধ্যে অবশ্যই একটা নিগূঢ় কাণ্ড রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আর দিন দুই চুপ করিয়া থাক না; সকল কথাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।' হইলও তাই। দিন দুই পরে বিষম কলঙ্কের ঢাক বাজিয়া উঠিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রোহিণী ঠাকুরাণী একটু নীরব হইলেন। আমি মনে করিতে লাগিলাম, যে বিষম রহস্য জানিবার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল, তাহার সন্ধান পাইবার সূচনা হইতেছে কি? স্ত্রীচরিত্রের এবংবিধ ভঙ্গুরতা এবং পুরুষচরিত্রের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ সংসারে প্রতিনিয়তই চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিত্য পরিদৃষ্ট সামান্য ঘটনার মধ্যে রাজা প্রমোদরঞ্জনের আজীবন ভীতিবিধায়ক রহস্যের মূল নিহিত থাকা সম্ভব কি?

রোহিণী ঠাকুরাণী আবার বলিতে লাগিলেন,—"তার পর মহাশয়, চক্রবর্ত্তী আমার স্বামীর পরামর্শমতে চুপ করিয়াই থাকিলেন। অধিক দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না, পরদিনই সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী ও রাজা প্রমোদরঞ্জন ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে একটি গোপন স্থানে দাঁড়াইয়া, ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। চক্রবর্ত্তীকে দেখিবামাত্র রাজা হতমত খাইয়া যেরূপ আত্ম চরিত্রের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার অপরাধ আরও সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দারুণ অপমান হেতু অতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া রাজাকে প্রহার করিলেন। কিন্তু রাজার জোরে তিনি পারিবেন কেন? রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুররূপে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিলেন। গোলমালে চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গেল। অপমানের সীমা থাকিল না। সেই রাত্রিতে এই সকল সংবাদ শুনিয়া, যখন আমার স্বামী চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, তখন আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। চক্রবর্ত্তী সেই অবধি নিরুদ্দেশ। তাঁহার জন্য গ্রামস্থ সকল ভদ্রলোকেই দুঃখিত হইল এবং তাঁহার অনেক সন্ধান করিল; কিন্তু কিছুই ফল হইল না। অনেকদিন পরে কাশ্মীর হইতে তিনি আমার স্বামীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি আজও জীবিত আছেন; কিন্তু পূর্ব্ব-পরিচিত কোন লোকের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই; তাঁহার স্ত্রীর সহিত কদাচ সাক্ষাৎ ঘটা নিতান্তই দুরাশা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"রাজা কি করিলেন? তিনি কি নিকটেই কোথায় থাকিলেন?"

"না। সেখানে আর কি তিনি থাকিতে পারেন? সেই রাত্রেই হরিমতির সহিত তাঁহার অত্যন্ত

বচসা হইল। পরদিন হইতে তিনিও অন্তর্দ্ধান হইলেন।"

"আর হরিমতি? নিশ্চয়ই এ ঘোর কলঙ্কের পর তিনি আর সে গ্রামে বাস করিতে পারিলেন না।"

"তিনি খুব থাকিলেন। তাঁহার কঠিন হৃদয়, অপমানে বা কুৎসা দ্বারা বিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তিনি অম্লান-বদনে সকলের উপর টেক্কা দিয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, তিনি জোর করিয়া সকলকে জানাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে নিতান্ত অমূলক মিথ্যা অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী। যখন পুরান গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোকে নূতন গ্রামে ঘর বাঁধিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনিও সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া গিয়া ঘর বাঁধিলেন। সেই বেহায়া মেয়েমানুষ অদ্যাপি সেখানেই আছেন এবং বোধ হয়, মরণ পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাঁহার চলিতেছে কেমন করিয়া? তাঁহার স্বামী তাঁহাকে এই কাণ্ডের পর আর সাহায্য করিতে কখনই সম্মত নহেন।"

"না মহাশয়, তিনি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। তিনি আমার স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, ঐ অভাগিনী স্ত্রীলোক যখন তাঁহারই স্ত্রী-পরিচয়ে তাঁহারই বাটীতে বাস করিতেছে, তখন সে যতই কেন মন্দ হউক না, তাহাকে অন্নাভাবে ভিখারিণীর ন্যায় মরিতে দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে অতএব তিন মাস অন্তর কলিকাতায় এক নির্দ্দিষ্ট লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে গ্রাসাচ্ছাদনের অনুরূপ সাহায্য পাইবে।"

"হরিমতি সেইখান হইতে টাকা আনিয়া থাকে?"

"কদাপি না। সে বলিল, তাহাকে যদি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়া মরিতে হয়, তাহা হইলেও সে কখন রামধন চক্রবর্ত্তীর নিকট এক কড়া কড়িও গ্রহণ করিবে না। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর চক্রবর্ত্তীর ঐ চিঠি আবার আমার চক্ষে পড়ায় আমি হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, যদি তোমার কোন অভাব হয়, আমাকে তাহা জানাইও। সে তাহার উত্তরে বলিয়াছিল "অন্নাভাবে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব, সেও স্বীকার, তথাপি চক্রবর্ত্তী বা তাহার কোন আত্মীয় লোককে আমি দুঃখের কথা কখনই জানাইব না।"

"আপনার কি বোধ হয়, তাহার নিজের টাকা-কড়ি আছে?"

"যদিই থাকে তো সে অতি সামান্য। লোকে বলে, আমারও তাই মনে হয়, রাজা প্রমোদরঞ্জন তাহাকে গোপনে সাহায্য করিয়া থাকেন।"

এ পর্য্যন্ত যে যে কথা শুনিলাম, তাহাতে রাজার সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ রহস্য-বিষয়ক সন্ধানই তো পাওয়া গেল না। কেবল একটা কথা আমার মনে অতিশয় সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী এই দারুণ অপমানের পরও সেই গ্রামে কেন জোর করিয়া বাস করিতে লাগিল, তাহার কোন মীমাংসা করিতে আমি সক্ষম হইলাম না। সেই স্থানে নিরন্তর বাস করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণিত হইবে মনে করিয়া সে সেখানে থাকিয়া গেল; এ সিদ্ধান্ত বিশেষ সারবান্ নহে। আমার যেন মনে হইল, তাহাকে বাধ্য হইয়া অগত্যা রামনগরে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু কে তাহাকে বাধ্য করিয়া সেই স্থানে রাখিল? সহজেই অনুমান হইতেছে যে, তাহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেছে, সেই তাহাকে নিশ্চয়ই রামনগরে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। সে স্বামীর নিকট অর্থ গ্রহণ করে নাই; তাহার নিজের বিশেষ টাকাকড়ি নাই; এরূপ পতিত, কলঙ্কিত, আত্মীয়-বিহীন স্ত্রীলোকের অন্যত্র সাহায্য লাভ করাও সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে জনরব যাহা ঘোষণা করিতেছে, তাহাই সত্য বলিয়া মনে করিতে হইতেছে। নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদরঞ্জন তাহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু কেন? তাহাকে নিয়ত অর্থসাহায্য করিয়া সেই রামনগরে রাখায় রাজার উদ্দেশ্য কি? কি দুরভিসন্ধি সংগোপিত রাখিবার জন্য এই অনুষ্ঠান। হরিমতির সহিত রাজার প্রসক্তির কথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য অথবা মুক্তকেশীর পিতৃত্ব-বিষয়ক তাঁহার কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই অনুষ্ঠান কদাপি সঙ্গত নহে। কারণ, তত্রত্য জনসাধারণ এ সকল ব্যাপার অতিশয় বিশ্বাস করে, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস কদাপি এতদুপায়ে তিরোহিত হইবার নহে। তবে কি? নিশ্চয়ই এ ব্যবহারের অভ্যন্তরে গূঢ় অভিসন্ধি আছে। রাজার জীবনের সহিত যে এক ভয়ানক রহস্য সংযোজিত আছে এবং যাহা হরিমতি জানে ও সম্ভবতঃ মুক্তকেশী জানিত, তাহাই প্রচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে হরিমতিকে সেই স্থানে থাকিতে হইয়াছে। এখন আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রাজার সহিত গোমস্তা-পত্নীর গুপ্ত আলাপে যে সকল কথা চলিত, তাহা যদি আর কোন ব্যক্তির শ্রবণ-পথে পতিত হইত, তাহা হইলে

সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিত।

তবে কি এ ঘটনায় লোকের অনুমান সত্য নয়? তবে লোকে যে অবৈধ প্রণয় এ ব্যাপারের মূল বলিয়া অনুমান করিয়াছে, তাহা কি অমূলক? তবে হরিমতি যে মিথ্যা অপবাদের কথা সমর্থন করিয়াছে, তাহাই কি সত্য? তবে কি প্রকৃত কথা লোককে জানিতে না দিবার জন্যই রাজা ও হরিমতি এই সন্দেহজনক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন? এইরূপ মীমাংসাই আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। রাজার রহস্যের মূল এই স্থানে নিহিত আছে, তাহা আমার বেশ হৃদ্গত হইল।

তদনন্তর নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমি নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলাম যে, হরিমতি যখন স্বামীর ঘরে আইসে নাই, তখন সে ব্যভিচারিণী ছিল এবং অবশ্যম্ভাবী কলঙ্ক গোপন করিবার জন্যই সে স্বতঃ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্থান ও কালের আলোচনা করিয়া আমার নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মিল যে, হরিমতির কন্যা মুক্তকেশী কোন মতেই রামধন চক্রবর্ত্তীর ঔরসজাত কন্যা হইতে পারে না। কিন্তু রাজা প্রমোদরঞ্জন মুক্তকেশীর পিতা কি না, তাঁহার সহিত হরিমতির পূর্ব্বাবধি প্রসক্তি ছিল কি না, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ আমি দেখিতে পাইলাম না। যদি আকৃতি ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে মুক্তকেশীকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের কন্যা বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজা যখন আপনাদের গ্রামে যাতায়াত করিতেন, তখন আপনি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়া থাকিবেন।"

রোহিণী বলিলেন,—"হাঁ, অনেকবার দেখিয়াছি।"

"তাঁহাকে দেখিয়া মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা কখন আপনার মনে উদিত হইয়াছিল কি?"

"না মহাশয়, তাঁহার সহিত মুক্তকেশীর আকৃতিগত কোন সাদৃশ্য ছিল না।"

"তবে কি মুক্তকেশীর চেহারা তার মা'র মত?"

"না, মা'র মতও নয়।"

মাতার অনুরূপও নহে এবং আনুমানিক পিতার অনুরূপও নহে। আকৃতিগত সাদৃশ্য যে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, তাহা আমি জানি এবং সেরূপ ঘটনা যে এককালে উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে, তাহাও বুঝি। তাহার পর মনে করিলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জন ও হরিমতির রামনগরে আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের জীবনের কিরূপ ভাব ছিল, তাহার সন্ধান করিতে পারিলে হয় ত সুবিধা হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যখন রাজা প্রমোদরঞ্জন প্রথমে আপনাদের গামে আসিলেন, তখন তিনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনারা শুনিয়াছিলেন কি?"

"না মহাশয়! কেহ বলিত, তিনি কৃষ্ণসরোবর হইতে আসিয়াছেন; এবং কেহ বলিত, উত্তরদেশ হইতে আসিয়াছেন; কিন্তু ঠিক খবর কেহই জানিত না।"

"বিবাহের পর স্বামীর ঘরে আসিবার পূ[র্ব্বে] হরিমতি কোথায় থাকিত বা কি করিত, ত[াহার] কোন সন্ধান আপনি জানেন কি?"

"সে বিবাহের পরে স্বামীর ঘরে আসিবা[র পূর্ব্বে] পিত্রালয়েই থাকিত। শুনিয়াছি তৎকালে বাপের বাড়ীর দেশের এক বড়লোকের তাহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল।"

"সে বড়লোকের বাড়ীতে সে কিরূপ যাতায়াত করিত?"

"শুনিয়াছি, সেই বড়লোকের বাড়ীর এ[ক] স্ত্রীলোকের সহিত হরিমতির খুব ভাব ছিল। [সেই] জন্যই সে সেখানে যাওয়া-আসা করিত।"

"এমন ভাবে কত দিন সে যাতায়াত ক[রিত], তাহা আপনি জানেন কি?"

"ঠিক জানি না, তবে ৩।৪ বৎসর হওয়া সম্ভব।"

"সেই বড়লোকের নাম আপনি কখন শুনিয়াছেন কি?"

"হাঁ মহাশয়, তাঁহার নাম দীনবন্ধু রায়।"

"আচ্ছা, দীনবন্ধু রায়ের সহিত রাজা প্রমোদরঞ্জনের বিশেষ সদ্ভাব ছিল, অথবা তিনি সে দিকে কখন কখন বেড়াইতে যাইতেন, এমন কথা আপনারা কেহ কখন শুনিয়াছেন কি?"

"না মহাশয়, এরূপ কথা আমরা কেহ কখন শুনি নাই।"

কি জানি, ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া আমি দীনবন্ধু রায়ের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। কিন্তু আমার মনে স্থির-বিশ্বাস হইল যে, রাজা প্রমোদরঞ্জন কদাপি মুক্তকেশীর পিতা নহেন। আমি আরও স্থির-সিদ্ধান্ত করিলাম, হরিমতির সহিত রাজার গুপ্ত সাক্ষাতের অবশ্যই অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল এবং অবৈধ

প্রণয় কদাপি তাহার কারণ নহে। তদনন্তর আমি রোহিণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর বাল্য-জীবন-সংক্রান্ত দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিলাম। ভাবিলাম, হয় ত এই কথাবার্ত্তার মধ্য হইতে আমার অনুসন্ধানের অনুকূল দুই একটা কথা প্রকাশ হইয়াও পড়িতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"এই পাপে ও দুরবস্থায় জন্মিয়া বেচারা মুক্তকেশী কিরূপে আপনার হাতে পড়িল, তাহার কথা আমি কিছুই শুনি নাই।"

রোহিণী বলিলেন, "ইহ-জগতে ঐ দুঃখিনী বালিকাকে যত্ন করিতে আর কেহই ছিল না। ি পাপীয়সী জননী কন্যাকে তাহার জন্মদিনাবধি ঘৃণা তি রিত, যেন সেই সম্পূর্ণ অপরাধী। বালিকার এই লোকে স্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বড় কাঁদিতে লাগিল। তখন ি ক আমি নিজ সন্তানের ন্যায় লালন-পালন সেই বেহা র জন্য প্রার্থনা করিলাম।"

এবং বোধ ই সময় হইতে বরাবরই কি মুক্তকেশী আপ-
আমি ছে থাকিত ?"

করিয়া ? নিরন্তর আমার কাছে থাকিত না। হরিমতির আর সা কখন কখন খেয়াল চাপিত। আমি তাহাকে না করিতেছি, আমার এই বিষম অপরাধের শাজা তিনি অ ন্যই যেন সে সময়ে সময়ে জোর করিয়া তাহাতে লইয়া যাইত। কিন্তু তাহার এরূপ খেয়াল যখন তাঁ বেশী দিন থাকিত না। মুক্তকেশীকে সে আবার করি রাইয়া দিত। যদিও আমার নিকট থাকিয়া তা মুক্তকেশী খেলার সঙ্গী পাইত না এবং তাহাকে উৎসাহহীন হইয়াই থাকিতে হইত, তথাপি সে আমার কাছে আসিতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইত। যখন হরিমতি তাহাকে আনন্দধামে লইয়া গিয়াছিল সেই সময়ে সে অনেক দিন আমার কাছছাড়া ছিল। সেই সময়েই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়স দশ-এগার বৎসর হইবে; কিন্তু বুদ্ধি বড় কম, আর যেন কেমন বিমর্ষ ভাব। দেখিতে মুক্তকেশী তখন পরমা সুন্দরী। তাহার মা তাহাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলাম। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর রামনগরে থাকিতে আমার আর মন টিকিল না।"

"হরিমতি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইল ?"

"না। আনন্দধাম হইতে সে যেন আরও কঠিন-হৃদয়া ও কর্কশ স্বভাবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। লোকে বলিতে লাগিল, রাজা প্রমোদরঞ্জনের হুকুম লইয়া তবে হরিমতি গ্রামান্তরে যাইতে পাইয়াছিল। আরও বলিতে লাগিল, ভগ্নীর টাকা আছে জানিয়া হরিমতি তাহার মরণকালে সেবা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার কিছু থাকা দূরে থাকুক, সৎকার করিবার মত পয়সাকড়িও ছিল না। এই সকল কথা শুনিয়া হয় ত হরিমতির মেজাজ আরও খারাপ হইয়াছিল। ফলতঃ মেয়ে লইয়া স্থানান্তরে যাইতে দিতে কোনমতেই সে রাজি লইল না; বরং আমার নিকট কন্যাকে থাকিতে না দিয়া আমাদের উভয়কে কষ্ট দেওয়াই তাহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইল। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া আমি গোপনে মুক্তকেশীকে বলিলাম,—'যদি কখন বিশেষ কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন তুমি আমার কাছে পলাইয়া যাইও; আপাততঃ এই ভাবেই তোমাকে থাকিতে হইবে।' কত দিনই আমি কলিকাতায় থাকিলাম; মুক্তকেশী আর আমার নিকট আসিবার সুযোগ পাইল না। অবশেষে পাগ্‌লাগারদ হইতে পলাইয়া সে আমার নিকট উপস্থিত হইল।"

"আপনি জানেন কি, কেন রাজা তাহাকে এমন করিয়া পাগ্‌লাগারদে আট্‌কাইয়া রাখিতেন ?"

"মুক্তকেশী আমাকে যাহা বলিয়াছে, আমি তাহাই জানি। সে এ সম্বন্ধে গোলমাল করিয়া কথাই বলিত, তাহা আমি সব বুঝিতে পারিতাম না। তাহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই, তাহার মাতা রাজার বিষয়ে একটা বিশেষ গোপনীয় কথা জানিত। আমি রামনগর হইতে চলিয়া আসার বহুদিন পরে সেই কথা কোন সময়ে তাহার মা তাহার নিকট হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর মুক্তকেশী সেই গোপনীয় কথা জানিতে পারিয়াছে বুঝিয়া রাজা তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে গোপনীয় কথা যে কি, তাহা তাহাকে হাজার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও সে বলিতে পারিত না। কেবল বলিত, তার মা যদি মনে করে, তাহা হইলে রাজা প্রমোদরঞ্জনের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। বোধ হয়, হরিমতি তাহাকে ঐ কথাই বলিয়া থাকিবে। মুক্তকেশী যদি বস্তুতঃ কিছু জানিত, তাহা হইলে আমাকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিত, এমন তো কখন বোধ হয় না।"

আমারও মনের এইরূপ বিশ্বাস। আমি মনোরমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন কাঠের ঘরে রাণীর সহিত মুক্তকেশীর সাক্ষাৎ হয়, তখন যে তিনি সত্য সত্যই কোন রহস্য জানিতে পারিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। মুক্তকেশীর জননী হয় ত অসাবধানভাবে এমন কিছু বলিয়া থাকিবে, যাহা অবলম্বন করিয়া স্থূলবুদ্ধি মুক্তকেশী সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, সে রাজার

সর্ব্বনাশ করিতে পারে। পাপজনিত সন্দিগ্ধচিত্ত রাজা মনে করিয়া থাকিবেন, মুক্তকেশী তাহার মাতার নিকট সমস্ত কথা জানিয়াছে এবং রাণীও মুক্তকেশীর নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়াছেন।

রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে আর কোন সংবাদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এবং সময় অনেক হইয়াছে বুঝিয়া, আমি বিদায় গ্রহণ করিবার সময় বলিলাম,—"আমি আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়াছি। আপনি হয় ত আমার উপরে কতই রাগ করিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন,—"সে কি বাবা, আমি যাহা জানি, তা আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তখনই আমি বলিতে রাজি আছি।" তাহার পর সতৃষ্ণ-নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, আপনি মুক্তকেশীর খবর কিছু জানেন। যখন আপনি প্রথমে আসিলেন, তখনই আপনার মুখ দেখিয়া আমার তাহা বোধ হইয়াছিল। সে আছে কি নাই, এ খবরটি পর্য্যন্ত না জানিয়া থাকা কত কষ্টকর, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতে-ছেন না। এরূপ অনিশ্চিত থাকার চেয়ে একটা ঠিক খবর পাওয়া বড়ই ভাল। আপনি বলিয়াছেন, তাহার সহিত আর সাক্ষাতের আশা নাই। আপনি জানেন কি, বলুন সত্য করিয়া, আপনি কি নিশ্চয় জানেন, ভগবান্ তাহার সকল কষ্টের শেষ করিয়া দিয়াছেন কি?"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে বলিয়া ফেলিলাম—"বোধ হয়, তাহাই ঠিক। আমি মনে মনে নিশ্চয় জানি, ইহ-জগতে মুক্তকেশীর সকল জ্বালার শান্তি হইয়া গিয়াছে।"

আহা, বৃদ্ধা মাটীতে আছড়াইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বলুন মহাশয়, আপনি এ সংবাদ কেমন করিয়া জানিলেন? কে আপনাকে এ কথা বলিল?"

আমি উত্তর দিলাম,—"কেহই আমাকে বলে নাই; কতকগুলি কারণে আমি স্থির করিয়াছি। সে সকল কথা এখনও প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। আপনি সকলই জানিতে পারিবেন। আমি এ কথা আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি যে, তাহার যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই। আর সেই বুকের বেদনাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আর আপনাকে নিশ্চয়রূপে জানাইতেছি যে, তাহার সৎকারাদি কার্য্য যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকল বৃত্তান্তই আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন।"

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"মরিয়া গিয়াছে!—সৎকার হইয়াছে! এই অল্পবয়সে সে আর নাই, আমি তাই শুনিবার জন্য বসিয়া আছি! আমি তাহাকে খাওইয়াছি, ধুয়াইয়াছি, মানুষ করিয়াছি। সে আমাকেই মা বলিয়া ডাকিত। সেই মুক্তকেশী আজি আর নাই! হা বিধাতঃ! কিন্তু বলুন মহাশয়, আপনি এত খবর কেমন করিয়া জানিলেন?"

আমি তাঁহাকে আবার বলিলাম,—"আপনি অপেক্ষা করুন, সকলই জানিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আবার আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে; আমি আর এক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ২।১ দিনের মধ্যে আবার আসিব।"

তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়, যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা এখনই জিজ্ঞাসা করুন—আমাকে ভাবিত করিয়া রাখিবেন না।"

"রামনগরে হরিমতির ঠিকানা কি, এই কথাটা কেবল আমার জানিতে ইচ্ছা আছে।"

আমার কথায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং যেন মুক্তকেশীর মৃত্যুসংবাদও ক্ষণেক ভুলিয়া গেলেন। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলি-লেন,—"হরিমতির ঠিকানা লইয়া আপনি কি করি-বেন?"

আমি বলিলাম,—"হরিমতির সহিত দেখা করিব। রাজার সহিত তাহার গোপন সাক্ষাতের কারণ কি, আমি তাহা জানিতে চাহি। আপনি বা প্রতিবাসিগণ যাহা মনে করিয়াছেন, রাজা ও হরি-মতির রহস্য নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্রবিধ। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আমাদের অজ্ঞাত অতি গুরুতর এক রহস্য উদ্ভেদ করিবার অভিপ্রায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া হরিমতির নিকট যাইতেছি।"

রোহিণী ঠাকুরাণী সকাতরে বলিলেন,—"এরূপ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। হরিমতি অতি ভয়ানক মেয়েমানুষ।"

"আপনি আমার ভালর জন্যই এ কথা বলিতে-ছেন, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি তাহার সহিত নিশ্চয়ই দেখা করিব।"

রোহিণী আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি, আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে ঠিকানা লিখিয়া লউন।"

তিনি ঠিকানা বলিয়া দিলেন। আমি তাহা

আমার পকেটবহিতে লিখিয়া লইলাম। তাহার পর বলিলাম,—"আমি আজি আসি, আপনার সহিত আবার দেখা হইবে। আপনাকে সকল কথাই পুনঃ সাক্ষাতে বলিব।"

তিনি বলিলেন,—"এস বাবা! বুড়া মানুষের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিও না। আবার বলিতেছি, হরিমতি বড় ভয়ানক মেয়েমানুষ।"

আমি কোন উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া লীলার বড়ই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। এত দুঃসহ দুঃখ ও দারিদ্র্যভাবে যে লীলা একদিনও অবসন্ন হয় নাই, আজি তিনি সহসা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। লীলা শয্যার উপর বসিয়া আছেন মনোরমা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত ও বিনোদিত করিবার জন্য বহুবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। লীলা অবনত মস্তকে বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া আছেন। আমাকে দূর হই ত দর্শনমাত্র মনোরমা আমার নিকটস্থ হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"দেখ, তুমি যদি উহাকে উত্তেজিত করিতে পার।" তিনি প্রস্থান করিলেন।

আমি লীলার নিকটস্থ হইয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম এবং জিজ্ঞাসিলাম,—"বল, লীলা, বল, কেন তুমি এমন করিয়া আছ? বল, তুমি কি ভাবিতেছ?"

লীলা ছলছলিত-নয়নে আমার নয়নের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আমার মন ভাল নাই, আমি কত কি ভাবি"—এই বলিয়া সরলা একটু আনত হইয়া আমার স্কন্ধের উপর মস্তক-স্থাপন করিলেন। আমি বলিলাম,—"কেন তোমার মন ভাল থাকে না, বল! আমি এখনই তাহার প্রতীকার করিব।"

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—"আমি তোমাদের কোনই উপকারে লাগি না। আমি তোমাদের ঘাড়ের বোঝা মাত্র। দেবেন, তুমি টাকা উপার্জ্জন কর, দিদিও তোমার সাহায্য করেন। আমি কেবল বসিয়া থাকি। তুমি হয় ত ক্রমে দিদিকেই আমার চেয়ে বেশী ভালবাসিবে। দোহাই তোমাদের, তোমরা আমাকে এমন করিয়া পুতুলের মত তুলিয়া রাখিও না।"

আমি সস্নেহে লীলার মস্তকোত্তোলন করিয়া সাদরে তাঁহার কপোলনিপতিত কেশসমূহ অপসারিত করিয়া দিলাম। তদনন্তর বলিলাম,—"এই কথা! ইহার জন্য তোমার দুঃখ? তুমিও আমাদের কাজের সহায়তা কর না কেন? আজি হইতেই তুমি কাজ আরম্ভ কর।" এই বলিয়া আমি বিশৃঙ্খল কাগজপত্র একত্র করিয়া তাঁহার নিকটে আনিয়া দিলাম এবং বলিলাম,—"জান তো তুমি, আমি কাগজের জন্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করি। তুমিও বহু দিনের যত্নে বেশ রচনা করিতে শিখিয়াছ। আজ হইতে তুমিও প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রবন্ধ গ্রহণ করিয়া অর্থ প্রদান করে, সেই ব্যক্তিই তোমার প্রবন্ধ গ্রহণ করিয়া অর্থ প্রদান করিবে। তোমার প্রবন্ধ একখানি স্ত্রীলোক-প্রকাশিত কাগজে অতি সমাদরে প্রকাশিত হইতে থাকিবে; সুতরাং তোমারও এতদুপায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইবে। সেই অর্থ তুমি নিজের নিকটে রাখিয়া দিবে। মনোরমা যেমন আমার নিকটে আসিয়া সংসার-খরচের জন্য টাকা চাহেন, অতঃপর সেইরূপ তোমার নিকটেও চাহিবেন। ভাবিয়া দেখ লীলা, তখন তোমার সাহায্য নহিলে আমাদের আর চলিবে না।"

তাঁহার বদনে আগ্রহপূর্ণ আনন্দ-জ্যোতিঃ দেখা দিল। তিনি বিগত কালের ন্যায় উৎসাহ ও সজীবতা সহকারে কাগজকলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। তাহার পর হইতে আবার যত্নে ও পরমোৎসাহে কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন। স্বকীয় অকর্ম্মণ্যতাবোধ হেতু তাঁহার এই শুভ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। মনোরমা ও আমি এই হিত-পরিবর্ত্তনের অনুকূলতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ রচনা সমাপ্ত হইলে তিনি তাহা আমার হস্তে প্রদান করিতেন। আমি তাহা মনোরমাকে দিতাম এবং তিনি তাহা লুকাইয়া রাখিতেন। আমি আমার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু টাকা লীলার রচিত প্রবন্ধের মূল্য আদায় হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতাম। কখন কখন লীলা সগর্ব্বে তাঁহার মুদ্রাধার আমাদের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতেন যে, তিনি হয় ত সে সপ্তাহে আমার অপেক্ষাও অধিক উপার্জ্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এবংবিধ গৌরবে প্রশ্রয় দিয়া এই নির্দ্দোষ প্রতারণা চালাইলাম। আহা, লীলার তৎকালে রচিত সেই সমস্ত প্রবন্ধ এখনও আমার নিকট রহিয়াছে। তৎসমস্ত আমার নিকট অমূল্য সম্পত্তি—লীলার চিত্তবিকার বিদূরিত

করার সাধনস্বরূপ সেই কাগজগুলি আমার চির-সমাধন।

লীলার অজ্ঞাতসারে কথা কহিবার সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র আমি মনোরমাকে রোহিণীর সহিত সাক্ষাতের বৃত্তান্ত ও কথাবার্ত্তা সমস্তই জানাইলাম। হরিমতির সহিত সাক্ষাতের কথা উঠিলে, মনোরমাও রোহিণীর ন্যায় বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, এখনও তুমি কিছুই জানিতে পার নাই, যাহার জন্য হরিমতি তোমাকে ভয় করিবে। অন্যান্য সহজ উপায়ের চেষ্টা না করিয়া কখনই হরিমতির নিকট যাওয়া উচিত কি? যখন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, লীলার কৃষ্ণসরোবর হইতে কলিকাতায় আসার তারিখ রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ব্যতীত আর কেহই জানেন না, তখন তোমারও মনে পড়ে নাই যে. আর এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহা জানে। সে ব্যক্তি রমণী। রাজার নিকট হইতে সেই তারিখের কথা বাহির করিবার চেষ্টা করার অপেক্ষা রমণীর নিকট চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত সহজ নহে কি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"সহজ হইতে পারে। কিন্তু আমরা জানি না, রমণী এ চক্রান্তে কত দূর লিপ্ত। এ ব্যাপারে যদি তাহার কোন স্বার্থ না থাকে, তাহা হইলে এ কথা মনে করিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব না-ও হইতে পারে। রাজা ও চৌধুরী স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম সাধ করিয়াছেন, সুতরাং এ ব্যাপারের প্রত্যেক কথা তাঁহাদের মনে আছে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে রমণীর সন্ধানে সময় নষ্ট করা নিতান্তই অনাবশ্যক। তুমি মনে করিতেছ, মনোরমা, যে, রাজাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না? অথবা আমি রাজার নিকট হারিয়া যাইব?"

তিনি উত্তর দিলেন, "সে ভয় আমার নাই। কারণ, এবার চৌধুরী রাজার সঙ্গে নাই। অতি ধূর্ত্ত চৌধুরীর সহায়তা না পাইলে রাজা তোমার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন ন।"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি চৌধুরীকেই কি ছাড়িব মনে করিয়াছ? কখনই না। তোমার মনে আছে, গিন্নী-ঝির লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জানা গিয়াছে যে, চৌধুরী মহাশয় রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত পত্র-লেখালেখি চালাইয়াছিলেন। নিতান্ত গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তিনি কখনই সেই অপ্রকৃতিস্থ ও তাঁহার চির-বিদ্বেষী ব্যক্তিকে পত্র লিখিতেন না ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। সেই পত্র ও সাক্ষাতের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই এমন কোন কথা জানা যাইবে, যাহাতে চৌধুরীকে আমাদের মুঠার মধ্যে আনিতে পারা যাইবে। আমি তো রামনগরে যাইতেছি। এই সময়ের মধ্যে তুমি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখ যে, জগদীশ-নাথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব তিনি যেন তাহা অচিরে লিখিয়া পাঠান। যদি স্বেচ্ছায় লিখিয়া না দেন, তাহা হইলে আইনের সাহায্যে তাঁহার নিকট হইতে সকল কথা বাহির করা যাইবে, ইহাও লিখিতে তুমি ভুলিও না।"

"তা আমি লিখিব; কিন্তু তুমি কি সত্য সত্যই রামনগর যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছ?"

"তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। কালি না হয়, পরশ্ব আমি নিশ্চয়ই রামনগরে যাইব।"

তৃতীয় দিনে আমি রামনগরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এ কার্য্যে আমার ২।১ দিন বিলম্ব করা সম্ভব নহে। এ জন্য মনোরমার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম, তিনিও প্রতিদিন আমাকে পত্র লিখিবেন আমিও তাঁহাকে পত্র লিখিব। সাবধানতার অনুরোধে আমরা পরস্পরকে আরোপিত নামে পত্র লিখিব স্থির হইল। যত দিন আমি মনোরমার নিকট হইতে নিয়মিতরূপে পত্র পাইতে থাকিব, তত দিন আমি বুঝিব যে ভয়ের কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। যদি কোন দিন পত্র না পাই, তাহা হইলে আমি সেই দিনই চলিয়া আসিব। লীলার নিকট আমার অনুপস্থিতির নানারূপ কল্পিত কারণ উত্থাপন করিলাম, তাঁহাকে স্বচ্ছন্দচিত্ত ও সন্তুষ্ট দেখিয়া আমি যাত্রা করিলাম। মনোরমা দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আমরা কিরূপ চিন্তাকুল থাকিব, তাহা মনে থাকে যেন। তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে আমাদের সকল শান্তি। যদিই এ যাত্রায় কোন অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা ঘটে মনে কর, যদিই তোমার সহিত রাজার সাক্ষাৎ হয়—"

আমি বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা তোমার মনে কেন উদিত হইতেছ?"

"বলিতে পারি না কেন, তথাপি মনে হইতেছে, হয় তো তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, আমার মনের এইরূপও প্রকৃতি। দেবেন্দ্র, তুমি হাস আর যাহাই কর, দোহাই তোমার যদি সেই ব্যক্তি তোমার সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে তুমি যেন ক্রোধান্ধ হইয়া কাজ করিও না।"

"কোন ভয় নাই, মনোরমা! আমি রাগের বশবর্ত্তী হইব না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমি বিদায় হইয়া দ্রুতপদে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার মনে উৎসাহ ও আশার সীমা নাই। অতি নির্ম্মল বায়ু ঝির-ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নবোদিত দিবাকরের হৈমকিরণ বিশ্ব বিভূষিত করিতেছে। সকলই প্রীতিপ্রদ, সকলই সন্তোষময়। আমার হৃদয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সর্ব্বশরীর তদ্ধেতু আসুরিক বলসম্পন্ন। যথাসময়ে রেল-শকট বসুধা বিকম্পিত করিতে করিতে ধাবমান হইল। যথাকালে আমি রামনগর পৌছিলাম।

রামনগর অতি ক্ষুদ্র গাম। বড় জনহীন, বড় ফাঁকা ফাঁকা। তথাপি নিরন্তর কলিকাতাবাসের পর হঠাৎ এরূপ স্থানে আসিলে চিত্ত বিনোদিত হয়। গ্রামে পৌছিয়া আমি সন্ধানে সন্ধানে ক্রমে হরিমতির বাটীর নিকট উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় বিশেষ লোকজন নাই। কদাচিৎ একটি স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করিয়া সরোবর হইতে জল আনিতে চলিতেছে, এক জন চাষা টোকা মাথায় দিয়া গরু তাড়াইতে তাড়াইতে মাঠ হইতে ফিরিতেছে। কোথায় বা গ্রাম্য পণ্য-বিক্রেতা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়া নিদ্রা দিতেছে। এক বৃদ্ধ ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাকু খাইতেছে।

আমি নির্দ্দিষ্ট বাটীর দ্বার-সমীপস্থ হইয়া দেখিলাম, তাহা অভ্যন্তর হইতে বদ্ধ। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমি সেই দ্বারের শিকল নাড়িতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে এক জন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে দ্বার খুলিয়া দিল এবং আমি কাহার সন্ধান করিতেছি, জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, একটু বিশেষ দরকারের জন্য হরিমতি ঠাকুরাণীর সহিত আমি দেখা করিতে ইচ্ছা করি। সে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং কিঞ্চিৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার দরকার কি জানিতে চাহিল, আমি তখন বলি কি? তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম,—"ঠাকুরাণীর কন্যার বিষয়ে বিশেষ কোন কথা আছে।" সে পুনরায় চলিয়া গেল এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরে আসিতে বলিল। দেখিলাম, ছোট একতলা কুঠরী, সম্মুখে খুব চওড়া রক। অঙ্গনমধ্যে এক তুলসীমঞ্চ। তাহার চারিদিকে কয়েকটা ফুলের গাছ। সকলই বেশ পরিষ্কার; অতিশয় ঝরঝরে। আমি দাসীর সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যভাগও বেশ পরিষ্কার। ভিত্তি-গাত্রে হিন্দু দেবদেবীর অনেক ছবি বিলম্বিত। ঘরের এক কোণে কোষাকুষি প্রভৃতি সরঞ্জাম। আর দেখিলাম, একটি জানালার নিকটে একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক হরিনামের ঝোলা-হস্তে বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহের যথাযথ স্থানে তিলকাদি শোভা পাইতেছে। তাঁহার মূর্ত্তি খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ। মাথার চুল সব পাকে নাই, অনেক পাকিয়াছে। মুখ ও দৃষ্টির ভাব এতই সংযত যে তাহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ভাব অনুমান করিতে প্রয়াসী হওয়া নিতান্তই নিরর্থক। তাঁহার ওষ্ঠাধর স্থূল ও ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচায়ক। ইনিই হরিমতি।

আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে বলিলেন,—"আপনি আমাকে আমার কন্যার কথা বলিতে আসিয়াছেন? বলুন, কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরও এরূপ সমান যে, তাহা শুনিয়াও মনের ভাব অনুমান করা সম্ভব নহে। তিনি আমাকে একখানি পিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি যখন বসিতেছি, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আমি মনে করিলাম, এ বড় কঠোর ঠাঁই; অতএব খুব সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। বলিলাম,—"আপনি জানেন, আপনার কন্যা হারাইয়া গিয়াছে?"

"আমি তাহা বেশ জানি।"

"এ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে, ইহাও আপনি আশঙ্কা করেন বোধ হয়?"

"হাঁ। আপনি কি আমাকে তাহার সংবাদ দিতে আসিয়াছেন?"

"তাই বটে।"

সম্পূর্ণ উদাসীন ও অকাতরভাবে কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গীর কোনপ্রকার অন্যথা না করিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন?"

রাস্তায় একটা কুকুর মরিয়া গিয়াছে শুনিলেও কেহ এরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। আমি তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন? আপনি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন আমি আপনার কন্যার মৃত্যুসংবাদ দিতে আসিয়াছি?"

"হাঁ। সেই বা আপনার কে, আমিই বা আপনার কে? আপনি তাহার কথা জানিলেন কিরূপে?"

"যে রাত্রিতে সে পাগ্‌লাগারদ হইতে পলাইয়াছিল, সেই রাত্রিতে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর সে যাহাতে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছিতে পারে, আমি সে জন্য তাহার সাহায্য করিয়াছিলাম।"

"আপনি বড অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন।"

"তার মা'র মুখে এ কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।"

"তা আপনি হউন, তথাপি আমি ঐ কথাই বলিতেছি। সে যে মরিয়াছে, তাহা আপনি জানিলেন কিরূপে?"

"তাহা আমি এখন বলিতে অক্ষম। কিন্তু আমি জানি, সে আর নাই।"

"কি উপায়ে আমার ঠিকানা পাইলেন তাহাও আপনি বলিতে অক্ষম কি?"

"আমি রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট আপনার ঠিকানা জানিয়াছি।"

"রোহিণী অতি নির্ব্বোধ মেয়েমানুষ। সে কি আপনাকে আমার নিকট আসিতে বলিয়া দিয়াছিল?"

"না, তা তিনি বলেন নাই।"

"তবে আপনি এখানে আসিলেন কেন?"

"মুক্তকেশীর মাত কন্যা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, জানিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন ভাবিয়া আমি আসিয়াছি।"

"হরিমতি আরও একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"বেশ কথা। আপনার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই?"

সহসা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"যদি আপনার আর কোন অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে আপনার কথা শেষ হইয়াছে; আপনি এখন আসিতে পারেন। আপনি কি উপায়ে এ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন, তাহা যদি বলিতেন, তাহা হইলে আপনার সংবাদ আরও সন্তোষজনক হইত। যাহা হউক, তাহার জন্য কোন শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক হইবে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। আপাততঃ স্নান করা দরকার হইবে বোধ হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে হরিনামের ঝুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তদনন্তর আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আপনি এখন আসুন তবে।"

তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আমার রাগ হইল এবং আমি তখন আমার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে বলিতে সংকল্প করিয়া কহিলাম,—"এখানে আসিবার আরও কারণ আছে।"

হরিমতি বলিলেন,—"হা, আমিও তা বুঝিয়াছি।"

"আপনার কন্যার মৃত্যু "

"কি রোগে তাহার মৃত্যু হইল?"

"হৃদ্রোগ।"

"হাঁ। তার পর?"

"আপনার কন্যার মৃত্যু উপলক্ষে দুইটি লোক আমার এক অতি প্রিয় ব্যক্তির সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার এক জন রাজা প্রমোদরঞ্জন-রায়।"

"বটে?"

আমি প্রণিধান করিয়া দেখিতে লাগিলাম, রাজার নাম শ্রবণে তাহার মুখের কোন ভাবান্তর হয় কি না, সে একটুও বিচলিত হয় কি না। দেখিলাম, সে পাষাণ দ্রবীভূত হইবার নহে। তাহার একটি শিরাও বিকম্পিত হইল না।

আমি বলিতে লাগিলাম, "আপনার কন্যার মৃত্যু অপরের অনিষ্টের কারণ হইতেছে শুনিয়া আপনি হয় তো আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছেন।"

হরিমতি উত্তর দিলেন, "না, আমি কিছুই আশ্চর্য্য জ্ঞান করি নাই। আপনি আমার বিষয়ে যেরূপ আগ্রহযুক্ত, আমি আপনার বিষয়ে সেরূপ আগ্রহযুক্ত নহি।"

আমি আবার বলিলাম, "আপনি হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি এ সকল কথা আপনার নিকট বলিতে আসিয়াছি কেন?"

"এ কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি বটে।"

"আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে এই দারুণ দুষ্ক্রিয়ার জন্য দায়গ্রস্ত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া এত কথা আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি।"

"আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তা আমার কি?"

"শুনুন। রাজার অতীত জীবনে এরূপ অনেক ব্যাপার আছে, যাহা জানিতে পারিলে আমার উদ্দেশ্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

"কি ব্যাপার, বলুন।"

"যখন আপনার স্বামী ঠাকুরবাড়ীর গোমস্তা ছিলেন, সেই সময়ে পুরান রামনগরে যে সকল কাণ্ড

ঘটিয়াছিল ও আপনার কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল, তাহাই আমি জানিতে চাহি।”

এতক্ষণে এত সঙ্কোচ, এত গাম্ভীর্য্যের পর,—এতক্ষণে যেন হরিমতিকে আমি বিচলিত করিতে পারিয়াছি বোধ হইল। দেখিলাম, তাঁহার চক্ষে রাগের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে; তাঁহার স্থির, নিশ্চল হস্তদ্বয় পরিধান-বস্ত্রের এক প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন - “আপনি সে সকল ব্যাপারের কি জানেন?”

আমি উত্তর দিলাম, “রোহিণী যাহা জানিতেন, আমি সে সবই জানি।”

তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি যেন ক্রোধান্ধ হইয়া কি বলিবেন, মনে হইল। কিন্তু না, তিনি তখনই সে ভাব সংবরণ করিলেন ও দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়া ঈষৎ বিদ্রূপসূচক হাসির সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—“এতক্ষণে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি। রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত আপনার বৈরতা আছে, আপনি শত্রু-নির্য্যাতনে সচেষ্ট হইয়াছেন; আমাকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে; রাজার সহিত আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে সব আপনাকে বলিতে হইবে। কেমন? তাহা নহিলে চলিবে কেন? আপনি মনে করিয়াছেন, আমি একটা পতিতা দুঃখিনী মেয়ে বৈ তো নহি, দুঃখে-কষ্টে দিনযাপন করি, সহজেই ভয়প্রযুক্ত আপনার নিকট সকল কথা বলিয়া ফেলিব। বুঝিয়াছি, আপনার অভিপ্রায় বেশ জানিতে পারিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ শব্দে ক্রোধ-সহকৃত কর্কশ হাস্য করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমি এখানে কিরূপে থাকি, তা আপনি জানেন না বুঝি! পাড়ার লোক ডাকিয়া আপনাকে তাড়াইয়া দিবার আগে সে সকল কথা আপনাকে শুনাইয়া দিতেছি। অকারণে, অন্যায়রূপে আমার চরিত্রের কুৎসা চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কুৎসা দূর করিয়া পুনরায় সুনাম লাভ করিবার বাসনায় আমি এই স্থানে নিরন্তর পড়িয়া আছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আগে যাহারা আমাকে দেখিলে মুখ বাঁকাইত, এখন তাহারা আমার সহিত সাগ্রহে ফিরিয়া কথা কহে। যে সকল সতী-লক্ষ্মীরা আগে আমাকে দেখিলে হাসিতেন, এখন তাঁহারাই, আমি কেমন আছি, জানিবার জন্য ব্যাকুল। আগে কোন ক্রিয়া-কর্ম্মে গ্রামের কেহই আমাকে নিমন্ত্রণ করিত না এবং আমি জোর করিয়া কোন ক্রিয়াবাড়ীতে গেলেও লোক বিরক্ত হইত। এখন আমি সেই ক্রিয়াবাড়ীর রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। এ সকল কথা বুঝি আপনি জানিতেন না? গ্রামের যেখানে যাইবেন, সেইখানেই আমার সুযশ শুনিতে পাইবেন। বলরাম ভট্টাচার্য্য সপরিবারে শয্যাগত। কে তাঁহাদের পথ্য রাঁধিয়া দেয়, সেবা-শুশ্রূষা করে, জানেন?—আমি। ভজার মা ঘরে মরিয়া পড়িয়া ছিল, সৎকার হয় না। কে উদ্যোগী হইয়া খরচপত্র করিয়া তাহার সৎকার করাইল, জানেন?—আমি। গোয়ালাদের মেয়ে প্রসব হইল, কিন্তু এমন সাধ্য নাই যে একটি পয়সা খরচ করিয়া মেয়ের প্রাণ বাঁচায়। তখন ঘি, ঝালমসলা লইয়া কে উপস্থিত, জানেন? আমি।—কত আপনাকে বলিব? বলিয়াই বা ফল কি? কোন ভয়েই আমি অবসন্ন হইব না। গ্রামস্থ তাবতেই আমার আত্মীয় এবং আমার সুনাম সর্ব্বত্র, আমি কেবল পরের উপকার, পূজা-অর্চ্চনা, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ও হরিনাম করিয়া কাটাই।” এমন সময়ে পথে কোন লোকের জুতার শব্দ শুনিয়া হরিমতি একটু জানালা খুলিলেন। এক জন বৃদ্ধ, লম্বোদর, শ্মশ্রুগুম্ফ-বিরহিত শিখাধারী ব্রাহ্মণ চটি-জুতা ফটাস ফটাস করিতে করিতে পথ দিয়া চলিতেছেন। তিনি হরিমতিকে দর্শনমাত্র জিজ্ঞাসিলেন,—“মা! ভাল আছ তো?” হরিমতি উত্তর দিল,—“হাঁ বাবা, ভাল আছি।” ব্রাহ্মণ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, “তোমার মত পুণ্যশীলা লোক ভাল থাকিলেই সকল মঙ্গল।” তখন হরিমতি সগর্ব্বে বলিল—“দেখিলেন তো স্বচক্ষে? উনি সিদ্ধান্ত মহাশয়! এখানকার টোলের অধ্যাপক এবং গ্রামের পুরোহিত। শুনিলেন তো উনি কি বলিলেন? আপনি মনে করিয়াছেন, এইরূপ স্ত্রীলোক নিন্দার ভয়ে অবসন্ন! এখন কি ভাবিতেছেন, বলুন।”

আমি উত্তর দিলাম, “যাহা ভাবিয়া আসিয়াছি, এখনও তাহাই ভাবিতেছি। গ্রামমধ্যে আপনি যথেষ্ট সম্মানলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সে সম্মান নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই, সাধ্যও নাই। আমি জানি, রাজা প্রমোদরঞ্জন আপনার শত্রু। তাঁহার উপর আমার রাগের যেরূপ কারণ আছে, আপনারও সেইরূপ আছে। আপনি এ কথা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন, করুন। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, আমার উপর রাগ করিতে পারেন; কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র চৈতন্য থাকে, তাহা

হইলে ঐ দুর্ব্বৃত্তের সর্ব্বনাশসাধনার্থ আমার সহায়তা করা আপনার নিতান্ত আবশ্যক ও উচিত।"

তিনি বলিলেন,—"আপনি উহার সর্ব্বনাশ করিয়া আমার নিকট আসিবেন; তখন দেখিবেন, আমি কি বলি।"

এই কথা কয়টি তিনি দ্রুত, ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপূর্ণভাবে সমাপ্ত করিলেন। যে দারুণ ক্রোধ এত দিন তিনি পোষণ করিতেছেন, তাহা এতক্ষণে আমি জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু ক্ষণেকের নিমিত্ত দলিত-ফণা সর্পের ন্যায় তাঁহার ক্রোধ তখনই বিস্তৃত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি তবে আমাকে বিশ্বাস করিবেন না?"

"না।"

"কেন? আপনি ভয় পাইতেছেন?"

"আপনার কি তাই বোধ হইতেছে?"

"আমার বোধ হইতেছে, আপনি রাজা প্রমোদরঞ্জনের ভয়ে ভীত।"

"বটে?"

আমি দেখিলাম, তাঁহার বদনে ও চক্ষুতে সবিশেষ ক্রোধের লক্ষণ প্রকটিত হইতেছে। অতএব এই সুরে কথা চালাইলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে আশা করিয়া আমি বলিলাম,—"রাজা যেরূপ ধনবান্ ও পদপ্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট ব্যক্তি, তাহাতে তাঁহাকে ভয় করা আপনার পক্ষে কোনই বিচিত্র কথা নহে। প্রথমতঃ তাঁহার উপাধি রাজা, তিনি প্রভূত জমীদারীর স্বামী, অতি সদ্বংশে তাঁহার জন্ম—"

এই সময়ে তিনি হঠাৎ অতিশয় হাসিয়া উঠিলেন এবং অতীব ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"হাঁ হাঁ,—জমীদারীর স্বামী—অতি সদ্বংশে জন্ম। ঠিক্ ঠিক্। অতি সদ্বংশে—বিশেষতঃ মাতৃপক্ষে।"

এখন সময় নষ্ট করিয়া এ সকল কথার মর্ম্মালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। এ স্থান হইতে প্রস্থান করার পর এ সব কথা ভাবিয়া দেখিব মনে করিয়া আমি বলিলাম "আমি বংশের বিচার করিতে আপনার নিকট আসি নাই। আমি রাজার মাতৃসম্বন্ধে কিছুই জানি না—"

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—"তবে আপনি রাজার সম্বন্ধেও কিছু জানেন না।"

আমি বলিলাম,—"তা ভাবিবেন না। আমি রাজার সম্বন্ধে অনেক জানি এবং অনেক সন্দেহ করি।"

"কি কি আপনি সন্দেহ করেন?"

"আমি যাহা যাহা সন্দেহ করি না, তাহাই আপনাকে আগে বলিতেছি। আমি সন্দেহ করি না যে, তিনি মুক্তকেশীর পিতা।"

এই কথা যেই বলা, সেই মাগী বাঘিনীর মত লাফাইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতিশয় ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল,—"কি স্পর্দ্ধা! কোন্ সাহসে তুমি এরূপ কথার উত্থাপন করিতেছ? কে মুক্তকেশীর পিতা, কে পিতা নহে, ইহার বিচার তুমি কোন্ সাহসে করিতেছ?"

আমিও জোর করিয়া বলিলাম,—"আপনার ও রাজার জীবনে যে রহস্য আছে, তাহা এতৎসংক্রান্ত নহে। যে রহস্য রাজার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আপনার কন্যার জন্মের সহিত তাহার উদ্ভব হয় নাই এবং আপনার কন্যার মৃত্যুতে তাহার অবসান হয় নাই।"

তিনি সে স্থান হইতে একটু সরিয়া গেলেন এবং দ্বারের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "আপনি চলিয়া যাউন।"

আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলাম,—"আপনি ও রাজা যে সময়ে রাত্রিকালে ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে গোপনে আলাপ করিতেন এবং যে সময়ে আপনাদের সেই রহস্যালাপ আপনার স্বামী ধরিতে পারিয়াছিলেন, তখন আপনার অথবা রাজার অন্তঃকরণে আপনার কন্যার জন্মসংক্রান্ত কোন ভাবনা ছিল না; আপনাদের মধ্যে কোন অবৈধ প্রণয় ছিল না।"

দেখিলাম, তাঁহার ভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল। আমার উক্তির মধ্যে আমি দৈবাৎ 'ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে' এই দুইটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। ইহাই কি এরূপ ভাবান্তরের কারণ? তাঁহার ক্রোধ অনেকটা কমিয়া গেল বোধ হইল। তিনি কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্‌ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আপনি কি এখনও আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

"আপনি কি এখনও আমাকে চলিয়া যাইতে বলেন?"

"হাঁ। আর কখন এখানে আসিবেন না।"

আমি দ্বারের দিকে চলিয়া আসিলাম এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে বলিলাম,—"আশা করি, রাজার সম্বন্ধে আমি আপনার আশাতীত

কোন সংবাদ আনিতে সমর্থ হইব। যদি তাহা পারি, তবে আবার আমি আপনার নিকট আসিব।"

"রাজার বিষয়ে এমন কোন সংবাদ নাই, যাহা আমি আশা করি না। কেবল"—আর কিছু না বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে আপনার আসনে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, "কেবল তাঁহার মৃত্যু-সংবাদের আশা নাই।"

দেখিলাম, তাঁহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য-রেখা প্রকটিত হইয়াছে। আর দেখিলাম, তিনি অতি ধূর্ত্ততাসহ আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি কিরূপ বলিষ্ঠ, রাজার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে ও মারামারি বাধিলে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে, তাহাই কি তিনি আলোচনা করিতেছিলেন? যাহাই তিনি ভাবুন, আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, সেই সিদ্ধান্ত মহাশয় আবার ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি সেই জানালার নিকটস্থ হইলে হরিমতি জিজ্ঞাসিলেন, —"সুদোর ছেলে ক'দিনের পর আজ ভাত খাবে কথা ছিল; খেয়েছে কি বাবা?" সিদ্ধান্ত বলিলেন, —"খেয়েছে বোধ হয়। তোমার বাছা এতও মনে থাকে। আমাদের এ গ্রামখানির তুমিই লক্ষ্মী।"

আর কি চাও? গ্রামের অধ্যাপক ও পুরোহিত আমার সমক্ষে তাঁহার সহিত দুই দুইবার কথা কহিলেন, তাঁহাকে পুণ্যশীলা ও গ্রামের লক্ষ্মী বলিলেন, ইহার অপেক্ষা সন্ধান আর কি হইতে পারে?

নবম পরিচ্ছেদ

আমি হরিমতির আবাস ত্যাগ করিয়া কয়েক পদমাত্র আসিতে না আসিতে পার্শ্বে একটা দরজা খোলার শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ঠিক হরিমতির বাটীর পাশেই একটা বাটীর দরজায় একটা কালো মত লোক দাঁড়াইয়া আছে। লোকটা দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল এবং আমার আগে আগে যাইতে লাগিল। আমি সহজেই চিনিতে পারিলাম, যে ছেঁড়া মোক্তার আর একবার আমার আগে আগে কৃষ্ণসরোবরের পথে চলিয়াছিল এবং যে আমার সহিত ঝগড়া বাধাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, এ সেই লোক। নিকটস্থ হইলে আমার সহিত লোকটা একবার কথাবার্ত্তা কহিবে কি না, ভাবিতে ভাবিতে সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সে একটি কথাও কহিল না, একবার ফিরিয়াও চাহিল না, একমনে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। তাহার এতদ্রূপ ব্যবহারে আমার মনে বড়ই কৌতূহল ও সন্দেহ জন্মিল এবং আমি তাহাকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলাম। এইরূপে চলিতে চলিতে আমরা রেল-ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। লোকটা একবারও পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিল না।

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। যে ২১ জন আরোহী দেরী করিয়া আসিয়াছে, তাহারা তখনও টিকিট-ঘরের গবাক্ষের নিকট গোল করিতেছে। শুনিতে পাইলাম, সেই ছেঁড়া মোক্তারও সেই গোলে মিশিয়া কৃষ্ণ-সরোবরের টিকিট চাহিতেছে। টিকিট লইয়া সে গাড়ীতে উঠিল, তাহাও আমি দেখিলাম।

এ ব্যাপারের অর্থ কি? আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি, হরিমতির বাটীর ঠিক পার্শ্বস্থ বাটী হইতে সে বাহির হইয়াছে। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, আমি হরিমতির সহিত সাক্ষাৎ করিব, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কা করিয়া, রাজা এই লোককে হরিমতির ভবনপার্শ্বে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে হরিমতির বাটীতে যাইতে ও তথা হইতে আসিতে দেখিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসরোবরে রাজাকে এই সংবাদ দিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে। সুতরাং অতঃপর স্বল্পকালের মধ্যে রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ঘটনাচক্র যে স্থানে গিয়াই অবস্থিত হউক, আমি কোন দিকেই দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং রাজা প্রমোদরঞ্জন বা অন্য কাহারও জন্য কোন চিন্তা না করিয়া, অবলম্বিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কলিকাতায় বড় আশঙ্কিত হইয়া চলাফেরা করিতে হইত; কারণ,সেখানে আমাকে কেহ চিনিতে পারিলে ক্রমে লীলার গুপ্তনিবাসও জানিতে পারিবে, কিন্তু এখানে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। এখানে আমি ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি। যদিই কেহ আমাকে চিনিতে পারে, তাহাতে আমারই বিপদ্ ঘটিবে, অপর কেহই সে জন্য দায়গ্রস্ত হইবে না।

ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রায় সন্ধ্যা হইল। এরূপ অপরিচিত নূতন স্থানে রাত্রিতে আর কোন সন্ধানের সুবিধা হইবে না বুঝিয়া আমি ষ্টেশন-সন্নিহিত এক দোকান-ঘরে আশ্রয় লইলাম এবং সেই

স্থানেই জলযোগ করিয়া পড়িয়া থাকিলাম। আহারান্তে মনোরমাকে সমস্ত সংবাদসহ এক পত্র লিখিলাম।

রাত্রিতে দোকানঘর নিতান্ত নির্জ্জন হইয়া গেল। আমি ছেঁড়া মাদুরে পড়িয়া অদ্যকার সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলাম। হরিমতির সমস্ত ব্যবহার ও সকল কথাবার্ত্তা স্মরণ করিতে লাগিলাম। যখন রোহিণী আমার নিকট রাজা ও হরিমতির নৈশ মিলন-ক্ষেত্রস্বরূপ ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখনই আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, এরূপ অবৈধ প্রণয়ের জন্য তাঁহারা ঠাকুরবাড়ীর সমীপ-দেশ ভিন্ন আর কোথায় কি স্থান পান নাই? এরূপ প্রকাশ্য স্থান কি এতাদৃশ কার্য্যের অনুকূল? যাহাই হউক, আমি দৈবাৎ ঠাকুরবাড়ীর নাম করিয়া ফেলিবার পর হইতে হরিমতির বিস্ময়জনক ভাবান্তর হইয়াছিল। আমার অনেক দিন হইতে ধারণা হইয়াছে যে, কোন অতি গুরুতর দুষ্ক্রিয়া রাজা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনের রহস্য। অধুনা ঠাকুরবাড়ীর নামে হরিমতির ভয় দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল যে, এই স্ত্রীলোক সেই দুষ্ক্রিয়ার কেবল সাক্ষী নহে—এ তাহার সাহায্যকারী।

কিন্তু কি সে দুষ্ক্রিয়া? অনেক ভাবিয়াও তাহার কিছু অনুমান করিতে সমর্থ হইলাম না। দেখিয়াছি, হরিমতি রাজাকে যেমন ঘৃণা করে, রাজার মাকেও তেমনই ঘৃণা করে। রাজার বংশের কথা উত্থিত হইলে সে নিতান্ত ঘৃণা ও বিদ্রূপ সহ বলিয়াছিল যে, অতি সদ্বংশেই তাঁহার জন্ম বটে, "বিশেষতঃ মাতৃপক্ষে!" এ কথার অর্থ কি? এ কথার তিন অর্থ সম্ভব। প্রথমতঃ, হয় ত রাজার জননী অতি নীচ-বংশোদ্ভবা। দ্বিতীয়তঃ, হয় ত তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল না। তৃতীয়তঃ, হয় ত তিনি রাজার পিতার বিবাহিতা বনিতা ছিলেন না। হরিমতির কথা সবিশেষ বিচার করিলে শেষ কথাটাই সঙ্গত মনে হয়। রাজার উপাধি, ঐশ্বর্য্য ও বংশ সকলেরই উপর হরিমতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিল। শেষ মীমাংসা ভিন্ন তাহার কথার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই রাজা কোন অত্যদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া নাম, সম্ভ্রম, বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সে কৌশল, সে রহস্য অবশ্যই তিনি বিহিত যত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টাশীল এবং তাহা প্রকাশিত হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ অধঃপতন ধ্রুব নিশ্চিত। তাঁহার সমস্ত ব্যবহার স্মরণ করিয়া দেখিলে এরূপ কোন ঘৃণিত রহস্য তাঁহার জীবনের সহিত নিশ্চয়ই সংলিপ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে রামনগরের ঠাকুরবাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? এই স্থানে এত সতর্কতার সহিত হরিমতিকে নিয়োজিত করিয়া রাখায় রাজার অভিপ্রায় কি? এই দুর্জ্ঞেয় কাণ্ডের কোনই মীমাংসা সম্ভব নহে। ফলতঃ যাহাই হউক, প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরবাড়ীর বর্ত্তমান গোমস্তার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ এ চিন্তা পরিত্যাগ করিলাম এবং নিদ্রাদেবীর শুভাগমন-প্রার্থনায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত রহিলাম। যদি বা নিদ্রা একবার দেখা দিতেন, তাহাও হইল না। দোকানদার ভজহরি দে বিলক্ষণরূপ অহিফেন সেবা করিয়া থাকেন, রাত্রি শেষ না হইলে তাঁহার নিদ্রা হয় না। তিনি এ দিকে সমস্ত রাত্রিটুকু নিরন্তর তামাক খাইতে খাইতে ও কাসিতে কাসিতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এখন তিনি একবার তাম্রকূট-সেবনার্থ উঠিয়া দেশালাই ঘষিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ও টীকা ধরাইলেন এবং বিহিত বিধানে তামাক সাজিয়া ভড় ভড় শব্দে হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাসি —ওঃ, দম আটকাইয়া মারা যায় আর কি! তবু কি হুঁকা ছাড়ে! এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া আমি হাই ছাড়িয়া ও গা-ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিলাম। আর একটা দোহার পাইলাম ভাবিয়া ভজহরি বড় খুসী হইল এবং সাদরে বলিল,—"বাবু কি তামাক খাইবেন না কি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"না, আমি তামাক খাই না।"

ভজহরি হয় ত দুঃখিত হইল এবং আমাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই মনে করিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুর কি করা হয়?"

আমি তাহাকে যাহা হয় একটা বুঝাইয়া দিলাম, সে তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"এ দেশে মহাশয়ের কি মনে ক'রে আসা?"

আমি বলিলাম,—"মনে বিশেষ কিছুই নাই। একবার এ দেশটা দেখা-শুনাই প্রধান ইচ্ছা।"

সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আর মহাশয়, এ দেশে এখন আর দেখিবার কিছুই নাই। পূর্ব্বকালে আমাদের গ্রামের ঠাকুরবাড়ী দেখিবার জন্য অনেক লোক সর্ব্বদা যাওয়া-আসা করিত বটে। তখন সে এক দিন ছিল। এখন সবই গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আগে অনেক লোক আসিত, এখন আর আসে না কেন?"

"কি আর বলিব মহাশয়, কালে কালে সবই লোপ হইতেছে। এখন কি আর লোক ঠাকুর-দেবতা মানে? আমাদের এই ঠাকুরের ভারী মাহাত্ম্য। দেশ-বিদেশ হইতে লোক ঠাকুর-পূজা দিতে, তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার কাছে ধন্না দিতে আসিত। ওঃ, তখন ধুম ছিল কত! তখন ঠাকুরবাড়ীর কাছেই আমার দোকান ছিল। প্রতি-দিন আমরা বিশ ত্রিশ টাকা বেচা-কেনা করিতাম। শেষে আর কিছুই হয় না; পেট চলে না দেখিয়া ক্রমে রেলের ধারে দোকান উঠাইয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"ঠাকুরের মাহাত্ম্য কি রকম?"

"ওঃ, ঠাকুর বড় জাগ্রত। যে যা কামনা করে, তা কখন নিষ্ফল হয় না।"

"বটে। ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা কিরূপ?"

"ঠাকুরের যা আয় আছে, তা সব সেবায় খরচ হয়। সে আর বড় কম নয়—বৎসরে ২॥০ হাজার টাকা। তা ছাড়া ঠাকুরের আরও এক আয় আছে, তাতেও বড় কম জমে না।"

"আর কি আয়?"

"এ অঞ্চলে চারিদিকে ১৫ ক্রোশের মধ্যে যেখানে যে বিবাহ হইবে, সেই তারিখ ধরিয়া, ঠাকুরবাড়ীর খাতায় সে জন্য কিছু না কিছু প্রণামী দিতে হইবেই হইবে। তা দু পয়সাই হউক, আর দু হাজার টাকাই হউক। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় এ প্রদেশের যে বিবাহের উল্লেখ নাই, সে বিবাহ অসিদ্ধ। বিবাহবিষয়ে কত আইন-আদালত হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় যে বিবাহের প্রণামী জমা নাই, সে বিবাহ মিথ্যা ও জুয়াচুরী বলিয়া আদালত না-মঞ্জুর করিয়াছে। এমন ব্যাপার কতই হইয়াছে। কেন, আপনি কি শুনেন নাই, চলিত কথাই আছে, 'রামনগরের ঠাকুরবাড়া, বিয়ের বাব সরকারী।' এমন চলিত কথা কতই আছে। তাহাতেও ঠাকুরের মন্দ আয়—"

আমি তাহার কথার শেষাংশ আর শুনিলাম না। যাহা শুনিলাম, তাহাতেই আমার হৃদয় শোণিত সবেগে বহিতে লাগিল। পূর্ব্বাপর সমস্ত বিচার করিয়া আমার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিল, এই ঠাকুরবাড়ীর খাতায় রাজার জীবনের সমস্ত রহস্য নিহিত আছে। হরিমতির কথাবার্ত্তা স্মরণ করিয়া এবং রাজার সমস্ত ব্যবহার আলোচনা করিয়া আমার মনে বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিল, নিশ্চয়ই রাজা তাঁহার পিতার বিবাহিতা বনিতার পুত্র নহেন এবং নিশ্চয়ই রাজার পিতার বিবাহের প্রণামী ঠাকুরবাড়ীর খাতায় জমা নাই। এই স্থানেই যাহা হউক, একটা কাণ্ড আছে। কতক্ষণে স্বয়ং ঠাকুরবাড়ী উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে খাতা দেখিব, ভাবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম। কতক্ষণে রাত্রির অবসান হইবে, ভাবিয়া আমি অধীর হইলাম। ঠাকুরের মাহাত্ম্য-বিষয়ে ভজহরি অনেক বক্তৃতা করিল। কিন্তু আমি তাহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলাম না, কোন উত্তর-প্রত্যুত্তরও করিলাম না। সে আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া অগত্যা নিরস্ত হইল।

ক্রমে সুদীর্ঘ নিশার অবসান হইলে আমি দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে ঠাকুরবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। অদ্যকার কার্য্যের ফলাফলের উপর আমার উদ্দেশ্যের সফলতা ও বিফলতা সবিশেষ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যত্ন সহকারে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ ও শান্ত করিতে করিতে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রমে শুভ্রবর্ণ, সমুন্নত ও বিস্তৃত ঠাকুরবাড়ী আমার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। গ্রামের সমস্ত লোক ঘরবাড়ী উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভবনের ভগ্নাবশেষ সকল চারিদিকে ঢিপি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমি সেই সকল ভগ্নাবশেষের পার্শ্ব দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছি, এমন সময় একটা ভগ্নপ্রাচীরের পার্শ্বদেশ হইতে দুইটি লোক দেখা দিল। তাহাদের এক জন আমার পরিচিত। আমি যে দিন উকীল করালী বাবুর আফিস হইতে ফিরিতেছিলাম, তখন যে দুই ব্যক্তি আমার সঙ্গ লইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহারই এক জন। তাহার সঙ্গীটাকে আমি কখন দেখি নাই। তাহারা আমার সহিত কোনই কথা কহিল না এবং আমার নিকটস্থ হইতেও চেষ্টা করিল না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আমি যে হরিমতির সহিত দেখা করিয়াছি, রাজা সে সংবাদ পাইয়াছেন এবং তদনন্তর আমি নিশ্চয়ই ঠাকুরবাড়ী যাইব, তাহাও তিনি বুঝিয়াছেন। সেই সংবাদপ্রাপ্তির জন্যই তিনি এই দুই লোককে এই স্থানে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার অনুসন্ধান এবার যে ঠিক পথে চলিতেছে, বর্ত্তমান ব্যাপার তাহার অবিসংবাদিত প্রমাণ। আমি ঠাকুরবাড়ীর দ্বার ছাড়াইলাম। বর্ত্তমান গোমস্তার বাসা দেবালয়ের খুবই নিকট। আমি সেই দিকেই চলিলাম।

গোমস্তা মহাশয়ের বেশ বাড়ীটুকু। চারিদিকে নানাবিধ ফলফুলের গাছ, মধ্যে বেশ পরিষ্কার একটি একতালা ঘর, সম্মুখে রংকরা ঝিলিমিলি ও রেল-লাগান একটি বারান্দা। তিনি স্ত্রী-পুত্র-বিহীন লোক; একাকী সেই বাড়ীতে বাস করেন। আমি যখন তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি বারান্দায় একখানি জলচৌকীর উপর বসিয়া, প্রকাণ্ড একটা গাড়ু লইয়া মুখ ধুইতেছেন। লোকটি প্রাচীন; বেশ সভ্যভব্য; বড় সুমূর্ত্তি; কিন্তু একটু বেশী গল্পে। তাঁহার একটু সংস্কৃত-বোধ আছে; গোমস্তা-গিরির চেয়ে একটু বেশী লেখাপড়া জানা আছে; মনে মনে এ সকল কারণে একটু অহঙ্কারও আছে এবং সে অহঙ্কারটুকু চাপিয়া রাখার ক্ষমতাও নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহারই নিকটে আমার প্রয়োজন শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। অনেক কথার পর ক্রমে ঠাকুরবাড়ীর কথা উঠিল এবং বিবাহের প্রণালী-বিষয়ক কথাও উঠিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"এই বিবাহের প্রণালী বাবদে আপনাদের সালিয়ানা কি পরিমাণ আয় হয়?"

তিনি বলিলেন, "আয় সকল বৎসর সমান হয় না; কারণ, বিবাহ সকল বৎসর সমান হয় না। তবে এ কথা বলিতে পারি, এ অঞ্চলে এমন বিবাহই হয় না, যাহার জন্য কিছু না কিছু প্রণামী এ ঠাকুর-বাড়ীতে না আইসে। কেহ ইচ্ছা করিয়া দিল, কেহ যে দিল না, তা আর হইবার যো নাই। কারণ, এখন সর্ব্বসাধারণের সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, এখানকার খাতায় তারিখ ধরিয়া অল্পই হউক, অধিকই হউক, কিছু জমা না দিলে সে বিবাহই অসিদ্ধ। কাজেই লোকে প্রণামী জমা না দিয়া কোন-মতেই থাকিতে পারে না; সুতরাং আয়ের কোন ব্যাঘাত হয় না।"

আমি বলিলাম,—"যখন আপনাদের খাতায় প্রণামী জমা হওয়া এত গুরুতর ব্যাপার এবং তাহা না হইলে যখন এত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তখন সে সম্বন্ধে আপনাদের বড়ই সাবধান থাকিতে হয় তো।"

তিনি বলিলেন, "ওঃ, সে বিষয়ে সাবধানতার কোন ত্রুটি নাই। নিয়ম এই, যিনি যখন গোমস্তা থাকিবেন, তাঁহাকে স্বহস্তে বিবাহের প্রণামী জমা করিতে হইবে এবং যেটি যে তারিখে আসিবে, সেটি সেই তারিখে জমা করিতে হইবে। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলেও ছাড়াছাড়ি নাই। তার পর এখান হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে, রূপনগরগ্রামে রাজসরকারের সদর কাছারী আছে। সেই কাছারীতে নায়েব ও অন্যান্য আমলা থাকেন। এ প্রদেশে রাজসরকারের যত বিষয়-সম্পত্তি আছে, রূপনগরেই তাহার কাছারী-বাড়ী। আমাদের ঠাকুরবাড়ীর কাগজপত্রও সেখানে দাখিল করিতে হয়, কিন্তু বিবাহের প্রণামী যে দিনকার যেটি, সেই দিনই সেটি চালানসহ লিখিয়া পাঠাইতে হয়। সেখানে চালানখানি সেরেস্তায় থাকে, আর পাকা খাতায় সেটি জমা হয় এবং সে পাকা খাতা অতি সাবধানে রাখা হয়।"

আমি বলিলাম,—"এ সকল অতি সুব্যবস্থা, সন্দেহ নাই। আমি একবার আপনাদের এই বিবাহের খাতা দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি মহাশয় কৃপা করিয়া একবার দেখান।"

তিনি বলিলেন,—"তার আর বিচিত্র কি? এখনই আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি। এ বিষয়ে আপনার কোন গোল উপস্থিত হইয়াছে বুঝি? তা সে জন্য কোন চিন্তা নাই। এ প্রদেশের যদি কোন বিবাহের কথা হয়, তাহা হইলে আমাদের খাতায় তাহার নিদর্শন নিশ্চয়ই পাইবেন। কোন্ কুলীন কোথায় ভাঙ্গিয়াছে, কে কোথায় বিবাহ দিয়া জাতি নষ্ট করিয়াছে, কোন্ শ্রোত্রিয় ফাঁকি দিয়া কুলীনের ঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে ইত্যাদিরূপ সমস্ত পরিচয় আমাদের খাতা হইতে পাওয়া যায়। আর যদি এ অঞ্চলে কোন বেশ্যার ছেলে কলে-কৌশলে সমাজে চলিবার যোগাড় করে, আমাদের প্রণামীর খাতা তাহার প্রবল শত্রু। এরূপ কোন সংবাদ যদি আপনার দরকার হয়, আপনি আমাদের খাতা হইতে নাম আর তারিখ টুকিয়া লইয়া যে কোন ভাল ঘটককে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তখনই আপনাকে সকল সংবাদ দিবে। তবে চলুন, এখনই যদি মহাশয় তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন আমি এইরূপ সময়েই প্রতিদিন ঠাকুরবাড়ী গিয়া থাকি।"

আমি বলিলাম,—"চলুন তবে। আমার এখনই তাহা দেখিবার দরকার।"

গোমস্তা মহাশয়ের বাক্য-স্রোত থামিল না। কথা কহিতে কহিতে আমরা ঠাকুরবাড়ী আসিলাম। ঠাকুরবাড়ী বৃহৎ ব্যাপার। এক দিকে ভোগের মহল, এক দিকে লোকজন থাকিবার মহল, এক দিকে গোমস্তার মহল, এক দিকে অতিথিশালা। এক প্রকাণ্ড পাঁচফুকুরি দালানে পাষাণময় হরিহর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আশেপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বিগ্রহ সংস্থাপিত। প্রকাণ্ড উঠান—পাথর ছাওয়া। সম্মুখে নহবৎখানা। আমি গোমস্তা মহাশয়ের সহিত চারিদিক্ ঘুরিয়া শেষে তাঁহার মহলে প্রবেশ করিলাম এবং তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলাম।

তিনি বলিলেন,—"বকেয়া খাতাপত্র সমস্ত পাশের এই ঘরে থাকে। বলিতে গেলে সে ঘর কাগজেই বোঝাই। কিন্তু সকলই বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে—দেখিতে কোন কষ্ট নাই। আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে ঐ ঘরে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। দেখিলাম, বস্তুতই সে ঘর কাগজে বোঝাই বটে। তিনি বলিলেন, "দেখিতেছেন, এ ঘরটি সিন্দুক বলিলেই হয়। এইরূপ হওয়াই উচিত। ঘরের একটি দ্বার। তাহা আবার কেমন মজবুত দেখুন। বাহিরে এই দ্বারের তিন স্থানে তিনটি তালা। ভিতরে এ দ্বার বন্ধ করিবার কোনই উপায় নাই। ভিতরে কেবল দুইটি কড়া লাগান আছে মাত্র—সেও কেবল ধরিবার ও খুলিবার সুবিধার জন্য।"

প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দোবস্ত খুবই ভাল। কাগজপত্রগুলি বৃহৎ বৃহৎ ঘড়িঞ্চায় রক্ষিত এবং বর্ষে বর্ষে ভাগ করিয়া টিকিট মারা। আমাকে গোমস্তা মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কোন্ বর্ষের কাগজ দেখিতে চাহেন?"

আমি বলিলাম,—"১২১১ সালের আগে।"

তিনি আমাকে ১২১১ সালের ঘড়িঞ্চা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহার বামদিকে উত্তরোত্তর আরও আগেকার কাগজ দেখিতে পাইবেন। আপনি নিঃসঙ্কোচে ইচ্ছামত ও আবশ্যকমত কাগজপত্র দেখুন। আপাততঃ কৃপা করিয়া আমাকে একটু ছুটী দিউন; আমি সরকারী কাজ দেখিতে যাই।"

আমি বলিলাম,—"আপনি যাইবেন বৈ কি? আপনি যতটুকু অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহা আশাতীত। আমি আপনার শিষ্টাচারে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি।"

গোমস্তা মহাশয় চলিয়া গেলেন; আমি ১২০৯ সালের ১নং জমা-খরচ বহি বাহির করিলাম। আমি জানিতাম, ১২১১সালে রাজা প্রমোদরঞ্জনের জন্ম হয়। সুতরাং অন্ততঃ পক্ষে তাহার দুই বৎসর আগে তাঁহার পিতা-মাতার বিবাহ হইয়াছিল ধরিতে হয়; কিন্তু যে কয়টা মাসে বিবাহ হয়, সে সব কয়টাই দেখিলাম; কত বিবাহের বাবদে কত টাকাই প্রণামী জমা দেখিলাম; কিন্তু এ সংক্রান্ত তো কিছুই দেখিলাম না। তাহার পর ১১০৮ দেখিতে আরম্ভ করিলাম। বৈশাখ—কিছু নাই। জ্যৈষ্ঠ—কিছুই নাই। আষাঢ়—কিছুই নাই। শ্রাবণ—কিছুই নাই। অগ্রহায়ণ—কিছু নাই। মাঘ—আছে আছে! দেখিলাম, পৃষ্ঠার শেষভাগে স্থানের অল্পতা হেতু একটু ঠেসাঠেসি করিয়া এই বিবাহের প্রণামী জমা করা আছে। লিখিত হইয়াছে, রাজা বসন্তরঞ্জন রায়ের সহিত কুসুমকামিনী দেবীর বিবাহ বাবদ প্রণামী জমা ১০০৲। ইহার অব্যবহিত পর-পৃষ্ঠার উপর দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির বিবাহের উল্লেখ আছে। আমার সহিত নামের সমতা হেতু আমি মনে করিয়া রাখিলাম। রাজার বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহাও আমি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম এবং পাছে ভুলিয়া যাই ভাবিয়া পকেট-বহিতে এ সকল সংবাদ লিখিয়া লইলাম। কেবল স্থানের অত্যল্পতা হেতু অতিশয় ঘেঁসাঘেঁসি ভিন্ন রাজা বসন্তরঞ্জনের বিবাহবিষয়ে আর কোন সন্দেহজনক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। যে রহস্য এখনই উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে হতাশ হইলাম। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে রাজা প্রমোদরঞ্জনের জননী-সংক্রান্ত কোনই বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখিলাম না, বরং তাঁহার সততা সম্বন্ধেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইল। অতঃপর খাতা বন্ধ করিয়া কি কর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিলাম। গোমস্তা মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসিলেন—"মহাশয়ের কাজ শেষ হইয়াছে?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু আমার অনুসন্ধান সন্তোষজনক হইল না।"

তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন, আপনি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, খাতায় কি তাহার বিরোধী প্রমাণ দেখিতে পাইলেন?"

আমি বলিলাম,—"তাই বটে।"

তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক, যদিই মনে বিশেষ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সন্দেহভঞ্জনার্থ আপনি রাজপুরের সদর কাছারীর খাতা ও চালান মিলাইতে পারেন। যদিও এখানকার খাতার সহিত সেখানকার কাগজপত্রের কোনরূপ অনৈক্যের সম্ভাবনা নাই, তথাপি মনের সন্দেহ মিটাইয়া ফেলাই ভাল।"

আমারও মনে হইল, অধুনা তাহাই সৎপরামর্শ; একবার রাজপুরের খাতা, সন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদিও তাহাতে কোন প্রকার বিভিন্নতা লক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি সেটি না দেখিয়া ফিরিয়া যাইলে কার্য্য অসমাপিত থাকিবে।

অতএব অন্ত এখনই এই দুই তিন ক্রোশ পথ আমি পদব্রজে গমন করিতে সংকল্প করিলাম। তদনন্তর বিহিত-বিধানে গোমস্তা মহাশয়ের সহিত শিষ্টাচার সমাপ্ত করিয়া আমি রাজপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রাজপুর একটা মহকুমা এবং রামনগরের ন্যায় নিতান্ত পল্লীগ্রাম নহে। ডাক্তার বিনোদ বাবুর বাটী রাজপুরের নিকটেই এবং কৃষ্ণসরোবর রাজপুর হইতে বেশী দূরে নহে। আমি পূর্ব্বে একবার রাজপুরের নিকটে বিনোদ বাবুর বাটীতে এবং কৃষ্ণসরোবরের রাজবাড়ীতে আসিয়াছিলাম।

ঠাকুরবাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর আসার পর আমি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তিদ্বয় এবং তাহাদের সঙ্গে তৃতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কিয়ৎকাল পরে তন্মধ্যস্থ এক জন রামনগরের দিকে চলিয়া গেল এবং অপর দুই জন আমার অবিলম্বিত পথেই চলিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আমারই অনুসরণ করিতেছে বুঝিয়া আমার মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। কারণ, ঠাকুরবাড়ীর অনুসন্ধান শেষ হইলে আমি নিশ্চয়ই রাজপুরে যাইব, এ কথা অবশ্য রাজা বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্যই অনুসরণকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং রাজপুরে কোন না কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা কখন অসঙ্গত নহে। আবার আশার সঞ্চারে আমার হৃদয় বলীয়ান্ হইয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আমি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম; লোক দুইটাও কিছু দূরে সমানভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। দুই একবার তাহারা একটু অধিকতর বেগে চলিয়া আমার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আবার তখনই দাঁড়াইয়া, উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ দূরে দূরে আসিতে লাগিল। তাহাদের মনে যে কোন দুরভিসন্ধি আছে, তাহার সন্দেহ নাই। সেই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও সদুপায়ের জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছে, ইহা আমার বেশ বোধ হইল। তাহাদের অভিপ্রায় কি, তাহা যদিও আমি স্থির করিতে পারিলাম না, তথাপি নির্ব্বিঘ্নে রাজপুর গমন করার পক্ষে আমার ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। শীঘ্রই এ আশঙ্কা সফলিত হইল।

রাস্তা নিতান্ত জনহীন। এক স্থানে উহা অতিশয় বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই বাঁকের নিকটস্থ হইবামাত্র পশ্চাতে পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, লোক দুইটা আমার খুব নিকটে আসিয়াছে। যেই আমি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম, সেই যে লোকটা কলিকাতায় আমার সঙ্গ লইয়াছিল, সে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আমার বাম-দিকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা এইরূপে আমার সঙ্গ লওয়ায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, তাহার পর এই ব্যবহারে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলাম এবং হস্ত দ্বারা লোকটাকে ঠেলিয়া দিলাম। সে তখনই 'বাবা গো, মেরে ফেলিল গো, দোহাই কোম্পানি, কে আছ, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া আমার দক্ষিণ-হস্ত চাপিয়া ধরিল, পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি আমার বাম হস্ত ধারণ করিল। এইরূপে তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। তাহারা উভয়েই আমার অপেক্ষা বলশালী, সুতরাং তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, আমি অগত্যা নিরস্ত হইয়া থাকিলাম এবং সন্নিকটে যদি অপর কোন লোক দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার নিকট সাহায্য পাইব আশা করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, অদূরে মাঠে এক জন কৃষক কর্ম্ম করিতেছে। সে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে বিবেচনায় আমি তাহাকে আমাদের সহিত রাজপুর পর্য্যন্ত আসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে ব্যক্তি নিতান্ত অসভ্যভাবে ঘাড় নাড়িয়া, অপর দিকে চলিয়া গেল। আমার শত্রুদ্বয় এই সময়ে ব্যক্ত করিল যে, তাহারা রাজপুরে উপস্থিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে মারপিটের নালিশ রুজু করিবে। আমি তাহাদের বলিলাম,—"তোমরা আমার হাত ছাড়িয়া দেও। আমি তোমাদের সঙ্গে রাজপুর যাইতেছি, চল।" আমার অপরিচিত ব্যক্তি নিতান্ত কর্কশভাবে হাত ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু অপর ব্যক্তি এ ব্যবহার অসঙ্গত ও বিগর্হিত বোধে হাত ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল এবং তাহার সঙ্গীকেও সেইরূপ করিতে বলিল। তাহারা উভয়ে আমার হাত ছাড়িয়া দিলে আমি স্বাধীনভাবে তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিলাম।

বাঁক ছাড়াইয়া কিয়দ্দূরমাত্র যাইয়াই আমরা

রাজপুর গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামের প্রবেশ-মুখেই থানা। ব্যক্তিদ্বয় আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেল এবং আমার বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ উপস্থিত করিল। দারোগা মহাশয় উভয়পক্ষের বক্তব্য লিখিয়া লইয়া আমাদের সকলকে তখনই চালান দিলেন। ডেপুটী বাবুর নিকট আমরা উপস্থিত হইলাম। লোকটি বড় রুক্ষস্বভাব এবং আপনার ক্ষমতাগৌরবে বড়ই অহঙ্কৃত। তিনি উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসিলে অভিযোগকারিদ্বয় সেই চাষার নামোল্লেখ করিল দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি অভিযোগকারীদিগকে সেই সাক্ষী আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া আপাততঃ জামীনে খালাস দিতে চাহিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আমি বিদেশী লোক না হইলে, তিনি আমার জামীন চাহিতেন না। স্থির হইল, আবার তিন দিন পরে মোকদ্দমা হইবে।

আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আমার সময় নষ্ট করাইয়া কোনরূপে আমার উদ্দেশ্যসাধনে বিলম্ব ঘটানই এই দুই ব্যক্তির অভিপ্রায়। যেরূপে হউক, কিছু সময় অতীত করাই তাহাদের অভিসন্ধি। বর্ত্তমান মোকদ্দমা তাহারই একটা উপায়মাত্র। সম্ভবতঃ, এইরূপে কিছু সময় কাটাইতে পারিলে তাহারা মামলা চালাইবে না। আমার মন এই সকল আলোচনা করিয়া এতই চঞ্চল হইল যে, আমি ডেপুটী বাবুকে গোপনে পত্র লিখিয়া সমস্ত ব্যাপার জানাইতে ইচ্ছা করিলাম। তদর্থে কালী, কলম, কাগজ লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পর এ কার্য্যের একান্ত অবৈধতা আমার হৃদ্গত হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনা আমাকে এরূপে বিচলিত করিয়াছে স্মরণ করিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল যে, এ প্রদেশে আমার এক জন পরিচিত লোক আছেন। তিনি ডাক্তার বিনোদ বাবু। পূর্ব্বে মনোরমা দেবীর পত্র লইয়া আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে আসিয়াছিলাম। সে পত্রে মনোরমা আমাকে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে এই পূর্ব্ব-পরিচয়বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলাম এবং অধুনা যে বিপদে পতিত হইয়াছি, তাহারও উল্লেখ করিলাম। এরূপ বন্ধুবিহীন অপরিচিত স্থানে তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আমার নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই, তাহাও লিখিলাম। আদালত হইতে হুকুম লইয়া একটা ঠিকা লোক নিযুক্ত করিলাম এবং যাতায়াতের গাড়ীভাড়া করিয়া ডাক্তার বাবুকে আনিবার নিমিত্ত পত্রসহ লোক পাঠাইয়া দিলাম। পথ অতি সামান্য; সুতরাং শীঘ্রই আমার নিষ্কৃতির উপায় হইবে ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

যখন পত্র লইয়া লোক চলিয়া গেল, তখন বেলা আন্দাজ ১॥টা। বেলা প্রায় ৩॥টার সময় আমার প্রেরিত লোক সঙ্গে ডাক্তার বিনোদ বাবু আসিয়া আদালতগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিনোদ বাবুর এই অত্যদ্ভুত সৌজন্যে ও অনুগ্রহে আমি বিমোহিত হইলাম। তখনই জামীন মঞ্জুর হইয়া গেল। বেলা ৪টার পূর্ব্বে আমি রাজপুরের পথে বিনোদ বাবুর সমভিব্যাহারে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বিনোদ বাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে আহার করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি সবিনয়ে এ যাত্রা তাঁহার নিমন্ত্রণ-রক্ষায় আমার অক্ষমতা জানাইয়া বারংবার ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম। সময়ান্তরে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সদর-কাছারীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমি যে জামীনে খালাস হইয়াছি, এ কথা নিশ্চয়ই অবিলম্বে রাজা প্রমোদরঞ্জন জ্ঞাত হইবেন এবং তৎক্ষণাৎ অভিনব কৌশলের উদ্ভাবনা করিয়া আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি যে রমক লোক, সন্নিহিত প্রদেশে তাঁহার যেরূপ সম্ভ্রম ও আধিপত্য, তাহাতে তিনি মনে করিলে অনেক অনর্থই ঘটাইতে পারেন। যতক্ষণ তাঁহার সর্ব্বনাশের অবিসংবাদিত প্রমাণ হস্তগত করিয়া তাঁহাকে আয়ত্তগত করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিশ্চিন্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বিচার করিয়া আমি সত্বর জমীদারী কাছারীতে উপস্থিত হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে তখন কাছারীতে নায়েব মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্য জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ এক জন আমলাকে খাতা দেখাইতে আদেশ করিলেন। আমি খাতা অন্বেষণ করিয়া ১২০৮ সালের মাঘ মাস বাহির করিলাম এবং ঠাকুরবাড়ীর খাতায় রাজার বিবাহের পূর্ব্বে যে বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলাম। পরে আমার নামধারী যে এক বিবাহ লিখিত আছে, তাহাও দেখিলাম। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে?—কিছু নাই! রাজা বসন্তরঞ্জন রায়ের

বিবাহ-বিষয়ক বিন্দুবিসর্গেরও উল্লেখ নাই! সর্ব্বনাশ!

তখন আমার মনের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। আমার শিরায় বিদ্যুদ্বেগে শোণিত ধাবিত হইতে লাগিল, এত পরিশ্রম—এত যত্নের পর আমার আশার সফলতা হইল। বস্তুতই এ বিবাহ খাতায় উঠে নাই কি! আমার চক্ষুর ভুল হয় নাই তো! আবার দেখি—ভাল করিয়া দেখি। না—নিঃসন্দেহ রাজা বসন্তরঞ্জনের বিবাহের প্রণামী সদর-কাছারীর খাতায় জমা হয় নাই। এত কষ্টের পর আমার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল; রাজা প্রমোদরঞ্জনের সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হইল; আমি তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে সমর্থ হইলাম। অহো, এই রহস্য না বুঝিতে পারিয়া কত সময়েই কত সন্দেহ করিয়াছি, কত রকম ভাবনাই ভাবিয়াছি। কখন মনে করিয়াছি, রাজা হয় ত মুক্তকেশীর পিতা, আবার কখন মনে করিয়াছি, তিনি হয় ত মুক্তকেশীর স্বামী। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের সন্দেহ কদাপি আমার মনে উদিত হয় নাই।

এখন কি বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, রাজা প্রমোদরঞ্জন বেশ্যাপুত্র? তাঁহার জননীর সহিত তাঁহার পিতার কোন কালে শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ হয় নাই; সুতরাং রাজা যে উপাধি ও পদ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোনই অধিকার নাই। তাঁহার পিতামাতা স্বামি-স্ত্রীরূপে বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কদাপি বিবাহ হয় নাই। রাজা প্রতারণা করিয়া ধূর্ত্তত সহকারে ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেই প্রতারণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কৌশলে হরিমতির সাহায্যে ঠাকুরবাড়ীর খাতায় জাল করিয়া রাখিয়াছেন। সদরের খাতায় জাল করিবার সুবিধা হয় নাই। কোন সন্দেহ হইলে ঠাকুরবাড়ীর খাতাই লোকে দেখে, সদরের খাতা পর্য্যন্ত কেহ সন্ধান করিতে আইসে না ভাবিয়া তিনি তত দূর সতর্কতার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। তাঁহার প্রতারণা এখন সহজেই ধরা পড়িতেছে। চালানে নাই, সদরের খাতায় নাই, ঠাকুরবাড়ীর খাতার লেখাও পৃষ্ঠার শেষে স্বল্প স্থানে কোন প্রকারে গুঁজিয়া দেওয়ার মত। সুতরাং তাহা যে জাল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে।

কেন যে রাজার ব্যবহার দারুণ অস্থিরতাপূর্ণ ও সন্দিগ্ধ, কেন যে তিনি মুক্তকেশীকে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য ব্যাকুল, কেন যে তিনি হরিমতিকে অর্থ দ্বারা এইরূপে পোষণ করিয়া আসিতেছেন ইত্যাদি সকল কথাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইল। যে কল্পনাতীত অতি ভয়ানক রহস্য এই সকল ব্যাপারের কারণ, তাহা অতঃপর আমার হস্তগত। আমি এখন একটি মুখের কথায় রাজার পদ-প্রতিষ্ঠা, সম্ভ্রম জল-বুদ্বুদের ন্যায় উড়াইয়া দিতে পারি। এক কথায় তাঁহাকে সম্ভ্রম-হীন, বন্ধুহীন, অর্থহীন, ভিখারী করিয়া দিতে পারি। তখন আমার মনে হইল যে, রাজা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশের আর কোন বিলম্ব নাই। এরূপ অবস্থায় তিনি কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম-সাধনে পশ্চাৎপদ হইবেন, এমন বোধ হয় না। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, রাজা হয় তো এই প্রতারণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিলুপ্ত করিতেও প্রয়াসী হইতে পারেন। হয় তো তিনিই এই সকল খাতা ধ্বংস করিয়া সকল প্রমাণ বিদূরিত করিতে উদ্যত হইবেন। এখানকার খাতা কোন প্রকারে ধ্বংস করা সম্ভব না হইলেও ঠাকুরবাড়ীর খাতা ধ্বংস করা সহজ হইতে পারে। এই আশঙ্কা মনে উদিত হওয়ার পর আমি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুরবাড়ী গিয়া খাতার সেই পৃষ্ঠায় গোমস্তার সহি ও মোহরযুক্ত একটা নকল লইবার অভিপ্রায় করিলাম। আমি তাড়াতাড়ি নায়েব মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া রামনগরের অভিমুখে চলিলাম। পথে পাছে পূর্ব্ববৎ কেহ আমার অনুসরণ করিয়া বিবাদ বাধায়, এই আশঙ্কায় বাজার হইতে একগাছি মোটা লাঠি ক্রয় করিয়া লইলাম। দৌড়াইতে আমি বাল্যকাল হইতে বিশেষ নিপুণ। সুতরাং আবশ্যক হইলে আমার চরণযুগলও আমাকে সাহায্য করিবে বলিয়া আমার আশা হইল।

আমি যখন রাজপুর হইতে বাহির হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে এবং একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক ক্রোশ-পরিমিত পথ যাওয়ার পর একটা লোক সহসা আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল এবং তখনই পাশে একটা শব্দ হইল আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এবং লাঠিগাছটি উত্তমরূপে ধরিয়া ভিজিতে ভিজিতে অন্ধকারে সমান চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর পার্শ্বস্থ একটা বেড়ার ধারে খস্-খস্ শব্দ হইল এবং তখনই তিন জন লোক পগারের মধ্য হইতে রাস্তায় উঠিয়া আসিল। আমি একটু সরিয়া গেলাম। কিন্তু তাহাদের এক জন আমার নিকটস্থ হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা আমাকে আঘাত করিল। সে উত্তমরূপে

লক্ষ্য করিয়া মারে নাই; সুতরাং আমার বড় লাগিল না। আমিও তৎক্ষণাৎ আমার লাঠির দ্বারা তাহার মস্তকে এক আঘাত করিলাম। সে ব্যক্তি দুই তিন পদ পিছাইয়া সঙ্গীদের স্কন্ধে পড়িবার উপক্রম করিল। আমি এই অবকাশে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম; তাহারাও আমার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। প্রথমে খানিকক্ষণ আমি তাহাদের ছাড়াইয়া বেশী দূর আসিতে পারিলাম বোধ হইল না। অন্ধকারে অপরিচিত স্থানে ঐরূপে দৌড়ান বড়ই বিপদজ্জনক। পার্শ্বের যে কোন দ্রব্যে পা বাধিয়া পড়িয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ক্রমে ক্রমে অনুসরণকারিগণের পদ-শব্দ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন আমার প্রত্যয় হইল, তাহারা পিছাইয়া পড়িতেছে। এইরূপ সময়ে অন্ধকারে অলক্ষিতভাবে পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক বেড়ার ফাঁক দিয়া আমি ময়দানের দিকে গমন করিতে অভিপ্রায় করিলাম। সম্ভবতঃ অনুসরণকারিগণ, আমি সোজা যাইতেছি মনে করিয়া সোজাই চলিবে; আমি যে অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছি, তাহা তাহারা বুঝিতেই পারিবে না। এই অভিপ্রায় করিয়া আন্দাজি পাশের এক বেড়ার ফাঁক দিয়া আমি ময়দানে প্রবেশ করিলাম এবং পূর্ব্ববৎ দৌড়িতে লাগিলাম। অনুসরণকারিদ্বয়ের এক জন অপরকে নিরস্ত হইতে বলিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম। তাহারা দৌড় বন্ধ করিল, তাহাও বুঝিলাম। তাহাদের পদ-শব্দ ও কণ্ঠস্বর কিছুই আর আমার কর্ণগোচর হইল না। আমি আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারে ময়দানের মধ্যে দৌড়িতে লাগিলাম। যেমন করিয়া হউক, পুরান রামনগরে আমার যাইতেই হইবে, তা যত বিপদ্‌ই হউক, আর যে অসুবিধাই হউক। কেবল এক সঙ্কেত আমি স্থির রাখিলাম। যখন আমি রাজপুর হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তখন আমার পিছনে ঝড় বহিতেছিল; এখনও সেই ঝড় পিছনে রাখিয়া আমি ছুটিতে লাগিলাম। এইরূপে বেড়া, খানা, ডোবা, ঝোপ পার হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে চলিতেছি, এমন সময়ে দূরে আলোক জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি পথ জানিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলিলাম। নিকটস্থ হইতে না হইতে দেখিলাম, একটা লোক লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহিরে আসিতেছে। আমাকে দর্শনমাত্র সে ব্যক্তি আমার মুখের দিকে লণ্ঠন উচ্চ করিয়া ধরিল। আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। আমি ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক পুরান রামনগরেই আসিয়া পড়িয়াছি। লণ্ঠনধারী ব্যক্তি অপর কেহই নহেন, আমার প্রাতের পরিচিত গোমস্তা মহাশয়। দেখিলাম, তাঁহার ভাবভঙ্গীর অতিশয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাকে নিতান্ত অস্থির ও সন্দেহযুক্ত বোধ হইল। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র যাহা বলিলেন, তার মর্ম্মই আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"চাবী কোথায়? আপনি লইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম,—"চাবী কি? আমি তো এই রাজপুর হইতে আসিতেছি। চাবী কিসের?"

বৃদ্ধ নিতান্ত অস্থিরভাবে বলিলেন,—"ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানার চাবী—যেখানে কাগজ থাকে। এখন উপায় কি? ভগবান, কি ঘটাইলে? শুনিতেছেন মহাশয়, চাবী সব হারাইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"কেমন করিয়া হারাইল? কখন্? কে লইল?"

অনিশ্চিত দৃষ্টির সহিত গোমস্তা বলিলেন, "কিছু জানি না। আমি ঠাকুরবাড়ী হইতে এই ফিরিয়া আসিতেছি। তার পর বড় দুর্য্যোগ দেখিয়া দরজা-জানালা সব বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। তার পর ঐ দেখুন, জানালা খোলা, কে ভিতরে ঢুকিয়া চাবী লইয়া গিয়াছে।"

তিনি আমাকে খোলা জানালা দেখাইবার নিমিত্ত যেমন হাত নাড়িলেন, তেমনই লণ্ঠন খুলিয়া গেল এবং দমকা বাতাস লাগায় বাতী নিভিয়া গেল। আমি বলিলাম,—"শীঘ্র আর একটা আলো লইয়া আসুন। তাহার পর চলুন, ঠাকুরবাড়ী যাই। শীঘ্র, যেন বিলম্ব না হয়।"

যে আশঙ্কা আমি করিয়াছি, তাহাই দেখিতেছি ফলিল। এত যত্ন করিয়া যে ভয়ানক প্রতারণার মূল আমি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং যে জন্য আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে সম্পূর্ণরূপে করতলগত করিয়াছি বলিয়া বোধ করিতেছি, তাহার নিদর্শন বুঝি হাতছাড়া হইয়া যায়। কারণ, যদি রাজা ঠাকুরবাড়ীর খাতা সরাইয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জালের প্রমাণ আর থাকিল না। তাঁহার মাতার চরিত্র ও নিজ জন্মবৃত্তান্তের কোন প্রশ্ন এত দিন পরে উত্থিত হওয়া সম্ভব নহে। যদিই বা সে কথা এখন উঠে, তাহা হইলে এ দেশে তাঁহার পিতামাতার বিবাহ হয় নাই বলিলেও এখন লোকে মানিয়া লইতে পারে। বিশেষতঃ তাঁহার এখন যেরূপ মান-সম্ভ্রম, তাহাতে এরূপ কোন সন্দেহ অধুনা লোকের মনে উদিত হওয়াই অসম্ভব। অতএব এখন খাতাখানি সরাইতে পারিলে রাজার

সকল দিক রক্ষা হয় এবং আমারও সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম বিফল হয়। না জানি, এতক্ষণে কত সর্ব্বনাশই হইয়া গেল ভাবিয়া আমি আর গোমস্তার আলোক সহ পুনরাগমনের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না; সেই অন্ধকারেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইতে ন যাইতে বিপরীত দিক্ হইতে একটি মনুষ্য আসিয়া আমার নিকটস্থ হইল এবং সবিনয়ে বলিল,—"রাজা, আমাকে ক্ষমা করুন।"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম, লোকটি আমার অপরিচিত। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—"অন্ধকারে তোমার ভুল হয়েছে। তুমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে খুঁজিতেছ কি? আমি রাজা প্রমোদরঞ্জন নহি।"

সে ব্যক্তি থতমত খাইয়া বলিল,—"আমি আপনাকে আমার মনিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।"

"তুমি কি এই স্থানে তোমার মনবকে দেখিতে পাইবে মনে করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞা, এই গলীতে অপেক্ষা করার জন্য আমার প্রতি হুকুম ছিল।"

এই বলিয়া সে লোকটা চলিয়া গেল। এ দিকে লণ্ঠনসহ গোমস্তা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ব্যস্ততার অনুরোধে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। তিনি উল্লিখিত লোকটাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"ও কে? ও কিছু জানে কি?"

আমি বলিলাম,—উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই,—চলুন এখন।"

গলীর মোড় ছাড়াইলেই ঠাকুরবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা গলীর মোড় ছাড়াইবামাত্র সেই পল্লীবাসী একটি শিশু আমাদের নিকটস্থ হইয়া গোমস্তা মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"দাদা ঠাকুর, দপ্তরখানার ভিতর মানুষ ঢুকিয়াছে। ভিতরের দিক্ হইতে কুলুপ বন্ধ করার শব্দ আমি শুনিয়াছি; আর দিয়েশলাই জ্বালিয়াছে, আর আলোও জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছি।"

গোমস্তা ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া আমার গায়ের উপর ভর দিলেন। আমি তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলাম,—"ভয় কি? চলুন না শীঘ্র। এখনও বিশেষ দেরী হয় নাই। সে যেই হউক না, আমরা এখনই তাহাকে ধরিতে পারিব। আপনি লণ্ঠন লইয়া যত শীঘ্র পারেন, আমার সঙ্গে আসুন।"

এই বলিয়া আমি দ্রুতপদে ঠাকুরবাড়ীর অভিমুখে চলিলাম। হঠাৎ পার্শ্বে কোন লোকের পদশব্দ শুনিয়া আমি ব্যগ্রতাসহ সেই দিকে ফিরিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, সেই চাকরটাও ছুটিয়া আসিতেছে, আমি তাহার কথায় মনোযোগ না দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যেই গলীর মোড় ছাড়াইলাম, সেই ঠাকুরবাড়ী নেত্রপথবর্ত্তী হইল। দেখিতে পাইলাম, দপ্তরখানার বহুতর ঘুলঘুলি দিয়া অতিশয় আলোক বাহির হইতেছে। যখন খুব নিকটস্থ হইলাম, তখন কাগজ ও কাপড়পোড়া গন্ধ পাইতে লাগিলাম এবং চট্‌পট শব্দও শুনিতে পাইলাম। ক্রমেই ঘুলঘুলির আলোক অধিকতর প্রবল হইতে লাগিল। আমি দৌড়িয়া দরজায় হাত দিলাম। কি সর্ব্বনাশ! দপ্তরখানায় আগুন লাগিয়াছে! এই ভয়ানক ঘটনা হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পর আমি সে স্থান হইতে পদমাত্র নড়িবার পূর্ব্বে এবং একবার নিশ্বাস ফেলিবারও পূর্ব্বে শুনিতে পাইলাম যে, কে ঘরের ভিতর হইতে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল এবং তালায় চাবী ঘুরাইতে লাগিল; আর শুনিতে পাইলাম, কে দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে সাহায্যের জন্য অতি ভয়ানক হৃদয়বিদারকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যে চাকরটার সঙ্গে আমার দুইবার দেখা হইয়াছিল, সে নিতান্ত অবসন্ন ও কাতর হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল এবং বলিল,—"হে ভগবান্! কি করিলে? নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের গলা! নিশ্চয়ই তিনি।"

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় আর একবার ভিতর হইতে তালায় চাবী ঘুরাইবার শব্দ পাওয়া গেল। গোমস্তা বলিলেন,—"হা ভগবান্! কাহার অদৃষ্টে এরূপ অপমৃত্যু লিখিয়াছ? সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ও যেই হউক, উহার মৃত্যু নিশ্চিত। ও যে তালা বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে।"

অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তির দারুণ দুষ্কৃতির জন্য মনে তাহার উপর যত ক্রোধ ছিল, ঐ হৃদয়হীন নরাধম সততা ও পবিত্রতা, প্রেম ও অনুরাগ যেরূপে পদবিদলিত করিয়াছে, তজ্জন্য তাহার উপর যে মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতনস্পৃহা ছিল, বহুদিন ধরিয়া উহার পাপোচিত প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যে দুর্দ্দমনীয় বাসনা ছিল, সে সকলই অধুনা আমি বিস্মৃত হইলাম—অতীত স্বপ্নের ন্যায় তৎসমস্ত আমার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন তাহার বর্ত্তমান নিরঙ্কুশয়

শোচনীয় দশা ভিন্ন আমার আর কিছুই মনে স্থান পাইল না, এইরূপ ভয়ানক মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহার উদ্ধারসাধন ভিন্ন আমার অন্তরে আর কোন প্রবৃত্তি থাকিল না আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"তালা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। জানালার নিকট আসিবার চেষ্টা কর। আমরা জানালা ভাঙ্গিবার উপায় করিতেছি। তুমি যে হও, আর বিলম্ব করিলে মারা যাইবে।"

শেষবার কুলুপের শব্দ হওয়ার পর অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি আর সাহায্যের জন্য চীৎকার করে নাই। এক্ষণে তাহার সজীবতার নিদর্শনস্বরূপ কোন শব্দই আর শুনা যাইতেছে না, কেবল দাহ্য-পদার্থের ফট্-ফট্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, চাকরটা উন্মাদের ন্যায় অধীর হইয়া ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, অ র গোমস্তা মহাশয় দূরে মাটীর উপর বসিয়া কেবল কাঁপিতেছেন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমি সহজেই অনুমান করিলাম, এই দুই ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত ব্যাপারের কোন সহায়তা হওয়া অসম্ভব।

তখন কি করা উচিত, তাহা আমার মনে হইল না। অদূরে এক ব্যক্তি দুঃসহ যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে,এই দারুণ কল্পনা আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ করিল। আমি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিকটস্থ কাষ্ঠস্তূপ হইতে একখানি প্রকাণ্ড কাষ্ঠ উঠাইলাম এবং সেই চাকরটাকেও তাহা জোর করিয়া ধরিতে বলিলাম, উভয়ে তাহা ধরিয়া একটা জানালার সমীপস্থ হইলাম এবং বারংবার প্রবলবলে সেই বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা জানালায় আঘাত করিতে লাগিলাম, কিয়ৎকাল আঘাত করার পর সেই জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড! রাশি রাশি অগ্নি লক্ লক্ করিতে করিতে সেই বাতায়নপথ দিয়া বাহিরে ধাবিত হইতে লাগিল। ভাবিয়াছিলাম, এই উন্মুক্ত পথ দিয়া অল্প-প্রমাণ বায়ু প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যক্তির জীবন-রক্ষা করিলেও করিতে পারে। কিন্তু বায়ু-প্রবেশের অবসর কোথায়? তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় ও হতাশ হইয়া বলিলাম,—"হায় হায়! লোকটাকে বাঁচাইবার কি আর কোন উপায় নাই?"

বৃদ্ধ গোমস্তা বলিলেন,—"কোন আশাই নাই। বৃথা চেষ্টা। যে ভিতরে আছে, সে এতক্ষণে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।"

ক্রমে পিল্ পিল্ করিয়া লোক আসিয়া কলরব বাধাইল। আমার তখনও মনে হইতে লাগিল, হয় তো হতভাগা এখনও মূর্চ্ছিত হইয়া অধোবদনে ঘরের মেজেয় পড়িয়া আছে। হয় তো এখনও চেষ্টা করিলে তাহাকে বাঁচান যাইতে পারে। এই মনে করিয়া আমি সমাগত দর্শকগণের মধ্যে গিয়া বলিলাম, - "প্রত্যেক কলসী জলের দাম দুই পয়সা করিয়া দিব। তোমরা ঠাকুরবাড়ী হইতে ঘড়া লও, যে যেখান হইতে ঘড়া কলসী জোগাড় কর। কুয়া হইতেই হউক, কি ঠাকুরবাড়ীর পুকুর হইতেই হউক, যত পার, জল আনিতে থাক। প্রতি কলসী দুই পয়সা।" এই কথায় দর্শকগণের মধ্যে একটা উৎসাহ উপস্থিত হইল। সকলেই জলের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি ও গোলযোগ যত হইতে লাগিল, কাজ তত হইতে লাগিল না। যাহা হউক, সারি সারি অনেক কলসী জল আসিয়া জানালার মধ্য দিয়া অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে থাকিল। পয়সা, সিকি, দুয়ানি ও কিছু টাকা গোমস্তার হস্তে দিলাম। তিনি বাহকগণকে হিসাব করিয় পয়সা দিতে থাকিলেন। এ দিকে এইরূপ কার্য্য চালাইয়া, আমি সেই কাষ্ঠ-স্তূপ হইতে একখানি লম্বা গুঁড়ি বাছিলাম। যে সকল লোক কলসী, ঘড়া কিছুই সংগ্রহ করিতে না পারায় জল আনিতে পারিতেছিল না, তাহাদের সাত আট জনকে সেই কাঠের গুঁড়ি টানিয়া আনিতে উপদেশ দিলাম। আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই গুঁড়ি উঠাইল। আমিও তাহা ধরিলাম। পরে সকলে মিলিয়া দপ্তরখানার দরজায় সেই গুঁড়ি দ্বারা বারংবার প্রচণ্ডরূপে আঘাত করিতে লাগিলাম। যদিও গুলমেখমারা সেই প্রকাণ্ড দরজা অতিশয় সুদৃঢ়, তথাপি পুনঃ পুনঃ এরূপ প্রচণ্ড আঘাত কতক্ষণ সহিতে পারে? অবশেষে ভীষণ শব্দ সহকারে সেই বৃহৎ দরজা ঘরের ভিতর-দিকে পড়িয়া গেল। তখন সাগ্রহে সকলেই গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তির জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিন্তু নিকটস্থ হয় কার সাধ্য! দারুণ অগ্নিতাপে আমাদের দেহ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম। তখন জলবাহিগণকে এই উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া জল ঢালিতে আদেশ দিলাম। কলসী কলসী জল সেই দরজার মধ্যে পড়িতে লাগিল।

চাকরটা কাতরভাবে অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল,—"তিনি কোথায়?"

গোমস্তা বলিলেন,—"সে কি আর আছে? ছাই হইয়া গিয়াছে। কাগজপত্রও ছাই হইয়া গিয়াছে। হা ভগবান্, এ কি করিলে?"

নিরন্তর লোকজন তাড়াতাড়ি করিয়া জল আনিয়া ঢালিতে লাগিল। আমি তখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া দূরে গিয়া উপবেশন করিলাম। এ দিকে ঠাকুরবাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে জানিয়া থানার দারোগা, জমাদার, কনষ্টেবল, চৌকিদারগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দারোগার উৎসাহ-বাক্যে লোকে উৎসাহিত হইয়া আরও আগ্রহ-সহকারে জল আনিতে লাগিল। যাহাতে এই অগ্নি দপ্তরখানা ছাড়াইয়া ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য মহলে বিস্তৃত না হয়, দারোগা তাহার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। আমার শক্তি ও উৎসাহ কিছুই নাই। আমি বুঝিলাম, যে নরাধম এই কাণ্ডের নায়ক, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই বোধের পর হইতে আমি নিতান্ত অবসন্নভাবে সেই অগ্নিকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশ্চেষ্টবৎ বসিয়া রহিলাম। ক্রমেই আগুন কমিয়া আসতে লাগিল। হয় তো দাহ্যপদার্থের অভাবে অথবা অবিরত জলপাত হেতু ক্রমে অগ্নির তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে অগ্নি হইতে শাদা শাদা ধূম উদ্গত হইতে লাগিল এবং ক্রমে দেখিলাম, পুলিসের লোকেরা দল বাঁধিয়া সেই ভগ্ন দ্বার সমীপে দাঁড়াইল এবং সমাগত দর্শকগণ আরও পশ্চাতে দাঁড়াইল। দুই জন কনষ্টেবল দারোগার আদেশক্রমে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং অনতিকালমধ্যে ধরাধরি করিয়া একটা প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া ফিরিল। দর্শকেরা সরিয়া আসিল এবং দুই ভাগ হইয়া গেল। সকলেই যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোক ও শিশুগণ সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিল। ক্রমে সেই বিপুল জনতার মধ্য হইতে নানারূপ শব্দ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপ বিভিন্ন উক্তিসমূহ আমার শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল ;—

'পেয়েছ পেয়েছ?' 'হাঁ।' 'কোথায় পেলে?' 'দরজার পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল?' 'খুব পুড়িয়াছে কি?' 'গা পুড়িয়াছে, মুখখানা পোড়ে নাই।' 'লোকটা কে?' 'রাজা, একটা রাজা।' 'রাজা, তা ওখানে কেন? রাজা না হবে।' না, রাজাই বটে।' 'নিশ্চয়ই একটা কুমৎলব ছিল।' 'তা আর বলতে।' 'দপ্তরখানা জ্বালাইয়া দিতে গিয়াছিল।' 'তাই হবে।' 'দেখিতে কি বড় ভয়ানক হয়েছে?' 'হয়েছে বই কি?' 'মুখখানা বড় ভয়ানক হয় নাই।' 'কেহ তাকে চেনে কি?' 'একটা লোক বলছে, চেনে।' 'কে সে?' 'একটা চাকর।' কিন্তু সে এমনই বেকুবের মত হইয়া গিয়াছে যে, দারোগা তাহার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।' 'আর কেহই চেন না কি?'

এমন সময় দারোগা মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "চুপ চুপ।" তৎক্ষণাৎ সকল গোল থামিয়া গেল। তখন দারোগা মহাশয় বলিলেন,—"যে ভদ্রলোক এই ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?"

বহু কণ্ঠে একসঙ্গে শব্দ উঠিল,—"এই দিকে —এই যে মহাশয়।"

দারোগা মহাশয় লণ্ঠন হস্তে লইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, "মহাশয়! একবার কৃপা করিয়া এই দিকে আসিবেন।"

এই বলিয়া তিনি আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। আমি তখন কথা কহিতে পারিলাম না; তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতেও বলিলাম না। মৃত ব্যক্তিকে আমি কখন দেখি নাই; সুতরাং আমার তাঁহাকে চিনিবার কোন সম্ভাবনা নাই; এই কথা কয়টি বলিব ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু আমার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। আমি যন্ত্র-পুত্তলির মত তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয় এই মৃত ব্যক্তিকে চেনেন কি?"

সে স্থানটায় অনেক লোক গোল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার সম্মুখে লণ্ঠন হস্তে তিন ব্যক্তি দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের দৃষ্টি এবং সমবেত সমস্ত লোকের দৃষ্টি আমারই মুখের প্রতি সঞ্চালিত হইল সম্মুখস্থ ব্যক্তিত্রয় লণ্ঠন নত করিয়া ধরিল। আমার চরণ-সমীপে কি পতিত রহিয়াছে, তাহা আমি বুঝিলাম।

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আপনি চেনেন কি মহাশয়?"

ধীরে ধীরে আমি দৃষ্টি নত করিলাম। প্রথমতঃ বস্ত্রাচ্ছাদিত পদার্থবিশেষ আমার চক্ষে পড়িল। তাহার উপর যে এক আধ ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহার শব্দও শুনিতে পাইলাম। তাহার পর কি দেখিলাম? সেই ক্ষীণালোকে তাঁহার ঝলসিত, জীবনবিহীন বদন আমার চক্ষে পড়িল। এইরূপে ইহজীবনে আমাদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ সমাপ্ত হইল। নিয়তির অচিন্তনীয় ব্যবস্থাক্রমে অদ্য এই ভাবে আমাদের দর্শন ঘটিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুলিস-তদন্ত সে দিন যাহা হইবার, তাহা হইল। পরদিন বৈকালে থানায় আবার বিশেষরূপ লেখাপড়া হইবে; আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে কথা থাকিল। আমি রাত্রিতে পূর্ব্বপরিচিত ভজহরির দোকানে নিতান্ত ক্লান্ত ও কাতরভাবে গিয়া পড়িলাম। প্রাতে উঠিয়া ডাকঘরে চিঠির সন্ধানে গমন করিলাম। এ দিকে যাহাই কেন ঘটুক না, কলিকাতা হইতে অন্তরে থাকায় লীলা ও মনোরমার জন্য যে দুশ্চিন্তা, কিছুই তাহার সমতুল্য নহে। মনোরমার পত্র পাইলে হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইবে জানিয়া আমি প্রাতে উঠিয়াই ডাকঘরে গমন করিলাম। মনোরমার পত্র আসিয়াছে। কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই; তাঁহারা উভয়েই সম্পূর্ণরূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ আছেন। আমি কোথায় আসিয়াছি, মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু লীলাকে বলি নাই বলিয়া লীলা বড়ই অভিমানিনী হইয়াছেন এবং আমি ফিরিয়া গেলে আমার সহিত আর বাক্যালাপ করিবেন না বলিয়াছেন। মনোরমার পত্রে এ কথা পাঠ করিয়া মন বড়ই আনন্দিত হইল। লীলার সহিত কলহ হইবে। না জানি সে কলহ কতই মিষ্ট! লীলা আবার পূর্ব্ববৎ সজীব ও প্রফুল্ল হইয়াছেন, ইহজগতে এতদপেক্ষা শুভসংবাদ আমার পক্ষে আর কিছুই নাই।

আমি মনোরমাকে এখানকার সমস্ত সংবাদ একে একে পরে পরে লিখিয়া জানাইলাম। যাহাতে এ সকল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও লীলা জানিতে না পারেন এবং কোন প্রকার সংবাদপত্র লীলার হস্তে না পড়ে, তজ্জন্য মনোরমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। অন্য স্ত্রীলোক হইলে এ সকল কথা এরূপ ভাবে জানাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু বিগত ঘটনাসমূহের বৃত্তান্ত শ্রবণে মনোরমার যেরূপ সাহস, সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে এ সকল ব্যাপার জানাইলে কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। পত্রখানি নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বৈকালে আমাকে থানায় যাইতে হইল।

যথাসময়ে থানায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, ইন্স্পেক্টর, সবইন্স্পেক্টর, হেডকনষ্টবল, কনষ্টবল প্রভৃতিতে থানা গস্ গস্ করিতেছে। আমি উপস্থিত হইলে তাঁহাদের তদন্ত আরম্ভ হইল। বহুতর সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছে, আমিও তাহার মধ্যে অন্যতম। এ সম্বন্ধে কয়টি অতি গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, মৃত ব্যক্তি কে? দ্বিতীয়তঃ, তাহার মৃত্যু কেমন করিয়া ঘটিল? তৃতীয়তঃ, ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানায় আগুন লাগাইবার কারণ কি? চতুর্থতঃ, চাবী অপহরণ করিবার উদ্দেশ্য কি? পঞ্চমতঃ, এক জন অপরিচিত ব্যক্তি তৎকালে কেন উপস্থিত ছিল? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পুলিস রাজপুর হইতে রাজা প্রমোদরঞ্জনের পরিচিত কয়েক জন লোক আনাইয়াছেন। চাকরটা এমন বিকলচিত্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার কোন কথা প্রামাণিক বলিয়া পুলিশ বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু রাজপুর হইতে আগত কয়েক জন ভদ্রলোকের সাক্ষ্য দ্বারা, অধিকন্তু মৃত ব্যক্তির নামাঙ্কিত ঘড়ী দেখিয়া, তিনি যে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়, তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। যে বালক প্রথমেই গোমস্তাকে দেশালাই জ্বালার খবর দিয়াছিল, সাক্ষিশ্রেণীর মধ্যে সে-ও ছিল। সে নির্ভীকচিত্তে সুস্পষ্টরূপে সকল কথাই বলিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে অধিক কথা বলিতে হইল না। আমি বলিলাম যে, মৃত ব্যক্তিকে কখন দেখি নাই; তিনি যে তৎকালে পুরান রামনগরে ছিলেন, তাহাও আমি জানিতাম না; দপ্তরখানা হইতে যখন লাস বাহির করা হয়, তখন আমি সঙ্গে ছিলাম না; আমি পথ ভুলিয়া যাওয়ায় গোমস্তার বাটীর নিকটে পথ জানিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম; সেই সময়ে তাঁহার চাবী হারাইয়াছে শুনিতে পাই; যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি তাঁহার সহিত ঠাকুরবাড়ী আসি; আমি সেই স্থানে আসিয়া আগুন দেখিতে পাই; তথায় আমি শুনিতে পাই, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি দপ্তরখানার ভিতরদিক্ হইতে কুলুপে চাবী ঘুরাইতেছে। আমি দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। অন্যান্য সাক্ষিগণকে চাবী চুরি ও আগুন লাগাইবার কারণ সম্বন্ধে নানারূপ জেরা করা হইল। কিন্তু আমি বিদেশী লোক, সুতরাং এ সকল বিষয়ের কিছুই জানি না বিবেচনায় আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হইল না। আমাকে যখন এ সকল বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না, তখন আমি স্বয়ং যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা বলিতে কখনই বাধ্য নহি। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সে সকল কথা ব্যক্ত করিলে হয় তো কেহই বিশ্বাসও করিবে না। যে হেতু, এই ব্যাপারের

আমি যে কারণ নির্দ্দেশ করিব, তাহার প্রমাণ এক্ষণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আর বলিতে হইলে হয় তো আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত, রাজার সমস্ত প্রতারণা ও অসদ্ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করিতে হইবে। উকীল করালী বাবু যেমন সে সকল কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন নাই, এ স্থলেও সম্ভবতঃ সেইরূপ ফল হইবে।

সেখানে বলি না বলি, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমার মনের ভাব এ স্থলে লিপিবদ্ধ করায় হানি নাই। রাজা যখন শুনিলেন যে, আমি রাজপুরের মারপিটের মোকদ্দমায় জামীনে খালাস হইয়াছি, তখন তাঁহাকে নিরুপায় হইয়া আমার হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভের নিমিত্ত শেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইল। পথিমধ্যে আমাকে আক্রমণ-চেষ্টা তাহারই একতর এবং দপ্তরখানা হইতে খাতার যে পত্রে তৎকৃত জাল আছে, তাহা অপসারিত করিয়া তাঁহার দুষ্কৃতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রচ্ছন্ন করা তাহার অন্যতর। শেষোক্ত উপায়ই অধিকতর কার্য্যকর; কারণ, তাহা হইলে তিনি যে প্রতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিবার কোন নিদর্শনই বিদ্যমান থাকিবে না। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ তাঁহার লুক্কায়িতভাবে দপ্তরখানায় প্রবেশ করা আবশ্যক এবং খাতার সেই পাতাখানি ছিঁড়িয়া লই। পুনরায় প্রচ্ছন্নভাবে বহির্গত হওয়া আবশ্যক। যদি আমার এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও অসঙ্গত নহে যে, সুযোগের জন্য তাঁহাকে রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। রাত্রিতে সুযোগক্রমে চাবী হস্তগত করিয়া তিনি দপ্তরখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় আবশ্যকানুসারে তাঁহাকে দেশালাই জ্বালিতে হইয়াছিল এবং পাছে আমি বা অন্য কোন কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তি সন্ধান পাইয়া প্রতিবন্ধক ঘটায়, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে অগত্যা দপ্তরখানার দরজার ভিতর-দিকের কড়ায় তালা লাগাইতে হইয়াছিল।

ইচ্ছাপূর্ব্বক দপ্তরখানায় অগ্নিপ্রয়োগ করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। অসাবধানতা ও অত্যন্ত ব্যস্ততা হেতু দৈবাৎ আগুন লাগিয়া যাওয়াই সম্ভব। নিশ্চয়ই তিনি প্রথমতঃ আগুন নিবাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অগত্যা পলাইতে চেষ্টা করেন। প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার সময় তিনি সম্ভবতঃ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রিঙে অনেক চাবী ছিল। তিনি ভয় ও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত হয় তো অন্য চাবী লাগাইয়া তালায় অতিশয় বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তালাটি এককালে খারাপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; অবিলম্বে আগুন এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, তাঁহার পক্ষে তাহা সহ্য হইয়া পড়ে। আমরা যৎকালে জানালা ভাঙ্গিয়া পথ পরিষ্কার করি তখন তাঁহার জীবনলীলার অবসান না হইলেও তিনি মরণোন্মুখ মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আর কোন যত্ন করিলেও সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যখন আমরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, তাহার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। আমি মনে মনে সমস্ত ঘটনার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছিলাম।

চাকরটাকে বস্তুতই মতিভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইল। সে বলে, মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার প্রভু এবং ঐ গলীর মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ ছিল। শুনিয়াছি, ডাক্তার পরে পরীক্ষা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ঘটনায় ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

আমি নিতান্ত ক্লান্তশরীর ও অবসন্নহৃদয় হইয়া ভজহরির দোকানে ফিরিয়া আসিলাম এবং শুইয়া পড়িলাম। পরশ্ব আমার রাজপুরের মোকদ্দমা হইবে। সুতরাং কল্য আমার আর কোন কাজ নাই। আমার অবস্থা ভাল হইলে আমি কল্য কলিকাতায় গিয়া লীলা-মনোরমাকে দেখিয়া আসিতাম। আমার হস্তস্থিত অর্থের ভূরিভাগ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এরূপ দুরবস্থাপন্ন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ অপব্যয় অসম্ভব।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া আমি পূর্ব্ববৎ ডাকঘরে গমন করিলাম দেখিলাম, পূর্ব্ববৎ মনোরমার প্রীতিপ্রদ পত্র পড়িয়া আছে। মনোরমার পত্র পড়িয়া জানিতে পারিলাম, যতই আমার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে, ততই অভিমানিনী লীলাবতীর ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তিনি আমাকে অপরাধোচিত শাস্তি দিবার বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

ডাকঘর হইতে ফিরিবার সময় বিগত রাত্রির ভয়ানক ব্যাপার-সমূহের অভিনয়স্থল অদ্য দিবালোকে একবার দর্শন করিতে বাসনা হইল। ইহ-সংসারের সর্ব্বত্র কঠোর ও মধুরের অপূর্ব্ব মিলন। যে আকাশে প্রদীপ্ত দিবাকর পরিদৃষ্ট হয়, সেই আকাশেই সুধাংশু বিরাজ করে। যে মুহূর্ত্তে বসুন্ধরায় মানব শমনসদনে গমন করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই

অভিনব শিশু জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। যে স্থানে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এক জন মানব যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই স্থান অধুনা সম্পূর্ণরূপ উৎসাহবিহীন। দেখিলাম, গোমস্তা মহাশয় আপনার ঘরে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। পোড়া ঘরের ছাই-মাটী ও অর্দ্ধদগ্ধদ্রব্যাদি অন্বেষণ ও বাহির করিবার জন্য কয়েক জন মজুর লাগিয়াছে। যে স্থানে অভাগার মৃতদেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে অধুনা এক জন মজুরের শানকপূর্ণ খানা গামছাজড়ান রহিয়াছে। অগ্নি-সন্দর্শনে বহু প্রকার পতঙ্গ সন্নিহিতপ্রদেশে প্রাণ-ত্যাগ করিয়া পড়িয়া আছে। কয়েকটি কাক সাগ্রহে তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। একটি সুশ্যামাঙ্গী পরিণতাবয়বা যুবতী সগৌরবে এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে আর এক জন অনুরূপ যুবা তৎকালে বিপরীতদিক্ দিয়া আসিতেছে, উভয়ে এই স্থানে নিকটস্থ হইলে কাহারও নয়ন সাকাঙ্ক্ষ ও সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিল না এবং কাহারও অধর ঈষৎ হাস্যের শোভা বিস্তার না করিয়া নিরস্ত হইল না। এই তো সংসারের আকৃতি!

রাজার মৃত্যু হওয়ায় লীলার স্বত্বপত্বসমর্থন-চেষ্টা আপাততঃ সম্পূর্ণরূপ বিফল হইল। এ চিন্তা বহুবারই আমার মনে উদিত হইয়াছিল, অধুনা সেই ভয়াবহ দৃশ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও এই চিন্তা আমার চিত্তে পুনরুদিত হইল। তাঁহার জীবলীলার অবসান হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রভূত যত্ন, যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম এবং অপরিমেয় অনুরাগ সকলই ব্যর্থ ও বিফল হইল এবং সমস্ত আশার অবসান হইল। কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যদিই তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলেই বা কি হইত? যে রহস্য আমি এত যত্ন করিয়া উদ্ভেদ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সম্পত্তি ও সম্ভ্রমের যে ব্যক্তি যথার্থ উত্তরাধিকারী, তাহারই উপকার হইত। রাজা বেশ্যাপুত্র হইয়াও প্রবঞ্চনা দ্বারা প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এক্ষণে রাজার এই রহস্য প্রচারিত হইলে সেই ব্যক্তিরই উপকার হইত। লীলার স্বত্বপত্ব-সমর্থন বিষয়ে এই ব্যাপার কোন সহায়তা করিতে পারিত, এমন বোধ হয় না। মনে এইরূপ ভাবোদয় হওয়ায় কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলাম।

ফিরিবার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে হরিমতির বাটী, তাহারই পাশ দিয়া আমি আসিলাম। আর একবার হরিমতির সহিত দেখা করিয়া যাইব কি? দরকার কি? রাজার মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চয়ই তিনি বহুপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। আমার সহিত সাক্ষাৎকালে রাজার সম্বন্ধে তিনি যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে পড়িল এবং বিদায়-কালে আমার প্রতি যেরূপভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে পড়িল। তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। আমি ধীরে ধীরে ভজহরির দোকানে ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় দোকানে বসিয়া ভজহরির সহিত নানাপ্রকার গল্প করিতেছি, এমন সময় একটি বালক আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। আমি আলোক-সন্নিহিত হইয়া পত্রের শিরোনাম পাঠ করিতে অন্যমনস্ক হইয়াছি, এমন সময়ে বালক পলাইয়া গেল। তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করা অনর্থক বোধে আমি অগত্যা পত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্র-খানি আমার নামে লিখিত। তাহাতে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই এবং হস্তাক্ষরও বিকৃত করিয়া লিখিত। কিন্তু প্রথম দুই এক ছত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, এ পত্র কাহার লিখিত। হরিমতিই এ পত্রলেখিকা। নিম্নে তাহার অবিকল নকল প্রদত্ত হইতেছে।

হরিমতির কথা

মহাশয়!

আপনি বলিয়াছিলেন, আর একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কিন্তু আইসেন নাই। তা আসুন বা না আসুন, খবর সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি মনে মনে ভাবিতে-ছিলাম,সেই ব্যক্তির সর্ব্বনাশের সময় হয় তো উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনিই হয় তো তাহার বিধিনিয়োজিত উত্তরসাধক। কথা ঠিক—আপনি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শুনিলাম, আপনি সেই ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থ যত্ন করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বলহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। আপনি যদি কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা হইলে আপ-নাকে আমি পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতাম। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকিলেও আপনার সাহায্যে আমার বাসনা সফল হইয়াছে। আমার তেইশ বৎসরের জাতক্রোধ আজি মিটিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা আজি ক্ষান্ত হইয়াছে। আপনার

অভিপ্রায় অন্যরূপ হইলেও আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

যে ব্যক্তি আমার এই মহোপকার-সাধন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। এ ঋণ কি প্রকারে শোধ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার বয়স, দিন থাকিত, যদি আমার যৌবন থাকিত, তাহা হইলে নির্জ্জনে প্রেমের রহস্যালাপ করিবার জন্য আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইতাম, বিশ বৎসর আগে আপনাকে সেরূপ ভাবে ডাকিয়া পাঠাইলে সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে আপনার কখনই সাধ্য হইত না। কিন্তু এখন আমার যে দিন আর নাই। অধুনা আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া ঋণ পরিশোধ করা ভিন্ন অন্য উপায় আমার নাই। আপনি যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন কোন কোন বিষয় জানিবার জন্য আপনার মনে অতিশয় কৌতূহল ছিল। আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে সকল কথা আমি এক্ষণে জানাইতেছি।

১২২৭ সালে বোধ হয়, আপনি বালক ছিলেন। আমি কিন্তু তৎকালে সুন্দরী যুবতী। পুরাণ রামনগরে আমি তখন বাস করিতাম। একটা মূর্খ লোক আমার স্বামী ছিল। যেরূপে হউক, সে সময়ে কোন একজন বড়লোকের সহিত আমার আলাপ ছিল। তাহার নাম করিলাম না; কারণ, তাহার নাম-সম্ভ্রম কিছুই তাহার নিজের নহে; আপনিও তাহা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছেন।

কিরূপে সে আমার কৃপালাভ করিল, তাহা এক্ষণে বলা ভাল। সোনাদানা ও ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া ভদ্রলোকের মত থাকিতে সকল মেয়েমানুষই ভালবাসে, আমিও বড় ভালবাসিতাম। সে ব্যক্তি আমার মন বুঝিয়া, ঠিক আমার পছন্দমত জিনিসগুলি নিয়তই আমাকে দিত। নিঃস্বার্থভাবে সে কখন আমাকে সেই সকল উপহার দিত না। প্রতিদানস্বরূপে আমার নিকট হইতে সে একটা অতি তুচ্ছ প্রার্থনা করিত। আমার স্বামীর অজ্ঞাতসারে, ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানার চাবী হস্তগত করিবার সে প্রার্থী। চাবীতে তাহার কি দরকার, জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মিথ্যাকথা বলিয়া বুঝাইয়া দিত। কিন্তু আমি যখন আমার প্রার্থনামত সামগ্রী পাইতেছি, তখন তাহার উদ্দেশ্য জানিবার আমার দরকার কি? আমার স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহাকে চাবী দিলাম এবং তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার কার্য্যের উপর চক্ষু রাখিলাম। একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার, এইরূপে চাবী লইল—চতুর্থবারে আমি তাহার অভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম, সে ঠাকুরবাড়ীর বিবাহের প্রণামীর খাতায় একটা জমা বাড়াইয়া দিতে চায়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? কাজটা অন্যায় বটে, কিন্তু তাহা লইয়া গোল করিলে গহনাগুলি আমাকে তখন দেয় কে? আমি জানিতে পারিয়াছি বুঝিয়া সে আমাকে চক্রান্তে মিশাইয়া লইল এবং তখন কলে ও কৌশলে আমি ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম।

তাহার পিতা-মাতার মোটে বিবাহই হয় নাই। অন্য লোকে কেহই এ কথা জানিত না। তাহার পিতা তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজমুখে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন এবং একখানি উইল পর্য্যন্ত না করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ ছেলে, পিতার মৃত্যু হইবামাত্র সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিল এবং পাছে শত্রুপক্ষে জানিতে পারিয়া গোল তুলে এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারী আসিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, এই ভয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঠাকুরবাড়ীর খাতায় প্রণামী জমা করিয়া সে সকল আশঙ্কা নির্ম্মূল করিতে মনস্থ করিল। এ জন্য তাহাকে নিন্দা করা অন্যায়। সংসারে কে আপনার স্বার্থ এরূপে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে? এই অভিপ্রায়ে দপ্তরখানার খাতা অন্বেষণ করিতে করিতে যে বৎসরে বিবাহ হইলে তাহার জন্ম হওয়া সঙ্গত হয়, সেই বৎসরের একটা পাতার নীচে একটু ফাঁক দেখিতে পাইয়া তাহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। এমন সুযোগ ঘটিবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎকালে তাহার উপর আমার বড় দয়া হইয়াছিল। তাহার মাতা ব্যভিচারিণী বা তাহার পিতা দুশ্চরিত্র, অথবা তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই ইত্যাদি কারণে তাহাকে অপরাধী করা কখনই সঙ্গত নহে। অপরাধ যদি কাহারও থাকে, তাহা হইলে সে জন্য তাহার পিতা-মাতাই অপরাধী। ন্যায়বিচার করিলে আমি কেন, কেহই তাহাকে অপরাধী বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

এ দিকে খাতার কালীর মত কালী ও তদনুরূপ লেখা তৈয়ার করিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। যাহা হউক, শেষে সব ঠিকঠাক হইলে সে কাজ গুছাইয়া ফেলিল। ঐ পর্য্যন্ত আমার সহিত সে কোন মন্দব্যবহার করে নাই। আমাকে যাহা যাহা দিবার কথা ছিল, সে সকলই দিয়াছে এবং কোনও সামগ্রী ফাঁকি দিয়া ছেলে ভুলানর মত দেয় নাই।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা হয় তো আপনি রোহিণীর মুখে শুনিয়াছেন। চারিদিকে অকারণে আমার নিন্দা প্রচার হইয়া উঠিল। উক্ত বড়লোক মহাশয়কে ও আমাকে নির্জ্জনে রাত্রিকালে বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া আমার স্বামী যাহা মনে করিলেন, তাহা বোধ করি, আপনি শুনিয়াছেন। তাহার পর সেই বড়লোক মহাশয় আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা বোধ করি, আপনি শুনেন নাই। আমি তাহা বলি, শুনুন।

ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া আমি তাহাকে সকাতরে বলিলাম,—"দেখ, অকারণ আমার স্বামী আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন এবং আমাকে সত্য সত্যই কলঙ্কিনী বলিয়া মনে করিতেছেন। তুমি দয়া করিয়া আমার এই কলঙ্ক দূর করিয়া দেও। তোমাকে অন্যান্য সকল বৃত্তান্ত বলিতে হইবে না। তুমি কেবল আমার স্বামীকে বুঝাইয়া দেও, তাহাতে আমার একবিন্দুও অপরাধ নাই। তোমার জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়া আমার এই উপকার তোমাকে করিতেই হইবে।" সে স্পষ্ট বলিল যে, এ কার্য্য সে পারিবে না। সে আরও বলিল যে, এই মিথ্যা কথা আমার স্বামী ও অন্যান্য সকলে বিশ্বাস করাই তাহার পক্ষে মঙ্গল; কারণ, যতদিন তাহাদের মনে এই বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন প্রকৃত বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইবে না। আমি তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলাম এবং বলিলাম, 'আমি প্রকৃত কথা সকলকে বলিয়া দিব।' তাহার উত্তরে সে বলিল, কথা ব্যক্ত হইলে তাহারও যেমন সাজা হইবে, আমারও তেমনই সাজা হইবে; আইনের চক্ষে উভয়েই সমান অপরাধী।

কথা সত্য। এই নরাধম আমাকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বিষম ফাঁদে ফেলিয়াছে। আমি আইনকানুন কিছুই বুঝি না, পরিণামে কি হইবে, তাহাও চিন্তা করি নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া, তাহার প্রয়োজন ও আগ্রহ বুঝিয়া তৎপ্রদত্ত অলঙ্কারাদির লোভে পড়িয়া আমি গলিয়া গিয়াছিলাম। এখন কাজেই আমি জড়াইয়া পড়িয়াছি। এ কথা ব্যক্ত হইলে তাহারও যে দণ্ড, আমারও সেই দণ্ড। এইরূপে সেই দুরাত্মা আমার সর্ব্বনাশ করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমাকে তাহার ভয় করিয়া চলিতে হইল। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, কেন আমি সেই পাপিষ্ঠ প্রবঞ্চককে আন্তরিক ঘৃণা করিতাম! এখন বুঝিতে পারিতেছেন, যে মহাত্মা সেই নরাধমের সর্ব্বনাশসাধনার্থ যত্নবান্ হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এত কথা কেন আমি সন্তোষ সহকারে লিখিয়া জানাইতেছি।

আমাকে সম্পূর্ণরূপে চটাইতেও তাহার সাহস হইল না। আমার ন্যায় স্ত্রীলোককে অতিশয় বিরক্ত করাও যে নিরাপদ্ নহে, তাহাও সে বুঝিত। এ জন্য সে আমাকে আর্থিক সাহায্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তাহার দয়ার সীমা নাই। পাপিষ্ঠ দয়া করিয়া কিছু পুরস্কার এবং আমাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার জন্য আমার কিছু ক্ষতিপূরণ করিবার প্রস্তাব করিল। আমি দুইটি সর্ত্ত পালন করিলে, সে আমাকে তিন মাস অন্তর যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবে, স্বীকার করিল। ওঃ, তাহার কি সদাশয়তা! সে দুই সর্ত্ত কি, শুনুন। ১ম, তাহার এবং আমার সম্বন্ধে নীরব থাকিব। ২য়, তাহার অনুমতি না লইয়া আমি রামনগর হইতে অন্য কোথায় যাইতে পারিব না। কিন্তু আমার তখন আর উপায় নাই; কাজেই পাপিষ্ঠের এই সকল সর্ত্তে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইল। আমার মূর্খ স্বামী ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া আমার দুর্নাম প্রচার করিয়াছে। এক্ষণে, সে স্বামীর গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা এই নরাধমের সাহায্যে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকাই ভাল। মোটা টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা হইল। যে সকল সতী-লক্ষ্মীরা আমাকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আমার দিন কাটিতে লাগিল ভাল।

এইরূপে সেই স্থানে থাকিয়া সুনাম অর্জ্জন করিবার জন্য আমি বিশেষ যত্নশীল থাকিলাম এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলাম। তাহার প্রমাণ আপনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। এই গুপ্ত কাণ্ড আমি কিরূপে গোপন করিয়া রাখিলাম এবং আমার পরলোকগতা কন্যা মুক্তকেশী তাহার কিছু জানিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা জানিতে আপনি নিশ্চয়ই কৌতূহলযুক্ত হইয়াছেন। আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, সুতরাং কোন কথাই গোপন করিব না। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু, এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে আপনি যে আমার কন্যার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্ধেতু আমি বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। যদি তাহার বাল্যজীবন জানিতে আপনার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি রোহিণীর নিকট হইতে তাহা জানিবেন। কারণ, তিনি সে বৃত্তান্ত আমার চেয়ে ভাল জানেন।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, আমি মেয়েটাকে কখনই বড় ভালবাসিতাম না। সে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার জ্বালার কারণ ছিল; বিশেষতঃ তাহার স্থূল-বুদ্ধি আমার বড়ই বিরক্তিকর। আমি সরলভাবে সকল কথা বলিলাম। আশা করি, ইহাতেই আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।

রাজার সর্ত্ত পালন করিয়া আমি তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর অর্থ ভোগ করিতে লাগিলাম এবং স্বচ্ছন্দরূপে দিনপাত করিতে থাকিলাম। যদি কখন আমার কোন স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আমার এই নূতন প্রভুর নিকট আমাকে হুকুম লইতে হইত। তিনি তাদৃশ স্থলে অনুমতি প্রদান করিতে প্রায়ই কুণ্ঠিত হইতেন না। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে নরাধম আমার উপর অত্যাচার করিতে কখনই সাহসী হইত না। তাহার গুপ্ত কাণ্ড নিজ সাবধানতার অনুরোধেও যে আমি সহসা প্রকাশ করিতে পারিব না, তাহা সে বেশ জানিত। আমি একবার আমার এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর মরণ-কালে শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত শক্তিপুরে গিয়া অনেক দিন ছিলাম। শুনিয়াছিলাম, ভগ্নীর অনেক টাকা ছিল। মনে করিয়াছিলাম যে, যদি কখন কোন কারণে আমার ত্রৈমাসিক বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য দিকে সময় থাকিতে চেষ্টা দেখা মন্দ নয়। কিন্তু আমার কষ্টই সার হইল। সিকি পয়সাও পাওয়া গেল না, ভগ্নীর কিছুই ছিল না।

শক্তিপুরে যাইবার সময় আমি মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। রোহিণী যে তাহাকে 'নয়' করিয়া লইতেছে, এ জন্য আমি কখন কখন বড় বিরক্ত হইতাম এবং তাহাকে কাড়িয়া আনিতাম। রোহিণীকে আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না; ও রকম হেকুব মেয়েমানুষ আমার দু'চক্ষের বিষ! আমি তাহাকে জ্বালাতন করিবার জন্যই সময়ে সময়ে মুক্ত-কেশীকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতাম। এই কারণেই মেয়েকে শক্তিপুরে সঙ্গে লইয়া যাই। সেখানে তাহাকে আনন্দধামের মেয়ে স্কুলে পড়িতে দিয়াছিলাম। আনন্দধামের জমীদারণী শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর চেহারায় বিশেষত্ব কিছু ছিল না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া-ছিল। যাহা হউক, বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, সেই জমীদারণী ঠাকুরাণী আমার কন্যাকে অতিশয় ভাল-বাসিতে লাগিলেন। স্কুলে সে তো কিছুই শিখিত না, বাড়ার ভাগ আনন্দধামে আদর পাইয়া আরও বিগ্‌ড়াইয়া উঠিল। তাহার অনেক খেয়াল ছিল, তাহার উপর আবার আনন্দধাম হইতে সর্ব্বদা শাদা কাপড় পরার খেয়াল লইয়া আসিল। আমি নিজে নানাপ্রকার রঙ্গীন কাপড় পরিতে ভালবাসিতাম। সুতরাং মেয়ের অন্য ভাব আমার বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইল এবং আমি বাড়ী ফিরিয়াই তাহার ঘাড় হইতে এ ভূত ছাড়াইব স্থির করিলাম। কিন্তু আশ্চ-র্য্যের বিষয়, কোন ক্রমেই তাহার এ সংস্কার আমি দূর করিতে পারিলাম না। তাহার প্রকৃতিই এই-রূপ। যদি তাহার মাথায় কোন কথা একবার ঢুকে, তাহা হইলে তাহা আর কোনমতেই সে ছাড়ে না। সকল বিষয়েই তাহার এইরূপ ভয়ানক একগুঁয়েমী। তাহার সহিত আমার অবিশ্রান্ত ঝগড়া চলিতে লাগিল। রোহিণী আমাদের এই ভাব দেখিয়া মুক্তকেশীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিতে চাহি-লেন। যদি রোহিণীও তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাদা কাপড় পরায় মত না দিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁর সঙ্গে মেয়েকে যাইতে দিতাম; কিন্তু মেয়ের পক্ষ হইয়া আমার বিপক্ষতা করায় আমি তাহাদের দুই জনকেই জব্দ করিব স্থির করিলাম এবং মেয়েকে রোহিণীর সহিত কোন মতেই আসিতে দিলাম না। মেয়ে আমার নিকটেই থাকিল। ক্রমে গ্রামমধ্যে আমার সুযশ ব্যক্ত হইতে লাগিল এবং আমার মেয়েটিকে অনেকেই ভালবাসিতে লাগিল। তাহার সাদা কাপড়ের ঝোঁক আমি আর বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম না। কিছুদিন পরে পাপিষ্ঠের গোপনীয় কাণ্ড উপলক্ষে এক বিষম বিবাদ বাধিয়া গেল।

আমি একবার কাশী যাইবার মনস্থ করিয়া, অধুনা নরকস্থ বড়লোক মহাশয়ের নিকট অনুমতি চাহিয়া পাঠাই। তিনি আমার পত্রের উত্তরে নানাবিধ কুৎসিৎ ও ঘৃণিত কটূক্তিপূর্ণ এক পত্র দ্বারা আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পাঠান। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমার এতই রাগ হয় যে, আমি মেয়ের সাক্ষাতেই তাহাকে নানাপ্রকার গালি দিতে আরম্ভ করি এবং বলিয়া ফেলি যে, "নরাধম জানে না যে, আমি একটি মুখের কথায় তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারি।" এইটুকুমাত্র বলার পর মুক্তকেশী কৌতুহলযুক্ত হইয়া সাগ্রহে আমার প্রতি চাহিয়া আছে দেখিয়া, আমার চৈতন্য হইল এবং আমি চুপ করিলাম। আমার বড়ই ভাবনা হইল। মেয়ের মাথার ঠিক নাই। সে যদি লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় যে, তাহার মা মনে করিলে ঐ ব্যক্তির

সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে তো লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এই ভাবিয়া আমি মেয়েকে কাছ-ছাড়া হইতে না দিয়া সাবধান করিয়া রাখিলাম। কিন্তু মহাশয় পরদিনই বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

বলা নাই, কহা নাই, পরদিন বড়লোক মহাশয় আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে সে যে কঠোর পত্র লিখিয়াছে, তজ্জন্য তাহার বড় অমুতাপ হইয়াছে। পাছে আমি রাগ করিয়া থাকি, এই ভাবনায় সে আমাকে ঠাণ্ডা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে দিন তাহার নিজের মেজাজ খুব খারাপ। সে মুক্তকেশীকে কখনই দেখিতে পারিত না, মুক্তকেশীও তাহাকে দেখিতে পারিত না। এক্ষণে মুক্তকেশীকে ঘরে দেখিয়া সে তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিল। কিন্তু মুক্তকেশী সে কথায় ভ্রুক্ষেপও করিল না। ভয়ানক চীৎকার করিয়া আপনাদের বড়লোক বলিল,—"শুনিতে পাচ্ছিস্? এ ঘর থেকে বেরিয়ে যা।" মুক্তকেশীও অতিশয় রাগিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আমার সহিত ভদ্রভাবে ভাল করিয়া কথা কহ।" দুর্ব্বৃত্ত আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এ পাগলটাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দেও।" মুক্তকেশী চিরকালই আপনাকে যথেষ্ট বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে পাগল বলায় সে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল এবং আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সে এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"যদি ভাল চাও, এখনই আমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা কর। এখনই তোমার গুপ্তকথা আমি বলিয়া দিব। জান না তুমি, একটি মুখের কথায় তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারি।" কালি আমি যে কথা বলিয়াছি, সে আজি ঠিক সেই কথাই তাহাকে বলিল। যেন সে সকলই জানে। বড়লোক মহাশয়ের যে ভাব হইল, তাহা বলিয়া বুঝান ভার। সে দারুণ ক্রোধে যে সকল কথা বলিয়া আমাকে গালি দিতে লাগিল, তাহা এতই ঘৃণাজনক যে, এ স্থলে উল্লেখ করা অসম্ভব। যাহা হউক, গালিগালাজের স্রোত বন্ধ হইয়া গেলে নরাধম নিজের সাবধানতার জন্য মুক্তকেশীকে পাগ্‌লা-গারদে আটকাইয়া রাখিবার প্রস্তাব করিল। মুক্তকেশী ভিতরকার কথা কিছুই জানে না; আমি রাগের ভয়ে কালি কেবল ঐ কথা বলিয়াছি; সে কেবল ঐ কথাই জানে, আর কিছু সে জানে না; ইত্যাদি নানা কথায় আমি তাহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিলাম। কত দিব্য ও শপথ করিলাম। কিন্তু সে কিছুই বিশ্বাস করিল না। সে স্থির করিল, নিশ্চয়ই আমি কন্যাকে সকল কথা জানাইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া আমাকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। মুক্তকেশীর মনে বদ্ধমূল সংস্কার হইল যে, তাহার ঐ কথায় নরাধম যখন এত ভয় পাইয়াছে, তখন অবশ্যই এ কথা তাহার পক্ষে বড়ই সাংঘাতিক, তখন সুযোগ পাইলেই এই কথা সকলকে বলিতে লাগিল। পাগ্‌লা-গারদে গিয়া সেখানকার লোকদিগকে প্রথমেই বলিল যে, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে সে রাজার সর্ব্বনাশ করিবে। আপনি যখন তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তখন কথা উঠিলে সে হয় তো আপনাকেও এ কথা বলিত। আমি শুনিয়াছি, এই অতি বড় ভদ্রলোক যে অভাগিনী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মুক্তকেশী তাঁহাকেও এ কথা বলিয়াছিল। কিন্তু আপনি কিংবা সেই মন্দভাগিনী যদি মুক্তকেশীকে কখন বিশেষ করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। মুক্তকেশী গুপ্তকথার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। সে বুঝিয়াছিল যে, একটা গোপনীয় কথা আছে সত্য, কিন্তু কি সে কথা, তাহার একবর্ণও সে কখন শুনে নাই।

বোধ করি, এতক্ষণে আমি আপনার কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছি। আমার সম্বন্ধে বা কন্যার সম্বন্ধে আর কিছুই আমার বলিবার নাই। মনোরমা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক আমাকে মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবে জানিয়া আপনার ভদ্রলোক মহাশয় উত্তরের জন্য আমার কাছে একটা মুসাবিদা রাখিয়াছিল। নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোকের নিকট নরাধম আমার সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যাকথা বলিয়াছে। বলুক, সে যখন আর নাই; তখন তাহার কথায় আর ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত বন্ধুভাবে আপনাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলাম; কিন্তু অতঃপর আপনাকে অতিশয় ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিয়া পত্রের সমাপ্তি করিব। আপনার সহিত সাক্ষাৎকালে আপনি অতীব সাহসিকতা সহকারে মুক্তকেশীর পিতৃবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন; যেন তাহাতে সন্দেহের বিষয় আছে। ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অভদ্রোচিত অকর্ত্তব্য ব্যবহার হইয়াছে। আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিলে আপনি কদাচ তাদৃশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। যদি আপনি মনে করেন যে,

আমার স্বামী মুক্তকেশীর পিতা নহেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করা হইবে। যদি এ বিষয়ে আপনার কোন কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে সে কৌতূহল দমন করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি। দেবেন্দ্রবাবু, পরকালের কথা বলিতে পারি না, ইহকালে আপনার সে কৌতূহল-নিবৃত্তির আর উপায় নাই।

অতঃপর আমার নিকট আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। যদি আর কখন আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি সমাদর করিব। যদি কখন সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে এ পত্রের কোন কথা তুলিবেন না। কারণ, এ পত্র যে আমি লিখিয়াছি, তাহা আমি কখনই স্বীকার করিব না। সতর্কতার অনুরোধে আমি পত্রে স্বাক্ষর করিলাম না। এ পত্রের লেখার ভঙ্গীও আমার হস্তাক্ষর অপেক্ষা বিস্তর ভিন্ন। আর এরূপ সুকৌশলে এ পত্র আপনার নিকট পাঠাইলাম যে, ইহা আমার প্রেরিত বলিয়া স্থির করা কখনই সম্ভব হইবে না, এরূপ সাবধানতায় আপনার ক্ষতি কিছুই নাই। কারণ, যে সংবাদ ইহাতে আছে, আমার সাবধানতাহেতু তাহার কোন অন্যথা হইতেছে না।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিমতির এই অত্যদ্ভুত পত্র পাঠ করার পর তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা হইল। পত্রের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে অস্বাভাবিক কঠিন-হৃদয়তা, লজ্জাহীনতা ও মনোবৃত্তির নীচতা পরিলক্ষিত হইতেছে, যে মৃত্যু ও দুর্ঘটনা নিবারণের নিমিত্ত আমি সবিশেষ চেষ্টাশীল ছিলাম, তাহাই নানাকৌশলে আমার স্কন্ধে আরোপিত করিবার জন্য পত্রের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রযত্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎসমস্ত মনে করিয়া আমার অন্তরে এতই ঘৃণার উদয় হইল যে, আমি তখনই সেই লিপি খণ্ড-বিখণ্ডিত করিতেছিলাম, কিন্তু সহসা মনোমধ্যে অন্য এক ভাবের উদয় হওয়াতে আমি বিরত হইলাম।

আমার মনে হইল, পত্রখানি দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও মুক্তকেশীর পিতৃনিরূপণ পক্ষে ইহা আমার সহায় হইতে পারে। মুক্তকেশীর পিতা কে, স্থির করা আমার পক্ষে আবশ্যক এবং তাহা আমার অনুসন্ধানের একাংশস্বরূপ। তাহার সহিত উপস্থিত ব্যাপারের কোন সংস্রব থাকা অসম্ভব নহে। পত্র মধ্যে দুই একটি স্থানে এরূপ দুই একটি উক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, যাহা ধরিয়া বিচার, আলোচনা ও অনুসন্ধান করিলে অনেক কথা প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু এখন তাহার সময় নয়। সময়ান্তরে অবকাশমতে আমি তাহাতে মনঃসংযোগ করিব। এই বিবেচনায় আমি সযত্নে পত্রখানি পকেট-বহির মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

কালি একবার আমাকে রাজপুরের ফৌজদারী আদালতে হাজির হইতে হইবে; তাহার পর এখানকার কার্য্যের শেষ। প্রাতে উঠিয়াই আমি যথারীতি ডাকঘরে গমন করিলাম। পত্র পাইলাম; কিন্তু তাহা বড় হাল্কা; যেন তাহার ভিতর কিছুই নাই। আমি নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে তাহার খাম খুলিয়া ফেলিলাম; দেখিলাম, ভিতরে অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাগজ ভাঁজা রহিয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টি কালী-চোপসান ও ব্যস্ততা সহ লিখিত কথামাত্র লিখিত রহিয়াছে।

"যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। আমি বাসা বদ্‌লাইতে বাধ্য হইয়াছি। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলী ৩নং বাটীতে আসিবে। আমাদের জন্য কোন ভয় করিও না। আমরা উভয়েই নিরাপদ্‌ ও সুস্থ আছি। শীঘ্র আসিবে।—মনোরমা।"

পত্র পাঠ করিয়াই আমার মনে হইল, জগদীশনাথ চৌধুরী নিশ্চয়ই কোন দৌরাত্ম্যের সূচনা করিয়াছেন। ভয়ে আমার অন্তর অভিভূত হইয়া গেল। আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম, না জানি কি হইয়াছে। ধূর্ত্ত জগদীশনাথ চৌধুরী না জানি কি চক্রান্ত করিতেছে। লাগাইত সন্ধ্যা আমি সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই কত অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা কে বলিতে পারে? কল্য বৈকালে মনোরমা এই পত্র লিখিয়াছেন; তাহার পর এক রাত্রি অতীত হইয়াছে। হয় ত এই সময়ের মধ্যেই কত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে। কেবল মনোরমার বুদ্ধি ও সাহসের উপর আমার অত্যধিক বিশ্বাসই আমাকে এখনও স্থির হইয়া ভাবিতে সক্ষম রাখিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব, রাজদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলাম। পাছে সময় নষ্ট হয়, এই ভয়ে আমি রেল-ষ্টেশনের নিকট

হইতে রাজপুর যাইবার জন্য একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিলাম। আমি যখন গাড়ীতে উঠিতেছি, তখন আর একটি ভদ্রলোক আমার গাড়ীতে অংশীদার হইতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য, আমি সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; কারণ, এ উপায়ে গাড়ীর পূরা ভাড়া আমাকে দিতে হইবে না। গাড়ীতে বসিয়া আমরা নানাবিধ গল্প করিতে করিতে চলিলাম। এই অগ্নি-কাণ্ড ও রাজা প্রমোদ-রঞ্জনের অপমৃত্যু তৎকালে এ দেশের প্রধান ঘটনা; সুতরাং সহজেই সেই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল। যে ভদ্রলোকটি আমার অংশীদার হইয়া আমার গাড়ীতে উঠিলেন, রাজার উকীল মণিবাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ আছে। রাজার এইরূপ মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া মণিবাবু সমস্ত বিষয় অব-ধারণ ও সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার সম্পত্তি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ইত্যাদি বিষয়ে মণিবাবুর সহিত এই ভদ্রলোকটির অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। রাজার দেনা এতই অধিক যে, তাহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। এ জন্য উকীলবাবু সে কথা আর গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজা মরণের পূর্ব্বে কোন উইল করিয়া যান নাই; আর উইল করিবার মত সম্পত্তিও ছিল না। স্ত্রীর যে সম্পত্তি তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই পাওনাদারেরা গ্রাস করিয়াছিল। রাজা বসন্তরঞ্জনের খুড়তুতো ভাইয়ের এক পুত্র আছেন। অধুনা এই ঋণজড়িত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। যাহা হউক, তিনি যদি হিসাব করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে বহুকালে সম্পত্তি ঋণমুক্ত হইলেও হইতে পারে।

যদিও শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠায় আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল, তথাপি এ সকল সংবাদ সহজেই আমার মনোযোগ আক-র্ষণ করিল। আমি বিবেচনা করিলাম, রাজার এই জালের সংবাদ ব্যক্ত না করাই সৎপরামর্শ। যে প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া এই ২৩ বৎ-সর কাল তিনি এই সমস্ত আয় ভোগ করিয়া আসিতেছেন ও যে সম্পত্তি তিনি উৎসন্ন করিয়া-ছেন, সেই সম্পত্তি এক্ষণে ঘটনাচক্রে সেই প্রকৃত উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইতেছে। এক্ষণে রাজার জালের কথা ব্যক্ত করায় কাহারও ইষ্ট-সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া লীলার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার এতাদৃশ নীচতা ও পাপিষ্ঠতা জগতে প্রচারিত না হওয়াই সৎপরামর্শ। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি তৎকালে এ কথা ব্যক্ত করিলাম না। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই অখ্যায়িকাবর্ণিত ব্যক্তিবৃন্দের কল্পিত নাম ব্যবহার করিয়াছি।

রাজপুরে সমাগত হইয়া আমি এই ভদ্র-লোকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম এবং আদালতগৃহে উপস্থিত হইলাম। যাহা আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। সেখানে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত কেহই উপস্থিত নাই। সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমার নিষ্কৃতি হইল। আদালত হইতে বাহিরে আসিবামাত্র ডাক্তার বিনোদবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে; কিন্তু তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট যে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা সম্পাদন করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি পত্রোত্তরে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম যে, নিতান্ত গুরুতর কার্য্যানুরোধে আমাকে এখনই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হই-তেছে। এ জন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহার নিকট আমার চির-কৃতজ্ঞতা বাচনিক ব্যক্ত করিয়া যাইতে না পারায় আন্তরিক দুঃখিত থাকিলাম।

যথাসময়ে আমি ডাক-গাড়ীতে চড়িয়া কলি-কাতায় চলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি বেলা ৩॥০ টার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া ৩নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটি বেশ ছোট-খাট—দেখিতেও বেশ পরিষ্কার। আমি দরজার কড়া নাড়িবামাত্র একসঙ্গে লীলা ও মনোরমা উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়-দিনমাত্র আমাদের সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু বোধ হইল যেন, কত কালই আমরা তফাৎ হইয়া আছি। প্রথম সাক্ষাতে সকলেরই নয়ন যে প্রকার উৎফুল্ল হইল, মুখ যেরূপ উজ্জ্বল হইল, তাহাতে হৃদয়ে যে অপরিসীম আনন্দোদয় হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। লীলার বড় অভিমান। পূর্ব্ব হইতেই ঝগড়া করিবার অনেক আয়োজন করিয়া-ছেন; কিন্তু এত সাধের ঝগড়াও তাঁহার করা হইল

না। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র হাসিয়া ফেলিলেন এবং আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে আমার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি নিকটস্থ হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"লীলা, লেখা চলিতেছে তো?" অভিমানিনী লীলা দুর্দ্দমনীয় হাস্যবেগ চাপিয়া বলিলেন,—"যাও, তুমি বড় দুষ্ট, তোমার সহিত আমার আর কথা নাই।"

আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং সকলে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলাম। আমি তখন মনোরমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম,—"যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাদের নিকট যে আবার আসিতে পারিব, তাহা আমার মনে ছিল না।"

লীলা সাগ্রহে আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আঁা! কি হইয়াছিল?"

আমি বলিলাম,—"তুমি যদি আমার উপর রাগ ত্যাগ কর, তবে সব বলি।"

লীলা বলিলেন,—"রাগ আমি কখন করি নাই, রাগ কখন করিবও না। তুমি এখন বল, কি হইয়াছিল?"

আমি বলিলাম,—"তুমিও যেমন আমার উপর রাগ কর নাই, আমারও তেমনই কিছুই হয় নাই। তোমার কথাও যেমন মিছা, আমার কথাও তেমনই মিছা। এখন আমাদের ঝগড়া মিটিয়া গেল, কেমন?"

লীলা বলিলেন,—"কাজেই, তুমি যে দুষ্ট, তোমার সহিত আমি ঝগড়া করিতে পারি কৈ?"

লীলার জীবনের উপর দিয়া যে দারুণ দুর্দ্দৈববাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে নিরতিশয় অবসন্ন ও প্রপীড়িত করিয়াছিল; কিন্তু মনোরমার প্রভূত যত্নবলে লীলার বদনমণ্ডলে সেই বিষাদকালিমা এখন আর নাই। করুণাময়ী জননীতুল্যা মনোরমা দেবীর উদ্ভাবিত কৌশল ও সদ্‌যুক্তি পরম্পরায় ক্লিষ্টা, রুগ্না, ব্যথিতা লীলাবতীর দেহে ও হৃদয়ে, বাহ্যে ও অন্তরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সজীবতা ও নবীনতার পূর্ণাবির্ভাব সংঘটিত হইয়াছে। অপরিমেয় স্নেহের শান্তিসুধা-সংস্পর্শে লীলা নবজীবন লাভ করিয়াছেন।

লীলা কার্য্যান্তর উপলক্ষে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, আমি বর্ত্তমান ব্যাপারে মনোরমার বুদ্ধি ও সাহসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কাণ্ডটা কি ঘটিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম।

মনোরমা বলিলেন,—"আমার আর তখন লিখিবার সময় ছিল না, তাই সকল কথা লিখিতে পারি নাই। আমার চিঠি পাইয়া তুমি অতিশয় ভাবিত হইয়াছিলে কি? তোমাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর দেখাইতেছে।"

আমি উত্তর দিলাম,—"প্রথমে আমার খুব ভয় হইয়াছিল। তার পর মনে করিলাম, যেখানে মনোরমা আছেন, সেখানে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, জগদীশনাথ চৌধুরীর কোন নূতন চাতুরী এই ভয়ের কারণ। তাই ঠিক কি?"

তিনি বলিলেন,—"ঠিক! কল্য তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। কেবল দেখা নহে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তাও হইয়াছে।"

"কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? আমরা কোথায় থাকি, তাহা কি সে জানিতে পারিয়াছিল?"

"সে আমাদের বাসায় আসিয়াছিল, কিন্তু উপরতলায় উঠে নাই। কেমন করিয়া কি ঘটিল, বলিতেছি, শুন। পুরান বাসার উপরকার ঘরে লীলা ও আমি কাজকর্ম্ম করিতেছিলাম। এমন সময় জানালায় ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলাম, রাস্তার অপর ধারে চৌধুরী একটা লোকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে।"

"তোমাকে কি সে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইয়াছিল?"

"না—আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু সে আমাকে দেখিতে পায় নাই বোধ হয়।"

"তাহার সঙ্গে যে ছিল, সে কে? অপরিচিত লোক কি?"

"না দেখেন, অপরিচিত নয়। আমি তখনই তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে পাগ্‌লাগারদের অধ্যক্ষ।"

"চৌধুরী কি তাহাকে আমাদের বাসা দেখাইয়া দিতেছিল?"

"রাস্তায় পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে যেরূপ ভাবে লোকে কথা কহে, তাহারা সেইরূপ ভাবেই সকল কথা কহিতেছিল; যদি সে সময় লীলা আমার মুখ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, নিশ্চয়ই কি একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং হয় ত অত্যন্ত গোল করিয়া ফেলিত। আমি নিয়ত লীলার দিকে পিছন ফিরিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলাম। শীঘ্রই তাহারা তফাৎ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিয়া গেল। কিন্তু চৌধুরী আবার তখনই ফিরিয়া আসিল এবং পকেট

হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া পেন্‌সিল দিয়া কি লিখিল। তাহার পর রাস্তা পার হইয়া সে আমাদের বাসার নীচের দোকানে আসিল। আমি দৌড়িয়া বাহিরে আসিলাম এবং কদাচ তাহাকে উপরে উঠিতে দিব না সংকল্প করিয়া নীচের সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তখনই দোকানদারের ছোট মেয়েটি সেই কাগজটুকু হাতে করিয়া আনিল। নরাধম তাহাতে লিখিয়াছে,—'সুন্দরি! আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যাবশ্যক একটি কথা বলিবার জন্য আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছি।— জগদীশ!' আমি মনে করিলাম, এরূপ দুর্জ্জনকে সহসা বিদায় করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা ইহার বক্তব্য জানিয়া লওয়াই সৎপরামর্শ। বিশেষতঃ তুমি এখানে উপস্থিত নাই। এখন তাহাকে বিরক্ত করিলে অত্যাচারের পরিমাণ দশগুণ বাড়িতে পারে। এই মনে করিয়া আমি মেয়েটিকে বলিলাম,— 'ভদ্রলোকটিকে তোমাদের পাশের ঘরে আসিতে বল; আমি এখনই সেখানে যাইতেছি।' পাছে লীলা টের পায়, ইহাই আমার বিশেষ ভয়। আমি তখনই দোকানের পাশের ঘরে উপস্থিত হইলাম। বিলাসিতার পরিচায়ক নানা বস্ত্রালঙ্কারে সমাচ্ছন্ন বিরাটকায় চৌধুরীকে সম্মুখে দেখিয়া পুনরায় আমার কৃষ্ণসরোবরের দিন মনে পড়িল। পরমাত্মীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোকে যেরূপ কথা কহে, সে সেইরূপ ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, যেন কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যেন আমরা সম্পূর্ণ আত্মীয়তায় বদ্ধ; যেন অন্তরজাত ঘটনাসমূহ স্বপ্নবৎ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।"

"কি বলিল, তাহা তোমার মনে আছে?"

"ঠিক মুখস্থ বলার মত বলিতে না পারিলেও আমি তাহার মর্ম্ম তোমাকে ঠিক বলিতে পারিব। আমার বিষয়ে সে যে সকল জঘন্য কথা বলিল, তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু তোমার বিষয় যাহা বলিল, তাহা আমি এখনই বলিতেছি। আমি পুরুষ হইলে তাহাকে প্রহার করিতাম। রাগে আমার অন্তর অস্থির হইলেও আমি নীরবে সমস্ত সহ্য করিলাম। সে দুই বিষয়ের প্রার্থী। প্রথমতঃ আমার প্রতি তাহার অন্তরের অনুরাগ সে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে অনুমতি চাহে। বলা বাহুল্য, আমি তাহার তাদৃশ প্রসঙ্গে কর্ণপাত করিতে অস্বীকার করিলাম। তাহার দ্বিতীয় কথা, তদীয় পত্রলিখিত শাসনবাক্যের পুনরাবৃত্তিমাত্র, এ কথা পুনরায় বলিবার প্রয়োজন কি, আমি জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাহার প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই তাহাকে উত্তেজিত হইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। সে রাজাকে কর্ত্তব্য বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু রাজা তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। তখন কাজেই চৌধুরীকে রাজার কথা ছাড়িয়া দিয়া, আত্ম-সাবধানতায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। যদিই তোমার দ্বারা তাহার কোন বিপদ্ উপস্থিত, হয়, এই ভয়ে তুমি যখন কৃষ্ণসরোবর হইতে ফিরিয়া আইস, তখন চৌধুরী অলক্ষিতভাবে তোমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের বাসা দেখিয়া যায়। উকীলের লোকেরাও সে দিন তোমার অনুসরণ করিয়াছিল। চৌধুরী এতদিন আমাদের ঠিকানা জানিয়াও আমাদের উপর কোন দৌরাত্ম্য করিবার প্রয়োজন দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি রাজার মৃত্যু হওয়ায় তাহার ধারণা হইয়াছে, তুমি নিশ্চয়ই অতঃপর এই চক্রান্তের অপর প্রধান ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে। এইরূপ মনে হইবামাত্র সে পাগ্‌লাগারদের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাঁহার পলাতকা বন্দিনী কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে আর কিছু উপকার না হইলেও তোমাকে নানাপ্রকার মামলা-মোকদ্দমা করিতে হইবে; সুতরাং তাহার কোন অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে তোমার আর সময় থাকিবে না। সে এ সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। কেবল এই কারণে সে এখনও উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসাধনে বিরত আছে।"

"কি কারণ?"

"সে কারণ বলা ও স্বীকার করা নিতান্ত লজ্জার কথা। আমিই এ সম্বন্ধে একমাত্র কারণ। এ কথা যখন আমার মনে হয়, তখন দারুণ ঘৃণায় আমি আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে থাকি। কিন্তু যাহাই হউক, পাষাণ-হৃদয় দুরাচার আমার প্রশংসায় বিমুগ্ধ। আত্মসম্মানের অনুরোধে আমি এ কথা এতদিন বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু তাহার দৃষ্টি, তাহার ভঙ্গী ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া তাহার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। কি বিড়ম্বনা! কি ভয়ানক লজ্জার কথা! আমার সম্বন্ধে কথা বলিবার সময়ে সত্যই দেবেন্দ্র, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, কারাধ্যক্ষকে বাড়ী দেখাইবার সময় তাহার মনে হইল, প্রিয় ভগ্নী লীলাবতীর সঙ্গশূন্য হইলে আমার

যাতনার সীমা থাকিবে না। আমার সেই কষ্ট নিবারণের উদ্দেশে, বাড়ী দেখাইতে গিয়াও সে দেখাইতে পারিল না এবং অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে ভাবিয়া নিরস্ত থাকিল। আমি এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, যাহাতে তোমাকে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে না দিই, ইহাই তাহার অনুরোধ। পুনরায় কোন কারণ উপস্থিত হইলে সে হয় ত সাধ্যমত অনিষ্টসাধানে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। মরিয়া যাই, সেও ভাল, তবু তাহার মত লোকের সঙ্গে এরূপ চুক্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি কিছুই বলিলাম না।"

আমি বলিলাম,—"কথা সব ঠিক বটে, কিন্তু ভয়ের কারণ কিছুই নাই। চৌধুরী কেবল তোমাকে অনর্থক ভয়প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হইতেছে। কারাধ্যক্ষের দ্বারা আমাদের কোন বিপদ্ ঘটাইতে তাহার আর সাধ্য নাই। কারণ. এক্ষণে প্রমোদরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং হরিমতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে। আমার কথা চৌধুরী কি বলিল?"

"সকলের শেষে সে তোমার কথা বলিল। তখন তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার ভাব পূর্ব্বকালের মত হইল। সে বলিল,—'তোমাদের দেবেন্দ্রবাবুকে সাবধান থাকিতে বলিবে। তাঁহাকে বলিয়া দিবে, আমি যে সে লোক নহি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিতে পারি, সমাজকে পদবিদলিত করিতে এবং আইন ও রাজশাসনকে পদাঘাতে উপেক্ষা করিতে পারি। আমার স্বর্গীয় বন্ধু যদি আমার পরামর্শমতে চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে আজি দেবেন্দ্রবাবুর লাস লইয়া পুলিশ-তদন্ত হইত। আমাকে উত্ত্যক্ত করিলে দেবেন্দ্র বাবুর কদাপি নিষ্কৃতি নাই। তিনি যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকুন। আমি তোমার অনুরোধে তাঁহার সে সুখে প্রতিবন্ধক হইব না। তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া বলিবে যে, জগদীশনাথ চৌধুরী কিছুতেই পিছ-পা নহে। আর কিছু বলিব না। অদ্য আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমাকে মনে রাখিবেন।' এই বলিয়া এবং কাতরভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে চলিয়া গেল।"

"ফিরিয়া আসিল না? আর কিছুই বলিল না?"

"না, গৃহনিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আর একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে চলিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম যে, এ বাসায় আর

কদাচ থাকা উচিত নয়। যখন চৌধুরী ইহার সন্ধান পাইয়াছে এবং তুমি এখানে উপস্থিত নাই, তখন এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই বিপদ্ ঘটিবে। লীলার স্বাস্থ্যের জন্য তুমি এ বাসা হইতে উঠিয়া আর একটু নির্জ্জন স্থানে যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলে। আমি লীলাকে সেই কথা মনে করিয়া দিলে সে বড় আনন্দিত হইল। সে সমস্ত সামগ্রীপত্র গোছগাছ করিতে লাগিল।"

"বাড়ী ঠিক করিলে কেমন করিয়া?"

"কেন? খবরের কাগজে আমি এই বাড়ীর সংবাদ দেখিয়াছিলাম। আমি তখনই রাস্তা হইতে একটা ঠিকা মুটে ডাকাইয়া তাহার দ্বারা চিঠি পাঠাইয়া দিলাম। তখনই উত্তর আসিল এবং সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমরা গাড়ী ভাড়া করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহই আমাদের দেখিতে পাইল না।"

আমি আন্তরিক সন্তোষের সহিত তাঁহার ধীরতার প্রচুর প্রশংসা করিলাম এবং তাহার সাহসের ও সুবুদ্ধির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলাম। তখন তিনি নিতান্ত সভয়নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"চৌধুরী অতি দুরন্ত। নিতান্ত ধূর্ত্ত লোক। সে না করিতে পারে, এমন কর্ম্মই নাই। দেবেন্দ্র, এখন কি করিলে আমরা নিরাপদ হইতে পারি, বল।"

আমি বলিলাম,—"উকীল করালীবাবুর সহিত সাক্ষাতের পর এখনও বহুদিন অতীত হয় নাই। আমি যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হই, তখন তাঁহাকে লীলার সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলিয়াছিলাম, লীলা তাঁহার জন্ম-ভবন হইতে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুর খোদিত নিদর্শন তাঁহার মাতৃপ্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল দুই ব্যক্তি এই বিজাতীয় অত্যাচারের নিমিত্ত দায়ী। সেই জন্ম-ভবনের দ্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় উন্মুক্ত হইবে এবং সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সেই খোদিত নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। যদিও বিচারাসন-সমাসীন বিচারপতি মহাশয়ের ক্ষমতাবলে তাহা সংসাধিত না হয়, তথাপি আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আমার নিকট সেই দুই ব্যক্তিকে দুষ্কৃতির নিমিত্ত দায়ী ও পদানত করিবই করিব। সেই দুই জনের এক জন অধুনা মানবক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর ব্যক্তি এখনও আছে; সুতরাং আমার সংকল্পও ঠিক আছে।"

দেখিলাম, মনোরমার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। বুঝিলাম, আমার প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি আছে। আমি বলিতে লাগিলাম,—"আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে অনেক ব্যাঘাত ও অনেক সন্দেহ আছে। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হইয়াছে বা যে যে বিপদের সম্মুখীন হওয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতের তুলনায় তৎসমস্ত অতি সামান্য ও নগণ্য। তথাপি মনোরমা যাহাই কেন হউক না, এ উদ্যম কদাপি পরিত্যাগ করা হইবে না। সমস্ত আয়োজন ঠিক না করিয়া জগদীশনাথ চৌধুরীর ন্যায় দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হইব, এরূপ উন্মাদ আমি নহি। ধৈর্য্যে আমার অভ্যাস আছে, সুতরাং সমুচিত সময়ের জন্য অপেক্ষিত থাকিতে আমি প্রস্তুত আছি। তাহাকে এখন ভাবিতে দেও, সে তোমাকে যে ভয়-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, আমরা যথার্থই তাহাতে ভীত হইয়াছি। আমাদের কোন সংবাদই যেন সে না পায়, আমাদের কোন কথাই যেন তাহার কর্ণগোচর না হয়। তাহা হইলে তাহার মনে ধারণা হইবে যে, তাহার অবস্থা সম্পূর্ণরূপ নিরাপদ্ হইয়াছে। তাহার পর তাহার দারুণ অহঙ্কৃত প্রকৃতি তাহার সর্ব্বনাশের পথ আপনি উপস্থিত করিয়া দিবে। অপেক্ষা করিবার এই এক কারণ—অপেক্ষা করিবার আরও গুরুতর কারণ আছে। শেষ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে মনোরমা, তোমাদের সহিত আমার সম্বন্ধ আরও গাঢ় হওয়া উচিত।"

সবিস্ময়ে মনোরমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার চেয়ে আত্মীয় ইহজগতে আমাদের কেহই নাই। তোমার সহিত সম্বন্ধ কিরূপে আরও গাঢ় হইতে পারে?"

আমি একটু বিবেচনা করিয়া বলিলাম,—"সে কথা দেবি, আমি আজ বলিব না। এখন তাহা বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই; কখনও হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু আপাততঃ আর একটা কথা আমাদের বিশেষ বিচার্য্য। তুমি লীলাকে তথায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ না জানাইয়া ভাল করিয়াছ, কিন্তু,—"

"আরও অনেক দিন না যাইলে এ কথা লীলাকে বলা কখনই উচিত নহে।"

"না মনোরমা, আজিই সুকৌশলে অন্যান্য কোন কথা না বলিয়া কেবল তাঁহার মৃত্যু সংবাদটি লীলাকে জানান আবশ্যক।"

মনোরমা কিয়ৎকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন, তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। কিন্তু সে শুভদিন কি ঘটিবে?"

আমি বলিলাম,—"কেন দিদি, তুমি আশঙ্কা করিতেছ? মনোরমা, তুমি আমাদের মা, তুমি আমাদের ভগ্নী। তোমার স্নেহ, তোমার দয়াই আমাদের সকল ভরসা। এখন আমাদের আর কি কষ্ট আছে? আমরা দরিদ্র হইলেও আমাদের সংসার এখন সুখময়। লীলার ধনসম্পত্তি দেখিয়া আমি কদাপি মুগ্ধ হই নাই। লীলা আমার চক্ষুতে চির-প্রেমময়, চির-আনন্দময়। অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্না লীলার অপেক্ষা দুঃখিনী লীলা আমার বিবেচনায় আরও মধুর। তবে কেন দিদি, তুমি কাতর হইতেছ?"

মনোরমা আর কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরদিন লীলা সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার মৃত্যু হেতু তাঁহার জীবনের প্রধান ভ্রান্তি ও বিষাদ বিদূরিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনা হইয়াছেন।

তদবধি আর কখন আমরা তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই এবং তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক কোনও প্রসঙ্গও উত্থাপন করি নাই। আমরা অধিকতর আগ্রহ সহকারে সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলাম এবং ধীরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম, আমাদের মনোগত অভিপ্রায় মনোরমা ও আমি প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম; অবৈধ বোধে আমরা উভয়েই তাহা লীলার নিকট অধুনা ব্যক্ত করিলাম না।

চৌধুরী যদি কলিকাতা হইতে অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমার সকল আশাই ব্যর্থ হইবে। কারণ, চৌধুরীকে আয়ত্তগত করিয়া তাহার পাপোচিত দণ্ডবিধান করিতে হইবে, ইহা আমার দৃঢ়সংকল্প এবং এই বাসনাই আমার সমস্ত মনোবৃত্তির উপর সতত প্রবল আধিপত্য করিতেছে। আমি জানিতাম, ৫নং আশুতোষ দের লেনে চৌধুরীর বাসা। সেই ৫নং বাটীর মালিক কে, তাহা আমি সন্ধান করিলাম। সেই বাটী আমার ভাড়া লইবার আবশ্যক আছে, অতএব তাহা শীঘ্র খালি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। বাড়ীর মালিক বলিলেন যে, বাটীর বর্ত্তমান ভাড়াটিয়া আবার নূতন

করিয়া ৬ মাসের এগ্রিমেণ্ট করিয়াছেন, সুতরাং আগামী আষাঢ় মাসের এ দিকে বাটী খালি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তখন মোটে অগ্রহায়ণ মাস। সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম।

রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া মুক্তকেশীর মৃত্যুসংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ জানাইব, স্বীকার করিয়াছিলাম। একদিন অবসর বুঝিয়া, আমি তদভিপ্রায়ে রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম। ঘটনা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আভ্যন্তরিক বৃত্তান্তের কিয়দংশ তাঁহাকে জানাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না বলিয়া অগত্যা তাঁহাকে কিছু কিছু বলিতে হইল। এই সাক্ষাতে যাহা ঘটিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সাক্ষাৎ হেতু মুক্তকেশীর পিতৃনিরূপণ বিষয়ে যত্নবান্ হইতে আমার ইচ্ছা হইল।

আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনোরমার সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলাম এবং তদনন্তর তাঁহারই নাম করিয়া দীনবন্ধুবাবুকে এক পত্র লিখিলাম। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, হরিমতি স্বামীর ঘরে আসিবার পূর্ব্বে এই দীনবন্ধুবাবুর বাটীতে সতত যাতয়াত করিত এবং কখন কখন সেখানে থাকিত। মনোরমার জবানী এই পত্র লিখিত হইল এবং কয়েকটি পারিবারিক তথ্যনিরূপণ এই পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইল। দীনবন্ধুবাবু তখনও বাঁচিয়া আছেন কি না সন্দেহ, তথাপি একবার লিখিয়া দেখা গেল।

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল এবং তাহা হইতে যে যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝা-গেল যে, কৃষ্ণসরোবরের রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের সহিত দীনবন্ধুবাবুর কখন পরিচয় ছিল না এবং তিনি কখন দীনবন্ধুবাবুর বাটীতে পদার্পণ করেন নাই। আনন্দধামের ৺প্রিয়প্রসাদ রায়ের সহিত দীনবন্ধুবাবুর বিশেষ বন্ধুতা ছিল এবং তিনি সতত দীনবন্ধুবাবুর বাটীতে যাতায়াত করিতেন। পুরাতন পত্রাদি দেখিয়া দীনবন্ধু বাবু নিঃসংশয়িতরূপে বলিতে সক্ষম যে, ১২৮৬ সালের ভাদ্রমাস হইতে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত তিনমাস কাল প্রিয়প্রসাদবাবু দীনবন্ধুবাবুর বাটীতে ছিলেন। তাহার পর তিনি চলিয়া যান এবং অনতিকালমধ্যেই তাঁহার বিবাহ হয়।

মোটামুটি দেখিলে এ সকল সংবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না হইতে পারে; কিন্তু মনোরমা ও আমি সূক্ষ্মরূপে অন্যান্য বৃত্তান্তের সহিত ঐক্য করিয়া যে মীমাংসায় উপস্থিত হইলাম, তাহা আমাদের মনে অকাট্য বলিয়া বোধ হইল।

ইহা আমরা জানি যে, ১২২৬ সালে হরিমতি সতত দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে যাওয়া-আসা করিত এবং সেই সময়ে প্রিয়প্রসাদ বাবুও সেই স্থানে ছিলেন। লীলার সহিত মুক্তকেশীর অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সমতার বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন এবং লীলা যে আকৃতি বিষয়ে মাতৃ-অনুরূপ নহে—পিতার অনুরূপ, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রিয়প্রসাদ বাবু অতিশয় রূপবান্ এবং অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষ ছিলেন। সুতরাং এরূপ স্থলে কিরূপ মীমাংসা সঙ্গত, তাহা বলা অনাবশ্যক।

হরিমতির পত্রও এ স্থলে আমাদের মীমাংসার সহায়তা করিল। সে নিষ্প্রয়োজনে তাহার লিখিত পত্রমধ্যে বরদেশ্বরী দেবীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছে যে, 'তাঁহার চেহারায় বিশেষত্ব কিছু ছিল না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।' তীব্র গায়ের জ্বালা ভিন্ন সে পত্রে এরূপ কথা লিখিবার কোন দরকার ছিল না। সুতরাং ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, বরদেশ্বরী দেবীর উপর হরিমতির বিরক্ত হইবার অবশ্যই কোন কারণ ছিল। সে কারণ কি, তাহা অনুমান করা অতি সহজ।

এ স্থলে বরদেশ্বরী দেবীর নাম উত্থাপিত হওয়ায় সহজেই মনে প্রশ্ন উঠিতেছে, আনন্দধামে মুক্তকেশীকে দেখিয়া সে কাহার সন্তান, তদ্বিষয়ে বরদেশ্বরী দেবীর মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল কি ?—না। বরদেশ্বরী দেবী তাঁহার স্বামীর বিদেশাবস্থানকালে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহার কোন কোন অংশ মনোরমা আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন, তাহাতে মুক্তকেশীর কথা বিশেষরূপে লিখিত আছে সত্য, কিন্তু স্বতঃ-সঞ্জাত স্নেহ ও কৌতূহল ভিন্ন সেই লেখার অন্য উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। হরিমতি চরিত্রের এই দারুণ কলঙ্ক প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ যত্নবতী ছিল, তাহাতে অপর ব্যক্তির এ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভাবিত নহে। স্বয়ং প্রিয়প্রসাদ রায়ই মুক্তকেশীকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতেন, এমন বোধ হয় না।

এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে হইল, পিতা-মাতার পাপে সন্তানেরা দুঃখ পায়; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই কথা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে। লীলা ও মুক্তকেশী উভয়েই নিরীহ ও

নিষ্পাপ। কিন্তু উভয়কেই অকারণ কত কষ্টই সহ করিতে হইল।

আপাততঃ মুক্তকেশীর প্রসঙ্গের এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গেল। যে মূর্ত্তি প্রথম দর্শনাবধি নিরন্তর আমাকে উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গালোচনার এই স্থলেই সমাপ্তি হইল। সে যেরূপ অলক্ষিতভাবে আমার সম্মুখে উপনীত হইয়াছিল, সেইরূপ অলক্ষিতভাবেই কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরও চারি মাস অতীত হইল। ফাল্গুন মাস আসিল—সুখময় বসন্ত দেখা দিল। আমাদের জীবন-প্রবাহ নির্ব্বিঘ্নে মন্থর-গতিতে এ কয় মাস প্রবাহিত হইল। লীলা এখন সম্পূর্ণরূপ সুস্থ, সম্পূর্ণরূপ প্রফুল্ল, সম্পূর্ণরূপ ক্রীড়াময় ও সম্পূর্ণরূপ আনন্দময়। কে বলিবে যে, এই কোমল লতিকার উপর দিয়া সেই প্রবল ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে? সে সকল দুর্দ্দৈব অতীতের অনন্তসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, আমাদের ব্যবহারে ও কার্য্যে তাহার কোনই পরিচয় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন লীলাকে দেখিয়া কাহারও মনে সেই আনন্দধামের প্রফুল্লতাময়ী, উৎফুল্লাননা লীলাবতী ভিন্ন আর কিছুই উদিত হইতে পারে না। এখন মনোরমাকে দেখিয়াও সেই বুদ্ধিমতী, চতুরা, সুস্থকায়া সুন্দরী ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারে না। কে বলিবে যে, আমাদের জীবনের মধ্য দিয়া অতি ভয়ানক দেড় বৎসরপরিমিতকাল অতীত হইয়া গিয়াছে?

লীলার জীবনাগত একমাত্র বিষয়ের যাবতীয় স্মৃতি তাঁহার মানসপট হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণসরোবরের রাজবাটী পরিত্যাগ করার পর হইতে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি-পার্শ্বে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকাল পর্য্যন্ত কোন ঘটনার একবর্ণও তিনি স্মরণ করিতে অক্ষম। নানা কৌশলে আমি তৎসমায়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁহার স্মরণ-পথে পুনরুদিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বিন্দুমাত্র কৃতকার্য্য হই নাই।

ধীরে ধীরে এবং অলক্ষিতরূপে আনন্দধামের পূর্ব্বভাবসমূহ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল। লীলাকে না দেখিলে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আমার সম্মুখে লীলার কেমন লজ্জা হয় এবং বদনকমল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তিনি বদন নত করেন। আমি তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যের জন্য যদি অন্বেষণ করি, তাহা হইলে সাক্ষাৎ হইবা-মাত্র সে কাজ আমি ভুলিয়া যাই এবং কিছুই বলিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হই। তাঁহাকে দেখিলে আমার হৃদয় বিকম্পিত হয়। ক্রমে এমন হইল যে, মনোরমা সমক্ষে না থাকিলে আমরা কোন কথাই কহিতে অক্ষম হইয়া উঠিলাম। আমি সেই সামান্য দীনহীন শিক্ষক—লীলা সেই সুখসেবিতা স্বর্গ-কন্যা! এরূপ পার্থক্যস্থলে—এরূপ অসমক্ষেত্রে বিবাহের আশা করা অসঙ্গত। আমি লীলার পাণিগ্রহণার্থী, এ কল্পনাও বাতুলতা বলিয়া আমি অবসন্ন হইতাম। এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রমে কাজকর্ম্মে আমার অতিশয় শৈথিল্য ঘটিল।

এ দিকে লীলারও সতত চিন্তাকুল অবস্থা। কোথায় বা লেখাপড়া—কোথায় বা কবিতা-রচনা। সেই প্রফুল্লাননা লীলা নিয়ত উন্মনা ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন। মনোরমা আমাদের উভয়েরই এইরূপ চিন্তাকুল-ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি লীলাকে একদিন এ কথা জিজ্ঞাসিলেন।

আমরা কেহই কাহাকে কোন কথা বলিতে পারি না। উভয়ের মনই বহুবিধভাবের উত্তেজনায় কাতর; কিন্তু উভয়েই নীরব। এক দিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ভগবান্ সহসা আমাদের হৃদয়বল সংবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে পরম সুখী করিলেন।

লীলা তাঁহার প্রকোষ্ঠমধ্যে পুস্তকাদি লইয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন, সহসা আমি তথায় প্রবেশ করিলাম। এতই সাবধানে ও নিঃশব্দে আমি লীলার নিকটস্থ হইলাম যে, লীলা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত অন্যমনস্ক-ভাবে কলম লইয়া লিখিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তথাপি লীলা কিছুই জানিতে ও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রবন্ধ লিখিতেছেন—কি বিষয়ে? নির্ব্বাক্ প্রেম। কাগজের মাথায় শিরোনাম লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধের আর কিছুই লেখা হয় নাই। এক ছত্র লেখা হইয়াছিল, কিন্তু কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর আমি বলিলাম,—"লীলা! তোমার প্রবন্ধের বিষয়টি বড়ই সুন্দর।"

লীলা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। দারুণ লজ্জায় তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইল। লোচনযুগল নত হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—"তুমি এখানে

আসিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে? কৈ আমি তো কিছুই জানিতে পারি নাই।”

আমি বলিলাম,—“আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি। তা হউক,তোমার প্রবন্ধের বিষয়টি বড় ভাল। তুমি শিরোনাম লিখিয়াছ, কিন্তু আর কিছুই লিখিয়া উঠিতে পার নাই। আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানি; তোমাকে তাহা বলিয়া শুনাই। তাহা হইলে তোমার প্রবন্ধ লেখার সুবিধা হইবে।”

লীলা অধোমুখে বলিলেন,—“না। আমি প্রবন্ধ লিখিব না।”

আমি বলিলাম,—“প্রবন্ধ লেখ বা নাই লেখ, কথাগুলি শুনিয়া রাখা ভাল। একদা ঘটনাক্রমে এক অতি সামান্য দীনহীন ব্যক্তি এক সুন্দরী-শিরোমণি, সুখসৌভাগ্যশালিনী রাজকুমারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়। অভাগা দরিদ্র এরূপ দেবদুর্লভ অমূল্য সম্পত্তিলাভের জন্য লোলুপ হইলেও সে কদাপি আপন পদ, অবস্থা ও সামর্থ্যের কথা বিস্মৃত হয় নাই। সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া চন্দ্রলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কাহাকে সে কথা সে বুঝিতে দেয় নাই। যে ভূলোকললামভূতা গুণবতীর জন্য তাহার হৃদয় এতাদৃশ উন্মত্ত হইয়াছিল, তাঁহাকে লাভ করা তাহার মত হতভাগার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে, তাহা সে জানিত। সেই স্বর্গ-কন্যা তাহার ন্যায় জঘন্য জীবের প্রেমের প্রতিদান করিবেন, ইহাও সে কখন প্রত্যাশা করিত না। তথাপি সে সেই সুন্দরীকে ভালবাসিত। কিরূপ সে ভালবাসা? সে ভালবাসার জন্য সে অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত; হৃদয়ে সেই সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া, স্নেহ, ভক্তি, মায়া প্রভৃতি কুসুমরাশি দিয়া তাঁহার চরণার্চ্চনা করিয়া সে সুখী; সেই সুন্দরীর কোন সেবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সে অযাচিত-ভাবে তাহা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ। কিন্তু যে প্রেমে তাহাকে জীবন দিতেছে ও তাহার জীবন লইতেছে, যাহার সতেজ শিখায় তাহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছে, যে প্রেমের তীব্র জ্বালায় সে অধীর হইয়া রহিয়াছে, সে প্রেমের বার্ত্তা ইহ-সংসারে কাহার সমক্ষে সে কদাপি ব্যক্ত করে নাই। যিনি এই সুপবিত্র প্রণয়ের আধার, যে স্বর্গ-কন্যা এই সুদৃঢ় প্রণয়ের কেন্দ্রস্থল, তাঁহাকেও কদাপি সে প্রণয়ের কথা বুঝিতে দেয় নাই। তাহারই যথার্থ নির্ব্বাক্ প্রেম। বল সুন্দরি! তাহার প্রতি করুণ-নয়নে দৃষ্টিপাত না করা সে সুন্দরী-শিরোমণির কি উচিত কার্য্য হইয়াছে? সে ঘৃণিত হউক, সে সামান্য হউক, সে অধম হউক, কিন্তু সে যথার্থ প্রেমিক। তাহাকে উপেক্ষা করা সে সুন্দরীর উচিত ব্যবস্থা হইয়াছে?”

সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে—সেই শুভক্ষণে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম কি? দেখিলাম, লীলাবতী সুন্দরীর সেই কুসুম-সুকুমার গণ্ডস্থল বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দুসমূহ দরদরিত ধারায় ঝরিত হইতেছে। আমি সাদরে সাগ্রহে তাঁহার হস্তধারণ করিলাম। তিনি অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—“কিন্তু সেই দেবতা, সেই মহাপুরুষ—সেই আরাধ্যতম মহাত্মা বড় মিথ্যাবাদী। সেই মর্ম্মপীড়িতা দুঃখিনী বালা তাঁহার জন্য কত অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, তিনি এক-দিনও তাহার বিচার করেন নাই; সেই অভাগিনী কিরূপে ব্যাকুলভাবে কালাতিপাত করিয়াছে, তাহা একবারও মনে করেন নাই। সে দীনহীনা। তাহার তুচ্ছপ্রেমের কথা সেই স্বর্গ-দেবতাকে সে একদিনও জানাইতে সাহস করে নাই; উপেক্ষার ভয়ে সেই অভাগিনী কদাপি সেই গুণময়ের সমীপে স্বীয় প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারই যথার্থ নির্ব্বাক্ প্রেম। বল দেবতা! তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত না করা সে মহাপুরুষের কি উচিত কার্য্য হইয়াছে?”

আমি তখনই উভয়বাহু দ্বারা সেই সুখ-সেবিতা সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলাম এবং বার বার প্রীতি-পরিপূরিত পবিত্র চুম্বন-পরম্পরায় অপার্থিব সুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। তখন পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাকে চির সুখী করিবার নিমিত্ত সেই সুন্দরী-শিরোমণিকে আমি অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“এই দুঃখিনী তোমার অযোগ্যা হইলেও তোমারই দাসী। দাসীকে চরণসেবায় বঞ্চিত করিও না।”

আমি তখনই মনোরমার সমীপস্থ হইলাম এবং লীলার সহিত আমার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“ভাই দেবেন! যে দিন আনন্দধামের সরসী-সন্নিহিত সৌধ-মধ্যে তোমাকে এই প্রেম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, যে দিন অমানুষিক ধৈর্য্য ও অত্যদ্ভুত বিবেচনা সহকারে তুমি আমার নিতান্ত কঠোর উপদেশের বশবর্ত্তী হইতে স্বীকার করিয়াছিলে, সেই দিনের কথা আজি মনে পড়িতেছে। যে যে প্রতিবন্ধক তৎকালে তোমার

অতুলনীয় প্রেমের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ঈশ্বরের অপরিসীম করুণাবলে তৎসমস্তের যাবতীয় নিদর্শন অধুনা বিদূরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সোদরাধিক স্নেহাস্পদ দেবেন্দ্র! তোমার নিকট অপরিচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাজালে আমি বদ্ধ। সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারি, এরূপ সাধ্য ইহ-জগতে এ অভাগিনীর নাই। আমার জীবনের জীবন, সমস্ত সুখের কেন্দ্র, একমাত্র আনন্দবর্ত্তিকা লীলাকে তোমার রক্ষণশীল হস্তে সমর্পণ করিয়া অপার আনন্দ-সম্ভোগ করা আমার পরম সৌভাগ্য। অতএব ভাই! সত্বর এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা কর। আর কি বলিব ?"

আমি বলিলাম,—"দেবি, আমরা যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে জীবনপাত করিতেছি, তাহাতে কোনরূপ উৎসব সহকারে এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা অসম্ভব। তুমি আমাদের মঙ্গলময়ী। তুমি আশীর্ব্বাদ সহকারে আমার হস্তে পাত্রী সম্প্রদান করিলে আমি চরিতার্থ হইব। লীলার যে আর বিবাহ হইয়াছিল, তাহা আমার কদাপি মনে হয় না। আমার মনে হয়, লীলা আমারই এবং আমি লীলারই; আমাদের আজীবন এই সম্বন্ধ। বস্তুতই লীলার সে বিবাহ বিবাহ নামের নিতান্ত অযোগ্য। যদি দারুণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমাকে উত্তেজিত করিয়া না রাখিত, যদি সেই দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিদ্বয়কে দণ্ডিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প আমার মনে না থাকিত, তাহা হইলে সেই অতীত ভ্রান্তির কথা, সেই লীলার দুর্ব্বিষহ অতীত যাতনার কথা কদাচ আমাদের মানসক্ষেত্রে সমুদিত হইত না।"

মনোরমা বলিলেন,—"আজি তোমার কথা শুনিয়া, ভাই, এত দিনের সমস্ত অন্তরতাপ নিবারিত হইল। তুমি লীলার সহায়, আশ্রয় ও রক্ষক। সেই লীলা তোমারই হইবে, ইহার অপেক্ষা শুভ সংবাদ আর কি হইতে পারে? লীলা এখন সম্পত্তিহীনা, আশ্রয়হীনা, আত্মীয়হীনা। এখনও এই লীলার প্রতি তোমার অনুগ্রহের লাঘব হয় নাই,ইহা পরম সৌভাগ্য।"

আমি বলিলাম,—"দিদি, সম্পত্তিতে আমার কি প্রয়োজন? আমি লীলার সম্পত্তি দেখিয়া কদাপি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই নাই; সুতরাং আজি তাঁহার সম্পত্তি নাই বলিয়াও কাতর নহি। লীলা সমস্ত বসুধার অধীশ্বরীই হউন বা কপর্দ্দকবিহীনা ভিখারিণীই হউন, অগণ্য হিতৈষী মিত্রমণ্ডলীতে তিনি পরিবৃত থাকুন বা সংসার-সমুদ্রে একাকিনী ভাসিতে থাকুন, আমার চক্ষে তিনি চিরপ্রেমময়ী—চির-আদরিণী। তাঁহার যেরূপ দশা-বিপর্য্যয় কেন ঘটুক না, এ অধম তাঁহার চিরদিন মুগ্ধ স্তাবক ও অনুগত প্রেমিক। তবে দিদি, তবে তাঁহারা সম্পত্তি, আশ্রয় বা আত্মীয় অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি?"

মনোরমা বলিলেন,—"তোমার এতাদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগের বিষয় আমি বেশ জানি। কিন্তু লীলার এই অবস্থা কি চিরস্থায়ী হইবে? ধন-সম্পত্তি আবাসাদি সকলই থাকিতে অভাগিনী কি চিরদিনই অপরিচিতভাবেই কালাতিপাত করিবে? তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে সে কি চিরবঞ্চিত থাকিবে?"

আমি বলিলাম,—"না, কখনই না। আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া দেখ মনোরমা, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, লীলার এ অবস্থা আমি কদাপি থাকিতে দিব না। কিন্তু আইনের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন ও বহুকাল অপেক্ষা করা আবশ্যক। আমরা উভয়েই অশক্ত। আশু উদ্দেশ্যসাধনের আর কোনই উপায় দেখিতেছি না। লীলা পূর্ব্বের ন্যায় লাবণ্যময়ী ও শোভাময়ী হইয়াছেন। এখন হয় ত প্রজাগণ ও দাসদাসীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে এবং তাঁহার হস্তাক্ষর মিলাইয়া, হয় ত অপর লোকেরও তাঁহার স্বরূপত্ব স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু সেই হৃদয়হীন, স্বার্থপর রাধিকাপ্রসাদ এইরূপ প্রমাণ-সমূহ চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইবেন কি? সে সম্বন্ধে আমার কোনই আশা নাই। তিনি যদি গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলে সকল উদ্যমই বৃথা। তাঁহার প্রতীতি জন্মাইতে হইলে আরও গুরুতর প্রমাণের প্রয়োজন হইবে। লীলার কৃষ্ণসরোবরের প্রাসাদ পরিত্যাগ ও মুক্তকেশীর মৃত্যু এই দুই ঘটনার তারিখের কখনই সমতা নাই। মুক্তকেশীর মৃত্যুর তারিখ আমরা জানি, কিন্তু লীলার কৃষ্ণসরোবরত্যাগের তারিখ আমরা জানি না এবং বহু সন্ধানেও এ পর্য্যন্ত তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। আর কেহই তাহা মনে করিয়া না রাখিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপী, যে ব্যক্তি এই চক্রান্তে লিপ্ত, সে আপনার পাপের পূর্ণ-কাহিনী অবশ্যই মনে করিয়া রাখিয়াছে। আর কেহই জানুক আর নাই জানুক, চৌধুরী যে নিশ্চয় সে তারিখ মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সংশয় নাই। একবার সমুচিত সুযোগমতে আমি তাহাকে আয়ত্তগত করিব, তাহার পর অন্য বিচার।"

মনোরমার সহিত তাহার পর বিবাহ-সংক্রান্ত অনেক কথা হইল। বিবাহ কিরূপ প্রণালীতে

হইবে, ঘটা কিছু হইবে কি না, আমোদ-আহ্লাদ কিছু হইবে কি না, কি কি লাগিবে ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। একে তো আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাহাতে আমাদের অধুনা অজ্ঞাতবাস। এরূপ স্থলে কোন লোক নিমন্ত্রণ করিয়া ঘটাঘটি করা সঙ্গত ও সম্ভব নহে; তথাপি কোন অনিষ্ট-সম্ভাবনা নাই জানিয়া আমার চিরসুহৃদ্ রমেশবাবুকে এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা স্থির হইল। তিনিই আমাদের বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী দুই-ই; অন্যান্য ব্যবস্থার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

দশ দিন পরে বিধাতার অনুগ্রহে আমরা অপরিসীম সুখের অধিকারী হইলাম—আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর কাল-স্রোত আমাদের পক্ষে যেন অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে নববর্ষ সমাগত হইল এবং প্রথম মাসও অতীত হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস গতপ্রায়; আষাঢ় মাসে চৌধুরীর বাসার মেয়াদ ফুরাইবে, তাহা আমার বেশ মনে আছে। যদি পুনরায় সে মেয়াদ বাড়াইয়া নূতন করিয়া এগ্রিমেণ্ট করে, তাহা হইলে সে আমার হাতে থাকিল এবং তাহাকে যখন খুসি আমি করতলগত করিতে পারিব। কিন্তু সে যদি আর মেয়াদ না বাড়াইয়া এখনই চলিয়া যায়, তাহা হইলে তো সকল আশাই ফুরাইবে, সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইবে। যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হইয়াছে—আর এক মুহূর্ত্তও এখন নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

আমার বিবাহের পর কখন কখন আমার মনে হইয়াছে, যাহা আমার জীবনের সকল সুখের মূল এবং যে দেবদুর্ল্লভ সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত আমি লালায়িত ছিলাম, যখন তাহা বিধাতার অনুগ্রহে আমার হইয়াছে, তখন আমার সুখ ও সন্তোষের কিছু বাকী নাই। তখন কেন আমি সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির সহিত বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হই? হয় ত তাহাতে আমাদিগকে নিরতিশয় বিপন্ন হইতে হইবে এবং হয় তো আমাদের এই বহু-যত্নার্জ্জিত স্বর্গীয় সুখ বিধ্বংসিত হইবে। এত দিন পরে যেন আমার হৃদয় একটু অবসন্ন হইল। মধুময় প্রেমের মধুর স্বর আমাকে যেন কঠোর কর্ত্তব্য পন্থা হইতে বিচলিত করিল। অমৃতময়ী লীলার অপার্থিব প্রেমই এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। সেই অমৃতময়ী লীলার অপার্থিব প্রেমই অচিরে আমার মনে অন্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইল।

এক রাত্রিতে লীলা শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আমি এক পার্শ্বে বসিয়া অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহার নিদ্রিত লাবণ্যরাশি সন্দর্শন করিতেছি। বুঝিলাম, নবীনার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল। শুনিলাম, তাঁহার বদন হইতে কয়েকটি অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। কি সে শব্দ? "দিদি কোথায়? না, আমি যাইব না।" আর কি বলিতে হইবে যে, লীলা এখন কৃষ্ণসরোবর হইতে যাত্রার পরাগত ঘটনার স্বপ্ন দেখিতেছেন? সেই অশ্রু, সেই যাতনার অব্যক্ত ধ্বনি তখনই আমার শিরায়-শিরায় অগ্নি জ্বালিয়া দিল। আমি পরদিন দশগুণ বলে বলীয়ান্ হইয়া নবোৎসাহে কার্য্য-সাগরে ঝাঁপ দিলাম।

চৌধুরীর বিষয়ে আগে যতদূর সম্ভব জানা চাই। এ পর্য্যন্ত তাহার জীবন আমার পক্ষে দুর্জ্জেয় রহস্যের ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। মনোরমার উত্তেজনায় রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় যে সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং যাহা এই আখ্যায়িকার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল কোন কথা নাই। রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত নানা প্রতারণা করিয়া চৌধুরী মুক্তকেশীকে কলিকাতায় আনিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহা ধরিয়া চৌধুরীকে বিপন্ন করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। তবে কি করি? মনোরমার দিনলিপির মধ্যে এক স্থানে চৌধুরীর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া যে স্থলে তিনি তাহার ইতিহাস জানিতে উৎসুক হইয়াছেন, তথায় লিখিয়াছেন, "চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নিবাস-ভূমির সীমায় প্রবেশ করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক, জানি না, ইহার কারণ কি? কিন্তু স্বীয় জন্মভূমির লোক কোথায় কে আছে, তাহা জানিতে এবং তাহার সন্ধান লইতে তিনি সততই ব্যস্ত। তিনি যে দিন প্রথমে আসিয়া পৌছিলেন, সে দিন আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, গ্রাম-সন্নিধানে পূর্ব্ব-বঙ্গের কোন লোক বাস করে কি না? সতত নানা দূরদেশ হইতে অনেক মোহরাঙ্কিত পত্র তাহার নিকট আসিয়া থাকে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

তাঁহার জীবনের অবশ্যই কোন রহস্য আছে। সে রহস্য কি, তাহা আমার সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়।"

দেশে যায় না কেন? দেশের লোকের সন্ধান করেই বা কেন? নিশ্চয়ই সে দেশের লোকের ভয় করিয়া চলে। কিন্তু এমন কি ব্যাপার ঘটিতে পারে, যাহাতে এ হেন দুর্দ্দান্ত লোককেও দেশের লোকের ভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়? অবশ্যই কোন গুরুতর কাণ্ড আছে। কিন্তু কি সে কাণ্ড? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে সে সন্ধান বলিতে পারে?

চিত্তের এইরূপ অনিশ্চিত ও অস্থির অবস্থায় মনে করিলাম, প্রিয় বন্ধু রমেশের বাড়ী তো পূর্ব্ববঙ্গে। ভাল, তাঁহাকেই কেন একবার এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক না।

এইরূপ স্থির করিয়া মনে করিলাম, রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে চৌধুরী লোকটি কেমন ও তাঁহার রীতি-প্রকৃতি কিরূপ, তাহা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া অবধারণ করা আবশ্যক। এই বিবেচনায় আমি সেই দিন বেলা ৩টার সময় আশুতোষ দের লেনে গমন করিলাম। মনে করিলাম, কিয়ৎকাল সন্নিহিত কোন স্থানে গোপনভাবে অবস্থান করিলে অবশ্যই চৌধুরীকে দেখিতে পাইব। অবশ্যই কোন না কোন কার্য্যানুরোধে সে একবারও বাটীর বাহির হইবে। আমাকে দেখিতে পাইলেও চৌধুরী যে আমাকে চিনিতে পারিবে, এমন আশঙ্কাও আমি করি না; কারণ, এক দিন রাত্রিকালে লুক্কায়িতভাবে আমার অনুসরণ করিবার সময়ে সে আমাকে দেখিয়াছে। বাটীর পার্শ্ব দিয়া আমি বারংবার যাতায়াত করিলাম। বাহিরে আসা দূরে থাকুক, কেহ একটা জানালাও খুলিল না, অনেকক্ষণ পরে নীচের তালায় একটা জানালা খুলিয়া গেল। কোন লোককেই দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু লোকের আওয়াজ পাওয়া গেল। সে স্বর মনোরমার দিনলিপি পাঠ করিয়া আমার পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। শুনিতে পাইলাম, সেই মৃদুগম্ভীর চাপা আওয়াজে শব্দ হইতেছে, "এস এস আমার সব সোনার যাদু! এস, আমার আঙ্গুলের উপর বইস সোনামণি! বাহবা! তুই বড় দুষ্ট। তুই কথা শুনিস্ না কেন বেটা? যাও সব, এক—দুই—তিন বাহবা!" বুঝিলাম, এই সেই চৌধুরী ইঁদুর লইয়া খেলা করিতেছে। পূর্ব্বে কৃষ্ণসরোবরে যেমন, এখন এখানেও তেমনই। আবার সকলই নিস্তব্ধ। বহুক্ষণ পরে বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল এবং চৌধুরী বাহিরে আসিল। সে ধীরে ধীরে রাস্তায় পড়িয়া উত্তরমুখে চলিল এবং ক্রমে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে পড়িল। আমিও ধীরে ধীরে একটু তফাতে থাকিয়া তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম।

লোকটার স্থূলতা ও আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মনোরমার লিখিত যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তাহা ঠিক মিলিল। কিন্তু লোকটার এই ষাটি বৎসর বয়সে এরূপ আশ্চর্য্য সজীবতা, প্রফুল্লতা এবং চত্বারিংশৎ বর্ষাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। অপূর্ব্ব কোমলতার সহিত বদনমণ্ডলে অতি মধুর মৃদুহাস্য মাখাইয়া, চতুর্দ্দিকে সস্নেহ ও সানুরাগ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে করিতে এবং হস্তের প্রকাণ্ড অথচ সুদৃশ্য যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে অতি সহজভাবে চলিতে লাগিল। যদি কোন অপরিচিত লোককে কেহ বলিত, এই ব্যক্তি কলিকাতার মালিক, তাহা হইলে সে কথা শুনিয়া সে লোক কদাচ অবিশ্বাস করিতে পারিত না। সে একবারও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল না। সম্ভবতঃ সে আমাকে দেখিতে পাইল না। এইরূপে চলিতে চলিতে সে ক্রমে হেদোর ধারে পৌঁছিল। তথা হইতে বিডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক দোকান হইতে একখানি পাঁউরুটি ক্রয় করিল। নিকটে আস্তাবলে একটা বানর বাঁধা ছিল, তাহার নিকটস্থ হইয়া সস্নেহে বলিল,—"আহা বেটা! তোমাকে সারাদিন বাঁধিয়া রাখে—কিছু খাইতে দেয় না। তোমার বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে? নেও বেটা, এই রুটীখানি দিতেছি, খাও তুমি।"

সে বানরকে রুটী খাওয়াইয়া আস্তাবলের বাহিরে আসিবামাত্র একটি ভিক্ষুক তিন দিন খাওয়া হয় নাই বলিয়া তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। সে হস্তস্থিত যষ্টি দেখাইয়া আরক্ত-নয়নে দৃষ্টিপাত করিল। ভিক্ষুক অগত্যা সরিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমে আমরা বেঙ্গল থিয়েটার পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। রঙ্গভূমির দ্বারদেশে প্রকাণ্ড এক বিজ্ঞাপন ঝুলান রহিয়াছে। চৌধুরী অনেকক্ষণ তাহা দেখিল এবং সহাস্য-মুখে টিকিট-ঘরের নিকটে আসিয়া একখানি টিকেট ক্রয় করিল। থিয়েটারের অধ্যক্ষের ও অন্যান্য কোন কোন লোকের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। আমি সংবাদপত্র-সংসৃষ্ট লোক বলিয়া তাঁহারা আমাকে জানিতেন। আমি তাঁহাদের নিকট দুইখানি টিকিটের প্রার্থনা

করিলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অনুগ্রহ সহকারে আমাকে দুইখানি টিকিট প্রদান করিলেন। আমি স্থির করিলাম, রমেশবাবু ও আমি আজি রাত্রিতে অভিনয় দেখিতে আসিব। চৌধুরীকে রমেশ চেনেন কি না, তাহা সেই সুযোগে জানিতে পারা যাইবে।

আমি ফিরিবার সময় রমেশের বাসা দিয়া আসিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহাকে থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়া আসিলাম। আমি নিজ আবাস হইতে যথাসময়ে আহারাদি করিয়া পুনরায় রমেশ বাবুর বাসায় চলিলাম। দেখিলাম, তিনি অগ্রেই প্রস্তুত হইয়া, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বলিলাম,—"চল ভাই।"

তিনি বলিলেন,—'তা আর বলিতে!'

আমরা দুই জনে লোকতঃ অভিনয় দর্শনার্থ, ধর্ম্মতঃ চৌধুরী-দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমরা যখন থিয়েটারে আসিলাম, তখন কনসার্ট বাজনা প্রায় হইয়াছে; অভিনয় আরম্ভ হয় হয় হইয়াছে। সকল লোকই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমাদিগকে গিয়া ষ্টলে এক পাশে দাঁড়াইতে হইল। আমরা যে জন্য আসিয়াছি, এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার কোন হানি নাই। চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চৌধুরীর সন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার বিরাট দেহ ফুলাইয়া ড্রেসসারকেলে বসিয়া আছেন। শ্রোতৃ-বৃন্দের যে কেহ তাঁহাকে দৈবাৎ দেখিতেছে, সেই মধ্যে মধ্যে নয়ন ফিরাইয়া সেই সুকান্তি, সুগঠিত-অবয়ব, সুপরিচ্ছদধারী, স্থূলাঙ্গ পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। আমি সরিয়া সরিয়া ক্রমে এমন স্থলে দাঁড়াইলাম যে, তাঁহাকে দেখিতে রমেশের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। কি জন্য আগ্রহ করিয়া রমেশকে থিয়েটারে আনিয়াছি, তাহা কিন্তু তাঁহাকে এখনও বলি নাই।

অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম দৃশ্য হইয়া গেল। চৌধুরী নিবিষ্ট-চিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিল, একবারও কোন দিকে ফিরিয়া চাহিল না। স্বস্থানে বসিয়া মৃদু-মৃদু হাস্য সহকারে মধ্যে মধ্যে আপনার বিরাট মস্তক নাড়িতে নাড়িতে চৌধুরী একমনে যেন থিয়েটার গিলিতে লাগিল। ক্রমশঃ দৃশ্যের পর দৃশ্য অতীত হইয়া প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত হইল। দর্শকেরা চারিদিকে গোলমাল করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। চৌধুরীকে রমেশ জানেন কি না, তাহা অবধারণ করিবার এই সুযোগ। আমি এতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রমেশ! দেখ দেখি, তুমি ঐ লোকটাকে চেন কি?"

আমি চৌধুরীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। চৌধুরী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। থিয়েটারের কনসার্ট বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। বলিলাম,—"ঐ যে মোটা লম্বা লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে পাইতেছ না?"

রমেশ বলিলেন,—"দেখিতেছি বটে, কিন্তু উঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই। কেন বল দেখি? লোকটা কি খুব বিখ্যাত বড়লোক? উঁহাকে কেন দেখাইতেছ?"

আমি বলিলাম,—"উঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানা আমার অতিশয় দরকার। তোমাদের দেশেই উঁহার বাড়ী। উঁহার নাম জগদীশনাথ চৌধুরী। এ নামটা কখন শুন নাই কি?"

"না ভাই, লোকটাকেও কখন দেখি নাই; নামটাও কখন শুনি নাই।"

আমি বলিলাম,—"ভাল করিয়া দেখ ভাই। কেন এ জন্য আমি এত ব্যগ্র হইয়াছি, তাহা তোমাকে পরে বলিব। তুমি বুঝি লোকটার সম্মুখদিক ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছ না। এই দিকে এস। এখান হইতে ভাল করিয়া দেখ দেখি।"

আমি তাঁহাকে সরাইয়া একটু পাশ-পানে লইয়া আসিলাম। সেখানে তখন রমেশ ও আমি ছাড়া আর কোন লোক নাই। কেবল আমাদের নিকটেই আর একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আমাদের ব্যবহার দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার আকার বড় কৃশ, খুব গৌরবর্ণ, বাম-গালে একটা কাটা দাগ। সম্ভবতঃ আমার কথাবার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে এবং সেই জন্য হয় ত তাঁহারও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, রমেশ খুব মনোযোগ সহকারে চৌধুরীর সেই হাস্যময় বদন কিয়ৎকাল দর্শন করিয়া বলিলেন,—"না ভাই, আমি ঐ মোটা লোকটাকে কখন দেখি নাই।"

এই সময়ে চৌধুরী একবার নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রমেশের

দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিল। আমি তখন নিঃসন্দেহে,বুঝিতে পারিলাম, রমেশ চৌধুরীকে না চিনিলেও চৌধুরী রমেশকে বিলক্ষণ চেনেন। শুধুই চেনেন না—বিলক্ষণ ভয় করেন। রমেশকে দেখার পর সেই নরাধমের মুখের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা দেখিয়া কখনই ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। রং যেন শাক হইয়া গেল ; মুখের সে সহাস্য ভাব যেন কোথায় উড়িয়া গেল ; সেই চঞ্চল আমোদময় লোক যেন পাষাণ-মূর্ত্তি হইয়া গেল। ফলতঃ রমেশকে দেখিয়া নিরতিশয় ভয়ে চৌধুরীর অন্তরাত্মা যে অভিভূত হইয়াছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

সেই গণ্ডদেশে চিহ্নযুক্ত কৃশকায় ব্যক্তিও আমাদের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশকে দেখিয়া চৌধুরীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার মনেও যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, স্পষ্টই বোধ হইল, তাঁহারও সেইরূপ ধারণা হইয়াছে। লোকটি কিন্তু বড়ই ভদ্র-প্রকৃতি। তিনি আমাদের কাণ্ড সমস্তই দর্শন করিতেছিলেন সত্য ; কিন্তু ঐ ব্যাপারে আমাদের সহিত যোগ দিবার জন্য কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। চৌধুরীর এবংবিধ অবস্থান্তর এবং ঘটনার এতাদৃশ অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দর্শনে আমি এতই বিচলিত হইয়াছিলাম যে, কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। এমন সময়ে রমেশ বলিলেন,—"ওঃ! এ মোটা লোকটা কিরূপ ভাবে দেখিতেছে দেখ! আমাকেই দেখিতেছে কি? আমি কি খুব বড়লোক না কি? আমি ইহাকে চিনি না; লোকটা আমাকে চিনিল কিরূপে?"

আমি চৌধুরীর দিকে নজর রাখিলাম। চৌধুরীও ক্রমাগত রমেশের দিকে চাহিয়া থাকিল। রমেশ অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিলেন। যেই দেখিল, রমেশ অন্য দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই চৌধুরী সরিতে আরম্ভ করিল এবং অল্প-কালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি রমেশের হাত ধরিয়া জোর করিয়া দরজার দিকে টানিয়া আনিতে লাগিলাম। রমেশ আমার রকম দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, সেই কৃশকায় ব্যক্তিও আমাদের আগেই ভিড় ঠেলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহির হইতে তখন দলে দলে লোক ভিতরে ফিরিয়া আসিতেছে, তজ্জন্য আমাদের শীঘ্র যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিল। আমরা যখন বাহিরে আসিলাম, তখন আমি রমেশ বাবুকে বলিলাম,—"চল ভাই, বাসায় ফিরিয়া চল। আর থিয়েটার দেখিয়া কাজ নাই। তোমার সঙ্গে আমার ভয়ানক দরকারী কথা আছে।"

রমেশ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ব্যাপার কি?"

আমি কথার দ্বারা কোন উত্তর না দিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলাম। রমেশকে চৌধুরী চিনিতে পারিয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরিত হইবার অভিপ্রায়ে পলাতক হইয়াছে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি সে এই ভয়ে এখন এককালে কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তো সর্ব্বনাশ! অতএব আর এক [illegible]ও নষ্ট করা অবিধেয়। আরও আমার মনে হইল, সেই কৃশকায় ব্যক্তিও অবশ্যই কোন অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চৌধুরীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। কি জানি, সেই বা কি বিঘ্ন ঘটায়। এই দুই প্রকার সন্দেহে আমি এক প্রকার চলচ্চিত্ত হইলাম এবং যেই আমি রমেশের গৃহমধ্যস্থ হইলাম, সেই তাঁহাকে আমার মনোগত সমস্ত অভিপ্রায় না জানাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার সমস্ত কথা শুনিয়া রমেশ বলিলেন,—"তা ভাই, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সাহায্য করিতে পারি? যখন লোকটাকে আমি মোটেই চিনি না, তখন উহাকে জব্দ করার আমি কি উপায় করিতে পারি?"

আমি বলিলাম,—"তুমি চেন বা নাই চেন, ও ব্যক্তি নিশ্চয়ই তোমাকে চেনে এবং তোমারই ভয়ে সে থিয়েটার হইতে পলাইয়াছে। তবেই দেখ রমেশ, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। তুমি তোমার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত সমস্ত স্মরণ করিয়া দেখ। তোমার স্বদেশাতিবাহিত জীবনের প্রত্যেক ঘটনা একবার মনে করিয়া দেখ। কোন লোক তোমার ভয়ে চিরদিন ভীত থাকিতে পারে, এমন কোন ঘটনা মনে পড়ে কি না, একবার ভাবিয়া দেখ।"

সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার কথা শুনিয়া রমেশের অতিশয় ভাবান্তর হইল। তাঁহাকে দেখিয়া চৌধুরীর যেরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল, আমার কথা শুনিয়া তাঁহারও সেইরূপ ভাবান্তর হইল। তাঁহার মুখ-চোখ শাদা হইয়া গেল এবং তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"অতি ভয়ানক কথা! অতি ভয়ানক! কিন্তু ঐ ব্যক্তিই কি সেই ব্যক্তি? অসম্ভব। তবে কি?"

আমি তাঁহাকে ব্যাকুলচিত্ত দেখিয়া বলিলাম,—

"ভাই, আমার কথায় যদি তোমার কোন মনস্তাপের কারণ উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া তোমার নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভাই, ঐ চৌধুরীর দুর্ব্যবহারে আমার স্ত্রীকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছে। যদি ও ব্যক্তিকে কোনরূপে আয়ত্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আমার স্ত্রীর সেই কষ্ট নিবারিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমি আমার সেই দুঃখিতা পত্নীর জন্য তোমাকে এরূপ ক্লিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি তোমার নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

এই কথার পর বিদায়প্রার্থী হইয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। রমেশ আমার হাত ধরিয়া আমাকে বসাইয়া বলিলেন,—"তোমার কথায় আমার আপাদমস্তক কম্পিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে তোমার কোনই দোষ নাই। আমার অতীত জীবনে এক ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং সেই জন্য আমি অদ্যাপি স্বদেশে যাই নাই। তোমার কথায় আজি আমার সেই অতীত ঘটনা আমূল স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। তাহাতেই আমি বিচলিত হইয়াছি। তুমি সে জন্য কিছু মনে করিও না ভাই।"

আমি বলিলাম,—"সেই অতীত ঘটনার সহিত ঐ ব্যক্তির কোন প্রকার সংস্রব ছিল কি? ও কেন তোমাকে দেখিয়া এরূপ ভীত হইল?"

রমেশ বলিলেন, "সেই অতীত ঘটনার সহিত একাধিক ব্যক্তির সংস্রব ছিল। দুই ব্যক্তির গুরুতর সংস্রব ছিল। আমি সেই দুই ব্যক্তির এক জন। অপর ব্যক্তি কোথায় আছে, ইহসংসারে আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে ব্যক্তির আকৃতি আমি ইহজীবনে কদাচ ভুলিব না, মরণান্তেও ভুলিতে পারি কি না সন্দেহ। আমাকে দেখিলে সে ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, সাক্ষাৎ যমদূত বোধে অতিশয় ভীত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি থিয়েটারে যে ব্যক্তিকে দেখাইলে, তাহার সহিত আমার কথিত ব্যক্তির কোনও সাদৃশ্য নাই। ও কখনই সে ব্যক্তি নহে।"

আমি বলিলাম,—"ভাবিয়া দেখ রমেশ, কাল সহকারে মনুষ্যের কতই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যে কৃশ থাকে, সে স্থূল হইতে পারে। যাহার দাড়ি-গোঁফ ছিল, সে হয় ত তাহা কামাইতে পারে। মাথায় ছোট ছোট চুলের স্থলে বড় বড় চুল হইতে পারে। পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে।"

রমেশ বলিলেন,—"অসম্ভব নহে সত্য। যদিও এ স্থলে তাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। কারণ, ও ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির কথা মনেও পড়িতেছে না।"

আমি বলিলাম,—"ভাই! যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে সেই অতীত বৃত্তান্ত জানিতে দিলে আমি একবার সমস্ত ব্যাপার স্বয়ং বুঝিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিতাম।"

রমেশ বলিলেন,—"আপত্তি—তোমার নিকট সে বিষয় বলিবার কোন আপত্তি নাই। তোমাকে সে কথা কখন বলি নাই, ইহা আমার বড় অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু সে কথা বড়ই দুঃখজনক; তাহা আমার হৃদয়কে চিরকালের জন্য ক্ষত-বিক্ষত করিয়া রাখিয়াছে। বিহিত যত্নে তাহা ভুলিতে চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু এতকাল নিরন্তর চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তথাপি তাহার একবর্ণও ভুলিতে পারি নাই। নিতান্ত কষ্টজনক হইলেও তোমাকে তাহা আজি বলিব। আমার জীবন কিরূপ কষ্টময়—কিরূপ যন্ত্রণা আমি সতত ভোগ করি, তাহা শুনিয়া তোমার কোন উপকার হইবে, এরূপ আমার মনে হয় না। তথাপি আমি তোমাকে সকল কথাই জানাইব।"

এই বলিয়া রমেশ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সহসা গৃহের দ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া আমার নিকটস্থ হইলেন এবং পুনরায় আসন-গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভাই দেবেন্দ্র, তোমাকে সহোদরাধিক ভালবাসিয়া থাকি, এ কথা আজ নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে যে ঋণে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কোন কালে তাহা পরিশোধ করা আমার সাধ্য নহে। তোমার ন্যায় বন্ধুর নিকট আমার এ বিজাতীয় মনস্তাপের বিবরণ এতদিন প্রচ্ছন্ন রাখা আমার পক্ষে বিহিত কার্য্য হয় নাই। এখনই আমি সেই অকৃতজ্ঞতার সংশোধন করিতেছি। কিন্তু ভাই, আমার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকেও আমার ন্যায় কাতর হইতে হইবে এবং তোমার প্রেমময় হৃদয় আমার দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, আমি সমস্ত কথাই তোমাকে বলিতেছি। ভাই, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় আমার এক রূপগুণবতী কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতাও ছিলেন। আমার সেই ভগ্নী

এবং আমি ভিন্ন তাঁহাদের কোন সন্তান ছিল না। আমাদের সংসার বড় সচ্ছল ছিল না—আমরা দরিদ্র ছিলাম। তথাপি বড় সুখী ছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং দারুণ দুঃখেও আমরা সুখী ছিলাম।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার ভগ্নীর বয়স প্রায় ২০ বৎসর। একটি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। আমার ভগ্নীর রূপ অতুলনীয় ছিল। লোকে দৈবাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার গুণও অলোকসামান্য ছিল। তাঁহার রূপ ও গুণের বিষয় আমাদের প্রদেশে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়াছিল। আহা! তাঁহার সেই পরম সুন্দর বদনে পরম সুন্দর হাসি, সেই অতি মধুর কথাবার্ত্তা, সেই অতি মনোহর শাব-ভঙ্গী মনে হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। হা বিধাতঃ! তুমি কি করিলে! আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেলে!”

রমেশের চক্ষু জলভারাকুল হইল। তিনি কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—“সেই সুশীলা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমাদের সকলেরই পরম স্নেহের সামগ্রী ছিলেন। তাঁহার অপার্থিব গুণরাশি ও অতুলনীয় রূপরাশি উভয়ই তাঁহাকে আমাদের সকলের নয়ন-পুত্তলী করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের ভবন-সন্নিধানে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। সেই রঘুনাথের সহিত আমার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। রঘুনাথ কলিকাতায় থাকিত; ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং বেশ খোস-পোষাকী বাবু ছিল। সে কখন কখন বাটী আসিত এবং বাটী আসিয়া আমাদের বাটীতে বড় বেশী সময় অতিবাহিত করিত। আমার সহিত অত্যধিক আত্মীয়তা তাহার এরূপ ব্যবহারের কারণ মনে করিয়া আমরা কোনই সন্দেহ করিতাম না। আমি বাটী না থাকিলেও রঘুনাথ আমাদের বাটীতে থাকিত। আমার জননীর সহিত সে কখনও কলিকাতার কথা কহিত, আমার জনকের সহিত কখন সে ধর্ম্মকথা কহিত, আমার ভগ্নীর সহিত কখন সে নানাদেশের কথা কহিত। কখন কখন সে আমাদের বাটীতে আহারও করিত। আমার ভগ্নীর প্রতি তাহার অতিশয় যত্ন দেখা যাইত। সে প্রতিনিয়ত অতি সুন্দর সুন্দর নানাপ্রকার সামগ্রী আমার ভগ্নীকে প্রদান করিত। সে সকল সামগ্রী আমাদের দেশে সচরাচর পাওয়া যাইত না। কিন্তু এই প্রকার যত্ন ও স্নেহ ভিন্ন অন্য কোন কুলক্ষণের পরিচয় আমরা কদাপি জানিতে পারি নাই। ক্রমে সেই দুরাত্মার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। আমার ভগ্নীপতির মুখে একদিন শুনিলাম যে, দুরাত্মা রঘুনাথ আমার ভগ্নীর নিকট প্রেমের প্রস্তাব করিয়াছে। তাঁহাকে অশেষবিধ প্রলোভন দেখাইয়া কুলটা হইবার পরামর্শ দিয়াছে এবং তাহার নিকট ধর্ম্ম বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছে। আমার বন্ধু হইয়া আমার এইরূপ সর্ব্বনাশের চেষ্টা! এই কথা শুনিবামাত্র আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল এবং সে পুনরায় আমাদের গৃহাগত হইলে বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে আমার বাসনা হইল। কিন্তু আমার ভগ্নীপতির পরামর্শক্রমে ক্রোধ সংবরণ করিয়া তাহাকে এক পত্র দ্বারা জানাইলাম যে, সে যেন আর কদাপি আমাদের বাটীতে না আইসে। তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তা অদ্য হইতে শেষ হইয়া গেল। হতভাগ্য এ পত্রের কোন উত্তর দিল না। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিলাম, সে হয় ত আপনার কদর্য্য ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহার লজ্জা, কোথায় বা তাহার ঘৃণা। সে যে মনে মনে আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করিতেছিল, তাহা আমরা কিছুই ভাবি নাই।

একদিন দ্বিপ্রহরকালে আমার ভগ্নী প্রয়োজনানুরোধে আমাদের গ্রাম্য সরোবরে গমন করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী আমাদের বাসবাটী হইতে প্রায় আধ পোয়া পথ দূরে অবস্থিত। আমরা দরিদ্র, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসী। পুরস্ত্রীর এরূপভাবে যাতায়াত আমাদের দেশের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের বাটী হইতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত লোকালয় ছিল না; কেবল মাঝামাঝি এক স্থানে এক শিবের ঘর ছিল। আমার ভগ্নী যখন পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন এক প্রকাণ্ড ষাঁড় রাগত হইয়া তাঁহাকে তাড়া করে। তিনি প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি সেই দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি দেবালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র নরাধম রঘুনাথও তথায় প্রবেশ করে এবং বলপূর্ব্বক আমার নিষ্পাপহৃদয়া সহোদরার অনপনেয় সর্ব্বনাশসাধন করে।

এ দিকে আমার ভগ্নীর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল

এবং আমি তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইলাম। কিয়দ্দূরমাত্র যাইতে না যাইতে অতি অস্ফুট রোদনধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল এবং আমি সভয়ে দ্রুতবেগে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম। দেবালয়ের নিকটস্থ হইয়াই আমি জানিতে পারিলাম যে, সেই স্থান হইতেই রোদন-ধ্বনি বিনির্গত হইতেছে এবং কণ্ঠস্বর আমার সহোদরা ভগ্নীর ভিন্ন আর কাহারও নহে। আমি মৃতকল্প হইয়া ছুটিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, দেবালয়ের দ্বার হইতে এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে বাহিরে আসিল। সেই ব্যক্তি রঘুনাথ। সে আমাকে দর্শনমাত্র বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"যাও, যাও রমেশ, যাহার মুখ দেখিতে চাহ নাই, সে আজি মনের বাসনা মিটাইয়াছে। দেখ গিয়া, ঐ মন্দিরমধ্যে তোমার ধর্ম্ম-ধ্বস্তা ভগ্নী সে সতীত্ব-ধন হারাইয়া অধোবদনে পড়িয়া কাঁদিতেছে! আজি আমার মনের কালী দূর হইয়াছে। যাও, তুমি এখন তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া যাও।"

সে পশুপ্রকৃতি নরাধম যখন এই কথা বলিল, তখন আমার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া গেল এবং আমি যেন বিশ্বসংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। অচিরে বিজাতীয় ক্রোধ আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল এবং আমি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অস্থিরভাবে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম। আমার হস্তে কোন অস্ত্র নাই। সে আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত উভয় হস্তে আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি তখন নিরুপায় হইয়া তাহার দক্ষিণ-হস্তের এক স্থানে বিষম দংশন করিয়া ধরিলাম। তাহার রুধিরে আমার বক্ষঃস্থল ও বস্ত্র ভাসিয়া গেল, তাহা আমার বেশ মনে আছে। সেও আমার পৃষ্ঠদেশ কামড়াইয়া ধরিল। কিন্তু আমার দংশনে তাহার যেরূপ প্রকাণ্ড এক খণ্ড মাংস উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার দংশনে আমার সেরূপ কিছুই হয় নাই। তথাপি দেবেন্দ্র, আমার দেহে অদ্যাপি সেই ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান আছে।"

এই বলিয়া রমেশ গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং আমাকে পৃষ্ঠদেশের সেই চিহ্ন দেখাইলেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তোমার আঘাত গুরুতর না হইলেও যখন এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার বাহুতে বিশেষ চিহ্ন আছে।"

তিনি বলিলেন,—"তাহার কোনই ভুল নাই।"

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম—"তাহার পর কি হইল?"

"তাহার পর সে আমাকে ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। তখন আরও ২।১ জন লোক সেই স্থানে জমিয়া গেল। তখন আমি অজ্ঞান। ক্রমে খুব গোল হইল। আমার বৃদ্ধ জনক-জননী, আমার ভগ্নীপতি এবং গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল লোক ও থানা-পুলিশ সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমার ভগ্নী সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। তাহার পর কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার পূর্ব্বে, কেহ সাবধান হইবার পূর্ব্বে, তত্রত্য এক খণ্ড ইষ্টক লইয়া তিনি অতিশয় শক্তিসহকারে আপনার মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তখনই রুধিরস্রোতে তাঁহার দেহ ভাসিয়া গেল এবং অনতিকালমধ্যে ধীরে ধীরে সেই অপাপবিদ্ধা সুরসুন্দরীর পবিত্র কলেবর হইতে প্রাণবায়ু প্রস্থান করিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমেশ পুনরায় কিয়ৎকাল উভয় হস্তে স্বীয় বদনাবৃত করিয়া থাকিলেন। তদনন্তর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অচিরে আমার জনকজননী দারুণ লজ্জা ও অত্যন্ত মনস্তাপজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু স্বর্গধামে গমন করিলেন। আমার ভগ্নীপতি মহাশয় আমার সেই শিশু ভাগিনেয়টিকে লইয়া কোথায় গেলেন, তাহা আমি জানি না। তাঁহারা এখন আছেন কি না, বলিতে পারি না। নরাধম রঘুনাথের দুর্ব্বৃত্ততায় আমাদের সোনার সংসার ছাই হইয়া গেল। সেই অবধি আমি দেশত্যাগী। লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় আমি আর তাহার পর পূর্ব্বপরিচিত লোকের সমক্ষে মুখ দেখাই না। আমার সে বাসভবনও বোধ করি এতদিনে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহার পর সে নরাধম রঘুনাথের কি হইল?"

"রঘুনাথের যে কি হইল, তাহা আর কেহই বলিতে পারে না। তাহার সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য আমি যে তাহার কতই সন্ধান করিয়াছি, তাহা আর কি বলিব। অনাহারে অনিদ্রায় আমি নিরন্তর তাহার সন্ধানে ফিরিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি কখন শুনিয়াছি, সে লাহোরে, কখন শুনিয়াছি, সে কাশ্মীরে, কখন শুনিয়াছি, সে মান্দ্রাজে আছে। আমি সকল স্থানেই গিয়াছি; কিন্তু কোথাও তাহাকে ধরিতে পারি নাই; তাহার নামে গবর্ণমেণ্ট হুলিয়া করিয়াছেন; সেই হুলিয়া বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতবর্ষের সকল থানায় প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে তাহার আকৃতির

বিশেষ বর্ণনা আছে। অধিকন্তু তাহার দক্ষিণ-হস্তে আমার দংশন-জনিত ক্ষত-চিহ্নেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সকল আশাই বৃথা হইল। ইহজীবনে তাহাকে ধরিবার ও তাহাকে দণ্ডিত করিবার সম্ভাবনা আর নাই।”

এই বলিয়া রমেশ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত হইলেন। আমি বলিলাম, -“বস্তুতই রমেশ, তোমার কথা শুনিয়া আজি আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলাম। তোমার জীবনের উপর দিয়া এরূপ অতি ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে এবং তাহা তোমাকে মথিত ও অবসন্ন করিয়া দিয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যখন এই লোমহর্ষণ শোকজনক বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিলাম, তখন তোমার সহিত সৌহার্দ্দের অনুরোধে সেই দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে আমিও বাধ্য। কিন্তু সকল কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া দেখ। আজি যে চৌধুরীকে নাট্যালয়ে তোমাকে দেখাইলাম, সে ব্যক্তি পূর্ব্বের রঘুনাথ নহে কি?”

রমেশ বলিলেন, -“না না, সে কখনই নহে। রঘুনাথ কৃশকায়, রঘুনাথ শ্যামবর্ণ, রঘুনাথের দাড়ি-গোঁপ ছিল। ও ব্যক্তি ভয়ানক স্থূলকায়, গৌরবর্ণ, দাড়ি-গোঁপ-বিহীন। এতদিনে রঘুনাথের মাথায় অবশ্যই পাকা চুল দেখা দিত, কিন্তু এ ব্যক্তির সকল চুল কাঁচা।”

আমি বলিলাম,—“কিন্তু ভাই, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। তৎকালে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর বয়স ছিল কত, তাহা তুমি জান কি?”

“অনুমান ৩০ বা ৩৫ হইবে।”

“বর্ত্তমান জগদীশনাথ চৌধুরীর বয়স প্রায় ৬০। এ বিষয়ে কোন অনৈক্য দেখা যাইতেছে না। আর মনে করিয়া দেখ, ইহসংসারে তোমাকে দেখিয়া ভীত হইতে পারে, এমন লোক কেহ আছে কি?”

রমেশ বলিলেন,—“না ভাই, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ছাড়া আমার ভয়ে ভীত হইতে পারে, এমন লোক সংসারে থাকা অসম্ভব। আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই; অপর কেহও আমার কোন অনিষ্ট করে নাই। সংসারে আমার মিত্র অনেক আছে, কিন্তু শত্রু কেহই নাই।”

আমি বলিলাম,—“একবার সব বিষয়টা বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। তোমাকে দেখিয়া ভয় পায় বা তোমার নিকট হইতে পলায়ন করে, এমন ব্যক্তি ইহসংসারে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ব্যতীত আর কেহই নাই। যে ব্যক্তিকে থিয়েটারে দেখাইয়াছি, সে যে তোমাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিল এবং তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে অসময়ে থিয়েটার ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তুমি তাহাকে চিনিতে পার নাই; কিন্তু সে যে তোমাকে চিনিয়াছে তাহারও কোন ভুল নাই। আর আমি ইহা উত্তমরূপ জ্ঞাত আছি যে, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের লোকের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক এবং যেখানে যখন থাকে, সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের লোক থাকে কি না, অগ্রে তাহার সন্ধান করে। ফলতঃ ভাই, আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সেই পাপী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এখন দুর্ব্বৃত্ত জগদীশনাথ চৌধুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার বর্ত্তমান কার্য্য সমস্ত প্রণিধান করিলেও উহাকে দুষ্কর্ম্মে চিরাভ্যস্ত পাপী বলিয়াই বোধ হয়। এই সকল কারণে ঐ ব্যক্তিই যে সেই রঘুনাথ, তৎপক্ষে আমার আর কোনই সন্দেহ নাই। তাহার পূর্ব্বচিহ্ন সমস্তই কালসহকারে এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃশতার পরিবর্ত্তে তাহার এখন স্থূলতা হইয়াছে; শ্যামবর্ণের পরিবর্ত্তে গৌরবর্ণ হইয়াছে; শ্মশ্রু ও গুম্ফ তিরোহিত হইয়াছে এবং নামও বিভিন্ন হইয়াছে। তথাপি যে এই ব্যক্তিই সেই দুরাত্মা, তাহার কোনই ভুল নাই। এখনই কোন উপায়ে তাহার হাতের জামা তুলিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই তাহার বাহুতে তোমার দংশনচিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তুমি যাহাই বল, ও যে সেই ব্যক্তি, তাহাতে অণুমাত্র সংশয়ের কারণ দেখিতেছি না। তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই, আর ও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, ইহাও কিছু অসম্ভব কাণ্ড নহে। ও ব্যক্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু তোমার বিশেষ কোন দৈহিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং তোমাকে ও সহজেই চিনিয়াছে অথচ তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই। বিশেষতঃ পাপী ব্যক্তি নিয়তই সশঙ্ক থাকে এবং স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম ব্যক্ত হইল ভাবিয়া সততই কাতর হয়। সেরূপ ব্যক্তি যাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার বিপন্ন হওয়া সম্ভাবিত, তাহাদিগকে যেরূপে মনে করিয়া রাখে, তাহাদের চিত্র হৃদয়পটে যেরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখে, অপরে কখনই সেরূপ পারে না। আমার মনে আর কোনই সন্দেহ নাই ভাই। পঁচিশ বৎসরের পর দুরাত্মা রঘুনাথের আজি সন্ধান

হইয়াছে। আজি একসঙ্গে তোমার মর্ম্মজ্বালা ও আমার মর্ম্মজ্বালা নিবারণের সুযোগ হইয়াছে। আর কালবিলম্বেও প্রয়োজন নাই। আমি সেই নরাধমের সর্ব্বনাশের পথ আজি রাত্রিতেই উন্মুক্ত করিয়া

এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। রমেশ বলিলেন, "তোমার সমস্ত যুক্তি শুনিয়া আমার মনেও ধারণা হইতেছে, ঐ জগদীশনাথ চৌধুরীই সেই চক্রবর্ত্তী হওয়া সম্ভব। কিন্তু আকৃতির বড়ই পরিবর্ত্তন। যাহাই হউক, তুমি কি প্রণালীতে আপাততঃ কার্য্য করিবে স্থির করিতেছ?"

আমি বলিলাম,—"তাহা এখনও আমি স্থির করিতে পারি নাই। সময় এক তিলও নষ্ট করা হইবে না। যাহা করিতে হয়, আজি রাত্রিতেই করিব। তোমাকে পরে সকল সংবাদ দিব। এখন আমি আসি।"

এই বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে আমি রমেশের বাসা হইতে প্রস্থান করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাসায় আসিতে আসিতে আমার মনে আরও স্থির-বিশ্বাস জন্মিল যে, জগদীশনাথ চৌধুরী নিশ্চয়ই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর। সেই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এতকাল পরে রমেশচন্দ্র রায়কে দেখিতে পাইয়াছে এবং নিশ্চয়ই নিদারুণ ভয়ে সে অবসন্ন হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, তাহার যমদূত এতকাল পরে দেখা দিয়াছে এবং অচিরে পলায়ন করিতে না পারিলে তাহার আর ভদ্রস্থতা নাই; সুতরাং যদি নিতান্তই আজি রাত্রিতে পারিয়া না উঠে, তাহা হইলে কল্য প্রত্যূষে যে পলায়ন করিবে। তাহার বাটীর মেয়াদও ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তখন আমার মনে হইল, কালি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে হয় ত সকলই হাত-ছাড়া হইয়া যাইবে, হয় তো সে কোথায় পলাইয়া যাইবে, তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিব না, অতএব মরি বা বাঁচি, আজি রাত্রিতেই তাহাকে ধরিতে হইবে।

আমার সেই দুঃখিনী লীলা ঐ নরাধমের চক্রান্তে আজি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। আজি সমাজে তিনি অপরিচিতা, মানব-রাজ্যে তিনি লুক্কায়িত, অতুল সম্পত্তি থাকিতেও তিনি আজি দীনহীনা। তাঁহার সর্ব্বস্ব দুই পাপিষ্ঠে লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহার এক জন নরকে গমন করিয়া আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতেছে, অপর ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত। তাহাকে পদাবনত করিবার উপায় আজি আমার হস্তগত হইয়াছে। এ লোভ কখন কি সংবরণ করা যায়?

আমার পরম বন্ধু রমেশ ঐ দুরাত্মার দ্বারা অচিন্তনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, অপরিসীম অপমানিত হইয়াছেন এবং অবক্তব্য হৃদয়-জ্বালা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত যেরূপ দুশ্ছেদ্য আত্মীয়তা-শৃঙ্খলে আমি বদ্ধ, তাহাতে তাঁহার যত মনস্তাপ, তৎসমস্তই আমার নিজ মনস্তাপের সমতুল্য বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ পিশাচকে একবার ধরিতে পারিলেই তাহারও এই প্রতিফল দিতে পারিব। কপালে যাহা থাকে হইবে, আজি রাত্রিতেই আমি ঐ নরাধমের সম্মুখীন হইব।

বিপদের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কি ফল? যত বিপদই কেন হউক না, যখন তাহার সম্মুখীন হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন ভাবিয়া আর কি লাভ? তথাপি একবার ভাবিয়া দেখা ভাল এবং যদি কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। সে পিশাচ যখন বুঝিবে যে, আমাকে নিপাত করিলে আপাততঃ তাহার সকল বিপদের শান্তি হইবে তখন সে কখনই তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবে না। সে তখনই আমাকে ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হইবে। কিয়ৎপরিমাণে এই বিপদ্ লাঘব করিবার নিমিত্ত আমার মনে এক অভিসন্ধি উদিত হইল। যদি আমি রমেশকে এক পত্র লিখিয়া রাখি এবং একটা নিয়মিত সময়ের পরে আমার নিকট হইতে আর কোন সংবাদ না পাইলে তাঁহাকে সেই পত্র খুলিতে অনুরোধ করি, যদি তাহার পর রমেশের পূর্ণ নামস্বাক্ষরযুক্ত ঐ পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার-সূচক এক রসীদ গ্রহণ করি এবং সেই রসীদ সঙ্গে রাখিয়া যদি চৌধুরীকে তাহা দেখাই, তাহা হইলে তাহার মনে হইতে পারে যে, কেবল আমাকে নিপাত করিলেই তাহার নিস্তার নাই। তাহার অন্য প্রবল শত্রুও তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এ অভিসন্ধি আমার মনে বড়ই ভাল বলিয়া বোধ হইল। আমি ব্যস্ততাসহ বাসায় আসিলাম এবং নিঃশব্দে আমার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া এই পত্র লিখিলাম :—

"ভাই রমেশ! তোমাকে থিয়াটারে যে

লোকটিকে দেখাইয়াছিলাম, সেই ব্যক্তিই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। এখন তাহার নাম জগদীশনাথ চৌধুরী হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সে ৫ নং অশুতোষ দের গলীতে অবস্থিতি করে। অবিলম্বে তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবে। আমি তাহাকে ধরিতে আসিয়া প্রাণ হারাইয়াছি, আর কি লিখিব?—অভিন্ন দেবেন্দ্র।"

এই পত্র এক খামের মধ্যে পুরিয়া, বেশ করিয়া গালার মোহর দিয়া আঁটিলাম এবং খামের উপর লিখিলাম, "কল্য প্রাতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত এই পত্র খুলিও না। নয়টার পর ইহা খুলিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিও। আপাততঃ এতৎসহ যে রসীদ পাঠাইলাম, তাহাতে সম্পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইবে।" তাহার পর সেই খামসমেত পত্র আর একখানি বৃহত্তর খামের মধ্যে পুরিয়া তাহাতেও মোহর লাগাইলাম। আমার মনে স্থির প্রতীতি হইল যে, যদিই আমি আজি চৌধুরীর হাতে মরি, তাহা হইলে তাহারও আর নিস্তার নাই। রমেশ যদি সন্ধান পান যে, ঐ ব্যক্তিই সেই রঘুনাথ, তাহা হইলে সে রমেশের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিলেও, পুলিসের হাতে কদাপি নিস্তার পাইবে না। তাহা হইলে কল্য তাহার সকল বিদ্যাই বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি দণ্ডিত হইতে হইবে। সে যেরূপ বুদ্ধিমান্ লোক, তাহাতে আমার এরূপ সাবধানতা দেখিয়া সে সকলই বুঝিতে পারিবে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাহাকে অনেক ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে।

তখন মনে হইল, এ পত্র রমেশের কাছে পাঠাই কিরূপে? নীচে নামিলাম। সেখানকার দোকান-ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। আমি দোকান-দারকে সমস্ত কথা বলিলে সে বলিল যে, তাহার ছেলে খুব হুঁসিয়ার। তাহাকে জল খাইবার জন্য চারিটা পয়সা দিলে সে এখনই চিঠি দিয়া আসিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাহাকে ঠিকানা বুঝাইয়া দিলে সে পত্র লইয়া গেল। শীঘ্র কার্য্য-সমাপ্তির অনুরোধে তাহাকে যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলাম এবং ফিরিয়া আসার পর আমার অন্য দরকার আছে বলিয়া সেই গাড়ী রাখিয়া দিতে বলিলাম। এখন রমেশের স্বাক্ষরযুক্ত রসীদখানি পাইলেই নিশ্চিন্ত হই।

যদিই আজি আমার জীবন যায়, তাহা হইলে আমার কাগজপত্রের জন্য কোন গোল উপস্থিত না হয়, এই বিবেচনায় আমি পুনরায় নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কাগজ ও চিঠি প্রভৃতি গুছা-ইয়া রাখিলাম। সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া মনো-রমাকে একখানি পত্র লিখিলাম এবং সেই পত্রসহ বাক্স, দেরাজ প্রভৃতির চাবীগুলি রাখিয়া একটি গালা-মোহরাঙ্কিত প্যাকেটের মধ্যে স্থাপিত করি-লাম এবং সেই পুলিন্দাটি আমার দেরাজের উপরেই রাখিয়া দিলাম। তদনন্তর লীলা ও মনোরমা আমার অপেক্ষায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া আছেন মনে করিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলাম। এতক্ষণ পরে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশকালে আমার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। যদিই আজি চৌধুরীর হস্তে আমার জীবন-লীলার অবসান হয়, তাহা হইলে এই সাক্ষাৎই তাঁহাদের সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। এইরূপ মনে হওয়ায় আমি বিচলিত হইলাম। কিন্তু দৃঢ়-সঙ্কল্পের বলে তখনই সেই ভাব আমি দমন করিয়া ফেলিলাম।

আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে লীলা নাই; কেবল মনোরমা একাকিনী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র বলিলেন, "এত সকালে ফিরিলে যে? শেষ পর্য্যন্ত ছিলে না বুঝি?"

আমি বলিলাম,—"রমেশ ও আমি কেহই শেষ পর্য্যন্ত থাকিলাম না। লীলা কোথায়?"

"তাহার মাথা ধরিয়াছে; এ জন্য আমি জেদ করিয়া তাহাকে সকালে ঘুম পাড়াইয়াছি।"

লীলা নিদ্রিত হইয়াছেন কি না, দেখিবার নিমিত্ত আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। বুদ্ধিমতী মনোরমা আমার মুখের ভাব, কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিলেন যে, আমি অদ্য নিশ্চয়ই একটা কোন কঠোর ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছি। সেই জন্য তিনি সাতিশয় কৌতূহলপূর্ণ-নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আমি আমাদের শয়ন-প্রকোষ্ঠে আসিয়া ধীরে ধীরে শয্যার নিকটস্থ হইলাম এবং মশারি সরাইয়া দেখিলাম, আমার পত্নী নিদ্রার সুকোমল আশ্রয়ে শান্তিলাভ করিতেছেন। সেই সুকুমারকায়া নবী-নার সহিত আমার এখনও একমাস বিবাহ হয় নাই। এই অল্পসময়ের মধ্যেই এইরূপ জীবন-মরণ-বিধায়ক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে মনে করিয়া এতক্ষণে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল। যদি এই উদ্যমে আমার প্রাণান্ত ঘটে, তাহা হইলে লীলাকে এই দেখাই আমার শেষ দেখা। আমার

বিকল হৃদয়কে বলীয়ান্ করিবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম এবং মঙ্গলময়ের কৃপায় সকল মঙ্গলময় হইবে ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া লীলার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। দ্বার-সন্নিহিত হওয়ার পর পুনরায় সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজল-নয়নে ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "দয়াময়! আমার প্রাণের প্রাণ, অভাগার সর্ব্বস্ব, ঐ পাপসংস্পর্শবিহীনা নবীনাকে তোমারই চির-কল্যাণময় চরণাশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি। অনাথ-নাথ! সকল যাতনাই সহজ ও সহনীয়। কিন্তু ঐ প্রেম-পুত্তলীর কষ্টের কল্পনাও অসহনীয়। অতএব দীনবন্ধো! ঐ সরলা যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়, ইহাই এ দীনহীনের একমাত্র প্রার্থনা।" আমি আর অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

লীলা নিদ্রিত না থাকিলে হয় তো আমি এরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কখনই আসিতে পারিতাম না। ধন্য জগদীশ্বর! দেখিলাম, বাহিরে মনোরমা এক খণ্ড কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দর্শনমাত্র তিনি বলিলেন,—"দোকানদারের ছেলে এই কাগজটুকু আমাকে দিয়া গিয়াছে। আর বলিতে বলিয়াছে যে, তোমার জন্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, ঠিক কথা; আমি এখনই আবার বাহিরে যাইব।" এই বলিয়া আমি সেই কাগজখণ্ডে যাহা লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল,—"তোমার পত্র পাইলাম। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তোমাকে আমি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে পত্র খুলিয়া পাঠ করিব ও তদনুযায়ী কার্য্য করিব।—অভিন্ন শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।"

আমি সেই কাগজখণ্ড আমার পকেট-বহির মধ্যে স্থাপিত করিলাম এবং অগ্রসর হইবার নিমিত্ত পা বাড়াইলাম। তখন মনোরমা দ্রুত আসিয়া উভয় হস্তে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, —"আমি বুঝিতে পারিতেছি, আজি রাত্রিতেই তুমি শেষ চেষ্টা করিবে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, শেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চেষ্টা আজিই করিব।"

"কিন্তু দেবেন্দ্র, একাকী যাইও না, আমি মিনতি করিতেছি, একাকী যাইও না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব। আমি স্ত্রীলোক বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইতে অমত করিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাইবই যাইব। আমি বাহিরে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিব।"

এই বলিয়া সেই স্নেহশীলা কামিনী আমার হস্ত ত্যাগ করিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি উভয় হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম, —"না দেবি, এ বিষয়ে তোমার সাহায্য করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। এরূপ কার্য্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য হওয়া সম্ভব নহে। আমার সঙ্গে না যাইয়া বাড়ীতে আমার প্রত্যাগমন-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা তোমার পক্ষে কত আবশ্যক, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি লীলাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলে আমার অনেক সাহায্য হইবে এবং আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব।"

তিনি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে এবং পুনরায় আমার গতিরোধ করিবার পূর্ব্বে আমি বেগে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম; তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে ঠিকানা বলিয়া দিলাম, আর বলিয়া দিলাম,—"যদি দশ মিনিটের মধ্যে যাইতে পার, তাহা হইলে দুনা ভাড়া।"

তখন রাত্রি ১১টা। এত গভীর রাত্রে মানুষ কখনই মানুষের সহিত দেখা করে না। যদি সে দেখা না করে? জোর করিয়া দেখা করিব। যদি তাহাতেও কৃতকার্য্য না হই, তাহার দ্বারে সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিব। সে যে ত্বরায় পলায়ন করিবে, তাহাতে কোন ভুল নাই। সে যখন বাটীর বাহির হইবে, আমি তখনই তাহাকে ধরিব।

মোড়ে গাড়ী থামাইয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। তাহার পর চৌধুরীর বাসার দিকে চলিতে লাগিলাম। যখন আমি বাটীর নিকটস্থ হইলাম, তখন সেই পথে বিপরীত দিক্ হইতে আর একটি লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। লোকটি নিকটস্থ হইলে চিনিতে পারিলাম, তিনি সেই গণ্ড-দেশে চিহ্নযুক্ত যুবক। আমার বোধ হইল, তিনিও আমাকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোন কথাই বলিলেন না। আমি ৫নং বাটীর দরজায় থামিলাম। তিনি কিন্তু সোজা চলিয়া গেলেন। ইনি কি দৈবাৎ এ পথে আসিয়া পড়িয়াছেন, না থিয়েটার হইতে চৌধুরীর অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন? যাহা হউক, তাহা আর এখন ভাবিবার দরকার নাই। সেই কৃশকায় যুবা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে আমি দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলাম। চৌধুরীর লোক ইচ্ছা করিলে, কর্ত্তা নিদ্রিত

হইয়াছেন বলিয়া আমাকে তাড়াইতে পারে। দেখি কি হয়।

একটি দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং জিজ্ঞাসিল, আমার কি দরকার। আমি তাহাকে আমার কার্ড দিয়া বলিয়া দিলাম যে,—"বড় গুরুতর দরকার বলিয়াই এত রাত্রিতে এবং এরূপ অসময়ে তোমার বাবুকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি এই কথা বলিয়া তাঁহাকে এই কাগজখানি দিলে আমার বড় উপকার হইবে। এই কাগজে আমার নাম লেখা আছে।"

সে কিছু ইতস্ততঃ করিয়া মনিবের নিকট আমার সংবাদ লইয়া যাইতে রাজি হইল। কিন্তু যাইবার সময় বেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গেল। সুতরাং আমি পথেই দাঁড়াইয়া থাকিলাম। অতি অল্পকাল-মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিল এবং বলিল যে, তাহার মনিব আমাকে নমস্কার জানাইয়া, আমার কি দরকার, জানিতে চাহিতেছেন। আমি বলিলাম,—"তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া বল গিয়া যে, আমার দরকার অন্য কাহারও নিকট বলিবার নহে।"

সে আবার দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল—আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং আমাকে ভিতরে আসিতে বলিল। তখনই আমি চৌধুরীর ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নীচে আলো ছিল না। মাগীটা কেরোসীনের ঠোঙ্গা আনিল; তাহাই ক্ষীণ আলোকে আমি সিঁড়ি দেখিয়া চলিতে লাগিলাম। যখন সিঁড়িতে উঠি, তখন দেখিতে পাইলাম, বারান্দা হইতে একটি স্ত্রীলোক একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি আমার প্রতি অত্যুগ্র দৃষ্টিপাত করিলেন। মনোরমার দিনলিপিতে আমি যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তাহার সহিত ঐক্য করিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইল, ইনিই সেই রঙ্গমতি ঠাকুরাণী। আমি উপরে উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ জগদীশনাথ চৌধুরীর সম্মুখীন হইলাম।

দেখিলাম, ঘরের চারিদিকে বাক্স, ব্যাগ, কাপড়-চোপড় ছড়ান রহিয়াছে। চৌধুরী একটা ব্যাগের মধ্যে জিনিসপত্র গুছাইতেছে। আর দেখিলাম, তাহার সেই ইঁদুরের খাঁচা সম্মুখস্থ টেবিলের এক পার্শ্বে স্থাপিত আছে। কাকাতুয়া ও মনুষ্য কোথায় আছে, দেখিতে পাইলাম না। চৌধুরী চেয়ারে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে একখানি দেরাজযুক্ত টেবিল। ঘরে আরও তিন চারিখানি চেয়ার পড়িয়া আছে। এক দিকে একখানি খাট রহিয়াছে। আমাকে দর্শনমাত্র চৌধুরী "আসুন মহাশয়, বসুন" বলিয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিল।

বৈকালে চৌধুরীকে যেরূপ প্রফুল্ল ও সজীব দেখিয়াছিলাম, এখন সেরূপ নাই। নাট্যশালায় যে দারুণ ভীতি তাহাকে অবসন্ন করিয়াছিল, তাহা এখনও তাহাকে অধিকার করিয়া আছে। সে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"আপনি আমার নিকট বিশেষ দরকারে আসিয়াছেন; কিন্তু আমার নিকট আপনার কি দরকার হইতে পারে, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল, থিয়েটারে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। রমেশকে দেখিয়া সে এতই বিচলিত হইয়াছিল যে, অন্য কিছু দেখিবার ও ভাবিবার তাহার সময় ছিল না। ইহা আমার পক্ষে শুভ বলিতে হইবে। কারণ, আমাকে রমেশের সঙ্গে দেখিলে সে সহজেই বুঝিতে পারিত যে, আমি তাহার সমস্ত অতীত দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং সে হয় তো আমার সহিত দেখাই করিত না এবং দেখা করিলেও হয় তো অতি সাবধানতার সহিত কথা কহিত।

আমি বলিলাম,—"আজি রাত্রিতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। দেখিতেছি, আপনি স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগে আছেন।"

"আমার স্থানান্তর-গমনের সহিত আপনার দরকারের কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

"কিছু আছে বৈ কি?"

"কি সম্বন্ধ আছে, বলুন। আমি কোথায় যাইতেছি, আপনি জানেন কি?"

"না। কিন্তু কেন আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা আমি জানি।"

তৎক্ষণাৎ সে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং ঘরের একমাত্র দরজায় একটা তালা লাগাইয়া আসিল। তাহার পর সেই চাবীটা পকেটে ফেলিয়া বলিল,—"দেবেন্দ্র বাবু, আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও আমরা উভয়েই উভয়কে বিলক্ষণ জানি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে আপনি কি একবার ভাবেন নাই যে, আমার সহিত এলোমেলোভাবে কথা কহিবার মত সহজ লোক আমি নহি?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি আপনার সহিত এলো-মেলো কথা কহিতে আসি নাই। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। যে দ্বার আপনি রুদ্ধ করিয়া আসিলেন, "তাহা খোলা থাকিলেও আপনার কোনরূপ অসদ্ব্যবহার হেতু আমি তন্মধ্য দিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিতাম না এবং যতক্ষণ কার্য্য শেষ না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই তাহা করিব না।"

চৌধুরী টেবিলের উপর হস্তস্থাপন করিয়া আমার মুখের দিকে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার হস্তের ভারে টেবিল কাঁপিয়া উঠিল এবং তদুপরিস্থ পিঞ্জরাবদ্ধ ইন্দুর সকল রং-করা তারের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতে লাগল। সে আমাকে জিজ্ঞাসিল,—"আপনার অভিপ্রায় কি?"

"শুনিলাম, আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছেন। এই শেষ সময়ে আপনাকে কয়েকটি কথা জানাইয়া দিতে চাহি।'

তাহার প্রশস্ত ললাট দিয়া ঘর্ম্মবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। সে দেরাজে হাত দিল এবং তাহার চাবী খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল,—"আমি কেন কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছি, আপনি তবে জানেন। বলুন দেখি কৃপা করিয়া, কেন?"

আমি বলিলাম,—"আমি তাহা বলিতেও পারি এবং তাহার প্রমাণও দেখাইতে পারি।"

"ভাল, একে একে হউক। আগে বলুন।"

আমি গম্ভীরভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলাম,—"আপনি রমেশচন্দ্র রায় নামক এক ভদ্রলোকের ভয়ে পলাতক হইতেছেন।"

সেই নরাধমই যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। কারণ, সে থিয়েটারে রমেশকে দেখিয়া যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, আবার আমার মুখে রমেশের নাম শুনিয়া অবিকল সেইরূপ হইয়া উঠিয়া সে দেরাজের ভিতর হইতে একটা ভারী পদার্থ টানিয়া বাহির করিতেছে, বোধ হইল। তখনই সে এক বারুদ পোরা, ঠিক করা, ছনলা পিস্তল বাহির করিল। আমি বুঝিলাম, আমার জীবন একটু সূক্ষ্ম সূতায় ঝুলিতেছে। আমি বলিলাম, "আরও এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন। দেখুন, আপনার দরজা রুদ্ধ এবং আমি নিরস্ত্র। তথাপি আমি একটু বিচলিত হইতেছি না এবং একটুও নড়িবার চেষ্টা করিতেছি না। আর দুইটা কথা শুনুন।"

"আপনি যথেষ্ট বলিয়াছেন, আর শুনিতে চাহি না। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমি এখন কি ভাবিতেছি?"

"বোধ হয় পারিতেছি।"

"আমি ভাবিতেছি, নানারূপ সামগ্রী চতুর্দ্দিকে পড়িয়া থাকায় ঘরটা বড় বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আবার আপনার মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বিশৃঙ্খলতা আরও বাড়াইয়া তুলিব না, তাই ভাবিতেছি।"

আমি বলিলাম, "আগে এই কাগজটুকু পড়ুন দেখি, তাহার পর যাহা হয় করিবেন। মনে করিবেন না যে, আমাকে নিপাত করিলেই আপনার বিপদের শেষ হইবে।"

আমি পকেট-বহি হইতে কাগজখণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে পড়িতে দিলাম। সে উচ্চস্বরে সেই কয় ছত্র পাঠ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সাবধানতার ব্যবস্থা বুঝিতে পারিল। তখনই সে পুনরায় দেরাজের মধ্যে পিস্তল রাখিয়া দিয়া বলিল, "দেখুন দেবেন্দ্র বাবু, আমি আপাততঃ পিস্তল রাখিয়া দিলাম বটে, কিন্তু আমি যে উহা আর বাহির করিয়া আপনার মগজ উড়াইয়া দিব না, ইহা আপনি যেন মনে করিবেন না। আমি নিরপেক্ষ লোক, পরম শত্রুর সম্বন্ধেও আমি সুবিচার করিতে পরাঙ্মুখ নহি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার মগজ ঘাসে বোঝাই নহে, তাহাতে সার আছে। সে কথা যাউক, এখন কাজের কথা—"

আমি বলিলাম, "কাজের কথা হইবার পূর্ব্বে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, তাহা আমি জানি। জগদীশনাথ চৌধুরী যে আপনার প্রকৃত নাম নহে, তাহাও আমি জানি। আপনার দক্ষিণ হস্তে রমেশ বাবুর দাঁতের দাগ যে এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাও আমি জানি।"

দেখিলাম, তাহার বদনমণ্ডল ঘোর উৎকণ্ঠা-কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। বলিল—"এ সকল মিথ্যা কুৎসিত কথা যে আপনাকে জানাইয়াছে, সে আমার পরম শত্রু, এ জন্য যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা শীঘ্রই করিব। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঐ কাগজখণ্ডে যে ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিয়াছে, সে কে?"

আমি বলিলাম,—"তিনি রমেশচন্দ্র রায়। আপনি যখন রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ছিলেন, তখন তিনি আপনার পরম বন্ধু ছিলেন। আপনি তাঁহার ভগ্নীর সতীত্ব নাশ করিয়া বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে চিনিয়াছেন কি?"

আবার সে দেরাজের মধ্যে হাত দিয়া পিস্তল বাহির করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ক্ষান্ত হইয়া আবার বলিল,—"আপনার পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে বন্ধুকে কতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিয়াছেন?"

"কালি প্রাতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত।"

"বুঝিয়াছি, আপনি বেশ বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যদি খুব যত্ন সহকারে উদ্যোগী হইয়া যাত্রা করি, তাহা হইলেও যে বেলা ৯টার আগে কলিকাতা হইতে বাহির হইতে পারিব, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য কথার পূর্ব্বে ইহা স্থির থাকা আবশ্যক যে, যতক্ষণ আপনি আপনার বন্ধুকে লিখিত পত্র আমার নিকট ফিরাইয়া আনিয়া না দিবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। এক্ষণে বলুন, আপনার কি জিজ্ঞাস্য?"

আমি বলিলাম,—"তাহা আপনি শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন কি, আমি কাহার স্বার্থের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি?"

সে বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের স্বার্থ।"

আমি বলিলাম,—"তাহা বলিলে ঠিক কথা হয় না। আমার স্ত্রীর স্বার্থ।"

তখনই যেন তাহার চক্ষে আমি অন্যরূপ লোক হইয়া পড়িলাম। আমাকে আর বিপজ্জনক বলিয়া তাহার বোধ থাকিল না। সে আমার মুখের দিকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত বিদ্রূপব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এককালে দেরাজ বন্ধ করিয়া ফেলিল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন যে, গত কয়েক মাস নিরন্তর যত্নে আমি এ সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাতে কোন সত্য কথা আমার নিকট প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিলে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আপনি এক অতি কুৎসিত চক্রান্তের অভিনেতা। নির্ব্বিবাদে এক লক্ষ টাকা লাভ করাই আপনার তাদৃশ অতি নিন্দনীয় চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

চৌধুরী কিছু জবাব করিল না, কিন্তু তাহার বদন অতিশয় চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন হইল।

আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনার আর্থিক লাভ আপনি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে থাকুন, আমি তাহা পুনর্গ্রহণের প্রার্থী নহি।" তাহার মুখমণ্ডল মেঘমুক্ত হইল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"যে ধর্ম্মবিগর্হিত ঘোর দুষ্ক্রিয়ার সাহায্যে এই হৃদয়হীন—"

সে আমাকে বাধা দিয়া বলিল,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনি কি এখানে নৈতিক উপদেশ শুনাইতে আসিয়াছেন? তাহা হইলে কৃপা করিয়া সে উপদেশ আপনি বন্ধ করিয়া রাখুন; আমার তাহাতে কোনই প্রয়োজন নাই। সময়বিশেষে তাহা আপনার অন্যান্য আত্মীয়ের উপকারে আসিতে পারে, অতএব এখানে তাহা অপব্যয় করিবেন না। আপনি কি চান, তাই বলুন।"

আমি বলিলাম,—"প্রথমতঃ আমার সমক্ষে আপনার স্বহস্তলিখিত এই ব্যাপারের একটা সম্পূর্ণ স্বীকারপত্র আমি চাহি।"

সে তাহার একটা স্থূল অঙ্গুলি উন্নত করিয়া বলিল,—"এক দফা। তার পর?"

আমি বলিলাম,—"আমার স্ত্রী যে দিন কৃষ্ণসরোবরের ভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন, সে দিন কোন্ তারিখ, তৎসম্বন্ধে আপনার সমর্থনোক্তি ভিন্ন অন্য কোন অকাট্য ও সহজ প্রমাণ চাহি। ইহাই আমার দ্বিতীয় দাওয়া।"

সে বলিল,—"দেখিতেছি, যে জায়গায় গলদ আছে, আপনি সেইখানটাই ধরিয়াছেন। তার পর?"

"আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।"

"বেশ! আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার কথা শুনুন। মোটের উপর বিবেচনা করিলে আপনি যাহাকে কৃপা করিয়া কুৎসিত চক্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত স্বীকার করার অপেক্ষা এই স্থানে আপনার দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণপক্ষী উড়াইয়া দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী। এক্ষণে আপনি যদি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবমত সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে আমি সম্মত আছি। আপনি যেরূপ বর্ণনা চাহেন, আমি তাহা লিখিয়া দিতেছি, যে প্রমাণ আপনি চাহেন, তাহাও আমি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। আমার পরলোকগত বন্ধু তাঁহার স্ত্রীর কলিকাতা-যাত্রা সম্বন্ধে দিন, তারিখ, ঘণ্টা ঠিক করিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি না, বলুন? আমি আপনাকে সে পত্র দিতে পারি। আর রাণীকে ষ্টেশন হইতে আনিবার জন্য যে আড়গড়া হইতে ব্রুহাম ভাড়া করিয়াছিলাম, তাহার ঠিকানা আপনাকে বলিয়া

দিতে পারি। সেখানকার অর্ডার-বহিতে নিশ্চয়ই আপনি তারিখ জানিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ কোচ-ম্যান বা সহিসও মনে করিয়া কোন কোন কথা বলি-লেও বলিতে পারিবে। আপনি যদি আমার সর্ত্ত পালন করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এ সকলই আমি করিতে সম্মত আছি। শুনুন, আমার সর্ত্ত কি। ১ম সর্ত্ত।—আমি ও আমার স্ত্রী যখন যেরূপে হউক, এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আপনি কিংবা আপনার বন্ধু কোনরূপে তাহার প্রতিবন্ধকতা-সাধন করিতে পারিবেন না। ২য় সর্ত্ত।—কালি প্রাতে যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মচারী না আসিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে আমার নিকটে থাকিতে হইবে। তাহার পর আপনার যে বন্ধুর নিকট সেই মোহর-আঁটা চিঠি আছে, সেই বন্ধকে আমার কর্ম্মচারীর মারফতে আপনার এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তিনি যেন পত্রপাঠ আমার কর্ম্মচারীর হস্তে সেই চিঠিখানি ফিরাইয়া দেন। আমার কর্ম্ম-চারী যতক্ষণ সেই পত্র ফিরাইয়া আনিয়া আমার হাতে না দিবে, ততক্ষণও আপনাকে আমার নিকট অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এই স্থলে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার পত্র হস্তগত হইলে আমি তাহা পাঠ না করিয়াই পুড়াইয়া ফেলিব; তাহার পর আমি সস্ত্রীক প্রস্থান করিলে আরও আধঘণ্টাকাল আপনাকে এখানে অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। তদনন্তর আপনি স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারিবেন, আমার তাতে কোন আপত্তি থাকিবে না। আমার সর্ত্তের কথা জানাইলাম। এখন আপনি ইহাতে সম্মত আছেন কি না বলুন।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে লোকটার বুদ্ধি-স্থৈর্য্য, অত্যন্ত দূরদৃষ্টি, অপরিসীম ধূর্ত্ততা এবং অত্যাশ্চর্য্য সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাহার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলে লীলার স্বরূপত্ব-সমর্থন-সম্বন্ধীয় প্রমাণাদি আমার হস্তগত হইতেছে সত্য, কিন্তু এরূপ নরাধমকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। আর এই দুরাত্মা রমেশের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহারও কোন প্রতিফল দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু বিবে-চনা করিয়া দেখা আবশ্যক, এই সুদীর্ঘকালের পর তাহার সেই অতীত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত রমেশ বা আমি তাহাকে কিরূপে দণ্ডিত করিতে পারি? নিজ শক্তিতে আমরা তাহাকে কোনই শাস্তি দিতে পারি না,ইহা নিশ্চয়। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত আমাদিগকে রাজশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সে পূর্ব্ব-দুষ্কৃতির প্রমাণ কোথায়? এই ব্যক্তিই যে সেই ব্যক্তি, তাহাই বা কে বলিবে? স্বয়ং রমেশই যখন তাহাকে চিনিতে পারিতেছে না, তখন আর কে তাহা সমর্থন করিতে সমর্থ? তাহার দক্ষিণ-হস্তের ক্ষতচিহ্ন বিশেষ প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ, নানা কারণে তাহার উৎপত্তি সম্ভাবিত। অতএব তাহাকে ছাড়িয়া না দিলেই বা আমরা এক্ষণে কি করিতে পারি? সুতরাং তাহার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের যে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, অগত্যা আমাদিগকে তাহাই যথেষ্ট বোধ করিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইতেছে। আরও আমার মনে হইল, প্রমোদরঞ্জনকে হাতে পাই পাই করিয়া পাইলাম না; সে চিরদিনের মত ফাঁকি দিয়া পলাইল। কি জানি, যদি এও আবার কোন প্রকারে হাত-ছাড়া হইয়া যায়। না, সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া অন্য মন করা কদাপি সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। লীলার স্বরূপত্ব সমর্থিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যের জয় হইবে—আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া বলিলাম,—"আপনার সমস্ত সর্ত্তে সম্মত হইলাম।"

আমার মুখের দিকে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরী বলিল,—"অতি উত্তম। এক্ষণে সকল বিষয়ের সুন্দর সুমীমাংসা লইয়া গেল।"

এই বলিয়া সে চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং হাই তুলিতে তুলিতে উভয় বাহু বিস্তার করিয়া আলস্য ত্যাগ করিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"ভাল হইয়া বসুন, দেবেন্দ্র বাবু! এখন আমি আপনার সহিত শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়াছি।"

তাহার পর সে দ্বার-সন্নিহিত হইয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"রঙ্গমতি দেবি, প্রিয়তমে,এক-বার এ দিকে আসিতে পারিবে কি? এখানে দেবেন্দ্র বাবু নামে একটি ভদ্রলোক আছেন। তোমার আসায় কোন আপত্তি নাই।" তিনি আসিলেন। তখন চৌধুরী আবার বলিল,—"প্রিয়তমে! তোমার জিনিসপত্র গুছানর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমার জন্য একটু চা তৈয়ার করিয়া দিবার সময় হইবে কি? এই দেবেন্দ্র বাবুর সহিত আমার অনেক লেখাপড়ার কাজ আছে; সেই জন্যই একটু চা খাওয়ার দরকার হইতেছে।"

রঙ্গমতি ঠাকুরাণী সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঘরের কোণে একটা ডেস্ক ছিল। চৌধুরী তাহার সমীপস্থ হইয়া কয়েক

দিস্তা কাগজ ও কতকগুলা পাখার কলম বাহির করিল। তাহার পর কলমগুলাকে যখন যেটা দরকার, তখন সেটা লইবার সুবিধা হইবে বলিয়া ডেস্কের উপর ছড়াইয়া রাখিল এবং সংবাদপত্রাদির জন্য ব্যবসায়ী লেখকগণ যেরূপ লম্বা লম্বা করিয়া কাগজ কাটিয়া লয়, সেইরূপ অনেক কাগজ কাটিয়া লইল। তাহার পর আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—"আজিকার এই রচনা এক অসাধারণ সামগ্রী হইবে। প্রবন্ধাদি রচনা বিষয়ে আমার চিরদিন অভ্যাস আছে। মনুষ্যের যত প্রকার মানসিক উন্নতি হইতে পারে, তন্মধ্যে ভাবের শৃঙ্খলা-বিধান-ক্ষমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তাহা আছে। আপনার তাহা আছে কি দেবেন্দ্র বাবু?"

তাহার পর যতক্ষণ চা না আসিল, ততক্ষণ সে গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল এবং যে যে স্থলে তাহার ভাবের গ্রন্থি সংলগ্ন না হইল, তত্তৎস্থলে সে আপনার কপোলদেশে হস্ত দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে বাধ্য হইয়া, স্বীয় কল্পনাতীত ঘোর দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করিতে বসিয়াও সে ব্যক্তি আপনার অনর্থক অহঙ্কার ও গৌরব প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল মনে করিয়া কিরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম। এমন সময় রঙ্গম'তি দেবী চা লইয়া আসিলেন এবং চৌধুরী স্ত্রীর প্রতি মধুর হাস্য-সহ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। রঙ্গমতি চলিয়া গেলেন। চৌধুরী চা ঢালিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"একটু চা খাইবেন কি দেবেন্দ্র বাবু?"

আমি অস্বীকার করিলাম। সে হাসিয়া বলিল,—"আপনি ভয় করিতেছেন বুঝি, পাছে আপনাকে বিষ খাওয়াই। ছি ছি! আপনারা অনাবশ্যক স্থলে বিশেষ সাবধান; ইহাই দক্ষিণদেশী লোকের প্রধান দোষ।"

চৌধুরী লিখিতে বসিল। এক খণ্ড কাগজ সম্মুখে লইল এবং একটা কলম লইয়া দোয়াতে ডুবাইল। তাহার পর একবার গলা ঝাড়িয়া লইল এবং খস্-খস্ শব্দে অতিদ্রুত লিখিতে আরম্ভ করিল। মোটা মোটা বড় বড় অক্ষরে ছত্রের মধ্যে অনেকখানি করিয়া ফাঁক দিয়া লিখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক খণ্ড কাগজ ফুরাইয়া গেল। এইরূপে এক এক খণ্ড লিখিয়া তাহাতে সংখ্যা দিয়া, ঘাড়ের উপর দিয়া পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া দিতে লাগিল। কলমটাও যখন খারাপ হইয়া গেল, তখন তাহাও এইরূপে পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া দিয়া আবার আর একটা কলম গ্রহণ করিল। ক্রমে তাহার চেয়ারের চারিদিকে কাগজের স্তূপ হইল। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইল; সেও লিখিতে লাগিল, আমিও নীরবে বসিয়া থাকিলাম। মধ্যে মধ্যে সে এক এক ঢোক চা খাইতে লাগিল; তদ্ভিন্ন আর কোন কারণে সে একবারও থামিল না। একটা, দুইটা, তিনটা, ক্রমে চারিটা বাজিল; তথাপি চারিদিকে কাগজ পড়ার নিবৃত্তি নাই; কাগজ-খস্-খসানিরও বিরাম নাই। চৌধুরীর অক্লান্ত লেখনী সমান চলিতে লাগিল; চারিটার পর হঠাৎ একটা কমলের খোঁচার শব্দ শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ চৌধুরী অতিশয় গৌরবের সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"বহুৎ আচ্ছা।" তাহার পর স্বকীয় বিশাল বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া সাহঙ্কারে বলিল, "দেবেন্দ্র বাবু, মার দিয়া! যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে স্বয়ং অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি যখন পড়িবেন, তখন আপনিও যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। বিষয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জগদীশের মাথার সমাপ্তি নাই, শেষও নাই। যাউক, এখন আমি কাগজগুলি গুছাইয়া একবার আগাগোড়া পড়িয়া পড়িয়া দেখিব এবং আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিব। এইমাত্র ৪টা বাজিয়াছে। বেশ। গোছান, পড়া, সংশোধন করা, ৪টা হইতে ৫টা। নিজের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য অতি অল্প নিদ্রা, ৫টা হইতে ৬টা। যাত্রার উদ্যোগ, ৬টা হইতে ৭টা। কর্ম্মচারীর মারফতে আপনার চিঠি আনান ব্যাপার, ৭টা হইতে ৮টা। তাহার পর প্রস্থান আর কি! এই দেখুন, আমার কাজের তালিকা।"

তাহার পর সে ঘরের মেজের উপর বসিয়া কাগজগুলি গুছাইয়া লইল এবং একটা গুণস্চ ও স্তা দ্বারা সকলগুলি গাঁথিয়া ফেলিল। নিজে একবার সবটা পড়িল। তাহার পর রঙ্গভূমির নট যেমন স্বরের হ্রাসবৃদ্ধি ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া অভিনয় করে, তদ্রূপভাবে সে সেই সকল কাগজ আমাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। পাঠকগণ, কিঞ্চিৎকাল পরেই চৌধুরীর লিখিত কাগজ দেখিতে পাইবেন। অধুনা এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে যাহা লিখিয়াছিল, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

তদনন্তর যে আড়গড়া হইতে ব্রুহাম ভাড়া করিয়াছিল, তাহার ঠিকানা আমাকে সে লিখিয়া দিল এবং প্রমোদরঞ্জনের একখানি পত্র দিল। সেই

পত্র কৃষ্ণসরোবর হইতে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত। রাণী লীলাবতী ২৬শে তারিখে কলিকাতায় আসিবেন, এই সংবাদ তাহাতে লেখা আছে। সুতরাং যে দিন তিনি ৫নং আশুতোষ দের গলীতে পরলোকগমন করিয়াছেন এবং নিমতলার ঘাটে তাঁহার সৎকার হইয়াছে বলিয়া প্রচার, সে দিন তিনি কৃষ্ণসরোবরে রাজবাটীতে স্বচ্ছন্দশরীরে জীবিত ছিলেন এবং তাহার পরদিন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাজার স্বহস্তলিখিত এই প্রমাণ এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত, সন্দেহ নাই। গাড়ীর আড়গড়ায় যদি আর কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

চৌধুরী ঘড়ী দেখিয়া বলিল,—"স-পাঁচটা বাজিয়াছে। আমি এখন একটু ঘুমাইব। আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন দেবেন্দ্র বাবু, আমার দৈহিক গঠন মহাত্মা নেপোলিয়ানের অনুরূপ। সেই চিরস্মরণীয় ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রার উপরেও আমার সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। আপনি এখন কৃপা করিয়া একটু ছুটী দিউন। ততক্ষণ আমার পত্নী আপনার নিকট বসিয়া গল্প-গুজব করিবেন এখন।"

আমি বুঝিতে পারিলাম, যতক্ষণ সে নিদ্রার সেবা করিবে, ততক্ষণ আমাকে পাহারা দিবার জন্যই রঙ্গমতি ঠাকুরাণীকে ডাকা হইতেছে। সুতরাং আমি কোন কথা না কহিয়া, আমাকে যে সকল কাগজ দিয়াছে, তাহাই গুছাইতে লাগিলাম। এ দিকে রঙ্গমতি নিঃশব্দে তথায় আগমন করিলেন। তখন চৌধুরী সেই খাটের উপর চিৎ হইয়া পড়িল এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই অতি সদাত্মা সাধু পুরুষের ন্যায় সুনিদ্রায় মগ্ন হইল।

রঙ্গমতি আমার প্রতি অতি কুটিল, হিংসা ও ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন,—"আমার স্বামীর সহিত আপনার যে যে কথা হইয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি। আমি হইলে আপনার বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়া এতক্ষণ আপনার জীবন শেষ করিয়া দিতাম।" এই কথার পর তিনি একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে থাকিলেন এবং যতক্ষণ তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ না হইল, ততক্ষণ আর কোন কথা বলিলেন না এবং একবারও আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে চৌধুরী চক্ষু মেলিল এবং উঠিয়া বসিল। তাহার পর স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"প্রিয়তমে রঙ্গমতি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। তোমার ও দিকের সব গোছগাছ ঠিক হইয়াছে? আমার এ দিকে যে সামান্য গোছান বাকী আছে, তাহা ১০মিনিটে শেষ হইবে; কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া তৈয়ার হওয়া ১০ মিনিট। কর্ম্মচারী আসিবার পূর্ব্বে আর কি করিব?" এই বলিয়া সে একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ইঁদুরের খাঁচা দেখিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিল, "আমার প্রধান সামগ্রী এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আমার এই সাধের সোহাগের সন্তানতুল্য ইঁদুরগুলি। ইহাদের কি করিব? এখন তো অবিশ্রান্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিব, কোথাও স্থির হইব না; সুতরাং জিনিসপত্র যত কম হয়, ততই ভাল। এই স্নেহময় পিতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত হইলে কে আমার কাকাতুয়া, ময়ুয়া আর ইঁদুরগুলির যত্ন করিবে?"

অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বকৃত দারুণ দুষ্কর্ম্মের বিষয় স্বহস্তে লিখিতে সে একটুও কাতর হয় নাই; কিন্তু পাখী ও ইঁদুরের ভাবনায় সে এখন বস্তুতই অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর সে আবার ডেক্সের নিকট বসিয়া বলিল,—"এক উপায় মনে পড়িয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ রাজধানীর পশুশালায় আমার কাকাতুয়া ও ময়ুয়া আমি দান করিয়া যাইব। তাহার জন্য যে বর্ণনা-পত্র লিখিত হওয়া আবশ্যক, তাহা এখনই লিখিতেছি।"

সে প্রত্যেক কথা বলিতে বলিতে লিখিতে লাগিল। "নং ১। অতি মনোহর বর্ণসম্পন্ন কাকাতুয়া। যাহারা বুঝে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ আদরের সামগ্রী। নং ২। অতি সুশিক্ষিত বুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকটি ময়ুয়া। নন্দনকাননের উপযুক্ত। জগদীশনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক কলিকাতার পশুশালায় প্রদত্ত হইল।"

রঙ্গমতি বলিলেন,—"কৈ, ইঁদুরের কথা লিখিলে না?"

চৌধুরী ডেক্সের নিকট হইতে রঙ্গমতির সমীপস্থ হইল এবং স্নেহগদ্গদস্বরে বলিল,—"মানব-হৃদয়ের কাঠিন্য ও দৃঢ়তার একটা সীমা আছে। যত দূর আমার সাধ্য, তাহা আমি করিয়াছি। ইঁদুরগুলিকে আমি কোনমতেই ছাড়িতে পারিব না। তাহা হইলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে।"

রঙ্গমতি স্বামীর প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য কোমলতা!" সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। তাহার পর ঠাকুরাণী সযত্নে খাঁচা লইয়া সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে রাত্রির অবসান হইল। তখনও আসিল না দেখিয়া চৌধুরী একটু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। বেলা সাতটার সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হইল এবং অবিলম্বে কর্ম্মচারী দেখা দিল। সে লোকটাকে দেখিলেই বোধ হয়. তাহার হাড়ে হাড়ে দুষ্টবুদ্ধি মাখা আছে। চৌধুরীর মুখে শুনিলাম, তাহার নাম হরেকৃষ্ণ। চৌধুরী তাহাকে ঘরের এক কোণে লইয়া গিয়া কানে কানে ফুস্-ফুস্ করিয়া কি কথা বলিল, তাহার পর প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচারী আমার সমীপস্থ হইয়া বিনীতভাবে পত্রের প্রার্থনা করিল। আমার প্রেরিত গালা-মোহর-আঁটা পত্রখানি এই পত্রবাহক দ্বারা ফেরত পাঠাইবার নিমিত্ত রমেশকে অনুবোধ করিয়া পত্র লিখিলাম এবং সে পত্র কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিলাম। চৌধুরী পুনরায় সেই ঘরে আসিলে কর্ম্মচারী চলিয়া গেল। চৌধুরীর এক আধটু যে কাজ বাকী ছিল, তাহা সে এই অবকাশে সমাপ্ত করিয়া ফেলিল।

বেলা ৮টার একটু আগে কর্ম্মচারী রমেশ বাবুর নিকট হইতে আমার চিঠি ফিরাইয়া আনিল। চিঠি যেমন মোহর-আঁটা, তেমনই আছে; কেহই তাহা খুলে নাই। চৌধুরী পত্রখানি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া দেশলাই জ্বালাইল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিল। তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"মনে করিবেন না দেবেন্দ্র বাবু যে, ভবিষ্যতে আপনি আমার হস্ত হইতে এই অত্যাচারের কোনই প্রতিফল পাইবেন না।" আমি কোন উত্তর দিলাম না।

কর্ম্মচারী যে গাড়ী করিয়া রমেশের নিকট যাতায়াত করিয়াছিল, সেই গাড়ী দরজায় খাড়া ছিল। এক্ষণে কর্ম্মচারীও জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলিতে লাগিল। এ দিকে রঙ্গমতি দেবীও কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। চৌধুরী আমার কানে কানে বলিল,—"আমার সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত আসুন। আপনাকে এখনও বলিবার কথা আছে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিলাম। রঙ্গমতি দেবী ইঁদুরের খাঁচা লইয়া আগেই গাড়ীতে উঠিলেন। চৌধুরী আমাকে পার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"মনোরমা দেবীর সহিত যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে কৃশ ও পীড়িত বোধ হইয়াছিল। সেই নারীকুলোত্তমার তাদৃশ অবস্থা দেখা অবধি আমি অতিশয় চিন্তাকুল আছি। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার প্রতি যত্নের ত্রুটি করিবেন না। এই প্রস্থানকালে আমি সানুনয়ে আপনাকে এই অনুরোধ করিয়া যাইতেছি।"

তাহার পর সে তাহার সেই প্রকাণ্ড শরীর কষ্টে গাড়ীর মধ্যে পূরিয়া ফেলিল। গাড়ী চলিয়া গেল। তখনই গলীর মোড় হইতে আর একখানি গাড়ী আসিল এবং যে দিকে চৌধুরীর গাড়ী গিয়াছে, সেই দিকেই চলিল। যখন আমার ও চৌধুরীর কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া গাড়ীখানি গেল, তখন দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে সেই গণ্ডদেশে দাগযুক্ত যুবক বসিয়া আছেন।

কর্ম্মচারী বলিল,—"আপনাকে আরও আধ ঘণ্টাকাল এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ।"

আমরা পুনরায় সেই উপরের ঘরে গিয়া বসিলাম। চৌধুরী আমার হস্তে যে সকল কাগজ দিয়াছে, তাহাই বাহির করিয়া, যে ব্যক্তি সেই অতি ভয়ানক চক্রান্তের প্রধান চক্রী এবং যে তাহা শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছে, তাহারই স্বহস্ত-লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলাম।

জগদীশনাথ চৌধুরীর কথা।

বহুকাল বহু ভাবে পশ্চিম-প্রদেশে অতিবাহিত করিয়া বিগত ১২৮৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি এ দেশে আগমন করি। আমার সহসা এ দেশে আগমনের গুরুতর গোপনীয় অভিসন্ধি ছিল এবং সেই অভিসন্ধি সাধনার্থ সাহায্যকারিস্বরূপে আরও কয়েক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আসিয়াছিল। রমণী-নাম্নী এক স্ত্রীলোক এবং হরেকৃষ্ণ নামক এক পুরুষ তন্মধ্যে প্রধান। কি সে অভিসন্ধি, যদি তাহা জানিবার জন্য কাহারও কৌতূহল হয়, তাহা হইলে আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহার সে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। এ প্রদেশে আসিয়া প্রথমে কয়েক সপ্তাহকাল আমার স্বর্গগত বন্ধু রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের বাটীতে অতিবাহিত করিব স্থির করিলাম। তিনিও পশ্চিম হইতে সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন এবং আমিও পশ্চিম হইতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এ সম্বন্ধে উভয় বন্ধুর অদ্ভুত সাম্য। তৎকালে আর এক গুরুতর বিষয়ে উভয় বন্ধুর অত্যদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। উভয়েরই সে সময়ে

ভয়ানক অপ্রতুল। টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। সভ্য-জগতে কে এমন ব্যক্তি আছেন যে, আমাদের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন না? যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়হীন অথবা অপরিমিত ধনবান্। প্রকৃত ব্যাপারের স্বরূপ আখ্যানই আবশ্যক। এই জন্য আমি এ স্থলে আমার এবং আমার রাজবন্ধুর আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কথা সরলভাবে সংঘোষিত করিলাম।

মনোরমা-নাম্নী এক অপার্থিব রমণী কর্ত্তৃক আমরা রাজার সেই প্রকাণ্ড ভবনে অভ্যর্থিত হইলাম এবং অনতিকালমধ্যেই সেই সুন্দরীর নিকট আমি হৃদয় বিক্রয় করিলাম। এই ষাটি বৎসর বয়সে আমার হৃদয়ে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকহৃদয়ের ন্যায় প্রেমাগ্নি প্রবলতেজে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যাবতীয় মূল্যবান্ সামগ্রী আমি সেই রমণীরত্নের চরণারবিন্দে উৎসর্গীকৃত করিতে লাগিলাম; আমার নিরপরাধিনী পত্নী কেবলমাত্র অসার পদার্থপুঞ্জই পাইতে থাকিলেন। জগতের এই রীতি, মানবের এই স্বভাব, প্রেমের এই ধর্ম্ম। জিজ্ঞাসা করি, এ সংসারে আমরা ছায়াবাজীর পুতুল ভিন্ন আর কি? হে সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতঃ! কৃপা করিয়া একটু ধীরে আমাদের রজ্জু আকর্ষণ কর। ত্বরায় আমাদের এই নৃত্য-ব্যাপার পরিসমাপ্ত করিয়া দেও। সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বাক্য-মধ্যে এক সম্পূর্ণ দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হইবে। এই দর্শনশাস্ত্র আমার উদ্ভাবিত।

এক্ষণে আরব্ধ উপাখ্যানের অনুসরণ করিতেছি। আমরা কৃষ্ণসরোবরে অবস্থিত হওয়ার পর আমাদের তদানীন্তন অবস্থা স্বয়ং শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরী অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অপরিসীম সৌভাগ্য হেতু তদীয় অত্যদ্ভুত দিনলিপি আমি বিগর্হিত উপায়ে পাঠ করিতে পাইয়াছিলাম। তৎপাঠে আমার দৃঢ়-প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, আমার প্রসঙ্গসমূহ এতই স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন যে, আমার তত্তদ্বিষয়ে আর কোন কথাই বলিবার প্রয়োজন নাই। যে নিরতিশয় কৌতূহলজনক কাণ্ডের বর্ণনা করা আমার আবশ্যক এবং যাহার সহিত আমি সম্পূর্ণরূপে সংলিপ্ত, শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর কঠিন পীড়া হইতে তাহার আরম্ভ ও উৎপত্তি।

এই সময়ে আমাদের অবস্থা বড়ই ভয়ানক। প্রমোদের কয়েকটা গুরুতর দেনা এই সময়ে পরিশোধ করিতে না পারিলে তাঁহার বিপদের সীমা থাকিবে না; আমারও তদ্বৎ প্রয়োজনীয় অপেক্ষাকৃত সামান্য অপ্রতুলের কথা এ স্থলে উল্লেখ না করিলেও হানি নাই। প্রমোদের রাণীর সম্পত্তি আমাদের উভয়ের কেবল একমাত্র ভরসাস্থল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু না হইলে তাহার সিকি পয়সাও হস্তগত হইবার উপায় নাই। বড়ই মন্দ সংবাদ, আরও মন্দ সংবাদ আছে। আমার পরলোকগত বন্ধুর এতদ্ভিন্ন চিন্তার আরও এক গোপনীয় কারণ ছিল। সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া কদাপি তাহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করি নাই। মুক্তকেশী-নাম্নী এক স্ত্রীলোক সন্নিহিত কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে, সে সময়ে সময়ে রাণী লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তৎকর্ত্তৃক একটা রহস্য ব্যক্ত হইলে রাজার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত, এই কয়টি সংবাদ ভিন্ন তৎকালে আমি আর কিছু জানিতাম না। প্রমোদ আমাকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, যদি মুক্তকেশীকে ধরিতে না পারা যায় এবং রাণীর সহিত তাহার আলাপ বন্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশের ইয়ত্তা থাকিবে না। যদি তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অপ্রতুলতার কি হইবে? অপরিসীম সাহসী জগদীশকেও এই আশঙ্কায় কাঁপিতে হইল!

তখন আমি প্রাণপণে মুক্তকেশীর সন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। যদি আমাদের টাকার দরকারের সীমা নাই, তথাপি সে চেষ্টারও বরং দেরী করিলে চলিতে পারে, কিন্তু মুক্তকেশীর সন্ধানে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহে না। আমি তাহাকে কখন দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছিলাম, রাণী লীলাবতীর সহিত তাহার অত্যদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি জানিতে পারিলাম যে, সে বাতুলালয় হইতে পলায়ন করিয়াছে, তখন আমার মনে এক অত্যদ্ভুত কল্পনার উৎপত্তি হইল এবং পরিণামে তাহার অতি বিস্ময়াবহ ফল ফলিল। আমার সেই অভিনব কল্পনা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন-সাধনের পরামর্শ প্রদান করিল। রাণী লীলাবতী ও মুক্তকেশীর পরস্পর নাম-ধাম ও অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে পারিলে সকল বিপদ্ই বিদূরিত হইয়া যাইবে, আমাদের তিন লক্ষ টাকা হস্তগত হইবে এবং রাজা প্রমোদরঞ্জনের গোপনীয় রহস্যও চিরদিনের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন থাকিবে। কি অপূর্ব্ব কল্পনা!

আমার অভ্রান্ত বুদ্ধি স্থির করিল যে, মুক্তকেশী দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আবার কৃষ্ণসরোবরের কাঠের ঘরে আসিবে। অতএব আমি কাঠের ঘরে অপেক্ষা করিয়া থাকিব স্থির করিলাম। গিন্নী-ঝি নিস্তারিণীকে বলিলাম যে, প্রয়োজন হইলে আমাকে

কাঠের ঘরে দেখিতে পাওয়া যাইবে; আমি সেই স্থানে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিব। আমি কখনই অকারণে লোকের অনুসন্ধিৎসা বা সন্দেহ উত্তেজিত করি না। নিস্তারিণী কখনই আমাকে অবিশ্বাস করিত না; উপস্থিত ছলনাও সে অবিশ্বাস করিল না।

এইরূপে কাঠের ঘরে অপেক্ষা করা নিষ্ফল হইল না। মুক্তকেশীর দেখা পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু যে স্ত্রীলোক তৎকালে তাহার অভিভাবিকা, সে আসিয়া দেখা দিল। সেই প্রবীণা স্ত্রীলোকও আমার মিষ্ট কথায় পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না এবং আমাকে তাহার সন্তানবৎ স্নেহের সামগ্রীর সমীপে লইয়া গেল। যখন আমি প্রথমে মুক্তকেশীর সমীপস্থ হইলাম, তখন সে নিদ্রিত ছিল। এই অভাগিনীর সহিত রাণী লীলাবতীর অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া আমার শরীর দিয়া তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল। কল্পনাবলে যে অচিন্তনীয় ব্যাপারের বাহ্যাবয়বমাত্র আমি সংগঠিত করিয়াছিলাম, অধুনা এই নিদ্রিতা নারীর বদন-সন্দর্শনে তাহা পূর্ণমাত্রায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ সুন্দরীর অবস্থা দেখিয়া আমার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় বিগলিত হইল এবং তাহার যাতনা-শান্তির নিমিত্ত আমি চেষ্টান্বিত হইলাম। আমি তাহাকে উত্তেজক ঔষধ দিয়া তাহার কলিকাতাযাত্রার সুযোগ করিয়া দিলাম।

এই স্থানে এক অত্যাবশ্যক প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়া সাধারণের হৃদয় হইতে এক শোচনীয় ভ্রান্তি বিদূরিত করা নিতান্ত আবশ্যক। আমার জীবনের ভূরিভাগ চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা মানবকে অতুলনীয় ক্ষমতাশালী করে, এই জন্য তাহার আলোচনায় আমার অত্যন্ত অনুরাগ। আমি এ কথার অর্থ বুঝাইয়া দিতেছি। মন মানব-রাজ্যের নেতা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু মনের শাসনকর্ত্তা কে?—শরীর। বেশ করিয়া আমার মনের কথা বুঝিবেন। এই অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন শরীর রসায়নবিদের সম্পূর্ণ পদাবনত। যখন কালিদাস মেঘদূতের কল্পনা করিয়া তাহা লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন রসায়নবিৎ জগদীশ চৌধুরী যদি তাঁহার নিত্যখাদ্যের সহিত পদার্থবিশেষের একটু গুঁড়া মিশাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী বটতলার অপেক্ষাও জঘন্য ও অপাঠ্য গ্রন্থ প্রসব করিয়া কলঙ্কিত হইত। বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি নিউটনকে জীবিত করিয়া আমার সমক্ষে লইয়া আইস; আমার সুকৌশলে বৃক্ষ হইতে ফল-পতন দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব তাঁহার মনে উদিত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি সেই ফল ভোজন করিয়া বসিয়া থাকিবেন। আর তোমাদের দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে লইয়া আইস; আমি তাঁহার পোলাও-কাবাবের সহিত এমন সামগ্রী মিশাইয়া দিব যে, ভোজনান্তে তিনি অত্যন্ত কোমলপ্রকৃতিক ভদ্রলোক হইয়া উঠিবেন। আর যে বীরবর প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ও প্রাণ-পাত করিতে প্রস্তুত, আমার হাতে একটা খিলি খাইলে 'রক্ষা কর!' 'রক্ষা কর!' শব্দে তিনি আক্‌বর বাদশাহের পদতলে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইবেন! রসায়ন এমনই অদ্ভুত বিদ্যা! ইহার এইরূপ অপরিসীম ক্ষমতা! কিন্তু এখানে এত কথা কেন বলিতেছি? কারণ, আমার রাসায়নিক অভিজ্ঞতা উপলক্ষ করিয়া লোকে অনেক কুৎসা রটনা করিয়াছে এবং আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়াছে। লোকে বলে, আমি আমার এই বিপুল রাসায়নিক জ্ঞান মুক্তকেশীর উপর প্রয়োগ করিয়াছিলাম এবং সুযোগ হইলে মনোরমা সুন্দরীর উপরেও তাহা প্রয়োগ করিতাম। উভয়ই অতি ঘৃণাজনক মিথ্যাকথা। অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন যে, মুক্তকেশীর জীবন রক্ষা করাই তৎকালে আমার প্রধান আবশ্যক ছিল এবং যে পাশকরা খুনে আমার কথা কলিকাতার বড় ডাক্তার সমর্থন করিতেছেন জানিয়াও জোর করিয়া চিকিৎসা করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করাই আমার প্রধান কামনা ছিল। এই ব্যাপারে দুইবারমাত্র আমি রসায়নের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে দুই স্থলে যে দুই ব্যক্তির উপর তাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। একদা একখানি গরুর গাড়ীর পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর পরম সুন্দর গতি পর্য্যবেক্ষণরূপ অসীম সুখ-ভোগ করার পর উক্ত আরাধ্য শত্রু কর্ত্তৃক গিরিবালার হস্তন্যস্ত পত্রদ্বয়ের একখানি এককালে বাহির করিয়া ও অপরখানি নকল করিয়া লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এই স্থলে দুই কাঁচ্চা সামগ্রীর দ্বারা আমার বুদ্ধিমতী পত্নী উপদেশানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত করেন। আর একবার রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে আমাকে রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আর কোন স্থলেই আমি রাসায়নিক কোন প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান

করি নাই। যদি লোকে এ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ কথা প্রচার করে, তাহা হইলে আমি এই স্থলে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছি। এতক্ষণে হৃদয়ভাবের কিছু লাঘব হইল। তার পর?

রোহিণীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, মুক্তকেশীকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আবশ্যক। দেখিলাম, রোহিণী অতি আগ্রহসহকারে এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার পর কলিকাতায় যাত্রার একটা দিন স্থির করিলাম। সেই দিনে তাহারা রেলে চড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। তখন এ দিকের অন্যান্য গোলযোগে মনঃসংযোগ করিবার সময় হইল। রোহিণী কলিকাতায় গিয়া রাণী লীলাবতীকে আপনাদের ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবে কথা ছিল। কিন্তু যদিই তাহারা অন্যরূপ অভিপ্রায় করিয়া পত্র না লিখে, তাহা হইলে কি হইবে? অতএব গোপনে তাহাদের ঠিকানা জানিয়া রাখা আবশ্যক। আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এ কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম? আমার মন উত্তর দিল— আমার অর্দ্ধাঙ্গ শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবী। সুতরাং তাঁহাকেও সেই গাড়ীতে চড়িয়া কলিকাতা যাইতে হইল। যখন তিনি যাইতেছেন, তখন তাঁহার দ্বারা আরও একটা কাজ সারিয়া লওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। শ্রীমতী মনোরমা দেবীর পরিচর্য্যার জন্য এক জন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। আমার অধীনে এ কার্য্যে অতি নিপুণা রমণী নাম্নী এক স্ত্রীলোক ছিল, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার স্ত্রীর যোগে তাহাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার স্ত্রী, রোহিণী ও মুক্তকেশী একসঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই রাত্রিতে আমার অর্দ্ধাঙ্গ সকল কার্য্য শেষ করিয়া এবং রাণীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রোহিণী যথাসময়ে রাণীকে পত্র দ্বারা তাহাদের কলিকাতার ঠিকানা জানাইয়া পাঠাইল। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি সে পত্র হস্তগত করিয়া রাখিলাম।

সেই দিন মনোরমা সুন্দরীর চিকিৎসকের সহিত আমার অনেক বচসা হইল। মূর্খের চিরন্তন নিয়মানুসারে সে আমাকে নানা অপ্রিয় কথা বলিল, কিন্তু আ মি অনর্থক কলহ করিয়া অসন্তোষ বৃদ্ধি করিলাম না।

তাহার পর আমার কলিকাতায় চলিয়া আসার অতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইল। আগতপ্রায় ব্যাপারের জন্য কলিকাতায় আমার একটা বাসা লওয়া আবশ্যক এবং পারিবারিক কোন কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। ৫নং আশুতোষ দেের লেনে বাসা স্থির হইল। আনন্দধামে রাধিকাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর পত্রাদি আমি গোপনে খুলিয়া পাঠ করিতাম। সুতরাং আমার জানা ছিল যে, তিনি বর্ত্তমান পারিবারিক অকৌশল-নিবারণের জন্য কিছুদিনের নিমিত্ত রাণী লীলাবতীকে আনন্দধামে লইয়া আসিতে রাধিকাবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার উদ্দেশ্যের অনুকূল বোধে আমি এ পত্র নির্ব্বিরোধে যথাস্থানে যাইতে দিয়াছিলাম। অধুনা আমি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকটস্থ হইয়া মনোরমার প্রস্তাবের সমর্থন করিলাম। বলিলাম যে, এ জন্য রাণীকে তাঁহার এক পত্র লেখা আবশ্যক এবং রাণী কলিকাতা হইয়া আসিবার সময় কোথায় রাত্রিবাস করিবেন, সে পত্রে তাহারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কলিকাতায় রাণীর পিসীমার বাসা আছে। সেই বাসাতেই রাণীকে থাকিতে আজ্ঞা করিতে বলিলাম। দেখিলাম, রাধিকাপ্রসাদ রায় লোকটা অতি অপদার্থ। তাহার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে আমার মত দুর্দ্ধর্ষ লোকের কতক্ষণ লাগে? আমি তখনই তাহার নিকট হইতে আবশ্যকমত চিঠি বাহির করিয়া লইলাম।

রায় মহাশয়ের পত্র লইয়া কৃষ্ণসরোবরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেই অকর্ম্মণ্য চিকিৎসকের অব্যবস্থায় মনোরমার পীড়া ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বড় ভয়ানক বিকার দাঁড়াইয়াছে। সে বিকার আবার সংক্রামক। রাণী ঠাকুরাণী পীড়িতার সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য জোর করিয়া মনোরমা দেবীর ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আমার মনের কখনই ঐক্য ছিল না। তিনি আমাকে একবার গোয়েন্দা বলিয়া গালি দিয়াছিলেন; তিনি আমার ও রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। এই সকল কারণে তাঁহার সহিত আমার কোনপ্রকার আত্মীয়তা ছিল না। সুতরাং স্বহস্তে যদি তাঁহাকে আমি সেই ঘরে পূরিয়া দিতাম, তাহা হইলেও অন্যায় হইত না। কিন্তু অসামান্য সহৃদয়তাসহকারে আমি তাহা করি নাই; তাঁহার প্রবেশের ব্যাঘাতও ঘটাই নাই। যদি হতভাগা ডাক্তারটা ব্যাঘাত না দিত, তাহা হইলে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং

...ন। তাহা ...করিয়া ধীরে ...আর প্রয়ো- ...রটা তথায় যাইতে দিল না। কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে সেই দিন ডাক্তার আসিলেন। তিনি আমার সমস্ত কথাই সমর্থন করিলেন। পঞ্চম দিবসের পর হইতে আমার মনোমোহিনী রুগ্নার শুভলক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে আবার একবার আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। আশুতোষ দের লেনে বাসার ঠিকঠাক করা, রোহিণী এখনও তাহার বাসায় আছে কি না, গোপনে তাহার সন্ধান করা এবং হরেকৃষ্ণের সহিত কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ করা আমার দরকার ছিল। সকল কাজ সারিয়া আমি রাত্রিতে ফিরিয়া আসিলাম। আর পাঁচ দিন পরে ডাক্তার বলিলেন যে, পীড়িতার জন্য আর কোন ভয় নাই। এখন বিহিত যত্নে সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিলেই তিনি ত্বরায় আরোগ্য হইয়া উঠিবেন। এই সময়ে ডাক্তারকে তাড়ান নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায় আমি এক দিন তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিলাম এবং অনেক গালিগালাজ করিলাম। প্রমোদকে পূর্ব্বেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলাম; সে এ কলহে মাথা দিল না। ডাক্তার আর আসিবে না বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমিও বাঁচিলাম।

এখন বাড়ীর চাকর-চাকরাণীদের তাড়ান দরকার। প্রমোদরঞ্জনকে অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তৈয়ারী করিলাম। তিনি কেবল একটা নিতান্ত নির্ব্বোধ ঝি ছাড়া আর সব লোকজনকে জবাব দিবার জন্য নিস্তারিণীকে হুকুম দিলেন। নিস্তারিণী অবাক্! কিন্তু যাহাই হউক, বাটী খোলসা হইয়া গেল। যে ঝি থাকিল, সে থাকা না থাকা দুই-ই সমান; কারণ, সে নির্ব্বোধের চূড়ামণি; সুতরাং আমাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার পর নিস্তারিণীকেও কিয়ৎকালের জন্য স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। গিরিবালাকে সন্ধান করার ওজরে তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইলাম। আমাদের যাহা মনোভীষ্ট, তাহা ঠিক হইল।

রাণী উৎকণ্ঠায় নিতান্ত কাতর হইয়া সর্ব্বদা নিজের ঘরে পড়িয়া থাকেন, আর সেই নির্ব্বোধ ঝিটা দিনরাত্রি তাঁহার কাছে থাকে। শ্রীমতী মনোরমাসুন্দরী উত্তরোত্তর আরোগ্য হইতেছেন বটে, কিন্তু এখনও শয্যাগত; রমণী চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার নিকটে থাকে। আমি, আমার স্ত্রী আর প্রমোদরঞ্জন ছাড়া বাটীতে আর কেহ থাকিল না, সকল দিকে এইরূপ সুবিধা করিয়া যে খেলা আমি সাজাইয়াছি, তাহার আর এক চাইল চালিলাম। ভগ্নীর সঙ্গশূন্য হইয়া রাণীকে যাহাতে একাকিনী শক্তিপুর যাইতে হয়, তাহাই আমার চেষ্টা। মনোরমা সুন্দরী অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন, এ কথা যদি রাণীকে না বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি কখনই একাকিনী যাইতে সম্মত হইবেন না। এ কথা তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে বলিয়া রাজবাটীর যে অংশে কোন লোক থাকে না, তাহারই একতম প্রকোষ্ঠে আমরা সেই রুগ্না সুন্দরীকে লুকাইয়া ফেলিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে আমি, আমার স্ত্রী ও রমণী এই তিন জনে মিলিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। প্রমোদ বড় চঞ্চল, এ জন্য তাহাকে ইহার মধ্যে লইলাম না। কি অপূর্ব্ব, কি রহস্যময়, কি নাটকোচিত দৃশ্য! আমার মনোমোহিনী রোগমুক্তির পর প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। যে যে ঘর দিয়া যাইতে হইবে, আমরা তাহার স্থানে স্থানে আলোক স্থাপন করিলাম এবং দ্বারাদি সমস্ত খুলিয়া রাখিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে খট্টা-সমেত রোগিণীকে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। দৈহিক শক্তির আধিক্যহেতু আমি খট্টার মাথার দিক্ ধরিলাম, আর রঙ্গমতী দেবী ও রমণী পায়ের দিক্ ধরিলেন। এই মহামূল্য ভার আমি অপার আনন্দের সহিত বহন করিলাম। আমাদের এই নৈশলীলা চিত্রিত করিতে পারে, এমন চিত্রকর কে আছে?

ভবনের এক নির্জ্জন ভাগে শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীকে রমণীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পর দিন প্রাতে আমি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলাম। রাধিকাবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রীকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এবং যাহাতে কলিকাতার পিসীর বাড়ীতে রাত্রিবাস করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন, কলিকাতায় আসিবার সময় সে পত্র প্রমোদরঞ্জনের হাতে রাখিয়া আসিলাম এবং তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম, আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইলে তিনি যেন সে পত্র তাঁহার রাণীকে দেন। যে বাতুলালয়ে মুক্তকেশী অবরুদ্ধ ছিল, রাজার নিকট হইতে তাহার ঠিকানা জানিয়া লইলাম এবং পলাতকা বন্দিনী পুনরায় ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অধ্যক্ষের নামে একখানি চিঠি লিখাইয়া লইলাম।

আমার বাসায় হাঁড়িকুড়ি পর্য্যন্ত গোছান ছিল; সুতরাং সে বিষয়ে কোন ভাবনা ছিল না। এখন মুক্তকেশী-হরিণীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য আর এক জাল পাতিলাম। এইখানে তারিখের প্রধান দরকার। আমি সব নখদর্পণে রাখিয়াছি; ঠিক বলিতেছি।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কোন উপায়ে রোহিণীকে আগে সরাইবার অভিপ্রায়ে একখানি গাড়ী করিয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গকে পাঠাইয়া দিলাম। রাণী লীলাবতী দেবী কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং রোহিণীর সহিত কথা কহিতে চাহেন, এই কথা বলিতেই রোহিণী আমার অর্দ্ধাঙ্গের সহিত গাড়ীতে উঠিয়া আসিল। তার পর পথিমধ্যে একটা স্থানে একটু বিশেষ দরকার আছে বলিয়া নামিয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। এ দিকে আমি মুক্তকেশীকে বাসায় আনিয়া উপস্থিত করিলাম। মুক্তকেশী তখন হইতে হঠাৎ রাণী লীলাবতী হইয়া পড়িল এবং আমার লোকজন তাহাকে আমার শ্যালক-পুত্রী এবং আমার পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিয়া জানিল।

কিরূপে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিলাম, বলি শুন। এ দিকে যখন এক অর্দ্ধাঙ্গ রোহিণীকে লইয়া নিযুক্ত, তখন অপর অর্দ্ধাঙ্গ অর্থাৎ স্বয়ং জগদীশ রাস্তা হইতে এক ছোকরা ধরিয়া মুক্তকেশীকে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, রাণী লীলাবতী আজিকার দিন রোহিণীকে সঙ্গে রাখিবেন, মুক্তকেশীও যেন পত্রবাহক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাণীর নিকট আইসেন। ভদ্রলোক মহাশয় পথে গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছেন। যেই সংবাদ পাওয়া, সেই মুক্তকেশী আসিল এবং গাড়ীতে উঠিল। হরিণী জালে পড়িল। এরূপ স্থলে, এরূপ ভাবে এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারের অভিনয় সম্পন্ন করিয়া আমি একটু আত্মপ্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বল দেখি, কোন্ কবি এরূপ অত্যদ্ভুত কাণ্ডের কল্পনা করিতে পারেন? কোন্ উপন্যাস-লেখক এরূপ অত্যদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন?

আশুতোষ দের লেন পর্য্যন্ত আসিতে পথে মুক্তকেশী একটুও ভীতভাব দেখাইল না। কেন দেখাইবে? আমি যখন স্নেহের অভিনয় করিব, তাহাতে তখন না গলিয়া থাকিতে পারে, এমন লোক কে আছে? আমি তাহাকে ঔষধ দিয়াছি, তাহাতে তাহার উপকার হইয়াছে; আমি তাহাকে রাজার হস্ত হইতে পলায়ন করিবার উপায় করিয়া দিয়াছি এবং সম্প্রতি রাণীর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দিতেছি। সুতরাং আমার মত বিশ্বাসের পাত্র আর কে আছে? কিন্তু এক বিষয়ে আমি বড় অসাবধান হইয়াছিলাম। সে যে আমার বাসায় আসিয়া রাণীকে দেখিতে পাইবে না, এ বিষয়ে তাহাকে কিছু বলিয়া রাখা উচিত ছিল। আমার বাসায় আসিয়া সে যখন উপরে উঠিল, তখন সম্পূর্ণ অপরিচিতা রঙ্গমতী দেবী ভিন্ন আর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সে নিরতিশয় ভীত, কম্পান্বিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে অভয় দিবার বিস্তর চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সেই চিররুগ্না—যে দারুণ হৃদ্রোগে পীড়িতা ছিল, বিজাতীয় অবসাদ হেতু, সেই পীড়ার অধুনা আতিশয্য ঘটিল এবং তাহার আপেক্ষ আরম্ভ হইল—সে মূর্চ্ছিতা হইল। তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে; আমি বড়ই ভীত হইলাম এবং নিকটস্থ ডাক্তার ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, ডাক্তারটি অতি বিচক্ষণ ও উপযুক্ত। আমি তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম যে, রোগীর বুদ্ধি বড় কম এবং তিনি সময়ে সময়ে বিভীষিকা দেখিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকেন। বন্দোবস্ত করিলাম, আমার স্ত্রী ব্যতীত আর কোন পরিচারিকা পীড়িতার নিকট থাকিবে না। কিন্তু অভাগিনীর পীড়া এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, আমাকে ইষ্টানিষ্টজনক কোন কথাই বলিতে তাহার সাধ্য ছিল না, তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভয় হইল—যদি এই কল্পিত রাণী লীলাবতী, আসল রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যায়।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার হরেকৃষ্ণের বাটীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি রাণীকে পত্র লিখিয়াছিলাম এবং যাহাতে ২৬শে তারিখে রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসা নিশ্চয়ই ঘটে, রাজাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি মুক্তকেশীর অবস্থা দেখিয়া, যাহাতে আরও অগ্রে রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসা হয়, তাহার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় কি? এ স্থলে কোন সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। জগদীশ-দিবাকর তৎকালে রাহুগ্রস্ত হইল।

সে রাত্রিতে কল্পিত রাণী লীলাবতীর অবস্থা বড় মন্দ হইল; কিন্তু প্রাতে তাঁহার অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমারও হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। আমার পূর্ব্বপত্রানুসারে কার্য্য হইলে পরদিন বেলা ১২॥০টার গাড়ীতে বৃষ্ণসরোবর

হইতে যাত্রা করিয়া ৩৷৷০টার সময় রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবার কথা। এ দিকে যখন মুক্তকেশী 'একদিন বাঁচিবে ভরসা' হইতেছে, তখন আর ভয় কি ? তখন রাণীর জন্য যে সব বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহাতে মনঃসংযোগ করা আবশ্যক হইল।

বিখ্যাত ব্রাউন-কোম্পানীর আড়গড়ায় গিয়া রাণীকে ষ্টেশন হইতে আনিবার নিমিত্ত একখানি ব্রুহাম ও জুড়ী ঠিক বেলা ২টার সময় যাহাতে আমার বাসায় আসিয়া পৌঁছে, তাহার অর্ডার রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া আসিলাম। তাহার পর হরেকৃষ্ণের বাসায় গিয়া যাহাতে রাণী উঠিতে পারেন, তাহারও বন্দোবস্ত করিলাম। তাহার পর কল্পিত মুক্তকেশীর বাতুলতা প্রমাণের জন্য যে দুই জন ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইব মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিলাম। তাঁহারা দুই জনেই অতি ভদ্রলোক। পরের উপকারার্থ তাঁহাদের জীবন দীক্ষিত। তাঁহারা উভয়েই আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া আমার প্রয়োজনমত সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে স্বীকৃত থাকিলেন। এরূপ উদারতা তাঁহাদের অত্যুন্নতির পরিচায়ক। তাঁহারা যথার্থই সাধু। এই সকল ব্যাপার শেষ করিয়া যখন আমি বাসায় ফিরিলাম, তখন ৫টা বাজিয়া গিয়াছে, আসিয়া দেখিলাম, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মুক্তকেশী মরিয়া গিয়াছে। ২৫শে মরিয়া গেল—এ দিকে ২৬-এর এ দিকে রাণী কলিকাতায় আসিবেন না ; সর্ব্বনাশ ! জগদীশনাথ অবাক্ ! মনে কর, কি ভয়ানক ব্যাপার ! জগদীশ অবাক্ !

তখন যে মালা গোলা গিয়াছে, তাহা গিলিলে আর উপায় কি ? যে চাইল চালা গিয়াছে, তাহা আর ফিরে না। আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার ভোলানাথ বাবু কৃপা করিয়া সৎকারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি কাতরভাবে 'বল হরি' বলিতে বলিতে খালি পায়ে সৎকার করিতে চলিলাম। তাহার পর নীরবে ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতে প্রমোদের পত্র পাইয়া জানিলাম, সেই দিন ১২৷৷০টার ট্রেণে রাণী লীলাবতী কৃষ্ণসরোবর হইতে যাত্রা করিবেন। যথাসময়ে আড়গড়া হইতে গাড়ী আসিল। কল্পিত লীলাবতী শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসল লীলাবতীকে আনিবার জন্য আমি ষ্টেশনে চলিলাম। মুক্তকেশীর যত কাপড়-চোপড়, সকলই আমি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎসমস্ত গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে জীবিতা রাণী লীলাবতীর শরীরে মৃতা মুক্তকেশীর আবির্ভাব হইবে। কি অদ্ভুত কাণ্ড। বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ উপন্যাসলেখকগণ ! আপনারা এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার মনে রাখিবেন।

নিয়মিত সময়ে ষ্টেশনে গিয়া রাণী লীলাবতীকে গাড়ীতে উঠাইলাম। পথে তিনি ভগ্নীর ভাবনায় বড়ই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখনই আমার বাসায় ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম এবং নিজবাসা বলিয়া তাঁহাকে হরেকৃষ্ণের বাসায় তুলিলাম। যে দুই কর্ত্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোক অপরিসীম সৌজন্যসহকারে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিতে সম্মত ছিলেন, তাঁহারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাণীকে ভগ্নীর বিষয়ে আশ্বস্ত করিয়া আমি একে একে আমার সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ বন্ধুদ্বয়কে রাণীর সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। তাঁহারা অতি বুদ্ধিমান্। সুতরাং সংক্ষেপে সকলই বুঝিয়া লইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে মনোরমা দেবীর পীড়ার ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি হইয়াছে সংবাদ দিয়া আমি ঘটনা খুব পাকাইয়া তুলিলাম।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। চিন্তা ও ভয়ে রাণী লীলাবতীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। রসায়নবিদ্যার অসীম ভাণ্ডার হইতে আমাকে অধুনা সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। এক গ্লাস ঔষধ-মিশ্রিত জল ও এক শিশি ঔষধ-মিশ্রিত স্মেলিংসল্ট রোগীর হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার ভয় ও ভাবনা অন্তর্হিত করিয়া দিল। রাত্রিতে আর একটু ঔষধের সাহায্যে রাণীর সুনিদ্রার সুযোগ করিয়া দিলাম। রমণী স্বহস্তে রাণীর পরিচ্ছদ বদলাইয়া দিল—মুক্তকেশীর পরিচ্ছদ রাণীর দেহে উঠিল। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমি ও রমণী এই পুনর্জীবিতা মুক্তকেশীকে লইয়া বাতুলালয়ে গমন করিলাম। ডাক্তারের সার্টিফিকেট, রাজা প্রমোদরঞ্জনের চিঠি, আকৃতির সমতা, মনের অবসাদ ও অস্থিরতা সকলই অনুকূল হইল, সুতরাং কেহই সন্দেহ করিল না। আসল রাণী লীলাবতীর কাপড়-চোপড় মোট-মোটারি আমার নিকট ছিল। আমি তৎসমস্ত আনন্দধামে পাঠাইয়া দিলাম।

এই অত্যদ্ভুত ঘটনাপুঞ্জের আখ্যান এই স্থলেই পরিসমাপ্ত হইতেছে। ইহার ফলস্বরূপে আমাদের যে আর্থিক লাভ হইল, তাহার বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই অচিন্তনীয় ব্যাপারের—এই কল্পনাতীত কাণ্ডের রহস্যোদ্ভেদ করিতে ইহজগতে কাহারও সাধ্য হইত না। কেবল আমার দুর্ব্বলহৃদয়তা,

আমার প্রগাঢ় প্রেম, সেই সুন্দরীকুলোত্তমা মনোরমার প্রতি আমার অত্যধিক আন্তরিক অনুরাগ, আমার কঠোরতা ও অতি সাবধানতা বিনষ্ট করিয়াছিল; তাহাতেই আজি আমি পরাজিত, আজি আমাদের অবস্থার এই বিপর্য্যয়! পাছে সেই ব্যথিতা সুন্দরীর হৃদয়-বেদনা সংবর্দ্ধিত হয়, এই ভয়ে গারদ হইতে তাঁহার ভগ্নী পলায়ন করিলে আমি তাঁহাদের অনুসরণ করি নাই। আমার সেই একগুঁয়ে পরলোকগত বন্ধুর প্রাণান্ত হওয়ার পর আমি যখন বাতুলালয়ের অধ্যক্ষকে তাহার পলাতকা বন্দিনীকে ধরিয়া দিব বলিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিলাম, তখনও সেই অদম্য প্রেম, সেই কোমলতা আমাকে অভিভূত করিল। আমি উদ্দেশ্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইলাম। পাঠক! এই পরিপক্ক কঠোর-হৃদয় বৃদ্ধের হৃদয়-উদ্যান একবার দর্শন কর। দেখিবে, তথায় প্রেমময়ী শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয়, যুবকবৃন্দ, বদনে কাপড় দিয়া হাস্য কর, আর সুন্দরীগণ! কৃপা করিয়া আমার দুঃখে এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ কর।

আর একটা কথা বলিয়া আমি এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্তের উপসংহার করিব। আমি বুঝিতে পারিতেছি, কৌতূহল-পরবশ লোকেরা এখনও তিনটি বিষয়ে সন্দিগ্ধ আছেন। তাঁহাদের প্রশ্নত্রয় ও তাহার উত্তর নিম্নে লিখিতেছি।

প্রথম প্রশ্ন। শ্রীমতী রঙ্গমতি দেবী আমার একান্ত অনুগত এবং আমার ইচ্ছা পূরণার্থ অতীব দুষ্কর কর্ম্মসাধনেও কখন পশ্চাৎপদ নহেন। এরূপ হইবার কারণ কি? যাঁহারা আমার চরিত্র ও প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন কথাই বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু অন্য লোকের জন্য বলিতেছি, অনুরূপ ভৈরবী পশ্চাতে না থাকিলে কোন ভৈরবই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। শক্তির সাহায্য না পাইলে পুরুষ অকর্ম্মণ্য। স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা এবং অবিচলিত-চিত্তে তাঁহার সেবা ও বাসনা-পূরণই স্ত্রীর ধর্ম্ম। ইহাই না তোমাদের ধর্ম্মনীতি? তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন? আমার ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী ধর্ম্মসূত্র বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এ স্থলে সনাতনধর্ম্মের পূর্ণানুষ্ঠান ঘটিয়াছে। ছিঃ! তবে তোমরা এ সম্বন্ধে কথা কহ কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যে সময়ে মুক্তকেশীর মৃত্যু হইয়াছিল, যদি তখন তাহার মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে আমি কি করিতাম? যদি রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসার পর মুক্তকেশীর মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে আমাকে কি করিতে হইত? তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ নিঃসঙ্কোচে তাহার যাতনাময় জীবনের অবসান করিয়া সুখময় চির-শান্তির উপায় করিয়া দিতাম। তাহা হইলে সেই মানসিক ও দৈহিক রোগগ্রস্ত দুঃখিনীর দেহাবরোধ-নিবদ্ধ আত্মাকে পরম স্পৃহণীয় মুক্তি প্রদান করিয়া সুখী করিতাম। ইহার আবার জিজ্ঞাসা কি?

তৃতীয় প্রশ্ন। সমস্ত ঘটনা ধীরভাবে আলোচনা করিলে আমার চরিত্র কি নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে? আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কদাপি না। এই ব্যাপারের মধ্যে আমি বিহিত-বিধানে অকারণ পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে অক্লেশে রাণী লীলাবতীর জীবনাবসান করিতে পারিতাম। বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, বহু কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া, নিরন্তর বহু যত্ন করিয়া আমি এত কল পাতিয়াছিলাম কেন? কেবল নিষ্পাপ থাকিবার অভিপ্রায়ে। আমার কৃত কার্য্য ও যাহা আমি করিলে করিতে পারিতাম, এতদুভয়ের আলোচনা কর—বুঝিতে পারিবে, আমি কত ধর্ম্মাত্মা—কিরূপ সাধু পুরুষ।

লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আমার এই প্রবন্ধ অসাধারণ সামগ্রী হইবে। তাহাই হইয়াছে। যেমন ব্যাপার, তদনুরূপ বর্ণনা হইয়াছে কি না, সাধারণে বিচার কর। ইতি।

শ্রীজগদীশনাথ চৌধুরী।

(অবিমুক্ত বারাণসীধামের ধর্ম্ম-সভার অন্যতম সভ্য, হরিদ্রানগর জ্ঞান-প্রচারিণী সভার সম্পাদক, বিরাটপুর নীতি-সঞ্চারিণী সভার সভাপতি, কৈবল্যনগরের জমীদার, লাঘব গ্রামের বিজ্ঞান-সভার পৃষ্ঠপোষক, ভূতপূর্ব্ব 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চৌধুরীর লিখিত কাগজ-সমূহের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, যে আধঘণ্টা আমার অপেক্ষা করিয়া থাকিবার কথা, তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হরেকৃষ্ণ মস্তকান্দোলন করিয়া আমাকে প্রস্থানের

অনুমতি দিল। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলাম। হরেকৃষ্ণ বা রমণীর আর কোন কথা ইহজীবনে আমি শুনি নাই। ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে তাহারা পাপের উত্তরসাধকতা করিতে আমাদের সম্মুখীন হইয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে তাহারা কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল, কে বলিতে পারে ?

অত্যল্পকালমধ্যে আমি পুনরায় গৃহাগত হইলাম। অতি অল্পকথায় লীলা ও মনোরমাকে এই বিপজ্জনক ব্যাপারের বৃত্তান্ত বিদিত করিলাম এবং আপাততঃ আমাদের কি করিতে হইবে, তাহারও আভাষ দিলাম। বিস্তারিত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে বলিয়া আমি তখন তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং অবিলম্বে ব্রাউন কোম্পানীর আড়গড়ায় গমন করিলাম। আমার প্রয়োজন অতি গুরুতর, এ কথা জানাইয়া, আমি তাঁহাদের খাতা হইতে একটি সংবাদ জানিবার প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। খাতা বাহির করিয়া তাঁহারা দেখাইয়া দিলেন, ১৮ই জুন অর্থাৎ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে খাতার ঘরে ঘরে নিম্নলিখিত কয়টি কথা লিখিত আছে :—

ব্রুহাম ও জুড়ী। জগদীশনাথ চৌধুরী। ৫নং আশুতোষ দের লেন, সিমুলিয়া। বেলা ২। ১৬। জাফর কোচম্যান।"

উক্ত জাফর কোচম্যানের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলে তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তুমি সিমুলিয়া, ৫নং আশুতোষ দের লেন হইতে একটি বাবুকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছিলে. মনে আছে কি ?"

জাফর, উত্তর দিল,—"হাঁ হুজুর, খুব মনে আছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"কেন এ কথা তোমার মনে থাকিল ?"

সে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে মনে থাকিবে না কেন ? একটা ভয়ানক লম্বা-চৌড়া লোক সে দিন গাড়ীতে সোওয়ার হইয়াছিল। সে কথা সহজে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকটার কথাবার্ত্তাও কি এমন মিষ্ট ! সে বাবুজী এখন কোথায় আছেন ধর্ম্মাবতার ?"

আমি বলিলাম,—"তিনি এখন কলিকাতায় নাই।"

সে বলিল, "আমি তাঁহার জানালার কাছে একটা কাকাতুয়া টাঙ্গান দেখিয়াছিলাম। কি চমৎকার কাকাতুয়া মহাশয় ! কত কথাই পাখীটা বলে।"

আমি বলিলাম, "ঠিক কথা, তাঁহার কাকাতুয়া ছিল বটে। তার পর, তুমি ষ্টেশনে গাড়ী লইয়া গেলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, সেই মোটা বাবু গাড়ীতে উঠিলেন। আমি শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ী লইয়া গেলাম। এক জন রাণীকে সেখান হইতে আনিবার কথা ছিল। সে রাণীর নাম কি ভাল ? আমার মনে আছে—বলিতেছি, আমি—হাঁ—রাণী লীলাবতী। ঠিক, তাঁর নাম রাণী লীলাবতীই বটে, নাম আমার বেশ মনে আছে। আমরা রাজা, রাণী, কি বড়লোকের কাজ একবার করিলে, কখন নাম ভুলি না। কখন কোন উপলক্ষে বখ্‌শীসটা আশটা পাওয়ার আশাতেও বটে, আর পরে আবশ্যক হইলে চাকরী-বাকরীর আশাতেও বটে, আমরা নাম মনে করিয়া রাখি।"

আমি বলিলাম,—"ঠিক কথা ; যাঁহাকে আনা হইয়াছিল, তাঁহার নাম রাণী লীলাবতী বটে।" এ পর্য্যন্ত জাফর যাহা বলিল,তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তারিখের কথা সে বলিতে পারে না, প্রয়োজনও নাই। এই আড়গড়ার রেজেষ্টারী-বহিতে তারিখের চূড়ান্ত প্রমাণ আছে। তখনই আমি খাতা হইতে সেই অংশের নকল তুলিয়া লইলাম। আড়গড়ার অধ্যক্ষকে সমস্ত কথা জানাইলে, তিনি তাহাতে একটা নাম সহি ও কারবারের মোহর করিয়া দিলেন। জাফর কোচম্যানকে আমি দুই তিন দিনের জন্য লইয়া যাইব। সে জন্য কারবারের যে ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণস্বরূপে টাকা জমা দিলে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে দুই তিন দিনের জন্য জাফরকে বিদায় দিলেন।

তদনন্তর আমি সেখান হইতে রমেশবাবুর বাসায় আসিলাম এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। ঐ ব্যক্তিই যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, তাহা তিনি বুঝিলেন এবং তাহাকে আইনের সাহায্যে দণ্ডিত করিবার কোনই উপায় নাই, তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমার যে কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, সত্বর আমি আমার স্ত্রীর স্বত্বপত্র-সমর্থন করিবার জন্য আনন্দধামে যাইব, তাঁহাকেও তদুপলক্ষে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হইলেন ; কিন্তু শেষে অবকাশাভাবে ঘটিয়া উঠিল না।

রমেশের বাসা হইতে বিদায় হইয়া আমি উকীল করালী বাবুর আফিসে গমন করিলাম। এই অনুসন্ধান-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভে আমি করালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে নিতান্ত অভরসার কথা বলিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন যে, "যদি আপনি কখন মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সাহায্য করিব।" আজি আমি মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারিয়াছি, আজি সকল প্রকার অকাট্য প্রমাণ আমার হস্তগত। এত দিন পরে আজি আবার আমি করালী বাবুর আফিসে চলিলাম। তখন ঐ দুই পাপিষ্ঠকে বিহিত বিধানে দণ্ডিত করিবার সংকল্প ছিল। এখন আর সে সংকল্প নাই, কারণ,এখন উভয়েই আমার আয়ত্তাতীত হইয়াছে। তাহা হউক, লীলার স্বরূপত্ব-সংস্থাপন ও তাঁহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয় হইতে এই বিজাতীয় প্রতারণাজাত ভ্রান্তির অপনোদন করা আমার ঐকান্তিক কামনা। যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা সফলিত করিতে পারিলেই আমি পূর্ণ-মনস্কাম হই। লীলা তাঁহার পিতৃব্যের আলয়ে —সেই আনন্দধামে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও আদৃত হইলেই আমার সকল বাসনা চরিতার্থ হয়। উমেশ বাবুর অনুপস্থিতিতে অধুনা করালী বাবুরই এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

করালী বাবু আমার অনুসন্ধানের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও তাহার বর্ত্তমান ফলাফল জ্ঞাত হইয়া যেরূপ অপরিসীম বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ও আমার যত্ন, উদ্যোগ ও কার্য্যপ্রণালীর যেরূপ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রাতে লীলা, মনোরমা, করালী বাবু, তাঁহার এক জন মুহুরী, জাফর কোচম্যান এবং আমি আনন্দধামের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লীলার স্বরূপত্ব সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত না হয় এবং সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে প্রিয়প্রসাদ রায়ের দুহিতা শ্রীমতী লীলাবতী দেবী বলিয়া স্বীকার না করে, ততক্ষণ যে খুল্লতাতের ভবন হইতে তিনি একদা অপরিচিতার ন্যায় অপমানিত ও বিদূরিত হইয়াছেন, তাঁহার সেই পিতৃব্য-ভবনে তাঁহাকে কদাপি লইয়া যাইব না, ইহাই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। তদভিপ্রায়ে আপাততঃ তারার খামারে লীলার অবস্থিতির ব্যবস্থা করিবার জন্য মনোরমাকে পরামর্শ দিলাম। তারামণি আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইল যে, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। যাহা হউক, সেখানে তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া করালী বাবু ও আমি রাধিকা বাবুর সহিত সাক্ষাতের বাসনায় আনন্দধামে গমন করিলাম।

হৃদয়হীন, স্বার্থপর রাধিকা বাবু আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া যেরূপ পাষণ্ডের ন্যায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তাহা মনে করিলেও লজ্জা ও ঘৃণা হয়। কিন্তু আমরা কোন দুর্ব্ব্যবহারে বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিলাম। তখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই ভয়ানক চক্রান্তের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বস্তুতই তিনি যার-পর-নাই অভিভূত হইয়াছেন এবং নিতান্ত ছেলেমানুষটির মত বলিতে লাগিলেন, "যখন লোকে বলিল, আমার ভাইঝি মারা গিয়াছে, তখন আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে, সে এখনও বাঁচিয়া আছে?" আমরা তাঁহাকে একটু ঠাণ্ডা হইতে সময় দিলে তিনি তাঁহার প্রাণের অধিক লীলাকে সাদরে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন। তা সে জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? তিনি তো আর মরিতে বসেন নাই যে, এখনই এ কাজ না সারিলে কোনমতেই চলিবে না। পুনঃ পুনঃ তিনি এইরূপ পাগ্লামীর ও হৃদয়হীনতার কথা কহিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। আমি সবিশেষ দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার এই সকল পাগলামী বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি জোর করিয়া বলিলাম, হয় তিনি স্বেচ্ছায় সরলভাবে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি সুবিচার করুন, নয় তাঁহাকে আইনের সাহায্যে আদালতে টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার দ্বারা আমরা আবশ্যকমত কাজ আদায় করিয়া লইব। তিনি করালী বাবুর দিকে কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিলে করালী বাবুও আমারই কথার সমর্থন করিলেন। তখন অগত্যা তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ব্যবস্থামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন।

করালী বাবু ও আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং ঢোল্ ফিরাইয়া প্রজাবর্গের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলাম যে, রাধিকা বাবুর হুকুম, তাহাদের সকলকে পরশু তারিখে আনন্দধামে আসিতে হইবে। ইত্যবসরে আমি সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে এই চক্রান্তের একটা বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

নিয়মিত দিন উপস্থিত হইল। আনন্দধাম-সংলগ্ন প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সন্নিহিত প্রদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই অত্যদ্ভুত কাণ্ডের বৃত্তান্ত শুনিতে ও লীলাকে দেখিতে সমাগত হইয়াছে। একটা উচ্চ বারান্দার উপর আমাদের বসিবার জন্য চেয়ার পাতা ছিল। শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ রায় মহাশয়কে আমরা জোর করিয়া সেই স্থানে ধরিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহার দুই দিকে দুই জন খানসামা—এক জনের হাতে স্মেলিংসল্টের শিশি, আর এক জনের হাতে গোলাপ-জলের বোতল। রায় মহাশয়ের নিজের হাতে ওডিকঁলো-ভিজান রুমাল।

আমরা সেই স্থানে সমবেত হওয়ার পর শ্রীমতী মনোরমা দেবী লীলাবতীকে সঙ্গে করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সমবেত ব্যক্তি-গণ তুমুল আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই কলরবে রায় মহাশয়ের মূর্চ্ছা হইবার মত হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে, অনেক গোলাপজল-প্রয়োগে এবং স্মেলিংসল্টের সাহায্যে তিনি সে যাত্রা কোনরূপে সামলাইয়া উঠিলেন।

আমি উচ্চস্বরে ধীরে ধীরে আমার লিখিত বৃত্তান্ত ও প্রমোদরঞ্জনের পত্র পাঠ করিলাম। জাফর কোচম্যান তাহার বক্তব্য বিশদরূপে ব্যক্ত করিল। উকীল বাবুও আইনসঙ্গত ব্যাপার অতি মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিলেন। কাহারও মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিল না। সকলেই মহানন্দে মগ্ন হইল। তাহার পর শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমাপার্শ্বস্থ সেই স্মারক চিহ্ন সর্ব্বসমক্ষে ভগ্ন ও বিচূর্ণ করিয়া ফেলি-লাম; রায় মহাশয় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন; সুতরাং তাঁহাকে কয়েক জন ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া গেল। এ দিকে "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল।

আমরা সকলে আনন্দধামে কিছু কাল থাকি. স্বার্থপর, স্বকীয় সুখাভিলাষী, স্বজন-সঙ্গ-বিরোধী রাধিকা-প্রসাদ রায়ের কদাপি তাহা অভিপ্রায়সঙ্গত ও বাসনানুগত হইতে পারে না, ইহা আমরা বেশ জানি ও বুঝি। বিশেষতঃ আমরাও তাদৃশ গলগ্রহ-রূ[illegible]পে সেখানে এক দিনও থাকিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। যে কা[illegible]র্য্যের জন্য আমরা আসিয়াছিলাম, সে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ [illegible] হওয়ার পর আমরা রায় মহাশয়ের নিকট বিদায় প্রা[illegible]র্থনা করিলাম। হৃদয়হীন রাধিকা বাবু একটা মৌখিক [illegible] শিষ্টাচারও করিলেন না। বলি-লেন,—"তা—তা [illegible]বেশ—আচ্ছা!" আমরা সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় বিস্তর লোক আমাদের সঙ্গে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিল।

এত দিনের যত্ন ও অধ্যবসায় সফল হইল। আমাদের দারিদ্র্যই আমাদের এতাদৃশ শুভ পরি-ণামের একমাত্র কারণ। ধনবান্ হইলে আমরা এরূপ ভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতাম না; নিশ্চয়ই তাহা হইলে আমরা আদালতে বিচারপ্রার্থী হইতাম। কোনরূপ অকাট্য প্রমাণাভাবে আমাদের নিশ্চয়ই পরাজয় হইত। যে যে উপায়ে প্রমাণসমূহ ও আভ্য-ন্তরিক বৃত্তান্তসমূহ আমরা জানিতে পারিলাম, আই-নের সাহায্যে তাহা জানিতে পারিতাম কি? আই-নের সাহায্যে হরিমতির সহিত সাক্ষাৎ হইত না। আইনের সাহায্যে কখনই রমেশের অতীত কাহিনী জানিয়া চৌধুরীকে বাধ্য করিয়া সকল সংবাদ আদায় করিতে পারিতাম না। হে করুণাময় বিশ্বজীবন! আমাদিগকে দরিদ্র করিয়া তুমি আমাদের মনোরথ-সিদ্ধির উপায় করিয়া দিয়াছ। তোমার অপার করুণাবলে আজি লীলা পরিচিতা, পুনর্জ্জীবিতা, দুঃখ-বিহীনা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর দুইটি ক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেই বর্ত্তমান উপন্যাস পরিসমাপ্ত হয়।

এই সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠার পর—সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি বিদূরিত হওয়ার পর—আশার সফলতা হেতু সকলেই সুখময় হওয়ার পর, আমার একবার স্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে বাসনা হইল। লীলা ও মনোরমা উভয়েই আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। স্থির হইল, এলাহাবাদ যাইব। প্রিয়বন্ধু রমেশ বাবু এই কথা শুনিয়া যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বড়ই ভাল হইল। এরূপ অকৃত্রিম বন্ধু-সহ দেশভ্রমণে অধিকতর আনন্দ জন্মিবে, তাহার সন্দেহ কি? আমরা মহানন্দে দুই বন্ধুতে রেলে উঠিলাম এবং যথাসময়ে এলাহাবাদ পৌঁছিলাম।

এলাহাবাদে আমরা একটা বাসা ভাড়া করি-লাম এবং সানন্দে চারিদিকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এক দিন মধ্যাহ্নকালেই আমি বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু রমেশ তাহাতে সম্মত হইলেন না: সুতরাং আমাকে একাকী

যাইতে হইল। দুই এক ঘণ্টা পরেই আমি প্রত্যাগত হইলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রমেশ কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে যৎপরোনাস্তি কৌতূহল জন্মিলেও রমেশকে উত্যক্ত করা হইবে আশঙ্কায় আমি বারান্দায় অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। দুই একটা কথাও আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি শুনিতে পাইলাম, রমেশ বলিতেছেন,—"বটে! বাবা সুরেশ, তুমি খুব চিনিয়াছ তো! তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। এত দিন পরে আমার মনের কালি মিটিয়াছে। ভগবান্ তোমায় সুখে রাখুন। তুমি আজিই কলিকাতায় যাইতেছ, যাও; আমিও হয় ত আজিই ফিরিব।" এই কথার পর ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং গণ্ডদেশে দাগযুক্ত সেই যুবা পুরুষ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া মস্তকান্দোলন করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর বোধ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ রমেশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, রমেশ বড় প্রফুল্ল ও আনন্দযুক্ত। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র আমার গলা জড়াইয়া বলিলেন,—"আজি আমার বড় সুসংবাদ। আজি ২৫ বৎসর পরে আমি আমার সেই অভাগিনী ভগ্নীর একমাত্র সন্তানের সন্ধান পাইয়াছি। আমার সেই ভাগিনেয় এই চলিয়া গেল; এখন কলিকাতায় যাইবে। কলিকাতায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাহার নাম সুরেশ। অতি শিষ্ট শান্ত খাসা ছেলে হইয়াছে।"

রমেশের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। এ সংবাদে বস্তুতই আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি সমুচিত কথায় আমার আন্তরিক আনন্দ ব্যক্ত করিলাম।

তাহার পর রমেশ বলিলেন,—"আরও এক অতি ভয়ানক সংবাদ আছে, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে জগদীশনাথ চৌধুরী খুন হইয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"খুন হইয়াছে? কে খুন করিল?"

রমেশ বলিলেন,—"তাহা জানি না। আমার ভাগিনেয় কলিকাতায় তাহার সন্ধান পায় এবং সেই দুর্ব্বৃত্তই যে জগদীশনাথ চৌধুরী সাজিয়া কলিকাতায় আছে, তাহাও জানিতে পারে। সে তদবধি অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে তাহার অনুসরণ করে। আজি সুরেশ দেখিয়া আসিয়াছে, কর্ণেলগঞ্জের নিকটে কে তাহার বুকে ছোরা মারিয়া নিপাত করিয়াছে। তাহার মৃতদেহ এখনও তথায় পড়িয়া আছে।"

আমি বসিয়া পড়িলাম। ভগবান্! তোমার বিচার কি অব্যাহত! কিছুতেই তোমার সূক্ষ্মদর্শী ন্যায়-বিচারের অন্যথা হইবার নহে। যে ঘোর দুষ্কর্ম্মান্বিত মহাপাপী স্বীয় অসামান্য বুদ্ধি-বিদ্যাবলে আমাদের হস্ত অতিক্রম করিয়া, রাজশাসনের চক্ষে ধূলি দিয়া সংসাররাজ্যে বিচরণ করিতেছিল, তোমার ন্যায়-বিচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে তাহার সাধ্য হইল না। তুমি আজ অন্যের অলক্ষিতভাবে তাহার প্রতি তোমার ন্যায়-দণ্ড প্রয়োগ করিয়া তোমার সর্ব্বদর্শিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছ। হা ভ্রান্ত মানব! কৃপাময়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিস্তারের আশা করা নিতান্তই মত্ততা। তখন আমি রমেশকে বলিলাম,—"চল ভাই, আমরা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসি। হয় তো সুরেশের ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে।"

রমেশ বলিলেন,—"না ভাই, এ সম্বন্ধে সুরেশের ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি চল, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া আসাই সৎপরামর্শ।"

আমরা উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কর্ণেলগঞ্জের এক গাছতলায় লোকারণ্য। মধ্যস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য লোকে ঠেলাঠেলি করিতেছে। যাহারা ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কেহ বলিতেছে, "কি চেহারা!" কেহ বলিতেছে, "হায়! হায়!" কেহ বলিতেছে, "নিশ্চয়ই একটা রাজা!" কেহ বলিতেছে, "বাঙ্গালা মুল্লুকের রাজা।" আমরা অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া দেখিতে পাইবার মত স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, চৌধুরীর প্রাণহীন বৃহৎ দেহ ভূশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেই উন্নত সুপ্রশস্ত ললাট, সেই কৃষ্ণ কুঞ্চিত ঘন কেশরাশি, সেই গৌরবর্ণোদ্ভাসিত সুগঠিত মুখশ্রী, সেই কুপথ-চালিত অপরিসীম জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকেতন-স্বরূপ বিশাল মস্তক অধুনা ধূলিধূসরিত; শঠতা ও প্রবঞ্চনার রঙ্গভূমি, যুগপৎ হাস্য ও রোদননিপুণ, পরমশোভাময় নয়নদ্বয় মৃত্যুকালিমায় সমাচ্ছন্ন ও মুদিত! সেই বিলাসিতার বিশাল ক্ষেত্র, সেই সুখসেবিত দেহ এখন জীবনশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন। সেই অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি স্বার্থের জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আর কার্য্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে না; ন্যায়ান্যায়বিচাররহিত হইয়া পরানিষ্টের কল্পনায় আর প্রমত্ত হইবে না

এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া পাপপঙ্কে আর পরিলিপ্ত হইবে না। এইরূপ—এই ভয়ানকভাবে তাহার জীবন-নাটকের যবনিকাপাত হইল। তাহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলের বামভাগে ছুরিকাঘাতের গভীর চিহ্ন রহিয়াছে। সেই আঘাতেই তাহার জীবনান্তসাধন করিয়াছে। শরীরে আর কুত্রাপি কোনরূপ আঘাত-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। সন্নিহিত প্রদেশ রুধিরে প্লাবিত। ক্ষতমুখ হইতে তখনও শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। কে তাহাকে হত্যা করিল, কে এই জঘন্য উপায়ে বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, পুলিস তাহার কোন সন্ধা-নই করিতে পারিল না। চৌধুরী যদিও রমেশ ও আমার ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে, তথাপি তাহার এতাদৃশ পরিণাম দেখিয়া আমরা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলাম। সেই দিনই আমরা এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিলাম।

চৌধুরী-পত্নী রঙ্গমতি দেবী এই ঘটনার পর এলাহাবাদ হইতে এক দিনের জন্যও স্থানান্তরে গমন করেন নাই। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সন্নিহিত জনগণ দেখিতে পাইত, যে স্থানে চৌধুরী নিহত হন, এক অবগুণ্ঠনবতী প্রবীণা কামিনী সেই স্থলে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতেন এবং উভয় হস্তে তত্রত্য ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধীরভাবে আমাদের জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দরিদ্র হইলেও আমরা পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এক বৎসর পরে আমার এক নয়নবিনোদন পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদের সংসার আরও সুখময় ও আনন্দময় করিয়া দিল। আমরা সকলেই অপরিসীম আনন্দে ভাসমান হইলাম, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরমার আনন্দের সীমা থাকিল না। মনোরমা সেই সুকুমারকায় প্রফুল্ল প্রসূনবৎ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এক দিন আমাকে বলিলেন,—"জান দেবেন্দ্র, খোকা কথা কহিতে শিখিলে কি বলিবে? খোকা মধুর ভাষায় ও মধুর স্বরে বলিবে, 'যাদেল মাচি নেই, তালা কায় কি'?"

আমি বলিলাম,—"কেবল খোকাই কি ঐ কথা বলিবে? খোকার বাপ-মা এখনও বলিতেছে এবং চিরদিনই বলিবে, যাদের মনোরমা দিদি নাই, তাহারা বাঁচে কেমন করিয়া?"

ক্রমে ষষ্ঠ মাসে আমরা খোকার অন্নপ্রাশনোৎ-সব সমাধা করিলাম। প্রিয়সুহৃৎ রমেশ বাবু, তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র, পরম শুভানুধ্যায়ী করালী বাবু, রোহিণী ঠাকুরাণী, তারামণি এই কয়-জন আত্মীয় তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র ভবনে সমাগত হইলেন। উমেশ বাবুকে আসি-বার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু নিতান্ত অসুস্থতা হেতু তিনি আসিতে সমর্থ হন নাই। এই আখ্যায়িকার প্রথমাংশে উমেশ বাবুর যে কথা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা তিনি এই সময়ে আমার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

অন্নপ্রাশনের পর কার্য্যোপলক্ষে আমাকে কিছু দিনের নিমিত্ত ঢাকায় যাইতে হয়। প্রথম প্রথম আমি নিয়মিতরূপে হয় মনোরমা, না হয় লীলা-বতীর পত্র পাইতাম। কিন্তু আমি কখন্ ফিরিব, তাহার স্থিরতা না থাকায় শেষ কয়দিন আমাকে আর পত্রাদি লিখিতে বারণ করিয়াছিলাম। গোয়া-লন্দ হইতে সন্ধ্যার পর যে গাড়ী ছাড়ে, আমি তাহা-তেই কলিকাতায় ফিরিলাম। প্রত্যূষে আমি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এ কি! বাসায় জনপ্রাণী নাই—নীরব। লীলা নাই, মনোরমা নাই, খোকা নাই।

বাসার সম্মুখস্থ দোকানদার আমাকে দেখিয়া বলিল,—"বাবু আসিয়াছেন? মা ঠাকুরাণীরা আপ-নার জন্য এই পত্র রাখিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া সে আমাকে একখানি পত্র দিল। তৎপাঠে আমি অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। লীলা তাহাতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা আনন্দধামে গিয়াছেন। কেন গিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ করিতে মনোরমা বারণ করিয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে আমি ফিরিয়া আসিব, তৎক্ষণাৎ আনন্দধামে যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং তথায় গমন-মাত্র সমস্ত ব্যাপার আমি জানিতে পারিব বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ভয় বা চিন্তার কোনই কারণ নাই; এ কথাও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; পত্রে আর কিছুই নাই।

তৎক্ষণাৎ আমি পুনরায় শিয়ালদহ ষ্টেশনাভি-মুখে ধাবিত হইলাম এবং বৈকালে আনন্দধামে পৌঁছিলাম। আমি যখন সেই স্থানে শিক্ষক ছ।

করিতাম, তখন যে ঘর আমার ব্যবহারার্থ নির্দ্ধারিত ছিল, দেখিলাম, লীলা-মনোরমা সেই ঘরেই অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে স্থানে যে চেয়ারে বসিয়া আমি লেখা-পড়া করিতাম, এক্ষণে সেই স্থানে ও সেই চেয়ারে মনোরমা খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। খোকা একটা চুষি-কাঠী চুষিতে চুষিতে লাল ফেলিয়া তাঁহার কাপড় ভিজাইয়া দিতেছে। আর আমি যে টেবিলে কাজ করিতাম, তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া লীলা সেই অতীত কালের অনুরূপ-ভাবে একখানি ছবির বহির পাতা উল্টাইতেছেন।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম,—"ব্যাপার কি? তোমরা এখানে কেন? রাধিকা বাবু জানেন কি—"

আমার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মনোরমা বলিলেন যে, রায় মহাশয় হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাহার পর করালী বাবু তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আনন্দধামে আসিতে বলিয়াছেন।

এতক্ষণে আমার মনে প্রকৃত অবস্থার ছায়াপাত হইল। আমি সম্পূর্ণরূপে তাহা হৃদ্গত করিবার পূর্ব্বে লীলা সকৌতুকে ও ঈষৎ হাস্য সহকারে আমার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"হুজুরের নিকট একটা কৈফিয়ৎ না দিলে আমাদের অপরাধ কোন রকমেই মাপ হইবে না দেখিতেছি, কাজেই ধর্ম্মাবতারের সন্তানের জন্য আমাকে পূর্ব্বকথার উল্লেখ করিতে হইতেছে।"

মনোরমা বলিলেন—"তাই বা কেন? ভবিষ্যতের কথাতেই আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই চঞ্চল শিশুসহ মনোরমা গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমার সম্মুখস্থ হইয়া আনন্দাশ্রু-জ্বলিত-নেত্রে কহিলেন,—"বল দেখি দেবেন্দ্র, আমার কোলে কে?"

আমি বলিলাম,—"যদিও তোমাদের আজিকার কাণ্ড দেখিয়া আমি পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছি, তথাপি আমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই যে, আমি নিজের ছেলে চিনিতে পারি না।"

সেই অতীত কালের ন্যায় সরলতা ও প্রফুল্লতা সহকারে মনোরমা সমুৎসাহে বলিলেন,—"বঙ্গদেশের মধ্যে এক জন গণ্যমান্য প্রধান জমীদারের বিষয়ে ওরূপ ভাবে কথা কহা তোমার উচিত নয়। সাবধান করিয়া দিতেছি, ভবিষ্যতে বিশেষ হুঁসিয়ার হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। জান তুমি, ইনি কে? নিশ্চয়ই তুমি জান না। ইঁহার পরিচয় বলিতেছি, শুন। এই খোকাবাবু শক্তিপুরের জমীদার, আনন্দ-ধামের একমাত্র মালিক। এখন চিনিতে পারিয়া-ছেন কি মহাশয়? খবরদার!"

আমাদের সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও সম্পদে যিনি সাহস ও ভরসা, আনন্দ ও উৎসাহরাশি লইয়া যিনি প্রতিনিয়ত উপস্থিত; যাঁহার স্নেহের সীমা নাই, করুণার সীমা নাই এবং মমতার সীমা নাই; যে দেবী আমাদের রক্ষয়িত্রী, সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সর্ব্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রী, সেই আনন্দময়ীর উল্লিখিত শুভ-ময়, সুখময়, প্রেমময় কথার পর আর বলিবার কথা কি থাকিতে পারে? আনন্দে আমার হস্ত বিকম্পিত হইতেছে—লেখনী হস্তভ্রষ্ট হইতেছে।

সমাপ্ত

অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দিব্যজ্যোতি বিকাশ
পরলোকের সংবাদের তারহীন বার্ত্তাবহ !
শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যে পরলোকের
দুর্জ্জ্ঞেয় সংবাদ-সংগ্রহ-গবেষণায় উন্মাদবৎ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—
তাঁহাদের সেই আত্ম-নিবেদনের কঠোর সাধনার প্রত্যক্ষদৃষ্ট
সুচিন্তারাশি সমন্বয়ে প্রকাশিত
ON THE OTHER SIDE of DEATH অবলম্বনে
বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত প্রামাণ্য মহাগ্রন্থ
পরলোক
সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদের
প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও বহুল গবেষণা পরিদর্শনের সুফল।
মানব মনের চির-প্রহেলিকাময় মৃত্যু-বিভীষিকা
নাশ করিয়া—মৃত্যুভয় দূর করিয়া—যদি কর্ম্মজীবনে অতুল্য উদ্যম লাভ
করিতে চান—যদি শমনের সমনকে তুচ্ছ করিয়া—
জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান ভুলিয়া
নিশ্চিন্তমনে সংসারের মজা লুটিবার সাধ থাকে—স্বর্গ ও নরক কি—মৃত্যুর পর কোথায়—
মানবাত্মার পরিণাম কি—জন্মান্তরবাদ কি ও কেমন - জন্মগত কর্ম্মফল. অদৃষ্টবাদ সত্য না
কুসংস্কার জানিয়া জীবনের মৃত্যু-আতঙ্ক পাপ ও পুণ্যের হাত হইতে
চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করিতে চান,—তবে
ভৌতিক-সাহিত্যের অদ্ভুত গবেষণার
বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থপাঠে—
জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা দূর করুন!
মরণের পথ দিয়া জীবন কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে—
কেমন নূতন জীবন-যৌবন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর হয়—তাহা পাঠে আত্ম-
বিস্মৃত হইবেন—আবাস্তব ভূতুড়ে গল্প বলিয়া অবিশ্বাস
করিতে পারিবেন না।

যাঁহাদের আত্মপ্রাণ-উপেক্ষা সাধনার প্রভাবে এই অদ্ভুত আবিষ্কার
সার্থক হইয়াছে—সেই যুগান্তব্যাপী সাধনামগ্ন মহামনীষী
স্যার অলিভার লজ—
ওয়ালেস—ক্রুক্স ষ্টেড প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণ
বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বর্গ-নরক, ভূতপ্রেত, জন্মান্তরবাদ, ভৌতিক-জগত
সম্বন্ধে কঠোরতমসাধনা, মহান্ চিন্তা ও গবেষণার ফলে যে খাঁটী সত্যের
সন্ধান পাইয়া—অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—এই মহাগ্রন্থে
সেই মানবমঙ্গল চিন্তারাশি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত।
৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার নাটকে
ভূতের আবির্ভাব করেন—তাঁহার নাটকে ভূতেরা পরলোক হইতে ফিরিয়া কেবল ভূলোকে
বিচরণ নহে—রীতিমত কথাবার্ত্তা কহিতেছে—তাহার পর এই পূর্ণ ৩৫০ সাড়ে তিন
শত বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে যে সাধনার চিন্তা—সকল চিন্তাকে পরাজিত করিয়াছিল বড় বড় বিজ্ঞানাচার্য্য—যাঁহারা বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কথা কহিতেন না—তাঁহারাই
অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভৌতিক আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের
আত্মনিয়োগের ফলে আজ শোকসন্তপ্ত মানবের প্রাণে শান্তিধারা বর্ষিত হইয়াছে।
এই মহাগ্রন্থপাঠে অবলীলাক্রমে বাড়ী বসিয়া দিন দুপুরে
ভূত নামাইয়া ভূতের সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতে ভূতের দ্বারা দূর দেশের ও
মৃত প্রিয় আত্মীয়ের সংবাদ লইতে—ভূতকে বশীভূত করিয়া দেশদেশান্তরের জিনিস
অনায়াসে শূন্যমার্গে বহাইয়া আনিতে পারিবেন—ভূতের এরোপ্লেন দেখিবেন
চিররহস্যাবৃত স্বর্গ-নরকের বিশদ বর্ণনা পাঠে জ্বলন্ত—চলন্ত চিত্রের
বায়স্কোপ দেখিবেন! আর দেখিবেন—সম্মোহিনী বিদ্যার
বিশ্বজয়ী শক্তির অপরাজেয় প্রভাব!
শুধু দেখিবেন বলিলে ভুল হয়—পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মিসমেরিজিয়াম বিদ্যা
সুকৌশল অনায়াসে শিখিতে পারিবেন।
কেবল ইহাই নহে—সিদ্ধ মহাত্মাগণ কেমন করিয়া রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া
যোগবলে শূন্যে পরিভ্রমণ করেন—কি কৌশলে অদৃশ্য পথে ভূতেরা শূন্যে মিলাইয়া যায়!
হৃদ্‌কম্প কাণ্ডের অতি বিস্ময়কর বিচিত্র সমাবেশে
আহার-নিদ্রা কর্ম্ম বিশ্রাম ভুলিবেন—শোকার্ত্তের শোক প্রশমিত হইবে!
সুচিন্তাশীল—থিওজফিষ্ট পণ্ডিত—শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ,
বেদান্তরত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।
ভাষা যেমন সরল প্রাঞ্জল—তেমনি সুমধুর—এন্টিকে ছাপা—সুন্দর বাঁধাই—
প্রচার জন্য এই বিরাট গ্রন্থের মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।
স্মরণ রাখিবেন—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির সর্ব্বাগ্রে ভৌতিক-সাহিত্যের
এই অত্যদ্ভুত আবিষ্কারের বিরাটগ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করিল!
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬, বহুবাজার, কলিঃ।